মাসুদ রানা

চাই ঐশ্বর্য

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন



চাই ঐশ্বর্য-১

প্রথম প্রকাশ: ২০০৯

এক

অক্টোবর, ১৯৮৯। কেপ কেনেডি, ফ্লোরিডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

শোয়া নয়, আবার ঠিক বসাও বলে না একে। যদিও বসবার উপযোগী গদিমোড়া একটা আসনেই রয়েছে এয়ারফোর্সের ক্যাপ্টেন ডেভিড মারফি, কিন্তু তার শরীরের পুরো ভর পড়েছে পিঠের উপর। চেয়ারে বসে থাকা অবস্থায় উল্টে পড়লে যা হয়, ঠিক সেভাবে আসলে উর্ধ্বমুখী হয়ে আছে সে ও তার তিন ক্রু। অস্বস্তিকর একটা অবস্থা; সঙ্গে যে সাড়ে চার মিলিয়ন পাউণ্ড ওজনের অতি-দাহ্য জ্বালানি আছে... সে-চিন্তাও দূর করতে পারছে না মাথা থেকে। বিরক্তি নিয়ে শুনছে ও লঞ্চ ডিরেক্টরের রোবট-সুলভ কথাবার্তা—আবেগের বিন্দুমাত্র ছোঁয়া নেই তাতে। এয়ার-কণ্ডিশনড় রুমে বসে আরাম করছে ব্যাটা, অথচ কথা বলছে মরা মানুষের মত। সমস্যাটা কী! জীবনের প্রথম মহাকাশ-যাত্রার মাত্র কয়েক মিনিট বাকি; তারপরও উত্তেজনা অনুভব করছে না মারফি, বরং বিরক্তিটাই ছেঁকে ধরছে ওকে। ইচ্ছে হলো রেডিও-লিঙ্কের ভিতর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে কয়েক মাইল দূরে বসে থাকা লঞ্চ-ডিরেক্টরের টুঁটি চেপে ধরে। তা হলে মন্দ হতো না কিন্তু! মোটকা ডিরেক্টরের চমকে ওঠা চেহারাটা ভেসে উঠল মানসপটে, মৃদু কৌতুক অনুভব করল ও—হেলমেটের ফেস-শিল্ডের ওপাশে হাসি হাসি হয়ে উঠল মুখটা।

ইয়ারপিসে আবার শোনা গেল লঞ্চ ডিরেক্টরের কণ্ঠ। '*আটলান্টিস*, দিস ইজ কন্ট্রোল। এইচ-টু ট্যাঙ্কের প্রেশারাইজেশন ঠিক আছে। ইউ আর *গো* ফর লঞ্চ। ওভার।'

'রজার, গ্রাউণ্ড। উই আর *গো* ফর লঞ্চ।' প্রত্যুত্তর দিল মারফি।

সময় গড়াতে শুরু করল, একঘেয়ে কথোপকথন চলল গ্রাউণ্ড কন্ট্রোল আর মারফির ভিতর। আগে থেকে ঠিক করে রাখা বিভিন্ন পয়েন্টের উপর প্রি-লঞ্চ চেক চলছে, দু'পক্ষই নির্বিকার। একটু পরেই উৎক্ষেপণ, অথচ কারও গলা শুনে সেটা বোঝার উপায় নেই। বাইরে, মহাকাশযানটার ককপিটের তাপনিরোধী জানালাগুলোর ওপাশে জমে বসেছে রাত—পূর্ব ফ্লোরিডাকে ঢেকে রেখেছে নিকষ আঁধার। আকাশের গায়ে মিট মিট করছে অগণিত তারা... সেগুলোর দিকে উড়াল দেবে ওরা খানিক পরেই।

অস্থির বোধ করল ক্যাপ্টেন, দেরি সহ্য হচ্ছে না আর। দূর আকাশের তারাগুলো হাতছানি দিয়ে যেন ডাকছে ওকে।

'*আটলান্টিস*, নিয়ন্ত্রণ এখন অনবোর্ড কম্পিউটারে।'

'রজার,' বলে সায় জানাল মারফি।

ধীরে ধীরে কাউন্টডাউনের শেষ অংশে পৌঁছুল ঘড়ির কাঁটা। এতক্ষণে উত্তেজনা অনুভব করতে শুরু করল মারফি। অগ্নিলারি পাওয়ার ইউনিটের গুঞ্জন,

কিংবা চলতে থাকা বিভিন্ন ফ্যান আর মোটরের আওয়াজ আর শুনতে পেল না... কেমন যেন একটা ঘোর লাগল ওর—মনে হলো নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে ছোট্ট কেবিনটার ভিতর।

'ফাইভ... ফোর... উই হ্যাভ মেইন ইঞ্জিন স্টার্ট...'

সেকেণ্ডের এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে গর্জে উঠল অরবিটার শাটলটার মূল ইঞ্জিন, লাখ লাখ পাউণ্ড ওজনের প্রেশারের সাহায্যে একজস্ট দিয়ে বের করল আগুনের শিখা—সেটা এতই উত্তপ্ত যে, রঙটা একেবারে দুধ-সাদা। লঞ্চ প্ল্যাটফর্মের ধাতব মেঝেতে বসাল নির্মম কামড়। তবে এই বিপুল অগ্নি-নির্গমনের খুব বড় কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না মহাকাশযানটাতে—মাউন্টের উপর একটু শুধু উঁচু হলো ওটা, এই যা। নভোচারীরা একে *টোয়্যাং* বলে।

পাইলটের সিটে বসা ক্যাপ্টেন মারফি অবশ্য অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন ফুয়েলের এই নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণ দেখতে পেল না; শুধুমাত্র শব্দতরঙ্গের ফলে সৃষ্ট ঝাঁকি অনুভব করল। এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধা ভর করল ওর ভিতরে—সব ঠিকঠাক আছে তো?

গ্রাউণ্ড কন্ট্রোল ওদিকে কাউন্টডাউন করে চলেছে। *'থ্রি... টু... ওয়ান...'*

মহাকাশযানটাকে আটকে রাখা ক্ল্যাম্পগুলো সরে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল নিরেট রকেট বুস্টারগুলো। প্রতিটা বুস্টার আটলান্টিসের ইন্টারনাল মোটরের চাইতে দ্বিগুণ শক্তি খরচ করছে। ককপিটে বসা মারফি ও তার তিন ক্রু পিঠে প্রবল চাপ অনুভব করল... তীব্র বেগে উঠতে শুরু করেছে গোটা মহাকাশযানের কাঠামোটা।

বুস্টার ইগনিশনের সঙ্গে সঙ্গে কয়েক হাজার গ্যালন পানির প্রবাহ ঘটিয়ে দেয়া হয়েছে একজস্ট নজল্‌-গুলোর নীচে, তীব্র উত্তাপে বাষ্পে পরিণত হলো তা—সাদা একটা মেঘে ঢেকে গেল বেরিয়ে আসা আগুনের ধারা।

'উই হ্যাভ লিফট্‌-অফ!' ঘোষণা করা হলো গ্রাউণ্ড কন্ট্রোল থেকে।

পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে টাওয়ারকে পেরিয়ে গেল শাটল্‌, আলোকিত করে তুলল চতুর্দিক—সূর্যোদয়ের বহু আগেই যেন ফ্লোরিডা উপকূলে ভোর ডেকে এনেছে। ম্যানগ্রোভ গাছে ভরা জলাভূমিকে নীচে ফেলে উপরে উঠে চলল ওটা, পিছনে রেখে যাচ্ছে প্লাজমা ট্রেইল... ওটাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন রাতের আকাশটার মাঝে ছুরি চালিয়েছে কেউ—দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছে।

খুব দ্রুত গতি বেড়ে চলল মহাকাশযানের—চল্লিশ সেকেণ্ডের মধ্যে সাউণ্ড-ব্যারিয়ার অতিক্রম করল, শব্দের চেয়ে দ্রুতবেগে চলছে ওটা এখন, প্রতি মুহূর্তে দ্রুততর হচ্ছে। দু'মিনিটের ভিতর রকেট বুস্টারগুলোর জ্বালানি ফুরিয়ে গেল, তবে ততক্ষণে ভূপৃষ্ঠ থেকে আটাশ মাইল উপরে পৌঁছে গেছে আটলান্টিস, ছুটছে শব্দের গতির চেয়ে সাড়ে চার গুণ জোরে।

মাধ্যাকর্ষণের টান স্বাভাবিকের চাইতে তিন গুণ হয়ে গেছে ইতোমধ্যে; আরও বাড়তে পারত, কিন্তু অনবোর্ড কম্পিউটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে শাটলের মেইন ইঞ্জিনে ফুয়েলের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করায় সেটা ঘটছে না। মারফির মনে হলো গদিমোড়া সিটটার উপর তাকে ঠেসে ধরে রেখেছে কোনও আসুরিক শক্তি।

অবস্থাটা সহ্য করবার জন্য ট্রেইনিং দেয়া হয়েছে তাকে, নতুন কিছু নয় ব্যাপারটা... তারপরও অনুভূতিটা বিস্ময়কর। হাতল থেকে হাত তোলার মত সামান্য কাজটাও এখন পরিণত হয়েছে অত্যন্ত পরিশ্রমের কাজ; ওটুকু করতে শরীরের সমস্ত শক্তি কাজে লাগাতে হচ্ছে—এমনই প্রবল মাধ্যাকর্ষণের টান।

'আটলান্টিস, উই হ্যাভ এসআরবি সেপারেশন।'

'রজার,' বলল মারফি। 'চমৎকার দৃশ্য!'

আসলেই তা-ই। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, শাটলের এক্সটারনাল ট্যাঙ্কের শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেছে জ্বালানি-ফুরোনো বুস্টারদুটো; পাক খেয়ে নীচ দিকে নামছে... বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে ঘর্ষণে জ্বলছে চোখ-ধাঁধানো আতশবাজির মত। ওটাকে পিছনে ফেলে উপরে উঠে চলল অরবিটার-শাটল, আগের চেয়েও দ্রুতবেগে।

ভূপৃষ্ঠ থেকে বাষট্টি মাইল উচ্চতায় পৌঁছুতেই দিগন্তে উদয় হলো সূর্য। চার নভোচারী মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেদিকে, আর এই ফাঁকে আটলান্টিস পৃথিবীর অ্যাটমোস্ফিয়ার ভেদ করে পৌঁছে গেল মহাশূন্যে। এ এক অদ্ভুত জগৎ—সুন্দর, সুনীল গ্রহটা এখানে স্রেফ একটা রঙচঙা গোলক... শূন্যতার মাঝে ভাসছে নিঃসঙ্গভাবে।

'আটলান্টিস, দিস ইজ গ্রাউণ্ড। ইউ আর নেগেটিভ রিটার্ন। ডু ইউ কপি?'

নেগেটিভ রিটার্নের মানে হলো মহাকাশযানটা এমন একটা উচ্চতা ও দূরত্বে পৌঁছে গেছে, যেখান থেকে উৎক্ষেপণটা আর বাতিল করা সম্ভব নয়। ভালমন্দ যা-ই ঘটুক, উৎক্ষেপণের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া ওদেরকে এখন শেষ করতেই হবে।

'রজার, গ্রাউণ্ড,' হিউস্টন কন্ট্রোলকে জবাব দিল মারফি—ওরা এখন কেপ কেনেডির কাছ থেকে মিশনের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছে। মার্কিন স্পেস-প্রোগ্রামের এই কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্রটার অবস্থান টেক্সাসে।

আট মিনিট পর মেইন-ইঞ্জিনে একটা গরগর শব্দ উঠল—এক্সটারনাল ট্যাঙ্ক থেকে ফুয়েলের শেষ বিন্দুটাও খরচ হয়ে গেছে। থেমে গেল ইঞ্জিনটা, একই সাথে শাটলের ভিতরে নেমে এল পিনপতন নীরবতা। হঠাৎ শরীরটা খুব হালকা মনে হলো মারফির কাছে, মুক্ত দুটো হাত সিটের হাতল থেকে উঠে গিয়ে পেঁজা তুলোর মত ভাসতে শুরু করেছে—পৃথিবীর আকর্ষণ পেরিয়ে এসেছে ওরা। মনটা খুশি খুশি হয়ে উঠল তার—এমন একটা জিনিস অর্জন করতে পেরেছে, যা বেশিরভাগ মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না—স্বপ্নপূরণ।

'আটলান্টিস, গো ফর ই.টি. সেপারেশন।'

'রজার। এক্সটারনাল ট্যাঙ্ক সেপারেশন... নাউ!'

বিদ্যুৎচমকের মত ছোট ছোট কয়েকটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আলগা হয়ে গেল সংযোগ—অরবিটারের ছোট্ট শরীর থেকে খসে পড়ল অবিশ্বাস্য আকৃতির ট্যাঙ্কটা, ঘুরপাক খেতে খেতে চলে যাচ্ছে অ্যাটমোস্ফিয়ারের দিকে। মাটিতে পড়বার আগেই বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণে ছাই হয়ে যাবে।

মারফির পিছনে বসে আছে শাটলের পে-লোড সায়েন্টিস্ট এক্রমও জ্যারেট। মুচকি হেসে সে বলল, 'মাধ্যাকর্ষণ শক্তিটা পদার্থবিদ্যার একটা চিরাচরিত নিয়ম

হতে পারে, তবে নিউটনিয়ান মেকানিক্সও কম যায় না—নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখানোয় ওস্তাদ।'

ওর বলার ভঙ্গিতে হাসি ফুটল সবার মুখে। শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিটা সহজ হয়ে এল মুহূর্তে।

অরবিটে পৌঁছে গেল আটলান্টিস। দু'ঘণ্টা পর খুলে দেয়া হলো পে-লোড বে'র দরজা—বাড়তি তাপ বেরিয়ে যাবার জন্য। ক্রু'রা ব্যস্ত হয়ে পড়ল তাদের প্রাইমারি মিশন টাস্ক নিয়ে। ইতোমধ্যে যিরো-গ্র্যাভিটির বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়তে শুরু করেছে ওদের উপর, আগামীকাল নাগাদ আর স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারবে না। এ-কারণে নাসা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, শাটলটা পৃথিবীর আড়াইশ' মাইল উপরের অরবিটে স্টেবল হবার পর যত দ্রুত সম্ভব পে-লোড লঞ্চ করা হবে।

উত্তেজনা বোধ করছে মারফি এবং ওর অপর তিন সঙ্গী, শরীরে অ্যাড্রেনালিনের নিঃসরণ ঘটছে। সেটা বেশিরভাগ শারীরিক সমস্যাকে চাপা দিতে পারলেও বমি বমি ভাবটাকে দূর করতে পারেনি। এটাই ওদেরকে ধীরে ধীরে অচল করে ফেলবে। নাসার কনভার্টেড বোয়িঙে চড়িয়ে যিরো-গ্র্যাভিটির এসব সমস্যা মোকাবেলা করতে শেখানো হয়েছে ওদেরকে, তারপরও কৃত্রিম পরিবেশ আর সত্যিকার পরিবেশের মাঝে তফাৎটা যে কত বড় হতে পারে, সেটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে নভোচারীরা। পাইলটের চেয়ারে বসে মারফি ভাবছে, সবার আগে বমিটা যেন তাকে করতে না হয়।

'আটলান্টিস, দিস ইজ গ্রাউণ্ড। পে-লোড ডেপ্লয়মেন্টের জন্য এখন তোমাদেরকে ভ্যানডেনবার্গের আণ্ডারে ট্রান্সফার করা হচ্ছে।'

একটা স্যাটেলাইট রয়েছে শাটলের কার্গো-বে'তে; আগেই ঠিক করা হয়েছে, ক্যালিফোর্নিয়ার ভ্যানডেনবার্গ এয়ারফোর্স বেস সেটার ডেপ্লয়মেন্ট তদারক করবে। এই বিশেষ জিনিসটাকে পৃথিবীর অরবিটে স্থাপন করবার জন্যই আসলে পাঠানো হয়েছে আটলান্টিসকে; যদিও নাসার অফিশিয়াল প্রেস রিলিজে এটাকে সায়েন্টিফিক ভেঞ্চার বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

'রজার,' বলে প্রত্যুত্তর দিল মারফি, দ্রুত একটা ঢোক গিলল। পাকস্থলী পাক খাচ্ছে অবিরাম, লালাগ্রন্থিগুলোর ক্ষরণ যেন তিন গুণ বেড়ে গেছে। সারাক্ষণ মুখে জমছে থুতু। 'ভ্যানডেনবার্গ, গো অ্যাহেড, দিস ইজ আটলান্টিস।'

'আটলান্টিস, দিস ইজ ভ্যানডেনবার্গ। পে-লোড ডেপ্লয়মেন্টের জন্য সবুজ সঙ্কেত দিচ্ছি।'

'রজার, ভ্যানডেনবার্গ। সবুজ সঙ্কেত রিসিভ করছি। আঠারো মিনিটের মধ্যে ডেপ্লয়মেন্ট হবে।'

সময়টা খুবই অল্প—ডেপ্লয়মেন্টটা যাতে ডিটেক্ট হয়ে না যায়, সেজন্য ইচ্ছে করেই খুব তাড়াতাড়ি সারা হবে কাজ। ইন্টারনাল রেডিও অন্ করল মারফি। সঙ্গী বিজ্ঞানীকে বলল, 'এডমণ্ড, আঠারো মিনিট তোমার হাতে। কাজ কেমন এগোচ্ছে?'

'রওনা হবার আগে নাশতা খেয়েছিলাম,' স্বভাবসুলভ রসিকতার সুরে বলল জ্যারেট। 'ওটা গলা দিয়ে নামার সময় যতটা ভাল লেগেছিল, উঠে আসার সময়

ততটাই খারাপ লাগছে। তবে চিন্তা কোরো না, টাইমটেবল্ মেইনটেন করতে পারব।'

শাটলের আফট ক্রু-স্টেশনের সামনে বসে আছে সে আর ওয়াল্টার ফ্লেমিং—পে-লোডের অপর বিশেষজ্ঞ। পুরো মহাকাশযানের নিয়ন্ত্রণ তুলে দেয়া হয়েছে তাদের হাতে। স্যাটেলাইটটা নিরাপদে কার্গো বে থেকে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ওরাই এখানকার হর্তা-কর্তা-বিধাতা। রোটেশনাল কন্ট্রোলার নিয়ে কাজ করছে ফ্লেমিং—ওটা আটলান্টিসের রোল, পিচ, ইঅ ইত্যাদিকে সামাল দেয়। জ্যারেটের এক্সপার্টিজ শাটলের ম্যানিপুলেটর আর্মকে নিয়ে। শাটল আর স্যাটেলাইটের কাঠামো, সেই সঙ্গে মাইক্রোগ্র্যাভিটির বিরূপ প্রভাবের কারণে ওদের দুজনের কাজটাই সবচেয়ে কঠিন ও সূক্ষ্ম। ভুল-ত্রুটির কোনও অবকাশ নেই, কারণ ওরা শুনেছে—*মেডিউসা* নামের যে-গোপন স্যাটেলাইটটাকে ওরা স্থাপন করতে চলেছে, সেটা তৈরি করতে ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের আড়াই বিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে। কথাটা সত্যি কি মিথ্যে কে জানে! তবে বাস্তবতা হলো, মহামূল্যবান বস্তুটার ভালমন্দের সমস্ত দায়িত্ব এখন ওদের দুজনের হাতে।

'সাবধানে কাজ করো, এডমণ্ড,' সকৌতুকে বলল ফ্লেমিং। 'ঘাপলা করলে কিন্তু সারাজীবনে আর কখনও সরকার তোমার ট্যাক্স রিফাণ্ড করবে না।'

জয়স্টিক নেড়ে স্টোরেজ র‍্যাক থেকে ম্যানিপুলেটর আর্মটা বের করায় ব্যস্ত জ্যারেট। ব্যঙ্গের সুরে বলল, 'হ্যাঁ, এমনিতে তো রিফাণ্ড করে কৃতার্থ বানিয়ে রেখেছে আর কী!'

'আটলান্টিস, দিস ইজ ভ্যানডেনবার্গ। গ্রাউণ্ড ট্র্যাকিং বলছে তোমরা পজিশনের কাছাকাছি রয়েছ। পে-লোড রিলিজ ইন ইলেভেন মিনিটস্।'

'রজার দ্যাট, গ্রাউণ্ড। ইলেভেন মিনিটস্।' জবাব দিল জ্যারেট। বমি ঠেকাবার জন্য ঢোক গিলল বড় করে।

'খারাপ লাগছে?' জানতে চাইল ফ্লেমিং।

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল জ্যারেট, ঢেকুর তুলল একটা। 'আমাদের অ্যাটিচিউড কেমন?'

'অন দ্য মার্ক... নব্বুই ডিগ্রি কোণে নাক নামিয়ে রেখেছি। এভরিথিং ইজ পারফেক্ট।'

'তারপরও ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না আমার,' অস্বস্তি নিয়ে বলল জ্যারেট। 'অরিজিনাল মিশন প্ল্যানে আমাদের পুরো একটা দিনের সিস্টেমস্ চেক, আর ম্যানিপুলেটর আর্ম নিয়ে প্র্যাকটিস করবার কথা ছিল।'

'ওই প্ল্যানে আমাদের গতকালকে লঞ্চ করবার কথা ছিল, সেটা ভুলে যাচ্ছ কেন? দোষ দিতে হয়, প্রকৃতি-মাতাকে দাও। ঝড়-টা আমাদের কেউ ডেকে আনেনি।' কাঁধ ঝাঁকাল ফ্লেমিং। 'তা ছাড়া... স্যাটেলাইটটা যত কম সময় আমাদের সঙ্গে থাকে, ততই ভাল। ঘাড়ের উপর এমন একটা বোঝা চেপে থাকলে ভাল লাগে না। শুনেছ তো, ওটা কী করতে পারে...'

'বক বক থামিয়ে কাজ করো, বাছারা!' বিরক্ত একটা কণ্ঠ ভেসে এল সামনে থেকে। কর্নেল মাইক ডোনোভানের কণ্ঠ ওটা—শাটল কমাণ্ডার। ফ্লাইটের সার্বিক

দায়িত্ব তাঁর কাঁধে। শাটলের বাকি তিন ক্রু'র মত অনভিজ্ঞ নন কর্নেল, আগেও মহাকাশ-ভ্রমণ করেছেন। ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি ও এয়ারফোর্সের যৌথ উদ্যোগে করা একটা গোপন মিশনে ছ'মাস আগেই একবার এসেছিলেন তিনি।

চুপ হয়ে গেল দুই বিশেষজ্ঞ। পালা করে সামনের ভিডিও মনিটর আর জানালা দিয়ে তাকিয়ে ম্যানিপুলেটর আর্মটা অপারেট করল জ্যারেট, মেডিউসা স্যাটেলাইটের গ্র্যাপেলের সঙ্গে আটকাল ওটা। নিকষ কালো মহাশূন্যের মাঝখানে স্যাটেলাইটের ভার্টিকাল স্ট্যাবিলাইযারটাকে স্রেফ একটা চিকন সাদা রেখার মত দেখাচ্ছে।

'চার মিনিট, জ্যারেট,' ঘোষণা করলেন ডোনোভান।

'রজার,' বলল জ্যারেট। ম্যানিপুলেটর আর্মের এলবো-ক্যামেরা থেকে পাওয়া ভিডিও-ফিডে সেঁটে রয়েছে তার চোখ। ওতে ষাট-ফুট দৈর্ঘ্যের কার্গো-বে'র ভিতরে মেডিউসাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ডেপ্লয় হবার আগ পর্যন্ত সোলার প্যানেল আর ট্রান্সিভার ডিশ ভাঁজ হয়ে রয়েছে স্যাটেলাইটের গায়ে; ওটাকে দেখাচ্ছে বিশাল, কালো রঙের একটা চোঙার মত। কার্গো-বে'র সবক'টা ফ্লাডলাইট জ্বলবার পরও ঘন কৃষ্ণবর্ণটা একবিন্দু হালকা হয়নি—ওটার রেইডার-অ্যাবজর্বিং চামড়া যেন আলোকেও শুষে নিচ্ছে, ঠিক একটা ব্ল্যাকহোলের মত। দৃশ্যমান একমাত্র সেন্সরটা যেন কামানের মুখ, ওটার ভিতরে জট পাকিয়ে রয়েছে সোনালি রঙের নানা রকম ওয়্যার।

শল্যচিকিৎসকের দক্ষতায় ম্যানিপুলেটর আর্মের জয়স্টিক নাড়ল জ্যারেট, মেডিউসাকে তুলে আনল কার্গো-বে'র খাঁজ থেকে। ভূপৃষ্ঠে আর্মটার শক্তি একজন সাধারণ মানুষের বাহুর চাইতে কম, তবে মহাশূন্যে ওটা অনায়াসে এগারো-টন ওজনের স্যাটেলাইটটাকে নড়াতে পারে। বিশাল এক পতঙ্গের বাহুর মত দেখাল ওটাকে, বে-র মেঝের উপর ঝুলিয়ে রেখেছে মেডিউসাকে।

গুড়ুত-গাড়ুত করতে থাকা পাকস্থলীকে সামাল দিতে দম আটকাল জ্যারেট—জয়স্টিক সামান্য নড়লে স্যাটেলাইটটা বাড়ি খেতে পারে শাটলের দেয়ালে, বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে। তাড়াতাড়ি আর্মটাকে বোতাম চেপে লক করল ও, তারপর একটা মোশন-সিকনেস ব্যাগ বের করে তার মধ্যে হড়হড় করে বমি করে দিল।

'আই অ্যাম টেকিং ওভার দ্য লঙ্ক,' বলে উঠল ফ্লেমিং। সঙ্গীকে বাঁচাল আসলে।

ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল জ্যারেট, বিড়বিড় করে ধন্যবাদ জানাল—চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। সিট ছেড়ে উঠে পড়ল সে।

কর্নেল ডোনোভানও উঠল, ভেসে চলে এল ম্যানিপুলেটর আর্ম কন্ট্রোলের পিছনে বসানো ওঅর্ক-প্ল্যাটফর্মে। রেডিওতে বলল, 'ভ্যানডেনবার্গ কন্ট্রোল, দিস ইজ আটলান্টিস। পে-লোড সেপারেশনের জন্য তৈরি আমরা। অ্যাটিচিউড ম্যাচ কনফার্মড।'

স্বস্তি বোধ করল ফ্লেমিং, কর্নেল নিজে দায়িত্ব নেয়ায় ভাল হলো। এ-ধরনের কাজে মাথার উপর ছায়া থাকলে ভাল লাগে।

রেডিওতে এবার নতুন একটা কণ্ঠ শোনা গেল। 'আটলান্টিস, দিস ইজ জেনারেল ফ্র্যাঙ্কলিন। কে ওখানে... মাইক নাকি?'

'ইয়েস, সার। কাউন্টডাউনের জন্য তৈরি আমরা। ছুটিটা শুরু করবার জন্যও।'

স্যাটেলাইট ডেপ্লয়ের পর আরও চারদিন মহাশূন্যে কাটাবে ওরা, মিশনটাকে আর দশটা স্বাভাবিক মিশনের মত দেখাবার জন্য। এ-সময়টাতে সত্যিকার অর্থে কিছুই করবার থাকবে না আটলান্টিসের ক্রু'দের, তাই সময়টাকে ছুটি বলে রসিকতা করছে কর্নেল।

হালকা একটা হাসি শোনা গেল রেডিওতে। জেনারেল বললেন, 'ওকে। আমার মার্ক থেকে এক মিনিট পর শুরু করো কাউন্টডাউন। মার্ক!'

মারফি, জ্যারেট আর ফ্লেমিং শুধু গুজব শুনেছে মেডিউসার সম্পর্কে, তবে পুরো শাটলে একমাত্র কর্নেল ডোনোভানই জানে ওটার সত্যিকার ক্ষমতা। নিঃসঙ্গ কোনও স্যাটেলাইট নয় ওটা, বিশেষ একটা সিস্টেমের অংশ... সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ! সিস্টেমটার চারটে স্যাটেলাইট আগেই স্থাপন করা হয়েছে মহাশূন্যে, মেডিউসার মাধ্যমে ওটা সম্পূর্ণ হবে। পুরো জিনিসটাকে বানাতে আসলেই দুই বিলিয়ন ডলারের বেশি খরচ হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের স্ট্র্যাটেজিক ডিফেন্স ইনিশিয়েটিভের চোখ হিসেব তৈরি করা হয়েছে মেডিউসাকে—অন্যান্য সব স্পাই-স্যাটেলাইট থেকে ওটা একেবারেই ব্যতিক্রম। সামরিক বিশেষজ্ঞরা জানেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের সমস্ত দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র মাটির নীচের অসংখ্য বাঙ্কার ও সাইলোতে লুকিয়ে রেখেছে। সঠিক লোকেশন জানা নেই ওগুলোর, যখন-তখন যে-কোনও সাইট থেকে ছোঁড়া হতে পারে এসব ক্ষেপণাস্ত্র। ওগুলোকে ঠেকাবার জন্য মহাশূন্যে লেযার-ডিফেন্স স্থাপন করেছে মার্কিন সরকার; কিন্তু সমস্যা হলো, লেযারকে সক্রিয় করবার আগে নিক্ষিপ্ত ক্ষেপণাস্ত্রকে ডিটেক্ট করতে হয়। কাজটা সময়সাপেক্ষ, তীব্র গতিতে ছুটতে থাকা একটা মিসাইলকে ট্র্যাক করাও অত্যন্ত কঠিন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, শুধুমাত্র সময়ের অভাবে ওটাকে নিষ্ক্রিয় করা যাচ্ছে না। সমস্যাটার সমাধান একটাই—প্রতিটা সোভিয়েত লঞ্চ-সাইট এবং মিসাইল ডাম্পের লোকেশন জানা থাকতে হবে। ওগুলোর উপর নিয়মিত চোখ রাখলে আর অতর্কিত হামলা চালাতে পারবে না ওরা, মিসাইল লঞ্চ করামাত্র সেটা ডিটেক্ট করা যাবে। এ-জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ল বিশেষ এক-ধরনের স্যাটেলাইট, যেটা মহাশূন্য থেকে মাটি-পাথর ভেদ করে দেখতে পারবে; ফাঁস করে দিতে পারবে চিন বা রাশিয়ার সমস্ত আণ্ডারগ্রাউণ্ড বাঙ্কার আর সাইলোর অবস্থান। এ-চিন্তা থেকেই জন্ম মেডিউসার।

অনেকটা গ্রাউণ্ড-পেনিট্রেটিং সোনারের মত কাজ করবে স্যাটেলাইটটা; তবে শব্দতরঙ্গের পরিবর্তে ওটা ব্যবহার করবে সাব-অ্যাটমিক পার্টিকেল। পার্টিকেল গানের মাধ্যমে ফায়ার করবে মেডিউসা, প্রতিফলিত সঙ্কেতকে রিসিভ করবে সিস্টেমের অন্য চারটে স্যাটেলাইট। পুরো প্রক্রিয়াটা সঠিকভাবে জানা নেই কর্নেল ডোনোভানের, তবে এটা শুনেছেন—কম্পিউটার মডেলে অত্যন্ত কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে মেডিউসা। ভার্চুয়াল টেস্টে কংক্রিট আর স্টিলের তৈরি বাঙ্কার

ডিটেক্ট করতে সক্ষম হয়েছে ওটা। ভিতরে কী ধরনের কেপণাস্ত্র লুকানো আছে, সেটা বলতে পেরেছে; এমনকী মিসাইলের কমাণ্ড বাঙ্কার, সাপোর্ট টানেল, পাওয়ার-কেইবল, এবং কমিউনিকেশন লাইনও চিহ্নিত করতে পেরেছে স্পষ্টভাবে। বিজ্ঞানীদের ধারণা যদি সঠিক হয়, তা হলে মহাশূন্য থেকে সাগরে লুকিয়ে থাকা সাবমেরিন ডিটেক্ট করতে পারবে মেডিউসা, মাইনফিল্ডের ম্যাপ তৈরি করতে পারবে... করতে পারবে আরও অনেক কিছু।

'আটলান্টিস, দিস ইজ ভ্যানডেনবার্গ। টার্গেট এখন চার মাইল দূরে, মিনিটে আট মাইল বেগে কাছে আসছে। ওগুলো তোমাদের দু'হাজার ফুট উপরে।'

সিস্টেমের অন্য চারটে স্যাটেলাইট ওগুলো। ডিজিটাল কাউন্টারে চোখ রেখে ডোনোভান বললেন, 'রজার, গ্রাউণ্ড। পনেরো সেকেণ্ডের মধ্যে ডেপ্লয় করব আমরা।'

চোখের পলকে কেটে গেল সময়টা। রেডিওতে শোনা গেল নির্দেশ, 'আটলান্টিস, স্ট্যাণ্ড বাই ফর পে-লোড সেপারেশন। থ্রি... টু... ওয়ান... মার্ক!'

কন্ট্রোল স্টিকের ট্রিগার চেপে দিলেন ডোনোভান, একই সময়ে ফ্লেমিংও ম্যানুভারিং থ্রাস্টারগুলো সচল করল—শাটলকে একটু নীচে নামিয়ে আনল, যাতে স্যাটেলাইটের সঙ্গে ঘষা না খায়।

কার্গো বে থেকে বেরিয়ে গেল মেডিউসা, গ্রাউণ্ড কন্ট্রোলের নির্দেশ গ্রহণ করতে শুরু করল ওটার কম্পিউটার। ছাতার মত খুলে যেতে থাকল স্যাটেলাইট—বিস্তৃত হলো সোলার-কালেকশন প্যানেল, যন্ত্রটার ইন্টারনাল সিস্টেমকে চার্জ করা হবে ওর সাহায্যে। একটা প্লুটোনিয়াম রিঅ্যাক্টর অবশ্য আছে মেডিউসার, তবে সেটা শুধুমাত্র পার্টিকেল গানকে শক্তি জোগায়। কক্ষপথে সাধারণ চলাফেরাটা সারা হবে সৌরশক্তির সাহায্যে।

সোলার প্যানেলের পর খুলে গেল অন্যান্য টেলিস্কোপিং ও কমিউনিকেশন প্যানেলের ডিশ। অল্প সময়ের মধ্যেই চোঙার মত আকৃতিটা বদলে গিয়ে মেডিউসা পেল হাত-পা ছড়ানো ভৌতিক একটা অবয়ব—পৃথিবীর উপর ভেসে বেড়ানো এক নরকের দূত যেন ওটা। দৃশ্যটা ভিডিও স্ক্রিনে রুদ্ধশ্বাসে দেখল চার নভোচারী।

'ওয়াও!' মুগ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল ফ্লেমিং।

অন্য চারটে স্যাটেলাইট দেখা গেল একটু পরেই, ওগুলোর সঙ্গে পুরোপুরি অ্যালাইন হয়নি মেডিউসা। ভ্যানডেনবার্গ কন্ট্রোল থেকে কম্পিউটারে নির্দেশ পাঠাতেই স্যাটেলাইটের জেট থেকে আগুনের শিখা বেরুল। আস্তে আস্তে নির্ধারিত পজিশনের দিকে এগোতে শুরু করল ভৌতিক আকৃতিটা।

পাইলটের সিট ছেড়ে উঠে এসেছে মারফি, ফ্লেমিঙের কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি মেরে দেখছে ভিডিও-স্ক্রিনের দৃশ্য। অনেকটা আপনমনে বলে উঠল, 'কী অদ্ভুত, না? দেখেই বোঝা যায়, ভাঙার কাজে মন না দিয়ে আমরা যদি গড়ার কাজে মন দিই, তা হলে কত কী-ই না ঘটতে পারে!'

বাঁকা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেন ডোনোভান। বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, 'কার সমালোচনা করছ? সরকারের? কোর্ট-মার্শালে দাঁড়াতে চাও নাকি?'

জবাব দেয়ার সুযোগ পেল না মারফি, ফ্লেমিং মুখ খোলায় বাধা পেল। জানালা দিয়ে তাকিয়ে মেডিউসাকে দেখার চেষ্টা করছিল বিজ্ঞানী, আচমকা বিড়বিড় করে উঠল, 'হোয়াট দ্য...'

'কী হয়েছে?' জানতে চাইলেন ডোনোভান।

সোজা হলো ফ্লেমিং। 'একটা ঝিলিক দেখলাম যেন। মনে হলো, মেটালিক কিছুর গায়ে সূর্যের আলোর প্রতিফলন...'

'তুমি শিয়োর?'

'ইয়েস, কর্নেল। খুব অল্প সময়ের জন্য দেখেছি... কিন্তু দেখেছি যে তাতে সন্দেহ নেই। কিছু একটা আছে ওখানে।'

ভ্যানডেনবার্গের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন ডোনোভান। 'গ্রাউণ্ড কন্ট্রোল, দিস ইজ আটলান্টিস। মেডিউসার পিছনে আমরা একটা কন্ট্যাক্ট দেখতে পেয়েছি। আপনারা কনফার্ম করতে পারেন? জিনিসটা ডেনজারাস প্রক্সিমিটিতে রয়েছে।'

'রজার, আটলান্টিস,' ওপাশে শোনা গেল উদ্বিগ্ন কণ্ঠ। 'এইমাত্র কলোরাডো স্প্রিংসের ইউএস স্পেস কমাণ্ড-সেন্টার থেকে একটা ফ্ল্যাশ-ওয়ার্নিং পেয়েছি। ওরা ওদের রেইডার স্টেশনের পাওয়ার বাড়াচ্ছে ব্যাপারটা ভালমত স্টাডি করবার জন্য। জিনিসটা যা-ই হোক, প্রিলিমিনারি টেলিমেট্রিতে ওটাকে কলিশন কোর্সে দেখা যাচ্ছে। স্ট্যাণ্ড বাই।'

'কী ওটা, ওয়াল্টার?' জিজ্ঞেস করল মারফি।

'কী জানি!' কাঁধ ঝাঁকাল ফ্লেমিং। 'বড় কিছু বলে মনে হয়নি। তবে এতদূর থেকে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়।'

নীরবতা নেমে এল ককপিটের ভিতর। বন্দির তাড়নায় মাঝে মাঝে গোঙাচ্ছে জ্যারেট, সেই সঙ্গে রয়েছে ইঞ্জিন ও মেশিনারির চাপা গুমগুম; আর কোনও আওয়াজ নেই।

কিছুক্ষণ পর আবার জ্যান্ত হয়ে উঠল রেডিও চ্যানেল। 'ভ্যানডেনবার্গ কন্ট্রোল টু আটলান্টিস। মাইক, দিস ইজ জেনারেল ফ্র্যাঙ্কলিন। স্পিড বাড়িয়ে একটু এগোও তোমরা, ভিজ্যুয়াল অ্যাসেসমেন্ট প্রয়োজন আমাদের। মেডিউসার পিছনের জিনিসটা বড্ড ছোট, আমরা অ্যাকিউরেট কিক্স নিতে পারছি না।'

'ঠিক আছে, জেনারেল। আমরা অ্যাটিচিউড পাল্টাচ্ছি।' পাশে তাকিয়ে ইশারা করলেন ডোনোভান। ফ্লেমিং তার কন্ট্রোল প্যানেলে দ্রুত কয়েকটা বোতাম চাপল। গতি বেড়ে গেল শাটলের, মাথা ঘুরিয়ে ছুটতে শুরু করল ধাবমান মেডিউসার পিছু পিছু।

জেনারেল ফ্র্যাঙ্কলিন বললেন, 'আটলান্টিস, গ্রাউণ্ড ট্র্যাকিঙে দেখা যাচ্ছে, তোমরা মিনিটে মাত্র পঞ্চাশ ফুট দূরত্ব কমাতে পারছ মেডিউসার সঙ্গে। স্পিড বাড়াও, প্লিজ। স্যাটেলাইটটার এক হাজার ফুটের মধ্যে পৌঁছুতে হবে তোমাদেরকে।'

'রজার, গ্রাউণ্ড।'

কর্নেল ডোনোভান আর ফ্লেমিং ব্যস্ত হয়ে পড়ল শাটলকে মেডিউসার কাছাকাছি নিয়ে যেতে। মারফি ফিরে গেল নিজের সিটে। কী ঘটছে, সেটা

সামনের মেইন-ভিউ উইণ্ডো দিয়ে দেখার ইচ্ছে। নিঃসীম অন্ধকার মহাশূন্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কর্নেল ডোনোভানের কণ্ঠ শুনতে পেল ও। আমেরিকান স্পেস কমাণ্ডের প্রধান জেনারেল ক্র্যাঙ্কলিনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন তিনি। ইতোমধ্যে মেডিউসা তার নির্ধারিত পজিশনে পৌঁছে গেছে।

'রেঞ্জ, পাঁচ হাজার গজ। ছুটে আসা জিনিসটা পনেরো সেকেণ্ডের মধ্যে আমাদের পাখিগুলোর কাছে পৌঁছে যাবে।'

মনে মনে উল্টো গুনতে শুরু করল মারফি। আট সেকেণ্ডের মাথায় পৃথিবীর ঝাপসা নীল দিগন্তের উপরে পাঁচটা স্যাটেলাইটকে জ্বলজ্বল করতে দেখল ও। সোনালি রঙের ফড়িঙের মত লাগছে ওগুলোকে, আলোর প্রতিফলনে খুঁটিনাটি বোঝা যাচ্ছে না। চার সেকেণ্ডের সময় পরিষ্কার হয়ে এল দৃশ্যটা—ডায়মণ্ড ফরমেশনে ভাসছে পাঁচটা স্যাটেলাইট, রিসিভার প্ল্যাটফর্ম আর কালেকশন ডিশ মেলে। দু'সেকেণ্ডের মাথায় রুপালি একটা ঝিলিক দেখতে পেল ও একটা স্যাটেলাইটের পিছনে—এত ছোট যে ঠিকমত চোখেই পড়ে না বলতে গেলে।

'নাউ!' শিকারে শোনা গেল জেনারেলের কণ্ঠ।

ঠিক পরমুহূর্তে ছোট্ট জিনিসটা আছড়ে পড়ল স্যাটেলাইটের কালেকশন ডিশের উপর—পুরনো একটা ম্যাগনেটিক-টর্ক রেঞ্চ, পঁচিশ বছর আগে একটা স্পেস-ওয়াকের সময় নভোচারীর হাত থেকে খসে পড়েছিল ওটা। স্রেফ একটা জঞ্জাল... এমন অসংখ্য প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট জঞ্জালে ভরে আছে মহাশূন্য। কিন্তু সামান্য জঞ্জালটাই যা ঘটাল, তা অবিশ্বাস্য।

কালেকশন ডিশটাকে ভেঙেচুরে বেরিয়ে গেল রেঞ্চটা। শূন্যের ভিতর শব্দ চলতে পারে না বলে কিছু শোনা গেল না, তবে প্রচণ্ড সেই সংঘর্ষে পুরো স্যাটেলাইটের ব্যালান্স নষ্ট হয়ে গেল। বিস্ফারিত চোখে স্যাটেলাইটটাকে পাক খেতে দেখল মারফি, তিন চক্কর খেয়ে ওটা আছড়ে পড়ল মেইন স্যাটেলাইটের গায়ে।

ডোনোভান ঘটনার বর্ণনা দিয়ে চলেছেন। জেনারেল আঁতকে উঠলেন, 'ওহ্ গড! গেল ওটা!'

চোখের সামনে পাক খেতে খেতে পৃথিবীর দিকে নেমে যাচ্ছে মেডিউসা। সেদিকে তাকিয়ে মারফি বলল, 'ঠিক ধরেছেন, জেনারেল।'

আটলান্টিসের দুইশ' বাট মাইল নীচে, স্পেস-কমাণ্ডের কন্ট্রোল রুমে স্থবির হয়ে বসে আছেন জেনারেল টেরেন্স ক্র্যাঙ্কলিন, বিশাল স্ক্রিনে প্রত্যক্ষ করছেন আমেরিকার সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে ব্যয়বহুল দুর্ঘটনা। মাত্র সাড়ে তিন মিনিটের ব্যবধানে অকল্পনীয় অর্জন থেকে পুনরুদ্ধারের অযোগ্য এক বস্তুতে পরিণত হয়েছে মেডিউসা। পার্টিকেল গানের প্ল্যাটফর্ম থেকে পাঠানো টেলিমেট্রি দেখে বোঝা যাচ্ছে, ক্রমশই নীচে নামছে ওটা। গ্রাউণ্ড কন্ট্রোল থেকে চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু কোনও ধরনের সঙ্কেতে সাড়া দিচ্ছে না মেডিউসা, কিছুতেই চালু করা যাচ্ছে না ওটার ম্যানুভারিং রকেট। কঠোর বাস্তবতা হলো, পড়ে যাচ্ছে ওটা... এবং কন্ট্রোল

পাশে বসা এক কম্পিউটার টেকনিশিয়ানের দিকে তাকালেন জেনারেল—পাগলের মত কিবোর্ড টেপাটেপি করছে সে। বললেন, 'অটোনমাস ফ্লাইট প্রোগ্রামটা চালু করে দেখো।'

'করেছি, সার। রেসপন্স পাইনি। সেন্ট্রাল প্রসেসরটা অফলাইন হয়ে আছে।'

'যত্তসব!' গজগজ করে উঠলেন জেনারেল। 'হতচ্ছাড়া জিনিসটার মধ্যে কোনও কিছু কি আদৌ কাজ করছে?'

'পার্টিকেল গানটা স্ট্যাণ্ডবাই আছে, সার। সমস্ত এনক্রিপশন রুটিনও ঠিকঠাক কাজ করছে।'

'বাহ্ বাহ্,' সখেদে বললেন জেনারেল, 'দারুণ কাজ দেখিয়েছে বটে আমাদের বিজ্ঞানীরা! পুড়ে ছাই হয়ে যায় তো যাক, কিন্তু ছবি তুলতে কোনও অসুবিধে নেই। অসুবিধে নেই গোপনে ডেটা পাঠাতেও!' বিতৃষ্ণা ফুটল তাঁর চেহারায়। টেকনিশিয়ানের দিকে তাকালেন। 'আর কতক্ষণ?'

'পঁচিশ সেকেণ্ডের মধ্যে অ্যাটমোস্ফিয়ারে ঢুকবে মেডিউসা,' কম্পিউটারে চোখ রেখে বলল লোকটা। 'টোটাল লস ইন থারটি সেকেণ্ডস্।'

মাথা নাড়লেন জেনারেল ফ্র্যাঙ্কলিন। তাঁর গোটা ক্যারিয়ার ঊর্ধ্বাকাশে পুড়ে ছাই হতে চলেছে। 'ওর পজিশন এখন কোথায়?'

'নর্দার্ন আফ্রিকার উপরে, সার। দক্ষিণ-পুবে যাচ্ছে। ভারত মহাসাগরের উপর ছড়িয়ে পড়বে ছাইটা।'

'তা হলে পার্টিকেল গানটা চালু করো,' নির্দেশ দিলেন জেনারেল। 'মরার আগে দু'চারটে ছবি তুলে যাক, মান-ইজ্জত হয়তো রক্ষা পাবে তাতে। কেউ বলতে পারবে না, সোয়া দুই বিলিয়ন ডলারের ক্যামেরাটা একটা স্ন্যাপও নেয়নি।'

'সার?' ভুরু কোঁচকাল টেকনিশিয়ান। কথাটা ঠিকমত বুঝতে পারেনি।

'যা বলছি করো!' খেঁকিয়ে উঠলেন জেনারেল।

কিবোর্ডে দ্রুত কয়েকটা বোতাম চাপল টেকনিশিয়ান, সঙ্গে সঙ্গে মেডিউসার প্লুটোনিয়াম রিঅ্যাক্টর চালু হয়ে গেল। সুপার-চার্জড্ পজিট্রনের একটা ধারা বয়ে গেল উত্তর আফ্রিকার উপর দিয়ে—শুরুটা হলো চাদ থেকে, তারপর ধারাটা সুদান, ইথিওপিয়া আর জিবুতি হয়ে সোমালিয়ায় গিয়ে থামল। পুরো দুই হাজার বর্গমাইল এলাকার ছবি তুলল মেডিউসা, তবে তা কাজে লাগার মত কিছু নয়। সাব-সারফেস টপোগ্রাফির স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি পেতে হলে এলাকাটার উপর আরও কয়েক দফা ঘুরতে হবে মেডিউসাকে, যা সম্ভব নয় এখন।

অ্যাটমোস্ফিয়ারে পৌঁছে গেল স্যাটেলাইট। বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণে পুড়তে শুরু করল ওটার শরীর। তেজস্ক্রিয় বিস্ফোরণ ঠেকাতে প্লুটোনিয়াম রিঅ্যাক্টরটা বন্ধ হয়ে গেল স্বয়ংক্রিয়ভাবে। জ্বলন্ত একটা উল্কার মত নামতে থাকল ওটা, ধীরে ধীরে আকারে ছোট হয়ে আসছে।

গ্রিক পুরাণে মেডিউসা ছিল এক ডাইনি, যে তার দৃষ্টি দিয়ে মানুষকে পাথরে পরিণত করতে পারত... মৃত্যুর দৃষ্টি ছিল ওটা। অনেকটা তেমনই একটা কাজ করতে চলেছে এই আধুনিক মেডিউসা। ধ্বংস হচ্ছে বটে, কিন্তু আফ্রিকার বিস্তীর্ণ পতিতভূমির গভীরে... লাখ-লাখ টন মাটি-পাথরের তলায় অদ্ভুত একটা কিছু

দেখে ফেলেছে স্যাটেলাইটটা। এমন এক জিনিস, যা গত দু'হাজার বছরের বেশি সময় ধরে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এই রহস্য কখনও প্রকাশ পাবার নয়, কিন্তু পেতে চলেছে। প্রাচীন সেই ডাইনির মত এই মেডিউসাও তার দৃষ্টির মাধ্যমে ডেকে আনছে মৃত্যু।

দুই

সাম্প্রতিক সময়। জানুয়ারি মাস। উত্তর ইরিত্রিয়া।

মরতে বসেছে এরিক অ্যান্ডনার, কিন্তু তা নিয়ে মোটেই পরোয়া করছে না।

গত একটি ঘণ্টা ধরে তাকে যে-অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে, মরণ এলে বরং সেটা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। কষ্টটা এতই অসহনীয় যে, বাঁচার ইচ্ছে উবে গেছে তার। সারা শরীর দপদপ করছে ব্যথায়, পানিশূন্যতায় আক্রান্ত হয়েছে একই সঙ্গে—গলা শুকিয়ে কাঠ, চামড়া খসখসে হয়ে গেছে। ধাওয়া খেয়ে ছোটাছুটি শুরু করবার একটু পরই ঘাম বন্ধ হয়ে গেছে, খাকি বুশ-শার্ট আর প্যান্টে এখন শুধুই শুকনো লবণের প্রলেপ... একসময় ঘামে ভেজা ছিল ওগুলো। শুরুতে মনে হচ্ছিল, তাড়া করতে থাকা লোকগুলোকে সে হারিয়ে দিতে পারবে; কিন্তু সময় গড়ানোর সঙ্গে পরিষ্কার হয়ে গেছে, এই রুক্ষ-অনুর্বর মরুভূমিতে স্থানীয় সন্ত্রাসীদের টিকে থাকার ক্ষমতা অনেক বেশি। স্রেফ সময়ের ব্যাপার, শিকারকে ওরা ঠিকই বাগে পাবে। ঘটছেও তা-ই। অ্যান্ডনার কাহিল হবার সঙ্গে সঙ্গে কাছাকাছি পৌঁছে গেছে তারা। পিছনে ওদের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে, বাতাসে ভেসে আসা অপরিচ্ছন্ন দেহের বোটকা গন্ধও পাচ্ছে সে।

চারজন লোক, প্রত্যেকের হাতে একটা করে এ.কে-ফোরটি সেভেন রয়েছে। চাইলে অনেকক্ষণ আগেই গুলি করে ফেলে দিতে পারত অ্যান্ডনারকে, কিন্তু তা না করে খেলছে ওকে নিয়ে। একদল শিকারী কুকুরের মত তাড়া করে ফিরছে ওকে, আতঙ্কিত করে তুলছে চেঁচামেচি আর ফাঁকা গুলি করে। চিন্তাভাবনা করতে পারছে না আর বেচারা, ছুটছে স্রেফ বাঁচার তাগিদে। গত একটি ঘণ্টা ধরে চলছে এসব... নির্মম, ভয়ঙ্কর, আতঙ্কের একটি ঘণ্টা। শারীরিক সহ্যশক্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে অ্যান্ডনার, ইন্সটিঙ্কট বলছে—পালানোর চেয়ে এখন রুখে দাঁড়ানোই উত্তম, লড়াই করে মরা ভাল। শত্রুরাও তা-ই চাইছে।

ক্যাম্পে ফেরার খানিক আগে একটু পানি খেয়েছিল অ্যান্ডনার—সেটাই শেষ। এই এলাকার অসংখ্য বক্স-ক্যানিয়নের মধ্যে আরেকটায় ঢুকেছিল সে আজ, বরাবরের মত ব্যর্থই হয়েছে তল্লাশিটা। ওর স্থানীয় গাইড মপাই রয়ে গিয়েছিল ক্যাম্পে, জিনিসপত্রের পাহারায়—সবসময়ের মত। ইরিত্রিয়ার উত্তরাঞ্চলের রুক্ষ, পার্বত্য এলাকায় আজ ওদের অষ্টম দিন। একেবারে বিরানভূমি এ-অঞ্চলটা। মাটি নেই, পানি নেই, নেই বৃষ্টি-বাদলও। কৃষিজীবী ইরিত্রিয়ানরা তাই কখনও বসত গড়েনি এখানে। অ্যান্ডনার মোটামুটি নিশ্চিত ছিল, ইটালিয়ান উপনিবেশ আমলের

পর সে আর তার গাইড-ই প্রথম এই এলাকায় পা রেখেছে।

বেলা এগারোটা বাজার খানিক আগে ক্যাম্পে ফিরেছে অ্যাভনার। ছোট একটা বালুঝড় উঠেছিল ফেরার পথে—চোখ কচকচ করছিল তাতে, নাক-মুখ বন্ধ হয়ে যেতে চেয়েছিল। তাই মুখে ব্যানডানা বেঁধে, এক্সপিডিশন-হ্যাটটা নিচু করে এগোতে হয়েছে তাকে। কিছু দেখতে পায়নি, শুধু ক্যাম্পের কাছে এসে শুনেছে ফটফট শব্দ... জোর বাতাসে পতাকার মত উড়ছিল ওর আর ম্‌পাইয়ের তাঁবুর ফ্ল্যাপ।

চোখ তোলার পর অবাক হতে হয়েছে—অভিযান শুরুর পর এই প্রথম ওকে স্বাগত জানাতে ভুলে গেছে গাইড—হয়তো কাছেই কোথাও গেছে। সাধারণত ক্যাম্পফায়ারের পাশেই পাওয়া যায় শীর্ণদেহী ইরিত্রিয়ান লোকটাকে; দিনভর চা বানায়, আর মগের পর মগ গেলে। আজ অগ্নিকুণ্ডটাই জ্বলছে না, কে যেন লাথি মেরে নিভিয়ে দিয়েছে। ছাই ছড়িয়ে রয়েছে চারপাশে। ম্‌পাইয়ের শখের কেতলিটা পড়ে আছে বালুর উপর। ক্লান্ত ছিল অ্যাভনার, এসব কিছুই লক্ষ করেনি। বিপদ নিয়ে মাথাই ঘামায়নি; নিজের তাঁবুর সামনে ক্যাম্প-টুলে বসে বুটের ফিতে খুলতে লেগে গিয়েছিল।

অচেনা একটা গন্ধে হঠাৎ সচেতন হয়ে ওঠে ও, ঘাড়ের পিছনের খাটো চুলগুলো দাঁড়িয়ে যায় সরসর করে। বিপদের আশঙ্কাটা তখুনি অনুভব করে প্রথমবারের মত, মনে হয় যেন আড়াল থেকে কেউ দেখছে ওকে। মোজা না খুলেই দাঁড়িয়ে যায় তড়াক করে।

কিছু বুঝে ওঠার আগে হুড়মুড় করে ওর সামনে এসে পড়ে ম্‌পাই। অজানা কোনও শক্তি যেন ছুঁড়ে দিয়েছে তাকে, ধপাস করে লুটিয়ে পড়ে বালিতে। পিছাতে গিয়ে অ্যাভনারও পড়ে যায়। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখে, গাইড লোকটা ওর কয়েক হাত দূরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে।

সারা মুখ রক্তে রঞ্জিত ম্‌পাইয়ের, লাল ধারা বেরিয়ে এসেছে চোখের কোটর থেকে... ওখানে মণি নেই! কখন ঘটেছে ব্যাপারটা, কে জানে! কিন্তু দেখা গেল মাছি ভন ভন করছে কালচে গহ্বরদুটোর কাছে। মৃদু স্বরে গোঙাল ম্‌পাই, দু'হাতে ভর দিয়ে এগোতে চাইল নিয়োগকর্তার দিকে।

নিজের অজান্তেই চেঁচিয়ে উঠেছিল অ্যাভনার। পাকস্থলী পাক দিয়ে ওঠায় বিবমিষা অনুভব করে। বসে থাকা অবস্থায় হাত-পা ছুঁড়ে পিছিয়ে যায়, সামনে পড়ে থাকা রক্তাক্ত দেহটা যেন কোনও বিষাক্ত জিনিস, ছুঁলেই মারা যাবে ও।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই গোঙানি কমে আসে ম্‌পাইয়ের। বালুতে মুখ গুঁজে নিথর হয়ে যায় দেহটা।

এরপর ক্যাম্পে প্রবেশ করে চার অস্ত্রধারী। দাগ-পড়া, ময়লা ইউনিফর্ম তাদের পরনে; ক্যামোফ্লাজ প্যাটার্নগুলো বহু-ব্যবহারে প্রায় মুছেই গেছে কাপড়ের গা থেকে। হাতা আর গলার কিনারাগুলো শতচ্ছিন্ন। পোশাকের জীর্ণদশা হলেও গায়ে-গতরে ত্যাগড়া, বয়েস বেশি হবে না—বিশ পেরিয়েছে কি পেরোয়নি। একই ধরনের চারটে সোভিয়েত রাইফেল ছিল ওদের হাতে—এ.কে-৪৭... তেল আর গ্রিজ মাখানোতে চকচক করছে।

উদ্ধত ভঙ্গিতে এগোল চার অস্ত্রধারী, বালিতে বসে থাকা আতঙ্কিত অ্যাভনারের উপর ওদের হিংস্র দৃষ্টি। ম্‌পাই তুলনামূলকভাবে অনেকটা ফর্সা ছিল, কিন্তু এরা মিশমিশে কালো—ঘনঘোর কৃষ্ণবর্ণের তীব্রতায় চামড়াতে নীলচে আভা চলে এসেছে। ইরিত্রিয়ানদের মত নয় এরা। উঁচু নাক, চওড়া কপাল, আর পুরু ঠোঁটের উপর থ্যাবড়া নাক সবার। পেশায় আর্কিয়োলজিস্ট হলেও নৃতত্ত্বের উপর কিছুটা জ্ঞান রয়েছে অ্যাভনারের, তাই বুঝতে পারে—অস্ত্রধারীরা সবাই সুদানের; প্রাচীন *কুশ* এলাকার লোক। ব্যাপারটা আতঙ্ক বাড়িয়ে দিল আরও। সুদানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে খুব ভালই জানা আছে ওর।

দীর্ঘদিন থেকেই গৃহযুদ্ধ চলছে সুদানে—উত্তরাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এবং দক্ষিণাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রিস্টানদের মাঝে। নিরীহ জনসাধারণ এদের মাঝখানে পড়ে পদদলিত হচ্ছে। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিসংঘ আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে হয়রান—বিভিন্ন ধরনের রিলিফ এজেন্সি থেকে শুরু করে পুরোদস্তুর শান্তিরক্ষী বাহিনী পর্যন্ত কাজ করছে ওখানে, কিন্তু এখন পর্যন্ত থামানো যায়নি লড়াই। প্রতিদিন শত শত মানুষ মরছে ও-দেশে। গত কয়েক বছরে রোগব্যাধি আর দুর্ভিক্ষের তাড়নায় দক্ষিণাঞ্চলের বহু যোদ্ধা টেরোরিজমের পথ বেছে নিয়েছে—রিলিফ এজেন্সির শিপমেন্ট ছিনিয়ে নিচ্ছে, সুদানে বসবাসকারী আড়াই লাখ ইরিত্রিয়ান রিফিউজির ক্যাম্পগুলোয় খুন-জখম আর ডাকাতি করছে, বর্ডার অতিক্রম করে ইরিত্রিয়াতেও হানা দিচ্ছে খাবার আর ওষুধের জন্য। এসব কাজ করতে গিয়ে নিরীহ মানুষজনকে খুন করছে ওরা নির্দ্বিধায়। সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপার হলো, মুক্তিপণের আশায় ইদানীং ওরা বিদেশি নাগরিকদেরকেও অপহরণ করতে শুরু করেছে।

চকিতে এসব মনে পড়ে গেল অ্যাভনারের। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকাল ও চার অনুপ্রবেশকারীর দিকে। ম্‌পাই গল্পচ্ছলে অনেকবার শুনিয়েছে ওকে সুদানিজ টেরোরিস্টদের নৃশংসতার কাহিনি, কিন্তু বিশ্বাস হয়নি। আজ নিজের জীবন দিয়ে সেসব কাহিনির সত্যতা প্রমাণ করে দিয়ে গেছে ইরিত্রিয়ান লোকটা।

'কী চাও তোমরা আমার কাছে?' জার্মান ভাষায় কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল অ্যাভনার।

টেরোরিস্টরা জবাব দিল না। অ্যাভনার খেয়াল করল, ওদের একজনের কোমর থেকে ঝুলছে একটা লম্বা মাচেটি, ফলায় রক্ত লেগে আছে... ম্‌পাইয়ের রক্ত!

ইংরেজিতে আবার প্রশ্নটা করল অ্যাভনার। এবারও নিরুত্তর রইল লোকগুলো। পরিবেশটা কেমন যেন গুমোট মনে হলো অ্যাভনারের কাছে—মাছি ভন ভন করছে চারদিকে, আকাশে চক্কর দিচ্ছে দুটো শকুন... মৃত্যুর গন্ধ পেয়ে গেছে ওরা।

'আমার কাছে কিছু নেই,' বলল অ্যাভনার। লোকগুলো বুঝুক না বুঝুক, কথা বলবে বলে ঠিক করেছে। ওর হাবভাবে নিশ্চয়ই আঁচ করতে পারবে কী বলতে চাইছে। 'সামান্য খাবার আছে—টেনেটুনে দু'দিন চলবে; টাকা যা আছে, তা-ও অল্প। তবে রাজধানী আসমারা-য় আরও টাকা রয়েছে আমার। আমাকে যদি

যেতে দাও, ওগুলো তোমাদের জন্য পাঠিয়ে দিতে পারব।'

এরপরও কোনও অভিব্যক্তি ফুটল না অনুপ্রবেশকারীদের চেহারায়, যেন পাথর কুঁদে তৈরি হয়েছে মুখগুলো।

'আমি একজন বিজ্ঞানী, পুরনো হাড়-গোড় পরীক্ষা করি। আমার তেমন কোনও টাকা-পয়সা নেই, বন্ধুবান্ধবও নেই উঁচুমহলে। জিম্মি হিসেবে কোনও মূল্য পাবে না আমার। প্লিজ, আমাকে যেতে দাও!' পানি গড়াতে শুরু করেছে অ্যাভনারের চোখ থেকে। 'প্লিজ... দয়া করো! যা-খুশি নাও, কিন্তু আমার ক্ষতি কোরো না। আমি বাঁচতে চাই!'

অনুনয়-বিনয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া ঘটল না চার সুদানিজের মধ্যে। কয়েক মুহূর্ত মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল তারা, তারপর মাচেটির মালিক এগিয়ে এল কয়েক পা—বয়সে অন্যদের তুলনায় একটু বড় সে, হাবভাবে নেতা বলে মনে হলো। কাছে এসে লাথি মেরে আর্কিয়োলজিস্টের বুটদুটো সরিয়ে দিল সে। একটু ঝুঁকে বলল, 'তুমি একটা আমেরিকান গুপ্তচর। এখানে এসেছ আমাদের লোকজনকে দাস বানাতে।' বলার ভঙ্গিতে মনে হলো, মুখস্থ করা বুলি ওটা।

'না,' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল অ্যাভনার। 'আমেরিকা থেকে আসিনি আমি। ইয়োরোপ থেকে এসেছি... আমি অস্ট্রিয়ান! গুপ্তচর নই, বিজ্ঞানী। পুরনো হাড়-গোড় দেখে অতীত নিয়ে গবেষণা করি। তোমাদের ক্ষতি করার কোনও ইচ্ছে নেই আমার!'

'মিথ্যে বলে লাভ হবে না,' চেহারা থমথম করছে সুদানিজ তরুণের। 'তুমি একটা আমেরিকান কুত্তা। তোমাকে মরতে হবে' [illegible]' পরে বেরিয়ে পড়ো। পনেরো মিনিট সময় দেব আমরা, তারপর তোমাকে ধাওয়া করতে শুরু করব।' হাতে ঝোলানো সস্তা ঘড়িটাতে সময় দেখাল সে।

হতভম্ব হয়ে গেল অ্যাভনার। কী বলছে এরা? তোতলাতে তোতলাতে প্রতিবাদের চেষ্টা করল, 'কিন্তু... আমি তো...'

'দৌড়াও! নইলে এখুনি গুলি খাবে।'

তর্ক বৃথা। তাড়াতাড়ি বুটজোড়া কুড়িয়ে পা গলাল অ্যাভনার, ফিতে বাঁধার ঝামেলায় গেল না, ছুটে বেরিয়ে গেল ক্যাম্প থেকে।

ওকে নাগালে পেতে মাত্র আধঘণ্টা লেগেছে টেরোরিস্টদের, তবে হামলা করেনি। পিছু পিছু স্রেফ ধাওয়াই করেছে তারা, ওকে নিয়ে ইঁদুর-বেড়াল খেলেছে। একঘণ্টা ধরে চলছে এই খেলা... কষ্টকর, ভয়ঙ্কর একটি ঘণ্টা। শক্তি ফুরিয়ে গেছে অ্যাভনারের, দম পাচ্ছে না আর; পা ফুলে গেছে রুক্ষ জমিতে ছুটতে ছুটতে। সারাজীবনে কখনও এভাবে দৌড়ায়নি বেচারা, ভাবেওনি এভাবে কোনদিন দৌড়াতে হবে।

এখন আর দৌড়াতে পারছে না ও, থপ থপ করে কোনোমতে হেঁটে চলেছে। পা-দু'টো ঠিকমত শরীরের ভারও নিতে পারছে না আর। পিছনে টেরোরিস্টদের সাড়া পাওয়া গেল—গদাইলস্করি চালে হাঁটছে তারা শিকারের পিছু পিছু, শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ঘেমেছেও খুব অল্প। অ্যাভনার থেমে যাচ্ছে দেখে আর অপেক্ষা করতে চাইল না। লম্বা কদমে ওর কাছে চলে এল টেরোরিস্টদের

নেতা। এ.কে-ফোরটি সেভেনের বাট দিয়ে সজোরে আঘাত করল আর্কিয়োলজিস্টের হাঁটুতে। হাড্ডি ভাঙার মড়াৎ শব্দ হলো, হাঁটুর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে... চেঁচাবার শক্তি পেল না অ্যাভনার, গুঙিয়ে উঠে মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে।

কোনও ধরনের তাড়াহুড়ো দেখা গেল না সুদানিজ লোকগুলোর ভিতর। ব্যথায় গড়াগড়ি করতে থাকা আর্কিয়োলজিস্টকে ঘিরে হাঁটু গেড়ে বসল তারা, ধীরে-সুস্থে একটা টার্কিশ সিগারেট ধরাল। পালা করে হাতে হাতে ঘুরতে শুরু করল সেটা। তিন চক্কর ঘুরল সিগারেটটা, যখন একেবারে ছোট হয়ে গেল, তখন শেষ টানটা দিয়ে আগুনটা নিভিয়ে ফেলল নেতা, ফিল্টারটা গুঁজে রাখল বুক-পকেটে।

শুকনো একটা নদীগর্ভে এসে পৌঁছেছে ওরা ধাওয়া করতে করতে। দু'পাশ তেমন খাড়া নয়, তবে তীব্র উত্তাপে পুরো জায়গাটা লোহার কড়াইয়ের মত তেতে আছে। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করেছে টেরোরিস্টদের মুখ আর হাতে। নদীর তলায় পড়ে থাকা শুকনো মাটি দিয়ে ঘামগুলো মুছতে শুরু করল ওরা।

অ্যাভনারের বুক হাপরের মত ওঠানামা করছে। প্রতিবার শ্বাস নেয়ার সময় চাপ পড়ছে পাঁজরের উপর, ফুসফুস যেন ফেটে বেরিয়ে আসবে বুকের খাঁচা থেকে। ভাঙা হাঁটুতে অসহ্য ব্যথা, দম নেয়ার তালে নড়ছে হাড়ের টুকরো হয়ে যাওয়া খণ্ডগুলো, বিঁধে যাচ্ছে লিগামেন্ট আর পেশিতে—ব্যথা বাড়িয়ে দিচ্ছে আরও। ইতোমধ্যে ফুলে ঢোল হয়ে গেছে জায়গাটা। চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করতে শুরু করল ও—ডাকছে ঈশ্বরকে।

'চোখ খোলো!' ধমক ভেসে এল টেরোরিস্ট নেতার কণ্ঠ থেকে।

খুলল অ্যাভনার। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'কী চাও তোমরা আমার কাছে? কেন এভাবে কষ্ট দিচ্ছ? বলেছি তো, আমার কোনও মূল্য নেই কোথাও...'

'তুমি একটা আমেরিকান গুপ্তচর,' কাছে এসে আবার পুরনো বুলি ঝাড়ল নেতা। 'তোমার মরণটাই আমাদের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান!'

'মিথ্যে কথা!' চেঁচাল অ্যাভনার।

না শোনার ভান করে নেতা বলল, 'তোমাকে পাঠানো হয়েছে আমাদের সম্পদ চুরি করবার জন্যে। আর আমাদের পাঠানো হয়েছে তোমাকে ঠেকাতে!'

'ওহ্ গড! প্লিজ! আমি চোর নই। আমি স্রেফ অতীত নিয়ে গবেষণা করি...'

কথাটাতে কান দিল না তরুণ সুদানিজ নেতা, সঙ্গীরা তাকে *হিলাল* নামে ডাকে। রাইফেলের বাটটা সজোরে অ্যাভনারের মাথায় নামিয়ে আনল সে, ঠিক কপালের উপরে। এই আঘাতে মানুষ খুন করা যায়, তবে শিকারকে নিয়ে কিছুক্ষণ খেলার ইচ্ছে রয়েছে তার; তাই পুরো শক্তি ব্যবহার করল না। তারপরও কম ব্যথা পেল না অ্যাভনার—গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, শরীরটা কুণ্ডলী পাকিয়ে ফেলল সহজাত প্রবৃত্তির বশে।

আবার রাইফেল চালাল হিলাল। তবে মাথা সরিয়ে নিয়েছে অ্যাভনার, আঘাত লাগল গলার পাশে—মট করে ভেঙে গেল কলার-বোন। এবার বাকি তিন টেরোরিস্টও ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। নেতার অনুকরণে বৃষ্টির মত একটার পর

একটা আঘাত করে চলল তারা বিজ্ঞানীর অরক্ষিত দেহে।

কয়েক সেকেণ্ড মাত্র চেঁচাল অ্যাভনার, তারপরই জ্ঞান হারাল। থামল না টেরোরিস্টরা, রাইফেলের বাটের উপর্যুপরি আঘাতে থেঁতলে দিল তাকে। জ্ঞানহীন অবস্থাতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল হতভাগ্য বিজ্ঞানী। লাশের উপর আরও কিছুক্ষণ তাণ্ডব চালাল রক্তলোলুপ চার তরুণ, ওটাকে মাংসের দলা বানিয়ে তারপর ছাড়ল।

'থামো!' খানিক পর বলল হিলাল। নেশা কেটে গেছে তার, সঙ্গীদের সরিয়ে আনল লাশের কাছ থেকে। নির্দেশ দিল, 'জামা-কাপড় সব খুলে নাও। লাশদুটো... সেইসাথে ক্যাম্পটাও নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। কেউ যেন জানতে না পারে, ওরা এখানে এসেছিল। বুঝেছ?'

ব্যস্ত হয়ে পড়ল তিন অনুচর। হিলাল তার পুরনো বুটজোড়া খুলে অ্যাভনারের জোড়া পরে নিল। তারপর সঙ্গীদের নিয়ে রওনা হলো ক্যাম্পের দিকে। সুদানের কালোবাজারে ভাল দামে বিকানোর মত দরকারি অনেক জিনিস পাওয়া যাবে ওখানে। খেয়াল রাখতে হবে, ওর স্যাঙাৎ-রা যেন ধ্বংসের নেশায় সেসব আবার নষ্ট করে না ফেলে!

তিন

চার মাস পর। আর্লিংটন, ভার্জিনিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

পৃথিবীর যে-প্রান্তেই থাকুক, খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠে মাসুদ রানা। মুগ্ধতায় কাটে সময়টা—অন্ধকারের চাদর সরিয়ে ধীরে ধীরে কী এক আশ্চর্য ভঙ্গিতেই না আলোকিত হয়ে ওঠে বিশ্বচরাচর! নীরবতা আর কোমলতা মিলিয়ে ভোরবেলা-টা স্ট্রেচিং, হালকা ব্যায়াম আর জীবনের জটিলতম বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তাভাবনার জন্য আদর্শ সময়।

আজও সূর্য ওঠার আগে জেগেছে রানা, বাথরুমে গেছে হাই তুলতে তুলতে। তবে আজ কিছুটা জড়তা রয়েছে শরীরে। কাল একটু রাত জাগা হয়ে গিয়েছিল—ওর প্রিয় বন্ধু সোহেল আহমেদের জন্মদিন ছিল গতকাল, ওকে নিয়ে রাতে বেশ কয়েকটা ক্লাবে ঘুরেছে, বেহিসেবি খানাপিনা করেছে। গত সাত দিন এজেন্সির নতুন অফিস খোলার কাজে আর্লিংটনে আছে রানা। সোহেল নিউ ইয়র্কে ছিল, ছয়দিনের ছুটি নিয়ে রানার কাছে চলে এসেছে গত পরশু রাতে। ওর জন্মদিন উপলক্ষে শাখা-প্রধান তিশা ইসলামের কাঁধে কাজ দেখাশোনার সব ভার চাপিয়ে দিয়ে গতকাল ছুটি নিয়েছিল রানাও।

ওয়াশিংটন ব্রাঞ্চের উপর থেকে চাপ কমাবার জন্য এখানে আর একটা শাখা খোলা জরুরি হয়ে পড়েছিল। গত দু'বছর ধরে ব্যস্ততা অনেক বেড়ে গেছে আমেরিকার রাজধানী শাখায়; এমন সব কেস আসছে, যেগুলো না-নিয়ে পারা যায় না, আবার নিলেও বোঝা বাড়ে। কাছাকাছি আর কোনও ব্রাঞ্চ না থাকায়

ওদেরকেই সামলাতে হয় সব। কাজের চাপে হাঁসফাঁস করছিল ওয়াশিংটন, তাই বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কাছাকাছি দ্বিতীয় একটা শাখা খুলবেন। অনেক ভাবনাচিন্তা করে আর্লিংটনকে বাছাই করা হয়েছে নতুন শাখার লোকেশন হিসেবে। ওয়াশিংটন থেকে খুব কাছে জায়গাটা, অফিস-ভাড়াও তুলনামূলকভাবে কম।

রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি আসলে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সেরই একটা কাভার, চিফ মেজর জেনারেল রাহাত খানের নির্দেশে গড়ে তুলেছে রানা বেশ কয়েক বছর আগে। বিসিআই সরকারী প্রতিষ্ঠান, তাই সব ধরনের আন্তর্জাতিক বিষয়ে নাক গলাতে অসুবিধা হয়, সেকথা ভেবেই মাসুদ রানাকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর করে এজেন্সিটা দাঁড় করানো হয়েছে। শুরু থেকেই ভাল কাজ করে আসছে রানা এজেন্সি, পৃথিবীর বড় বড় প্রায় সব শহরেই খোলা হয়েছে শাখা অফিস। বিভিন্ন কারণে যুক্তরাষ্ট্রের শাখাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, ওয়াশিংটনের গুরুত্ব তো আরও বেশি। আর্লিংটন শাখা মূলত ওয়াশিংটনের কাজেরই একাংশ করবে, তাই ওদের সেটআপটা একেবারে নিখুঁত হওয়া দরকার। নিখুঁত ভাবেই গুছিয়েছে দক্ষ এজেন্ট তিশা, তারপরেও ব্রাঞ্চ চালু করবার দশদিন আগে রানাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন ওকে সাহায্য-সহযোগিতা করবার জন্য।

আর্লিংটনের পুরনো আবাসিক এলাকায় ছোট্ট একটা ডুপ্লেক্স বাড়ি ভাড়া করেছে তিশা রানার জন্য। জায়গাটা চমৎকার, পুরো এলাকা জুড়ে সারি সারি একই ডিজাইনের বাড়ি। গাছপালাও রয়েছে প্রচুর। অত্যন্ত মনোরম পরিবেশ। রানা দশ-বারো দিন থাকবে শুনে বাড়িটা রানার মন-মতন করে সাজিয়ে দিয়েছে তিশা। দোতলায় ওর বেডরুম, সঙ্গে লাগোয়া বারান্দা আছে। পাশেই পড়ার ঘর। নীচতলায় ডাইনিং রুম, কিচেন আর লিভিং রুম। দামি ফার্নিচার, বইপত্র, শো-পিস, পেইন্টিং আর ফুলের টব দিয়ে সাজিয়েছে ও পুরো বাড়ি।

মুখ-হাত ধুয়ে, প্রাতঃকৃত্য সেরে নীচতলায় চলে এল রানা। লিভিংরুমের সোফায় কম্বলমুড়ি দেয়া একটা দেহ দেখা গেল—সোহেল। রাতে আর হোটেলে ফেরেনি, ওর এখানেই রয়ে গেছে; ঘুমোচ্ছে নাক ডাকিয়ে। চেহারাটা বাচ্চা-বাচ্চা দেখাচ্ছে। একবার ভাবল ডেকে তোলে, পরমুহূর্তে বাতিল করে দিল চিন্তাটা। ভোরে ওঠার অভ্যেস নেই ফাজিলটার, ডাকাডাকি করলে খেপে গিয়ে লাথি-ঘুসি ছুঁড়তে পারে।

কিচেনে গিয়ে শুধু কফি বানাল রানা, সোহেল ওঠার পর একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট করবে। পেপার এসে গেছে ইতোমধ্যে—দরজা খুলে সামনের বারান্দা থেকে ওটা কুড়িয়ে নিল ও; বগলে গুঁজে ধূমায়িত কফির কাপ হাতে নিল, চলে এল ড্রয়িংরুমে। সোহেলের মুখোমুখি আরেকটা সোফায় বসল। কফিতে আয়েশ করে চুমুক দিয়ে চোখ বোলাতে শুরু করল পত্রিকার পাতায়। এসপিয়োনাজ এজেন্ট ও, স্বভাবজাত কারণে আন্তর্জাতিক খবরগুলোই প্রথমে খুঁজে নেয়।

বেশ গুরুত্ব দিয়ে ইজরায়েলের খবর ছাপা হয়েছে *ওয়াশিংটন পোস্ট*-এ। ছ'সপ্তাহ আগে জেরুসালেমের পশ্চিম প্রাচীরের কাছে বোমা হামলা হয়েছিল, এখন পর্যন্ত ব্যাপারটার সুরাহা হয়নি। হামলাকারীদের ধরতে পারেনি ক্ষমতাসীন

সরকার, বিচার-টিচার তো অনেক পরের কথা। দেশের প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী ইয়োরাম রাবাক এই হামলার তীব্র সমালোচনা করেছেন। আসন্ন নির্বাচনে নিজেই প্রধানমন্ত্রীত্বের জন্য লড়বেন ভদ্রলোক, সুযোগ পেলে ক্ষমতাসীন প্রাইম মিনিস্টার লিওনিদ হালপেরিনকে তুলোধুনো করতে ছাড়ছেন না তাই। পত্রিকা খুললে রোজই তাঁর নানা ধরনের বক্তব্য দেখা যায়। আজও ব্যতিক্রম ঘটেনি। রাবাক বলেছেন, তিনি নিজে ক্ষমতায় থাকলে এই জঘন্য অপরাধের সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারে এক সপ্তাহের বেশি লাগত না। প্যালেস্টাইনের সঙ্গে চলমান শান্তি-আলোচনা বন্ধ করে নতুন হামলা চালাবার পক্ষপাতী তিনি।

তিক্ততা অনুভব করল রানা খবরটা পড়ে। মধ্যপ্রাচ্য আবার অশান্ত হতে শুরু করেছে—এসব তারই ইঙ্গিত। ইজরায়েলের রাজনীতি নিয়ে আর আগ্রহ পেল না, সামনের নির্বাচনে মুসলিম-বিশ্বের কিছু যাবে আসবে না। ওখানে সব কাকেরই এক রা। ইয়োরাম রাবাক, বা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী লিওনিদ হালপেরিন... যে-ই ক্ষমতায় আসুক না কেন, ফিলিস্তিনীদের ফাটা কপাল জোড়া লাগবে না। শান্তি-আলোচনা যেটা চলছে, সেটা যে কোনও সুফল বয়ে আনবে না—তা-ও জানা কথা।

পত্রিকা নামিয়ে রেখে কফিতে শেষ চুমুক দিল রানা। চোখ তুলতেই দেখল, সোহেল আড়মোড়া ভাঙছে। ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'শালা, কফি গেলার জন্য অন্য কোনও জায়গা পাসনি? গন্ধে আমার ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলি!'

'ভাবলাম বেড-টির মত বেড-কফি পেলে খুশি হবি তুই,' হাসল রানা।

'কোথায় বেড-কফি? কাপ তো ওই একটাই দেখছি।'

'তাতে কী? তোর জন্য তলানি রেখেছি তো! নে, ওঠ, ওটুকুই খেয়ে নে!'

'হারামজাদা!' তড়াক করে উঠে বসল সোহেল। 'মেরে ঠ্যাং ভেঙে দেব। জলদি কফি বানিয়ে আন্।'

'চাকর পেয়েছিস আমাকে? বানাতে হয় নিজে বানা।'

চেহারা করুণ হয়ে উঠল সোহেলের। 'এমন করিস কেন, দোস্ত? মেহমানের সঙ্গে এমন করে কেউ? এক কাপ কফিই তো চেয়েছি...'

'তোকে চেনা আছে আমার। বসতে দিলে খেতে চাস, খেতে দিলে শুতে, আর শুতে দিলে ঘুমাতে...। শালা একটা অকাল কুষ্মাণ্ড তুই। কফি আনার পর সিগারেট চাইবি... জানিস, তোর অত্যাচারে সিগারেট খাওয়াই ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছি আমি? খালি দে না, একটা দে! ওসব আর চলবে না।'

'শালা চাপা মারার জায়গা পাও না? তোর মেডিকেল রিপোর্ট আমি দেখিনি? ওই রিপোর্টের পর সিগারেট ছেড়েছিস তুই বুড়োর গাল খেয়ে, তা না হলে কানটা ধরে বিসিআই থেকে বের করে দেবে বলেছিল, ভেবেছিস জানি না? সব শুনেছি আমি!'

'একটু ভুল শুনেছিস। আসলে বলেছিল, তোর কানটা ধরে আমাকে ঘর থেকে বের করে দেবে লাঠি আনার জন্যে।' এই বলে একটা সিগারেট ধরাল রানা।

'দোস্ত...'

'না!'

'দোস্ত...'

'আবার? তোকে কতবার বলেছি না, খালিপেটে এসব খেতে নেই? আগে বাথরুম থেকে হাত-মুখ ধুয়ে আয়, তারপর বাবুর্চি হয়ে যা,' বলল রানা। 'কিচেনে গিয়ে কফি আর ব্রেকফাস্ট তৈরি করে আন্, তারপর একটা পাবি।'

আহত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল সোহেল। বলল, 'বাড়াবাড়ির একটা সীমা থাকা উচিত, বুঝলি? যা ব্যাটা, কিছুই দরকার নেই আমার। হোটেলে চললাম আমি।' মেঝেতে কম্বল ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। 'ওখানে অর্ডার দিলেই তোর মত একশ'টা বেয়ারা ছোটাছুটি শুরু করবে কফি আর নাস্তা নিয়ে।'

'আরে, আরে! রাগ করলি নাকি?' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'একটু বাজিয়ে দেখছিলাম। সত্যি সত্যি তোকে ব্রেকফাস্ট তৈরি করতে পাঠাব ভেবেছিস নাকি? মাশাল্লাহ্, যা তোর রান্নার হাত... এরচেয়ে না খেয়ে থাকা ভাল। বোস, বোস, নাশতা আমিই বানাব। কী খাবি?'

মুখের ভাষা হারাল সোহেল। খুশি হবে, নাকি খেপে যাবে—বুঝতে পারছে না। ওর অবস্থা দেখে মুচকি হাসল রানা। বলল, 'বুঝেছি, যা খাওয়াব, তা-ই খাবি। যা, মুখহাত ধুয়ে আয়। আমি ব্রেকফাস্ট দিচ্ছি।'

বন্ধুকে আর কিছু বলতে না দিয়ে কিচেনের দিকে রওনা হলো রানা।

আধঘণ্টা পর নাশতা সারা হলো, এরপর আরও আধঘণ্টা ধরে চলল আড্ডা আর খুনসুটি। আটটা বাজতেই হোটেলে ফিরে গেল সোহেল, এগারোটার পর দেখতে আসবে কেমন চলছে ব্রাঞ্চের প্রস্তুতিপর্ব। রানাও গিয়ে ঢুকল বাথরুমে। অফিসে যাবার প্রস্তুতি নিতে হবে।

গোসল সেরে সবে বেরিয়ে এসেছে, এমন সময় বেজে উঠল ফোন। কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে রিসিভার তুলল ও। 'হ্যালো?'

'মি. মাসুদ রানা?' নারীকণ্ঠ শোনা গেল ওপাশ থেকে।

'ইয়েস। কে বলছেন, প্লিজ?'

'একটু হোল্ড করুন। আণ্ডারসেক্রেটারি অভ স্টেট ফর আফ্রিকান অ্যাফেয়ার্স... মি. এডওয়ার্ড ব্যাগলি কথা বলতে চান আপনার সঙ্গে।'

'কে?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

'আমাদের আফ্রিকা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব। মি. এডওয়ার্ড ব্যাগলি। আপনার কোনও অসুবিধে আছে?'

'না, না, কোনও অসুবিধে নেই, দিন,' বিস্ময়টা চাপা দিয়ে বলল রানা। মার্কিন সরকারের একজন আণ্ডারসেক্রেটারি যেন-তেন মানুষ নন, হঠাৎ ওর সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন কেন? তাও আবার এই সাতসকালে?

কয়েক সেকেণ্ড পরই রিসিভারে ভেসে এল নতুন কণ্ঠ। 'দিস ইজ এডওয়ার্ড ব্যাগলি।'

'মাসুদ রানা, স্যর।' সম্মান দেখাল রানা।

'গুড মর্নিং, মি. রানা। অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করলাম না তো?' হার্ভার্ড উচ্চারণে বললেন ব্যাগলি—বলার ভঙ্গিতে সম্ভ্রান্ত ভাব।

'না,' বলল রানা। 'বিরক্ত নয়, বিস্মিত করেছেন।'

'এত সকালে ফোন করেছি দেখে বিস্মিত হবারই কথা। আসলে গতকাল থেকে খুঁজছি, কিন্তু আমার পি.এ. আপনাকে লোকেট-ই করতে পারল না। ব্রাঞ্চ খোলার কাজে নাকি মহা ব্যস্ত আছেন, কেউ সেলফোনের নম্বরটা দিতে রাজি হয়নি। তাই ভাবলাম, বাসাতেই ধরি—সকালবেলা, কাজে বেরুনোর আগে।'

কথাগুলো ঠিকমত শুনছে না রানা, মনে ভিন্ন চিন্তা। এডওয়ার্ড ব্যাগলির সঙ্গে পরিচয় নেই ওর, তবে নামটা শুনেছে। সত্যিই আমেরিকান সরকারের একজন ক্ষমতাশালী উপ-সচিব তিনি, আফ্রিকা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বেও আছেন। হোমরা-চোমরা মানুষ; ওর কাছে কী চাইতে পারেন, সেটা বুঝতে পারছে না। ভদ্রলোকের কথা শেষ হতেই ও বলল, 'মেসেজ দিয়ে রাখতে পারতেন, আমি ফোন করতাম।'

'ব্যাপারটা মাথায় আসেনি আমার পি.এ.-র। ভেবেছে পরে আবার যোগাযোগ করবে,' বললেন ব্যাগলি। 'এনিওয়ে, আপনি এ-মুহূর্তে ব্যস্ত নন তো?'

'জী না, মি. আণ্ডারসেক্রেটারি।'

'প্লিজ, এডওয়ার্ড বলে ডাকুন আমাকে। কিংবা ব্যাগলি।'

'বেশ, মি. ব্যাগলি। আমাকেও মাসুদ বা রানা, যে কোনও নামে ডাকতে পারেন, তবে মিস্টারটা বাদ দিয়ে, ঠিকাছে? এবার বলুন দেখি কী করতে পারি আপনার জন্য?'

'সরাসরি কাজের কথা শুনতে চাইছেন, না?' হাসলেন ব্যাগলি। 'গুড, আপনার অ্যাটিচিউড আমার পছন্দ হয়েছে। আসলে... একটা কাজ আছে আমার হাতে—আপনার এজেন্সিকে ভাড়া করতে চাই সেজন্যে।'

'মাফ করবেন, তবে একটা প্রশ্ন না করে পারছি না। হঠাৎ প্রাইভেট এজেন্সিকে ভাড়া করতে চাইছেন কেন? স্টেট ডিপার্টমেন্টের কাজ করে দেবার জন্য তো সিআইএ, এফবিআই, এনএসএ... এরা সবাই মুখিয়ে আছে।'

'এই কাজটা অন্যরকম, মি. রানা; ওদের ধারার নয়।' গম্ভীর গলায় বললেন ব্যাগলি। 'আপনার এজেন্সির কথা বললেও আসলে আমি নির্দিষ্টভাবে আপনাকেই কাজটার জন্য চাইছি।'

'আমাকে?' বিস্ময় আরেকটু বাড়ল রানার। 'কেন?'

'কারণ কাজটা করবার মত অভিজ্ঞতা কাছেপিঠে শুধুমাত্র আপনারই আছে। খোঁজখবর নিয়েছি আমি, মি. রানা। ভোশিয়ে বলে কাজটা আপনার জন্য সহজ।'

'কী কাজ সেটা, মি. ব্যাগলি?'

'ব্যাপারটা একটু জটিল, ফোনে ব্যাখ্যা করতে পারব না। শুধু এটুকু বলতে পারি, লাখ লাখ মানুষ উপকৃত হবে এর ফলে। আপনি আগ্রহী?'

'ঠিক বুঝলাম না...'

'যেটুকু বলেছি তাতে কারও কিছু বোঝার কথা নয়। আসলে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার,' সরাসরি বললেন ব্যাগলি। 'সাক্ষাতেই সব খুলে বলব। দুপুর ঠিক বারোটায় আমার অফিসে আসতে পারবেন?'

'জী না, বারোটায় পারব না। কাজ আছে,' কৌশলে বলল রানা। দেখা যাক,

ভদ্রলোক কতটা সিরিয়াস। 'তবে দেড়টার দিকে উইলার্ড হোটেলে পাবেন আমাকে। লাঞ্চে যাব। যদি চান, তখন কথা হতে পারে আমাদের।'

হেসে উঠলেন ব্যাগলি। 'অফিসে আসতে চাইছেন না, তাই না? নো প্রবলেম, গরজটা আমার, আমিই আসব। যদি আপত্তি না থাকে, লাঞ্চের বিলটাও আমিই দিতে চাই।'

'আপত্তি নেই আমার।'

'গুড। তা হলে দেড়টায় দেখা হচ্ছে?'

'জী।'

'সি ইউ দেন।' লাইন কেটে দিলেন ব্যাগলি।

রিসিভার নামিয়ে রাখল রানাও। কপালে ভাঁজ পড়েছে। ঘুম থেকে ওঠার পর যে-ফুরফুরে ভাব ছিল, সেটা উধাও হয়ে গেছে ওর ভিতর থেকে।

বেশ কয়েক মাইল দূরে, কানে হেডফোন লাগিয়ে দু'পক্ষের টেলিফোন আলাপ শুনছিল এক লোক। লাইন কেটে যেতেই ব্যস্ত হয়ে উঠল তার দু'হাত, সামনে রাখা কম্পিউটারের কিবোর্ডে বোতাম টিপতে শুরু করল, কলটা কোথায় রিসিভ করা হয়েছে, সেটা বের করছে। পিছনে দাঁড়িয়ে আছে দলের লিডার—মাঝারি গড়নের তীক্ষ্ণ চেহারার এক যুবক; মাথাভর্তি কোঁকড়া কালো চুল, চোখদুটো আশ্চর্য রকমের গভীর। গম্ভীর হয়ে মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

ইউনিভার্সিটি অভ মেরিল্যাণ্ডের খুব কাছে, কলেজ পার্ক স্ট্রিটের একটা অ্যাপার্টমেন্টে রয়েছে তারা। ভিতরে ঢুকলে বিসদৃশ কিছু চোখে পড়বে না, লিভিং রুমটা আর দশটা অ্যাপার্টমেন্টের লিভিং রুমের মতই, সাধারণ। অস্বাভাবিকত্ব রয়েছে লিভিং রুমের সঙ্গে লাগোয়া দুটো শোবার ঘরে। একটাতে গায়ে গা লাগানো কয়েকটা বাঙ্ক বেড বসিয়ে দলের সবার ঘুমোনোর ব্যবস্থা করা হয়েছে—ঠিক একটা ব্যারাকের মত। অন্য বেডরুমটায় রয়েছে অত্যাধুনিক সব ইকুইপমেন্ট। আড়ি পাতার যন্ত্র থেকে শুরু করে লং রেঞ্জ কমিউনিকেশন ডিভাইস, রেইডার ডিসপ্লে, জিপিএস ট্র্যাকার, কম্পিউটার... প্রয়োজনীয় সব যন্ত্রপাতি রয়েছে ওখানে। দেয়ালে সাঁটা হয়েছে পুরো শহরের একটা বিশাল ম্যাপ। এক দেখাতেই অভিজ্ঞরা বুঝতে পারবে, ওটা একটা ইলেকট্রনিক সার্ভেইলান্স সেন্টার।

লিডারকে অধৈর্য হতে দেখে কম্পিউটারের সামনে বসা অপারেটর বলল, 'নাম্বারটা আনলিস্টেড। একটু সময় দাও।'

ঝড়ের বেগে কাজ করল কম্পিউটার, আনলিস্টেড টেলিফোন নাম্বারের তালিকা ঘেঁটে চলেছে। একটু পর শেষ হলো সার্চ, দুনিয়ার আধুনিকতম অ্যালগরিদম ব্যবহার করে সঠিক তথ্য খুঁজে বের করল ওটা—সাধারণ ট্রেসিং সিস্টেমের চেয়ে অর্ধেক সময়ে।

'মাসুদ রানা,' স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে বলল অপারেটর। 'আর্লিংটনের একটা ঠিকানা দেখতে পাচ্ছি। কম্পিউটার এখুনি ওদের কথোপকথনের একটা প্রিন্টআউট দেবে।'

'রানা?' ভুরু কোঁচকাল লিডার। 'নামটা পরিচিত মনে হচ্ছে। আর্কাইভ ঘেঁটে দেখো তো, ওর সম্পর্কে কিছু পাওয়া যায় কি না।'

বাটন চেপে স্ক্রিন খালি করে ফেলল অপারেটর, ওদের ডেটাবেজ খুলল। মিনিটখানেকের মধ্যেই ওখানে উদয় হলো রানার চেহারা, নীচে ওর ডোশিয়ে। দ্রুত ওটা পড়ে ফেলল লিডার, মগজের মধ্যে গেঁথে নিচ্ছে সব তথ্য, চেহারায় ফুটে উঠল বিস্ময়।

'এ তো ডেনজারাস লোক!' বলল সে। 'ব্যাগলি হারামজাদা একে ভাড়া করছে নাকি?' দরজার কাছে গিয়ে সামনের রুমে বসা একজনকে ডেকে আনল লিডার।

নবাগতের পরনে ছাইরঙা সুট, চেহারা অতি-সাধারণ। এ-ধরনের মানুষের দিকে দ্বিতীয়বার চোখ ফিরিয়ে তাকায় না কেউ। খোলা ময়দানেই তাই অদৃশ্য হয়ে থাকতে পারে লোকটা—ফিল্ড অপারেটিভদের জন্য ওটা মস্ত বড় এক গুণ। লোকটাও তা-ই।

'সার, ব্যাগলি আরেকটা ফোন করছে,' জানাল অপারেটর।

'ট্র্যাক করো ওটা,' নির্দেশ দিল লিডার। তারপর তাকাল তার ফিল্ড এজেন্টের দিকে। 'মাসুদ রানা নামে এক লোকের উপর রাউণ্ড-দ্য-ক্লক সার্ভেইলান্স চাই আমি। ব্যাগলি সম্ভবত ওকে কাজটা দিতে চলেছে। রানার ব্যাপারে মোটাসোটা একটা ডোশিয়ে আছে আমাদের কাছে, ইনফরমেশনগুলো বেশি সুবিধের নয়। ওর সম্পূর্ণ গতিবিধির খবর জানা দরকার তাই। যত দ্রুত সম্ভব, সবগুলো টিমকে ওর পিছনে লাগাও।'

'ইয়েস, সার।' মাথা ঝাঁকাল ফিল্ড এজেন্ট।

'আর... সাবধানে থেকো,' সতর্ক করল লিডার। 'লোকটা অত্যন্ত চালু। কাউন্টার-সার্ভেইলান্স টেকনিক এর মুখস্থ।'

হাসল ফিল্ড এজেন্ট। 'ও তো দূরের কথা, ওকে যদি আর কেউ ফলো করে, সে-ও টের পাবে না কিছু।'

'তা হলে তো ভালই।'

'আর কিছু, সার?'

'না। রানার ব্যাপারে ব্যাকগ্রাউণ্ড চেক চালাব; যদি নতুন কিছু পাই, জানাব তোমাকে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল এজেন্ট। কম্পিউটারের স্ক্রিনের দিকে আবার তাকাল লিডার—রানার সুদর্শন চেহারাটা ভেসে আছে তাতে।

'কেন যেন মনে হচ্ছে, তোমাকেই খুঁজছিলাম আমরা!' আনমনে বলে উঠল সে।

চার

ওয়াশিংটন ডিসি। বেলা দেড়টা।

রীতিমত ঐতিহাসিক একটা স্থাপনা বলা চলে উইলার্ড হোটেলকে—বয়স এক শতাব্দীর বেশি, রাজধানীর সবচেয়ে পুরনো ও ঐতিহ্যবাহী স্থাপনাগুলোর একটা। এই দীর্ঘ সময়ে কয়েক দফা রেনোভেশনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে হোটেলটাকে, তারপরও এর মূল পরিচিতি বদলায়নি। আজও ওটা দূর-দূরান্ত থেকে আসা সিনেটর আর আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের দ্বিতীয় আবাস—সারা বছরই তাঁদের পদচারণায় মুখর হয়ে থাকে হোটেলটার লবি।

বিখ্যাত এই হোটেলের রাউণ্ড রবিন বারে বসে আছে রানা, হাতে ধরা বিয়ারের গ্লাসে ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছে। হোটেলের মত বারটাও বিখ্যাত—ভারী কাঠে তৈরি, কারুকাজ করা, সেই প্রথম আমলের। মৃদু আলোয় আলোকিত জায়গাটা ক্ষমতা আর প্রতিপত্তির দ্যুতি ছড়ায়, নীরবে ঘোষণা করে—এখানে যেন-তেন কারও স্থান নেই।

ওসব নিয়ে অবশ্য ভাবছে না রানা, চিন্তা করছে আসন্ন মিটিংটা নিয়ে। এডওয়ার্ড ব্যাগলি সম্পর্কে বিসিআই চিফের সঙ্গে কথা না বলে দেখা করতে আসা ঠিক হলো কি না, ভাবছে। সোহেলের সঙ্গে আলাপ করেছিল ব্যাপারটা নিয়ে, ও মানা করল। পরামর্শ দিল, সবকিছু শোনার পর চিফকে রিপোর্ট করতে। হয়তো কাজটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়, খামোকা আগে থেকেই বুড়োকে বিরক্ত করবার মানে হয় না। এমনিতেও আণ্ডারসেক্রেটারি ভদ্রলোক যে-প্রস্তাবই দিন না কেন, সেটায় রাজি হওয়া সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না। এজেন্সির আর্লিংটন শাখাটাকে খাড়া করবার আগে অন্য কোনও দিকে মনোযোগ দেবার উপায় নেই ওর। কাজ-টাজ নেবার তো প্রশ্নই ওঠে না। ভদ্রতার খাতিরে এসেছে, নইলে ফোনেই মানা করা যেত। তবে আবার পুরোপুরি উড়িয়েও দিতে পারছে না ব্যাপারটা। লাখ লাখ মানুষের উপকারের কথা বলছিলেন মি. ব্যাগলি—সেটা কী?

অলস ভঙ্গিতে চারপাশে নজর বোলাল রানা। দিনটা মঙ্গলবার, পুরোদমে চলছে অফিস-আদালত; তারপরও এই দুপুরবেলায় বারে বেশ ভিড়। নানা রকম আলাপ-আলোচনায় মশগুল সবাই, বিষয় অবশ্য একটাই—আমেরিকান রাজনীতি। কান খাড়া করে দুয়েকজনের কথা শুনল ও। জানতে পারল—নতুন একটা বিল পাশ করা নিয়ে ক্ষমতাসীন পার্টির মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে, জনৈক সিনেটর তাঁর মেয়ের বয়েসী এক ইন্টার্নের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়েছেন, চিফ জাস্টিসকে গদিছাড়া করতে চাইছে কয়েকজন প্রভাবশালী সিনেট সদস্য। আনমনে মাথা নাড়ল রানা, লোকজনের মুখে লাগাম নেই। এমন একটা উন্মুক্ত জায়গায় এমন বেপরোয়া মন্তব্য কেন করছে এরা? চারপাশে বয়-বেয়ারারা ঘোরাফেরা করছে, অচেনা মানুষ বসে আছে—তা কি এরা দেখেও দেখছে না?

নাকি জেনে-শুনেই ছড়াতে চাইছে এরা গুজব?

ভাবনাটায় ছেদ পড়ল ধোপদুরস্ত পোশাক পরা মাঝবয়সী এক পরিচারক এসে গলা খাঁকারি দেয়ায়। 'মি. রানা? আপনার অতিথি এসে পড়েছেন।'

'ধন্যবাদ।' কবজিতে বাঁধা ট্যাগ-হিউয়্যার ঘড়ির দিকে তাকাল রানা। এডওয়ার্ড ব্যাগলি একেবারে ঠিক সময়ে এসেছেন। একজন রাজনীতিকের জন্য ব্যাপারটা অস্বাভাবিক তো বটেই!

পরিচারকের পিছন পিছন হাঁটতে গিয়ে হঠাৎ রানার ঘাড়ের পিছনটা শিরশির করে উঠল। পুরনো একটা অনুভূতি ওটা—ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের প্রভাব। বিপজ্জনক পেশায় দীর্ঘদিন থাকার ফলে মজ্জাগত হয়েছে। সাবলীল ভঙ্গিতে ঘাড় ফিরিয়ে দৃষ্টি বোলাল ও ভিড়ের উপর। কেন যেন মনে হচ্ছে, কেউ ওর ওপর নজর রাখছে। সবকিছু স্বাভাবিকই ঠেকল, আলাদা করে কেউ ধরা পড়ল না চোখে। মুখ ফিরিয়ে নিল রানা।

তবে কাজ যা হবার হয়ে গেছে—ওয়াচার মেয়েটা ভিতরে ভিতরে ভড়কে গেল। বুঝতে পারছে না, টার্গেটের চোখে ধরা পড়ে গেছে কি না। বারের একপ্রান্তে বসে আছে সে, অন্যমনস্ক হবার ভান করে হাতে ধরা ওয়াশিংটন গাইডের পাতা উল্টাচ্ছে। রানা একটু দূরে চলে যাওয়া পর্যন্ত অভিনয়টা চালিয়ে গেল, তারপর আলগোছে হাত ঢুকিয়ে দিল স্কার্টের পকেটে। ঝুঁকি নেবে না বলে ঠিক করেছে।

সাবধানে, সবার নজর এড়িয়ে পকেটে রাখা একটা মাইক্রো-ট্রান্সমিটারের বোতাম চাপল মেয়েটি। নীরব সঙ্কেত ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে, সেই সঙ্কেত পেয়ে মিনিটখানেক পর সার্ভেইলান্স টিমের নতুন একজন সদস্য ঢুকল বারে। সঙ্গীর সঙ্গে কোনোরকম দৃষ্টি-বিনিময় করল না মেয়েটি, তড়িঘড়ি করে সামনে রাখা ডায়েট সোডা শেষ করল, তারপর বিল মিটিয়ে বেরিয়ে পড়ল হোটেল থেকে।

রাউণ্ড-দ্য-ক্লক, মানে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টার সার্ভেইলান্সে কখনোই দশজনের বেশি প্রয়োজন হয় না, টার্গেট যতই সতর্ক বা সন্দেহপ্রবণ হোক না কেন। তারপরও মাসুদ রানার ডোশিয়ে দেখার পর কোনও ধরনের চান্স নেবে না বলে ঠিক করেছে ওদের লিডার—দলে মোট বারোজন সদস্য আছে, সবাইকেই পাঠিয়েছে বাঙালি লোকটার উপর নজর রাখতে। শুরুতে ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়েছিল মেয়েটির কাছে, তবে একটু আগে রানা যে-আচরণ করল, তাতে বোঝা যাচ্ছে—লিডারের ভয় অমূলক ছিল না। এ-লোক সাধারণ কেউ নয়, তাকে নজরবন্দি রাখতে চাইলে বাড়তি ওয়াচারের প্রয়োজন রয়েছে—ঘন ঘন পালাবদল করতে হবে তাদেরকে।

ভাল একজন লিডারই পেয়েছে ওরা, হাঁটতে হাঁটতে ভাবল মেয়েটি।

'গুড আফটারনুন, মি. রানা,' সহাস্যে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন এডওয়ার্ড ব্যাগলি।

করমর্দনের ফাঁকে আণ্ডারসেক্রেটারিকে ভাল করে দেখল রানা। ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে, মাথাজোড়া মস্ত এক টাক। নাকটা উঁচু, তীক্ষ্ণ—মুখের

তুলনায় বড় দেখাচ্ছে। শরীরটা বেশ মোটাসোটা, সনাতন আমলাদের আকৃতি; চোয়াল গোল, গালদুটো ফোলা-ফোলা। চেহারায় আন্তরিকতা, কিন্তু চশমার ওপাশে চোখদুটোতে কাঠিন্য লক্ষ করল ও। বোঝা যায়, প্রয়োজনে যথেষ্ট নির্মম হতে পারেন তিনি।

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মি. আণ্ডারসেক্রেটারি,' হাতে ছোট্ট একটা ঝাঁকি দিয়ে বলল রানা।

'আহ্-হা! সকালেই তো বললাম, আপনি আমাকে নাম ধরে ডাকতে পারেন। ফর্মালিটি পছন্দ করি না আমি, পছন্দ করি না লোক-দেখানো ভদ্রতাও।'

'লোক দেখাচ্ছি না,' বলল রানা। 'সত্যিই সম্মান দেখাচ্ছি।'

'সেটারও প্রয়োজন নেই,' হাসলেন ব্যাগলি। মুক্তোর মত দাঁতের পাটি ঝিকমিকিয়ে উঠল। 'বসুন।'

অর্ডার দিল ওরা। খাবার আসার আগে ড্রিঙ্ক পরিবেশন করা হলো, সেটা হাতে নিয়ে গল্পে মেতে গেলেন আণ্ডারসেক্রেটারি। ব্যক্তিত্ববান মানুষ, চমৎকারভাবে কথাও বলতে জানেন; খানিক সময়ের জন্য এখানে আসার মূল উদ্দেশ্যটার কথা ভুলে গেল রানা, মুগ্ধ হয়ে শুনতে থাকল ভদ্রলোকের কথা। সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন ব্যাগলি, রানা এজেন্সির ব্যাপারে খোঁজখবর নিলেন, আলাপচারিতার প্রাণ ধরে রাখলেন হালকা ঠাট্টা-মশকরার মাধ্যমে।

হাতের ড্রিঙ্ক শেষ হয়ে গেছে, নতুন একটা চাইল রানা। তারপর তাকাল মি. ব্যাগলির দিকে, উসখুস করতে শুরু করেছে। ব্যাপারটা লক্ষ করে ভদ্রলোক বললেন, 'বুঝতে পারছি, কাজের কথা শুনতে চাইছেন। আসলে এতক্ষণ সময় নষ্ট করিনি, আপনার সঙ্গে ভালমত পরিচিত হয়ে নিচ্ছিলাম—তার দরকার আছে। আশা করছি, সামনের বেশ কয়েকটা দিন আমরা একসঙ্গে কাজ করব।'

'সবকিছু শোনার আগে আমি কোনও কথা দিচ্ছি না,' রানা বলল।

'নো প্রবলেম। বলব সব। তবে আমাদেরকে একটু তাড়াতাড়ি সারতে হবে। আধঘণ্টা পর আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

'আমারও।'

'তা হলে দেরি না করে কাজের কথাই বলি, কেমন? তবে তার আগে একটা প্রশ্ন করি—আফ্রিকা সম্পর্কে কতটুকু জানেন আপনি?'

'বেশ কিছুটা,' বলল রানা। 'বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন কাজে ওখানে যেতে হয়েছে আমাকে। স্থানীয় ভাষাগুলো জানি না, তবে ফ্রেঞ্চ দিয়ে কাজ চালানো যায় ওখানে—সেটাও মোটামুটি পারি। *কতটুকু জানি* বলে আসলে কী জানতে চাইছেন, ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে আপনি যদি আফ্রিকার ইতিহাস, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, কিংবা অর্থনৈতিক অবস্থার খবর আমার মুখে শুনতে চান, তা হলে আজকের রাতটাও এখানেই কাটিয়ে দিতে হবে।'

'হুম,' মাথা ঝাঁকালেন ব্যাগলি। 'আমিও শুনেছি, আপনি ওখানকার অনেক খবর রাখেন। ধরতে গেলে একজন এক্সপার্ট।'

'এক্সপার্ট কি না, জানি না,' বিনয় করল রানা। 'তবে হ্যাঁ, আফ্রিকার

বেশিরভাগ জায়গাই আমার চেনা।' মহাদেশটার প্রতি ওর আলাদা দুর্বলতার কথা গোপন রাখল ও। হাজারো দুঃখ-দুর্দশা, আর নিষ্ঠুরতার মাঝেও ওখানেই জীবনের শ্রেষ্ঠ কিছু সময় কাটিয়েছে রানা, পেয়েছে খাঁটি কিছু বন্ধুর খোঁজ। আফ্রিকাকে ভালবাসে ও।/

'শুনে ভাল লাগল,' বললেন ব্যাগলি। 'ইরিত্রিয়া সম্পর্কে কতটা জানেন?'

এবার একটু অবাক হলো রানা। এ দেখি রীতিমত চাকরির ইন্টারভিউ নিতে শুরু করেছে। ইরিত্রিয়ার প্রসঙ্গ তুলছে কেন ভদ্রলোক? এমনকী আফ্রিকার স্ট্যাণ্ডার্ডেও ওটা একটা পিছিয়ে পড়া জায়গা।

নবীন একটা দেশ এই ইরিত্রিয়া। হর্ন অভ আফ্রিকার উত্তরে, লোহিত সাগরের পারে অবস্থিত। তিনটা দেশ ঘিরে রেখেছে ওটাকে—সুদান, ইথিওপিয়া আর জিবুতি। ১৯৯৩ সালে যুদ্ধ করে ইথিওপিয়ার কাছ থেকে স্বাধীনতা পেয়েছে। খনিজ সম্পদ বলতে কিছু নেই, বড় মাপের ইণ্ডাস্ট্রিও নেই ওখানে—বিদেশি বিনিয়োগ যৎসামান্য। কাব্যিক ভাষায় *নিরাশার দেশ* বলা যায় ইরিত্রিয়াকে। স্বাধীনতার গৌরব নিয়ে শুধু বাঁচছে ওরা, আর কিছু নয়। এই দেশের ব্যাপারে ব্যাগলির আগ্রহটা কোথায়?

'মোটামুটি জানি ইরিত্রিয়া সম্পর্কে,' বলল রানা। 'কেন?'

'অত্যন্ত গরীব একটা দেশ, তাই না?' বললেন ব্যাগলি। 'তবে রাতারাতি ওদের ভাগ্য-পরিবর্তনের একটা সুযোগ যদি পান আপনি, তা হলে কি আগ্রহী হবেন?'

বিভ্রান্ত বোধ করল রানা। কী বলতে চাইছেন ভদ্রলোক?

লাঞ্চ সার্ভ করার জন্য ওয়েইটার আসায় একটু চুপ করে রইলেন ব্যাগলি। ওরা চলে যাবার পর ছুরি-কাঁটাচামচ তুলে নিলেন, রানাকেও শুরু করতে ইশারা করে খেই ধরলেন কথার:

'বেশিরভাগ ইরিত্রিয়ান নাগরিকই গ্রামীণ অর্থনীতি নির্ভর। পশুপালন করে ওরা, সঙ্গে চাষাবাদ। শহর বলতে রয়েছে শুধু *আসমারা*—ওদের রাজধানী। স্বাধীনতা-যুদ্ধ শেষে ওই একটা শহরই শুধু টিকে ছিল, তারপর আর বাড়েনি। পুরো দেশটারই আসলে নড়বড়ে অবস্থা, গড়ে মাথাপিছু বাৎসরিক আয় মাত্র একশো চল্লিশ ডলারের মত। ত্রিশ লাখ জনসংখ্যার জন্য আয়টা কত সামান্য, তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন? দুর্ভিক্ষ ওখানকার একটা প্রধান সমস্যা। এ-কারণে আড়াই লাখ ইরিত্রিয়ান শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছে পার্শ্ববর্তী সুদানে, ওদেরকে দেশে ফিরতেও দিচ্ছে না ক্ষমতাসীন সরকার—নাজুক অর্থনীতি ওদের বোঝা সইতে পারবে না বলে। ওরা বৈদেশিক সাহায্যও নিচ্ছে না—ঘাড়ত্যাড়ামি বলতে পারেন... মরে যাবে, তাও ঋণের বোঝা মাথায় নেবে না... এমনই ওদের আত্মসম্মান! অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, অলৌকিকভাবে কোনও অর্থনৈতিক বিস্ফোরণ না ঘটলে ওদের ভাগ্য বদলাবার উপায় নেই। দেশের মানুষ না-খেয়ে মরবে, আড়াই লাখ শরণার্থীও দুনিয়ার জঘন্যতম কিছু শরণার্থী-শিবিরে পড়ে পড়ে পচবে।'

কিছু বলল না রানা, আফ্রিকার জনগণের দুর্ভোগের কথা খুব ভাল করেই

জানা আছে ওর। সারাজীবনে নরকতুল্য যে-সব জায়গা দেখেছে, তার বেশিরভাগই ওই অন্ধকার মহাদেশে। পুরনো স্মৃতিগুলো মনে পড়ে যাওয়ায় নিজের অজান্তেই একটু কেঁপে উঠল ও। হাতের দিকে তাকাল—এই দু'হাতে কঙ্কালসার বহু শিশুকে বয়ে নিয়ে গেছে ও আশ্রয়-শিবিরে। ওখানে রোগ-শোকের ভয়াবহতা দেখেছে ও নিজের চোখে। দেখেছে, কলেরা-ম্যালেরিয়া আর এইডস্ কীভাবে নিঃস্ব একেকটা জাতিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। দু'টুকরো রুটির আশায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কড়া রোদে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মানব-কঙ্কালেরা, তারপরও তাদের মুখে আহার জোটে না ঠিকমত। সে এক ভয়াবহ দৃশ্য।

সেসবের চেয়েও ভয়াবহ কিছু অপেক্ষা করছিল ওর জন্য। খাওয়া থামিয়ে পাশে ঝুঁকলেন ব্যাগলি, ব্রিফকেস খুলে বের করে আনলেন একটা ম্যানিলা খাম—রাবার ব্যাণ্ড দিয়ে বাঁধা। সেটা থেকে কয়েকটা ফটোগ্রাফ বের করলেন তিনি, বাড়িয়ে ধরলেন রানার দিকে। ওগুলো হাতে নিয়েই চমকে গেল ও, অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল।

প্রথমটায় মৃতপ্রায় এক কঙ্কালসার বৃদ্ধকে দেখা যাচ্ছে... একটা দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছেন। জীবিত এই বৃদ্ধের পা চিবুচ্ছে একটা ঘেয়ো কুকুর, চুষে ছিবড়ে করে ফেলছে; অথচ মাটিতে রক্তের পরিমাণ খুবই সামান্য! দ্বিতীয়টায় দেখা যাচ্ছে উদোম এক তরুণীর মৃতদেহ, পড়ে আছে মাটিতে হাত-পা ছড়িয়ে। তার সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বেশ ক'জন সৈনিক, লাশটাকে ধর্ষণ করবে! তৃতীয় ছবিটা আরও ভয়াবহ—যন্ত্রণাকাতর একটি শিশু, সারা শরীরে ক্ষত, কী যেন চিবুচ্ছে। ভাল করে তাকাতেই আঁতকে ওঠার অবস্থা হলো রানার। খিদের জ্বালায় নিজেই নিজের শরীরের মাংস খুবলে খুবলে খাচ্ছে শিশুটি!

বাকিগুলো দেখার আর রুচি হলো না, নীরবে ছবিগুলো ফিরিয়ে দিল রানা। সামনে থেকে সরিয়ে রাখল খাবারের প্লেট। খামের ভিতর ছবিগুলো ভরে ফেলে ব্যাগলি বললেন, 'আপনার খাওয়াটা মাটি করে দেবার জন্য দুঃখিত। তবে আমার প্রস্তাবের গুরুত্ব বোঝাবার জন্য ছবিগুলো দেখানোর প্রয়োজন ছিল আপনাকে।'

'নাটকীয়তার দরকার ছিল না,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'ওখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে জানা আছে আমার। এগুলো নিশ্চয়ই ইরিত্রিয়ার ছবি?'

'হ্যাঁ। সবাই হতভাগা ইরিত্রিয়ান... এভাবেই বেঁচে আছে ওরা, কিংবা এভাবেই মরছে। কিন্তু সুখবর হলো, ওদেরকে সাহায্য করবার ক্ষমতা আছে আমাদের হাতে। আমার বিশ্বাস, এই প্রথমবারের মত ইরিত্রিয়ার জনগণকে আশার আলো দেখাতে পারব আমরা।'

গলায় উঠে আসা বমিভাবটাকে দূর করার জন্য এক ঢোক পানি খেল রানা। 'কীভাবে?'

খাবারের প্লেট সরিয়ে সামনের দিকে একটু ঝুঁকলেন ব্যাগলি। নিচু গলায় বললেন, 'আপনাকে আমি যা বলতে এসেছি, সেটা অত্যন্ত গোপনীয়... একেবারে *টপ সিক্রেট* ক্যাটাগরির তথ্য। মুখ খোলার আগে তাই আপনার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি চাই—এ-বিষয়ে কখনও কাউকে কিছু বলবেন না আপনি... কাজটা নিন, কিংবা না-ই নিন।'

'এ-ধরনের প্রতিশ্রুতি আমি দিতে পারব না, মি. ব্যাগলি,' রানা বলল। 'আমার ব্যাপারে যদি ঠিকমত খোঁজ নিয়ে থাকেন, তা হলে এটা নিশ্চয়ই জানতে পেরেছেন—আমি কিছু কিছু জায়গায় দায়বদ্ধ। তবে এটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারি—অন্যায় কোনও সুযোগ নেব না। যতটুকু সম্ভব, ততটুকু গোপনীয়তা অবশ্যই বজায় রাখব।'

'আমার জন্য ওটুকুই যথেষ্ট, মি. রানা,' সন্তুষ্ট গলায় বললেন ব্যাগলি। 'তা হলে আসল কথা বলি। ১৯৮৯ সালে নাসা আর ইউ.এস. এয়ারফোর্স যৌথভাবে *মেডিউসা* নামে একটা স্পাই স্যাটেলাইট লঞ্চ করেছিল। স্টার ওয়ারস ডিফেন্স প্রোগ্রামের চোখ হিসেবে কাজ করবার কথা ছিল ওটার। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে একটা অরবিটও কমপ্লিট করতে পারেনি ওটা, লঞ্চ করবার কিছুক্ষণের ভেতর একটা অ্যাকসিডেন্টে পড়ে ক্র্যাশ করে। তবে পড়ে যাবার আগে বেশ কিছু ছবি তুলে রেখে যায় ওটা... স্ট্র্যাটেজিক্যালি গুরুত্বহীন একটা এলাকার ছবি। ক্র্যাশের আগে স্যাটেলাইটটার ক্যালিব্রেশন সম্পন্ন করতে পারেনি বিজ্ঞানীরা, কাজেই ছবিগুলোর নির্দিষ্ট কোনও অর্থ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এলাকাটাও ইম্পরট্যান্ট নয়... ফলে কেউ ব্যাপারটা নিয়ে উৎসাহী হয়নি। এয়ারফোর্সও ওগুলো নিয়ে তাই কখনও মাথা ঘামায়নি, ক্লাসিফায়েড ফাইলে ভরে গত বিশ বছর ধরে ফেলে রেখেছিল আর্কাইভে। কিছুদিন আগে ক্লাসিফিকেশন উঠিয়ে নেয়া হয়েছে ফাইলটা থেকে, ফলে ওগুলো দেখার সুযোগ পেয়েছি আমরা...'

'কোন এলাকার ছবি তুলেছিল ওটা?' বাধা দিয়ে জানতে চাইল রানা।

'মেডিউসার তোলা সবচেয়ে পরিষ্কার ছবিগুলো পূর্ব-সুদান আর উত্তর ইরিত্রিয়ার,' ব্রিফকেস খুলে নতুন একটা খাম বের করলেন ব্যাগলি, সেখান থেকে কয়েকটা ফটোগ্রাফ মেলে ধরলেন রানার সামনে।

স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফির সঙ্গে পরিচয় আছে রানার, তবে চোখের সামনে যে-বিশটা ছবি রয়েছে, সেগুলো অন্যরকম। হঠাৎ দেখায় এক্স-রে'র মত মনে হলো—সারফেসের একটা ছায়া-প্রতিবিম্বের তলা থেকে ফুটে উঠেছে বিভিন্ন রকম পাথর আর শিলার প্রতিকৃতি। একেকটা একেক রঙের। ভূ-গর্ভস্থ নদীও চোখে পড়ছে, সেগুলো একেবারে সাদা।

'এই শটগুলো উত্তর ইরিত্রিয়ার,' বললেন ব্যাগলি। 'প্রতিটায় সারফেসের গভীর থেকে গভীরতর লেভেলের ছবি দেখাচ্ছে। প্রি-প্রোগ্রামড় ইন্সট্রাকশন ফলো করছিল মেডিউসার কম্পিউটার। প্রতিটা শট নেবার আগে তার ফটোগ্রাফিক এলিমেন্টের শক্তি বাড়িয়ে নিচ্ছিল। ব্যাপারটা অনেকটা একটা পেঁয়াজ ভেদ করে দেখার মত, একটা একটা করে পরত সরিয়ে ছবি তুলেছে মেডিউসা।'

স্যাটেলাইটটার এই অদ্ভুত ক্ষমতার কথা শুনে অবাক হলো রানা। 'ঠিক কী ধরনের স্যাটেলাইট ছিল ওটা, বলুন তো?'

হাসলেন ব্যাগলি। 'ইউনিক... ওয়ান অভ আ কাইণ্ড। ছবিতে যা দেখছেন, তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি ক্ষমতা ছিল মেডিউসার। আপনার মত ওই একই প্রশ্ন আমিও করেছিলাম। এয়ারফোর্সের যে-লোক আমাকে ছবিগুলো দিয়েছে, তার ভাষামতে মেডিউসা ছিল মেডিক্যাল ক্যাট স্ক্যানার, বা এমআরআই-এর মত

একটা যন্ত্র—পার্থক্য শুধু এই যে, মানুষের মাথার পরিবর্তে ওটা পৃথিবীর চামড়া ভেদ করে দেখতে পারত। অত্যন্ত সফিসটিকেটেড একটা স্যাটেলাইট ছিল ওটা; যদি ক্র্যাশ না করত, তা হলে অরবিটাল সার্ভেইলান্স আর ইন্টেলিজেন্স গ্যাদারিঙে আমাদের দেশের ধারে-কাছে কেউ আসতে পারত না।'

'চমৎকার প্রযুক্তি,' স্বীকার করল রানা, 'কিন্তু এর সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক, তা বুঝতে পারছি না।'

'একটু ধৈর্য ধরুন, খুব শীঘ্রি বুঝতে পারবেন।' খাম থেকে আরেকটা ছবি বের করলেন ব্যাগলি। 'এটা দেখে কী বুঝছেন?'

হাতে নিয়ে এক নজর দেখল রানা, মেডিউসার তোলা অন্যান্য ছবিগুলোর সঙ্গে তেমন কোনও পার্থক্য নেই। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ও বলল, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এই ছবিটার কি আলাদা কোনও বিশেষত্ব আছে?'

'হ্যাঁ,' বললেন ব্যাগলি। 'এটা সত্যিকার ছবি না, কম্পিউটার সিমিউলেশন। মেডিউসাকে বানানোর পিছনে যে-সব বিজ্ঞানী জড়িত ছিলেন, তাঁদেরই একজনের করা। ভদ্রলোকের উপর দায়িত্ব ছিল, স্যাটেলাইটটার আউটপুট ইমেজ মডেলিঙের। মানে, মেডিউসার তোলা ছবিগুলো কেমন হবে, কী ধরনের রঙ দিয়ে আণ্ডারগ্রাউণ্ড বিভিন্ন এলিমেন্ট রিপ্রেজেন্ট করা হবে... এসব ঠিক করার দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর। জিয়োলজির ঝোঁক ছিল ভদ্রলোকের, তা ছাড়া জানতেন—হীরার খোঁজে দক্ষিণ আফ্রিকার সাব-সারফেস টপোগ্রাফি নিয়েই সবচেয়ে বেশি স্টাডি করা হয়েছে; তাই ওই এলাকাটাকেই সিমিউলেশনের মডেল হিসেবে বেছে নেন। আপনার হাতে যে-ছবিটা রয়েছে, সেটা দক্ষিণ আফ্রিকার কিম্বারলি এলাকার। মেডিউসা যদি তার পজিট্রন ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলত, তা হলে ঠিক এমনই দেখাত ছবিটা।'

ব্যাপারটা সম্পর্কে জানা আছে রানার। আফ্রিকান সাভানার মাঝখানে এককালে কিম্বারলি ছিল স্রেফ একটা ছোট টিলা। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই ওই টিলার মধ্যে আবিষ্কৃত হয় হীরা, ফলে রাতারাতি চেহারা বদলে যায় জায়গাটার। কয়েক বছরের মধ্যে বিশাল এক শহর তৈরি হয় ওখানে; উত্থান ঘটে সিসিল রোডস্ আর তাঁর ডি-বিয়ার্স করপোরেশনের।

ডায়মণ্ড বা হীরা এক অর্থে অভিশপ্ত বস্তু। অন্তত অন্য কোনও দামি রত্ন হীরার মত এত অপরাধ, দুর্নীতি আর বেদনাদায়ক রোমান্সের জন্ম দেয়নি। অথচ জিনিসটা আসলে জমাট বাঁধা কার্বন, রাসায়নিক ব্যাখ্যায় গ্রাফাইট আর কয়লার সহোদরা। ধারণা করা হয় তিন বিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীর একশো বিশ থেকে দুশো কিলোমিটার গভীরে প্রথম তৈরি হয় হীরা। অবিশ্বাস্য তাপ আর চাপে, গ্যাস ও তরল পাথরের সঙ্গে নির্ভেজাল কার্বন ভলকানিক শ্যাফটের মধ্য দিয়ে সারফেসের দিকে উঠে আসতে শুরু করে। এই শ্যাফটকে সাধারণত পাইপ বলা হয়। এই মিশ্র পদার্থ বিস্ফোরিত হয়ে যখন উপরে উঠছে, ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বাঁধে কার্বন, অতি মাত্রায় কঠিন আর স্বচ্ছ পাথরে পরিণত হয়। অতটা গভীর তলদেশ থেকে অল্প যে-ক'টা ম্যাটেরিয়াল পৃথিবীর সারফেসে পৌঁছায় তার মধ্যে হীরা একটা।

যে-শাফট ধরে ওপরে উঠে আসে হীরা, সেটার আকৃতি প্রায় গোল হয়, যতই সারফেসের দিকে ওঠে ততই চওড়া হতে থাকে, অথবা সরু—জাহাজের চিমনির মত, আবার কখনও গাজরের মত। লাভা যখন আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে বেরিয়ে আসে তখন তরল থাকে, কিন্তু তরল পাথরের সঙ্গে মিশ্রিত হীরা ওপরে ওঠার সময় দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে যায়, জমাট বেঁধে শক্ত ঢিবি বা স্তূপে পরিণত হয়। এই ঢিবি বা স্তূপ প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে ক্ষয়ে যায়, হীরাগুলো ছড়িয়ে পড়ে, তখন সেগুলোকে বলা হয় পাললিক তলানি। ক্ষয়ে যাওয়া শাফট বা পাইপ অনেক সময় লেকে পরিণত হয়। তবে স্ফটিকে পরিণত পাথরের বড় টুকরোগুলো আণ্ডারগ্রাউণ্ড পাইপ বা শূট-এ থেকে যায়। অমনই একটা পাইপ ছিল কিম্বারলিতে, এখন অবশ্য ফুরিয়ে গেছে। তবে আজও হীরার উৎস, বা পাইপকে কিম্বারলাইট পাইপ বলে ডাকা হয়।

পাশাপাশি কিম্বারলির কম্পিউটার প্রজেকশন আর মেডিউসার তোলা ছবিগুলো রাখল রানা, দেখতে পেল—দুটোর মধ্যে অন্তত ডজনখানেক সাদৃশ্য আছে। কল্পনার ঘোড়াকে লাগামছাড়া হতে দিল না, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সবক'টা ছবি। ওভাবে দেখায় ব্যাপারটা বরং আরও স্পষ্ট হয়ে গেল, সন্দেহের কোনও অবকাশ রইল না। হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল রানার, উত্তেজনায় হাতের তালু ঘেমে উঠল। এমন একটা আবিষ্কার কারও জীবদ্দশায় একবারই হতে পারে... আর সেটাই এডওয়ার্ড ব্যাগলি মেলে ধরেছেন ওর সামনে! এই তো... ছবিতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, ইরিত্রিয়ার প্রাচীন বন্ধ্যাভূমির নীচে পড়ে আছে একটা কিম্বারলাইট পাইপ... আকার-আয়তনে প্রায় হুবহু দেড়শো বছর আগে আবিষ্কৃত দক্ষিণ আফ্রিকারটারই মত! মাথা তুলে আণ্ডার-সেক্রেটারির দিকে তাকাল ও। চেহারায় নীরব জিজ্ঞাসা।

মৃদু একটা হাসি ফুটল মি. ব্যাগলির ঠোঁটে। 'ঠিকই ধরেছেন... আমাদের লোকজনও একই কথা ভাবছে। ইরিত্রিয়ায় একটা হীরার উৎস আছে। ব্যাপারটার গুরুত্ব আশা করি বুঝতে পারছেন? দেশটার জন্য ওটা একটা অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটিয়ে দিতে পারে।'

উত্তেজনার রাশ টেনে ধরল রানা। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবল বিষয়টা নিয়ে, তারপর শান্ত কণ্ঠে বলল, 'ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার, কোনও সন্দেহ নেই; কিন্তু অবিশ্বাস্য না? ওই এলাকায় কখনও হীরা, কিংবা হীরার মার্কার-মিনারেলগুলোর কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি। একথা বলছি না যে, ইরিত্রিয়ায় ভালমত তল্লাশি চালানো হয়েছে; তারপরও এমন একটা জিনিস গত দেড়শো বছরে কেউ খেয়াল করেনি—তা কি হতে পারে? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বহুদিন ব্রিটিশরা শাসন করেছে দেশটা, ওরা সাধারণত এমন জিনিস মিস করে না।'

'ওদের কাছে মেডিউসা ছিল না,' বললেন ব্যাগলি। 'আমাদেরও কপাল খারাপ। ক্যালিব্রেশনের আগেই স্যাটেলাইটটা ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় আমরাও বলতে পারছি না, পাইপটা ঠিক কোথায়, কিংবা কতটা গভীরে আছে। সারফেসের কাছে হতে পারে, আবার হতে পারে দশ হাজার ফুট গভীরেও। কিছুই বলা সম্ভব নয় এই ছবি দেখে। একমাত্র উপায় হচ্ছে, ওখানকার টপোগ্রাফির সঙ্গে মিলিয়ে

বালি-মাটি পরীক্ষা করে হ্যাঁ বা না নিশ্চিত করা। কাউকে না কাউকে যেতে হবে ওখানে।'

'এ-কাজের জন্যই চাইছেন আমাকে?' প্রশ্ন করল রানা।

'একজ্যাক্টলি, মি. রানা। আপনার এজেন্সি... সোজা কথায় আপনাকে চাইছি আমরা পাইপটা খুঁজে বের করবার জন্য।'

মাথা নাড়ল রানা। এটা হতে পারে না। হীরার খনি সংক্রান্ত মোটামুটি ভূ-তাত্ত্বিক জ্ঞান আছে ওর, কয়েক বছর আগে হীরকসম্রাট রডনি বুমারকে মোকাবেলার সময়ে বেশ পড়াশোনা করতে হয়েছিল। ও বলল, 'দেখুন, এর মধ্যে হাজারটা সমস্যা আছে। আমারগুলো পরে বলছি, আগে প্রাকৃতিক সমস্যাগুলো শোনাই। এটা যে-আসলে কিম্বারলাইট পাইপ, তার-ই কোনও গ্যারান্টি নেই। হ্যাঁ, সিমিউলেশনের সঙ্গে মিলছে বটে, কিন্তু ওটা যে ধ্রুব-সত্য, তা ধরে নেয়া যায় না। তা ছাড়া ওটা কিম্বারলাইট পাইপ হলেও হীরা থাকবে, এমনটি ভাবাও ভুল। অতীতে এমন অনেক পাইপ পাওয়া গেছে, যার ভিতরে হীরা ছিল না। ভিতরে হীরা থাকলেও অনেক সময় ভূমিক্ষয়ের কারণে সেগুলো ছড়িয়ে পড়ে, সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। তা ছাড়া এসব পাইপ হচ্ছে মরীচিকার মত, সঠিক লোকেশন জানা না থাকলে খুঁজে লাভ নেই, কয়েকশ' লোক কাজে লাগালেও সন্ধান বের করতে পারবেন না। হীরা-টিরা পাওয়া তো অনেক পরের কথা।'

'সমস্ত ছবি অ্যানালিসিস করে আমরা দুইশ' বর্গমাইলের একটা এলাকা নির্দিষ্ট করেছি...'

ব্যাগলিকে কথা শেষ করতে দিল না রানা। বলল, 'হোয়াটএভার, মি. ব্যাগলি। আমি জানতে চাই, এ-বিষয়টা নিয়ে আপনি আমার কাছে এসেছেন কেন? আমি একজন সামান্য ইনভেস্টিগেটর... খনি-টনি খোঁজা জিয়োলজিস্টদের কাজ। রানা এজেন্সি, কিংবা আমি এ-ধরনের কাজ করি না, করবার মত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাও নেই আমাদের।'

'আপনি বিনয় করছেন, মি. রানা,' বললেন ব্যাগলি। 'আমি বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়েছি, আপনি নামকরা একজন শৌখিন আর্কিয়োলজিস্ট, খোঁড়াখুঁড়ির বিষয়ে ভাল অভিজ্ঞতা আছে। সেজন্যে কম-বেশি জিয়োলজিকাল নলেজ নিশ্চয়ই আছে আপনার। পাইপটা খুঁজে বের করবার জন্য ফিল্ডে যেসব ছোটখাট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে, তা আপনি পারবেন।'

'পারব না বললে মিথ্যে বলা হবে, তবে কাজটা একজন জিয়োলজিস্টের, প্রাইভেট কোনও ব্যস্ত ইনভেস্টিগেটরের নয়। এই আমেরিকাতেই হাজার হাজার অভিজ্ঞ ভূতত্ত্ববিদ আছেন, তাঁদের মধ্য থেকে পছন্দমত একজনকে বাছাই করে একটা টিম গঠন করে নিন। ওরাই আপনাকে সবচেয়ে ভাল রেযাল্ট এনে দিতে পারবে।'

'না, মি. রানা,' মাথা নাড়লেন ব্যাগলি। গলা নামিয়ে বললেন, 'ওরা রাজিই হবে না। তা ছাড়া গোপনীয়তার একটা ব্যাপার আছে। এই বিশেষ কাজটার জন্য সবচেয়ে বেশি যা দরকার, তা হলো দুঃসাহস, সার্ভাইভেবিলিটি এবং টাফনেস। আর্কিয়োলজিকাল জ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে ওরকম যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি একমাত্র

আপনাকেই পেয়েছি আমরা।'

'একটা ভূতাত্ত্বিক সার্ভের সঙ্গে সার্ভাইভিবিলিটি এবং টাফনেসের কী সম্পর্ক?' ভুরু কোঁচকাল রানা। 'আর গোপ...'

'দুনিয়ার সবচেয়ে কঠিন ও ভয়ঙ্কর একটা এলাকার কথা বলছি আমি, মি. রানা। ইরিত্রিয়ার স্বাধীনতা-যুদ্ধের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর রণাঙ্গন ছিল ওটা, আজও ওখানে যুদ্ধের সময় ইথিওপিয়ানদের পোঁতা আড়াই লাখ সোভিয়েত ল্যাণ্ড-মাইন রয়ে গেছে। তা ছাড়া বর্ডার অতিক্রম করে সুদানিজ দস্যু আর বিদ্রোহীরা প্রায়ই হানা দেয় এলাকাটায়, ডাকাতি আর খুন-জখম করে বেড়ায়। আমার হাতে ইনফরমেশন আছে, কয়েক মাস আগে ওরা একজন অস্ট্রিয়ান আর্কিয়োলজিস্টকে নৃশংসভাবে খুন করেছে... ওই সার্চ-এরিয়াটাতেই! ব্যাপারটা প্রচারও পেয়েছে। বুঝতেই পারছেন, কেন অ্যাকাডেমিক জিয়োলজিস্ট দিয়ে কাজ হবে না, স্রেফ বেঘোরে খুন হয়ে যাবে ওরা। আমাদের দরকার একজন দক্ষ, শক্ত লোক... যে এ-ধরনের সিচুয়েশন ট্যাকেল করতে জানে।'

'আপনি কি আমার আগ্রহ জাগাতে চাইছেন, নাকি ভয় দেখাতে?'

'আমি শুধু আপনাকে বাস্তব পরিস্থিতিটা বলছি, মি. রানা। সিদ্ধান্ত আপনার। তবে সেটা নেবার আগে সবদিক জেনে নেয়া প্রয়োজন আপনার।'

ওয়েইটারকে ইশারা করে প্লেটগুলো নিয়ে যেতে বলল রানা। টেবিল খালি হতেই সরাসরি জিজ্ঞেস করল, 'পুরো ব্যাপারটা আপনি ইরিত্রিয়ানদের হাতে তুলে দিচ্ছেন না কেন?'

'ভাল প্রশ্ন,' হাসলেন ব্যাগলি। 'তবে জবাবটাও সহজ। অফিশিয়ালি মেডিউসার কোনও অস্তিত্ব নেই, বা ছিল না, মি. রানা। যে-জিনিসের অস্তিত্ব নেই, সেটার তোলা ছবি আমি কাউকে দেখাব কী করে?'

'আমাকে তো দেখালেন!'

'সেটা ভিন্ন ব্যাপার। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে আপনার ব্যাপারে এয়ারফোর্সকে রাজি করাতে হয়েছে আমাকে। কিন্তু মেডিউসা সংক্রান্ত সবকিছু এখনও *টপ সিক্রেট* বলে গণ্য করা হয়। সে-খবর আমি বাইরের কোনও দেশের সরকারকে জানাতে পারি না।'

চুপ করে রইল রানা। বুঝতে পারছে, আরও কিছু বলবেন ভদ্রলোক। ইরিত্রিয়ান সরকারকে আঁধারে রাখার পিছনে এটাই একমাত্র কারণ হতে পারে না। ছবির কথা গোপন করেও কিম্বারলাইট পাইপের খবর জানানো যেত ওদের।

সামনের দিকে ঝুঁকলেন ব্যাগলি। 'দ্বিতীয় কারণটাকে আপনি সিম্পলি একটা পলিসি ডিসিশান বলতে পারেন। আমরা ইরিত্রিয়ান সরকারকে শুধু সম্ভাবনার কথা শুনিয়ে অস্থির করতে চাই না; বরং কিম্বারলাইট পাইপটার সঠিক লোকেশন, ওখানকার স্টকের সম্ভাব্য মূল্য এবং হীরা উত্তোলনের সবচেয়ে কার্যকর উপায়টার খবর জানিয়ে সরাসরি সাহায্য করতে চাই। আর সেজন্যেই আপনার মত একজন নির্লোভ, আদর্শবাদী মানুষ প্রয়োজন আমাদের। আমরা চাই, আপনি ইরিত্রিয়ায় যান, কিম্বারলাইট পাইপটা খুঁজে বের করুন; সেই সঙ্গে এটাও বের করুন—ওতে সত্যিই হীরা আছে কি নেই।'

ভদ্রলোকের এই ভালমানুষি ভাবটা পছন্দ হলো না রানার। ও নিশ্চিত, অনেক কিছু চেপে যাচ্ছেন তিনি। আমেরিকানরা এখনও এত মহাপুরুষ হয়ে যায়নি যে, নিঃস্বার্থভাবে আফ্রিকার একটা দেশকে হীরার খনি খুঁজে দেবে। এডওয়ার্ড ব্যাগলিকে ধীরে ধীরে অপছন্দ করতে শুরু করল ও।

'তারমানে ইরিত্রিয়ার ভিতরে, ওদের কিছু না জানিয়ে জিয়োলজিক্যাল সার্ভে চালাতে চাইছেন আপনি?' বাঁকা সুরে প্রশ্ন করল রানা। 'ওদের উপকারের জন্য? ফেলানথ্রপি?'

'না, না,' তাড়াতাড়ি মাথা নাড়লেন ব্যাগলি। খোঁচাটা ঠিকই টের পেয়েছেন। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা। 'অবৈধ কোনও কাজ করব না আমরা। আনঅফিশিয়ালি ইরিত্রিয়ান সরকারের টপ-লেভেলের কয়েকজনকে আসল ঘটনা খুলে বলেছি আমি; ইন ফ্যাক্ট, ওরা ওদের একজন লিয়াজোঁ-ও দিয়েছে এখানকার দূতাবাস থেকে। টপ-লেভেলের ওই কয়েকজন... সেই সঙ্গে আমার ইরিত্রিয়ান লিয়াজোঁর কাছে কোনও কিছু গোপন নেই, বাকিদের বুঝ দেয়া হয়েছে মূল্যবান খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের কথা বলে। মোদ্দা কথা হলো, আপনার চিন্তার কিছু নেই, মি. রানা। অন্তত ওদের সরকার আপনার কাজে বাধা দেবে না।'

'এখনও রাজি হইনি আমি,' মনে করিয়ে দিল রানা। তারপর হেলান দিল চেয়ারে। কয়েক মুহূর্ত ভেবে বলল, 'দেখুন মি. ব্যাগলি, অস্বীকার করব না, অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং একটা কেস এটা। তবে সমস্যা হলো, জিয়োলজিকাল সার্ভে আমার কাজের ধারার মধ্যে পড়ে না। তা ছাড়া এ-মুহূর্তে আমার হাতে সময়ও নেই। তারপরও যদি আমাকে অপরিহার্য মনে করেন, ব্যাপারটা আরও একটু ভেবে দেখতে পারি আমি; কিন্তু সেজন্যে দু-এক সপ্তাহ সময় দিতে হবে আমাকে।'

রানার সন্দেহটা সত্যি বলে প্রমাণিত হলো পরমুহূর্তে। আণ্ডারসেক্রেটারির চেহারায় মেঘ জমল ওর কথা শুনে। আসলেই গোপন কোনও মতলব আছে লোকটার, রানা সেটার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ওর অনীহাতে তাই বিচলিত হয়ে পড়েছে।

'কোনও সমস্যা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ইয়ে... না।' আমতা আমতা করলেন ব্যাগলি। 'আমি আসলে ইরিত্রিয়ানদেরকে বুঝিয়েছি যে, কাজটা দ্রুত করা যাবে। সে-মোতাবেক চাকাও ঘুরতে শুরু করেছে...'

মাথায় রক্ত চড়ে গেল রানার, ভেবেছে কী লোকটা? ওকে এত সহজে বাঁদর-নাচ নাচাতে পারবে? পুরো প্রস্তাবটাতেই একটা নোংরা গন্ধ পাচ্ছে ও শুরু থেকে, সামনে মুলো ঝুলিয়ে ওকে আগুনে ঝাঁপ দেয়াতে চাইছে ব্যাগলি। তাতে রাজি হবার প্রশ্নই আসে না।

ন্যাপকিনে মুখ মুছে উঠে দাঁড়াল রানা। 'দুঃখিত, আপনি তা হলে ভুল লোকের কাছে এসেছেন, মি. আণ্ডারসেক্রেটারি। এ-কাজটা নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যা-যা বলেছেন, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না। অন্যের গোমর রক্ষা করতে জানি আমি, কাউকে কিছু বলব না। গুড বাই, সার। দয়া করে আমার

সঙ্গে আর যোগাযোগ করবার চেষ্টা করবেন না।'

ব্যাগলিকে বিস্মিত করে দিয়ে বেরিয়ে গেল রানা। মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে, এখানে আর সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। ধুরন্ধর আণ্ডারসেক্রেটারি তার মতলব নিয়ে থাকুক, ও এতে জড়াবে না। বিসিআই চিফকে একটা রিপোর্ট দিয়ে চ্যাপ্টারটা এখানেই শেষ করে দিতে হবে।

রেস্টুরেন্টের একপ্রান্তে বসে রানার চলে যাওয়া প্রত্যক্ষ করল ওয়াচার লোকটা, ব্রিফকেসে হাত ঢুকিয়ে একটা বোতাম চাপল। এতক্ষণ একটা ইউনি-ডিরেকশনাল মাইক্রোফোনের সাহায্যে রেকর্ড হচ্ছিল রানা আর ব্যাগলির কথাবার্তা, থেমে গেল তা।

পাঁচ

কলেজ পার্ক স্ট্রিটের অ্যাপার্টমেন্ট।

ডাইনিং টেবিলের ঠিক মাঝখানে রাখা হয়েছে টেপ-রেকর্ডারটা, চলছে। চারদিক ঘিরে বসে আছে সার্ভেইলান্স টিমের লিডার আর তার তিনজন সহকারী, মনোযোগ দিয়ে শুনছে মাসুদ রানা আর এডওয়ার্ড ব্যাগলির মধ্যকার কথোপকথন।

টেপটা শেষ হতেই হাত বাড়িয়ে স্টপ বাটন চাপল লিডার, তাকাল বাকিদের দিকে। 'কী মনে হয় তোমাদের?'

'বৃথা চেষ্টা,' বলল দলের একমাত্র মেয়েটি। 'চালু লোক, টোপ দিলেই তাতে ঠোকর দেবে না।'

'আমি একমত,' মাথা ঝাঁকাল তার পাশেরজন।

'এই লোকের কাছে ব্যাগলি যে-পরিমাণ ডিটেইলস্ দিয়েছে, তা দেখে আমি অবাক,' বলল তৃতীয়জন—দলের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ও বয়স্ক লোক সে। 'আগের দু'জনকে তো এর অর্ধেকও বলেনি।'

'কারণ মাসুদ রানার মত রেপিউটেশন তাদের ছিল না,' মন্তব্য করল লিডার। 'ওর ডোশিয়ে-টা দেখলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে তোমাদের কাছে। যে-সে লোক নয় এই মাসুদ রানা। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের অন্যতম সেরা এজেন্ট। শুধু তাই নয়, আরও অনেকগুলো পরিচয় আছে তার। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির এক বা একাধিক শাখা ছড়ানো রয়েছে—ও তার প্রধান, ন্যাশনাল আণ্ডারওয়াটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সির অনারারি প্রজেক্ট ডিরেক্টর—অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের বিশেষ প্রিয়পাত্র, জাতিসঙ্ঘের ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি-টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনের স্পেশাল এজেন্ট... ওর আর্কিয়োলজিকাল অ্যাচিভমেন্টও চোখ কপালে তুলে দেবার মত। বাজি ধরে বলতে পারি, ব্যাগলি শুরু থেকে ওকেই চাইছিল। অন্য দুজনের কাছে গিয়েছিল শুধুমাত্র এই লোকটাকে পাওয়া যাচ্ছিল না বলে।'

'কিন্তু রানা তো ইন্টারেস্টেড নয়,' বলল মেয়েটি। 'আমরা এখন কী করব? ব্যাগলি এরপর কার কাছে যায়, সেটা দেখার জন্য অপেক্ষা করব?'

'না,' মাথা নাড়ল লিডার। 'মাঠে নামতে হবে আমাদেরকে। বাজেটের বেশিরভাগই খরচ হয়ে গেছে, অথচ মূল অপারেশন শুরু হয়নি এখনও। এমন চলতে থাকলে আমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে। সেটা হতে দেয়া যায় না।'

একটু ভাবল লিডার। তারপর বলল, 'রানাকেই প্রয়োজন আমাদের। ব্যাগলি যখন নরমাল চ্যানেলে ওকে রিক্রুট করতে ব্যর্থ হয়েছে, তা হলে আমাদেরকে বিকল্প পথে চেষ্টা করতে হবে। ওর উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ কজা করা দরকার, যাতে ও ইরিত্রিয়ায় যেতে বাধ্য হয়—ব্যাগলির লোক হিসেবে নয়, আমাদের লোক হিসেবে! ওর দুর্বলতা খুঁজে বের করতে হবে আমাদেরকে। ডোশিয়ে বলছে, ওর কোনও জীবিত আত্মীয়স্বজন নেই; টাকার লোভ দেখিয়েও কাজ হবে না—এই লোক অন্য ধাতুতে গড়া। তার মানে এই নয় যে, ও ধরাছোঁয়ার বাইরে। কাজে নেমে পড়ো তোমরা। মনে রেখো, যেভাবেই হোক, রানাকে দু'সপ্তাহের মধ্যে ইরিত্রিয়ায় পাঠাতে হবে আমাদের।'

'হুম, তারমানে আমাদের অপারেশনাল পেরিমিটারের কোনও সীমা থাকছে না?'

'না। যে-কোনও পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারো, কিন্তু ব্যাগলির প্রস্তাব মেনে নিতে রানাকে রাজি করানো চাই। কারও কোনও প্রশ্ন আছে?' দেখা গেল নেই। 'গুড, বেরিয়ে পড়ো তা হলে। আমি আবার আর্কাইভ নিয়ে বসছি, দেখি রানার ব্যাপারে নতুন কিছু জানা যায় কি না।'

সঙ্গীদের বিদায় করে দিয়ে কমাণ্ড রুমে গিয়ে ঢুকল লিডার। দরজা বন্ধ করে অন্ করল কম্পিউটার, সিকিওর্ড কানেকশনের মাধ্যমে ওদের ডেটাবেজে ঢুকল, খুলল রানার ফাইল। স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আনমনা হয়ে গেল সে।

জেরুসালেমের প্রাচীরের ঠিক বাইরে প্রাচীন-ঐতিহ্যবাহী এক পরিবারে জন্ম হয়েছে লিডারের, ওর আসল নাম হাসাব। গত নয়শো বছর ধরে ওদের পরিবার বংশ-পরম্পরায় ওখানেই বাস করছে। একসময় খ্রিস্টান ও মুসলিমদের সঙ্গে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি রেখে শান্তিতে বসবাস করত ওদের পরিবার। ওরা ছিল হাতে গোনা ফিলিস্তিনী ইহুদিদের অংশ। শত শত বছরে ধর্মটা কোনও সমস্যা করেনি ওদের জন্য, কিন্তু গত শতাব্দীর মাঝামাঝি ঘটে গেল পট-পরিবর্তন। ইহুদি-রাষ্ট্র ইজরায়েল জন্ম নেবার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ল ওদের গোটা সমাজ। দেশপ্রেম আর ধর্মের মাঝখানে পড়ে হাবুডুবু খেতে শুরু করল ফিলিস্তিনী ইহুদিরা। একদিকে ফিলিস্তিনী হিসেবে তাদের জন্মভূমিতে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ সইতে পারছিল না ওরা, আবার অন্যদিকে ইহুদি হয়ে তাদের ধর্মভাইদেরকে দূরেও ঠেলে দিতে পারছিল না।

এই টানাপড়েনে একঘরে হয়ে পড়ে ওরা—না ফিলিস্তিনী মুসলমান, না ইজরায়েলি ইহুদি... কারও মাঝেই আর স্থান পায়নি, কেউ ওদেরকে বিশ্বাস করতে পারেনি। দু'পক্ষের মাঝখানে পড়ে পদদলিত হতে থাকে তারা—হাসাবের

পরিবারও তার ব্যতিক্রম নয়। আশির দশকে পশ্চিম তীর আর গাজায় ফিলিস্তিনীদের বিপ্লবের সময় ওর ছোট চাচাকে খুন করে মুসলমানরা। আবার ইজরায়েলি সামরিক অভিযানেও মারা পড়ে পরিবারের আরও দুই সদস্য। হাসাব তখন নিতান্ত শিশু।

বড় হবার পর এসবের বাইরে থাকতে চেয়েছে ও, কিন্তু পারেনি। নিজের এক চাচাত বোন সাবিহকে ভালবাসত হাসাব, দশ বছর আগে সে মারা পড়ে ইজরায়েলি সিকিউরিটি ফোর্সের গুলিতে—হামাসবিরোধী একটা অভিযান চালাচ্ছিল তারা। সেদিন থেকে বদলে গেল হাসাব, হাতে তুলে নিল অস্ত্র। শৈশব আর কৈশোরে শান্তি ও আদর্শের যে-শিক্ষা ও পেয়েছিল, তা ভুলে গিয়ে পরিণত হলো সবার ঘৃণিত এক মানুষে... একজন সন্ত্রাসবাদীতে! এখন ও শুধু ফলাফলে বিশ্বাস করে, কাজের পদ্ধতিতে নয়। সহিংসতার পথে যদি ওর লক্ষ্য অর্জিত হয়, স্বপ্নপূরণ হয়... তবে হোক না!

'হাসাব?' ডাক শুনে সংবিৎ ফিরে পেল ও। ইয়াশাদ দাঁড়িয়ে আছে দরজায়—দলের সবচেয়ে বয়স্ক ও অভিজ্ঞ সদস্য, ওর চাচা। ওর প্রেমিকার আব্বা।

'আসুন, চাচা,' হাসাব বলল। 'ভিতরে এসে আমাকে দুশ্চিন্তাগুলোর হাত থেকে বাঁচান।'

একটা চেয়ার টেনে ভাইপোর পাশে এসে বসল ইয়াশাদ। 'কী নিয়ে ভাবছ তুমি?'

'সহিংসতা নিয়ে—হিংসা আর হানাহানির যে-পথ আমরা বেছে নিয়েছি, তা নিয়ে। এর অর্থ কী?'

'এর কোনও অর্থ নেই,' দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল ইয়াশাদ। 'স্রেফ একটা পথ বলতে পারো, কিংবা উপায়—ঠিক যেমন লাঙল, বা স্ক্রু-ড্রাইভার, কিংবা এ.কে-ফোরটি সেভেন।'

'জানি। কিন্তু এর চরিত্র নিয়ে ভাবছি আমি।'

মৃদু হাসি ফুটল ইয়াশাদের ঠোঁটে। নতুন এই জীবনের শুরুর দিনটি থেকে হাসাবকে শিক্ষা দিয়ে আসছে সে, অথচ আজও ছেলেটার মনের সমস্ত জিজ্ঞাসা দূর হয়নি। এক অর্থে সেটা ভাল, হাসাব অন্যান্যদের মত বিবেকবুদ্ধিহীন যন্ত্রে পরিণত হয়নি। সবদিক ভেবেচিন্তে কাজ করে ও, সংগঠনে নেতৃত্ব দেবার জন্য ওর মত লোকেরই দরকার। শুধু যে সাবিহ ওকে ভালবাসত তা নয়, সে-ও মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসে ছেলেটাকে।

'সহিংসতার কোনও চরিত্র নেই, হাসাব,' বলল ইয়াশাদ। 'ওটা মানুষের থাকে। বেসিক্যালি সবাই শান্তি চায়, কিন্তু দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে চরম পথটা বেছে নেয়া ছাড়া উপায় থাকে না। উন্মত্ত হয়ে উঠি আমরা, ওটাই আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। আত্মরক্ষার জন্য, অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য ভেতরের এই হিংস্রতাকে ব্যবহার করলে ক্ষতি নেই। কিন্তু ওটা যদি চিন্তাভাবনা ছাড়া মানবহত্যার জন্য ব্যবহার করো, তা হলে এমন শক্তিশালী একটা জিনিসকে শুধু অপচয়ই করা হয়।'

'আর এই যে মাসুদ রানার বিরুদ্ধে যেটা ব্যবহার করতে চলেছি আমরা?' প্রশ্ন করল হাসাব।

'সেটা প্রয়োজনের খাতিরে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ইয়াশাদ। 'শোনো, নিজেকে অপরাধী ভাববার কিছু নেই। রানা লোকটা নিরীহ-ভালমানুষ নয়, আজ সকালে ও বেরিয়ে যাবার পর ওর বাড়িটা তল্লাশি করেছি আমি। কথাটা অন্যদের সামনে তুললে ওরা নার্ভাস ফিল করত, তাই মুখ বন্ধ রেখেছিলাম। তবে যা আবিষ্কার করেছি, সেটা ভাল কিছু নয়। এই লোককে হাতের মুঠোয় আনতে হলে আমাদেরকে কঠোর হতেই হবে।'

'কীভাবে ঢুকেছেন ওর বাড়িতে?' অবাক হয়ে জানতে চাইল হাসাব। 'সিকিউরিটি সিস্টেম ছিল না?'

'ছিল... খুব ভাল মানেরই ছিল। তবে নিখুঁত সিস্টেম বলে কোথাও কিছুর অস্তিত্ব নেই... মানে, আমার মত পোড়-খাওয়া লোককে ঠেকানোর মত আর কী!' হাসল ইয়াশাদ, চোখের পাশে চামড়ার ভাঁজ গভীর হলো। 'তবে স্বীকার করছি, রেলিং ধরে ঝুলে সিঁড়ি বাইবার বয়স পেরিয়ে এসেছি আমি, বেশ কষ্ট হয়েছে।'

'কী পেয়েছেন ওর বাড়িতে?'

'এক গাদা অস্ত্র-শস্ত্র—ক্লজিটে লুকানো ছিল। হেকলার অ্যাণ্ড কচ মেশিন-পিস্তল, একটা বেরেটা-নাইন্টি টু অটোলোডার, অ্যামিউনিশন, স্মোক আর ফ্র্যাগমেন্টেশন গ্রেনেড, নাইট-ভিশন গিয়ার, প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভের বেশ কয়েকটা ব্লক... লিস্টটা আরও বড়।'

'তাতে কী? ও তো একটা স্পাই, অস্ত্রশস্ত্র থাকতেই পারে।'

'সাধারণ একজন স্পাই শুধু সাইড-আর্মস্ আর বাড়তি অ্যামিউনিশন রাখে,' বিরক্ত গলায় বলল ইয়াশাদ। 'রানা রাখছে পুরো একটা অস্ত্রাগার। মানেটা হলো, যে-কোনও ধরনের বিপদ সামলাবার জন্য ওর প্রস্তুতি আছে। তা ছাড়া ওর ফোনবুক ঘেঁটেছি আমি, আমেরিকার উচ্চপদস্থ বহু লোকের নাম আছে তাতে... সবাই ওর ঘনিষ্ঠ এবং বন্ধু। মানেটা বুঝতে পারছ? হাইলি-কানেক্টেড একজন লোক, তার উপর নিজস্ব দলবল আছে, সবদিক থেকে তৈরি... ওকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে বাধ্য করাটা সহজ হবে না।'

'পিছিয়ে আসতে বলছেন?' ভুরু কোঁচকাল হাসাব।

'তা বলছি না, ওকে আমাদের দরকার। তবে খুব সতর্ক থাকতে হবে... এবং নির্মম হতে হবে আমাদের। কোনও ধরনের দুর্বলতা দেখানো চলবে না।'

'তা আমি দেখাবও না,' দৃঢ় গলায় বলল হাসাব। 'এই মিশন আমাদের জন্য জীবন-মরণের মত ব্যাপার, চাচা। আফ্রিকার ওই মরুভূমিতে লুকিয়ে আছে আমাদের ভবিষ্যৎ—আমাদের ভাইদের জন্য আশার আলো, অবিশ্বাসীদের মনে বিশ্বাস জাগিয়ে তোলার অব্যর্থ অস্ত্র! ওটা পেতেই হবে আমাদেরকে। যত বড় কানেকশনই থাকুক রানার; যতই চালু, কিংবা তৈরি হোক; আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জন করবই। আপনার কি মনে হয়, ও আমাদের পথের কাঁটা হতে পারবে?'

ভাইপোর চোখে আবেগের আগুন দেখতে পেয়ে সন্তোষ ফুটল ইয়াশাদের চেহারায়। শান্ত গলায় সে বলল, 'না, পারবে না।'

ছয়

আর্লিংটন, ভার্জিনিয়া।

এডওয়ার্ড ন্যাগলির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে এলেও পুরো ব্যাপারটা মাথা থেকে তাড়াতে পারছে না রানা। ভাবছে, বসের কাছে রিপোর্ট দেবার আগে কয়েকটা প্রশ্নের জবাব জানা থাকা দরকার। তাই আর্লিংটনের অফিসে ফিরেই আফ্রিকার ভূতত্ত্ব আর ভূগোল বিষয়ক বেশ কিছু রেফারেন্স বই আনিয়ে নিল ও স্থানীয় পাঠাগার থেকে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে চোখ বোলাতে থাকল ওগুলোয়; মাঝে মাঝে ইন্টারনেটের সাহায্য নিচ্ছে। সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পরও ব্যস্ত রইল বইপত্র নিয়ে। সোহেলকে ইতোমধ্যে পুরো ঘটনা জানিয়েছে ও, তাই চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আজ ওর বদলে ডিউটি দিয়েছে ব্রাঞ্চে, সাহায্য করেছে তিশাকে। রানা কাজে ব্যস্ত দেখে সন্ধ্যায় আড্ডা দিতেও আসেনি।

তবে রানার খাটুনিটাতে ইতিবাচক কোনও ফল মিলল না। ইরিত্রিয়ার ওই এলাকার ভূতত্ত্ব কিম্বারলাইট পাইপের উপস্থিতি সমর্থন করে না। গ্রেট রিফট ভ্যালির ডগায় বসে আছে গোটা দেশটা, লাখ লাখ বছর আগে ওখানে ভলকানিক অ্যাকটিভিটি ছিল বটে, কিন্তু তাতে হীরা বেরিয়ে এসেছিল, এমন কোনও প্রমাণ নেই। আজ পর্যন্ত হীরার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনও ট্রেসার এলিমেন্টও পাওয়া যায়নি ওখানে। আবিষ্কৃত হয়নি কোনও পাললিক তলানি। ইরিত্রিয়ায় হীরা থাকবার মত সামান্য ইঙ্গিতও পাওয়া গেল না কোথাও।

কিন্তু মেডিউসা স্যাটেলাইটের ছবিগুলো বলছে ভিন্ন কথা। কিম্বারলির কম্পিউটার প্রজেকশনের সঙ্গে বিস্ময়কর সাদৃশ্য ছিল ওগুলোর। অবশ্য হাজারটা কারণে অমনটা হতে পারে: কম্পিউটার মডেলিঙেই হয়তো ভুল ছিল। কিন্তু তারপরও মাথা থেকে চিন্তাটা দূর করতে পারল না ও। ন্যাগলির বক্তব্যে যদি বিন্দুমাত্র সত্যতাও থাকে, তার মানে হচ্ছে: একটা কিম্বারলাইট পাইপ পড়ে আছে ওখানে... আবিষ্কৃত হবার অপেক্ষায়। যা-তা ব্যাপার নয় ওটা, সত্যিই পুরো ইরিত্রিয়ান জাতির ভাগ্য পাল্টে দিতে পারে একটা হীরা-ভর্তি পাইপ। যে-লোক ওটা আবিষ্কার করতে পারবে, সে গোটা একটা দেশের হিরোতে পরিণত হবে। ক্ষণিকের জন্য লোভ জাগল রানার মনে: হাজার হোক, গোটা একটা জাতিকে কৃতজ্ঞ বানাবার সুযোগ ক'জনই বা আর পায়!

মাথা ঝাঁকিয়ে ভাবনাটা দূর করল রানা। ঘড়ির দিকে তাকাল। বাংলাদেশে সকাল হয়েছে, ওখানে ন'টা বাজে; তারমানে চিফ এসে পড়েছেন অফিসে। ফোন করা যায়।

একবার মাত্র রিং হলো, তারপরই রিসিভারে ভেসে এল গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর। 'ইয়েস?'

দিবাচোখে রানা দেখতে পেল, প্রায়ান্ধকার রুমটায় বসে আছেন মেজর

জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান, চুরুটের ধোঁয়ায় ভরে আছে ঘরটা। কাঁচাপাকা ভুরুর নীচে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা এত দূর থেকেও যেন অনুভব করতে পারছে ও। পুরোটাই কল্পনা, তারপরও বুকটা কেন যেন ঢিব ঢিব করতে থাকল। কোনোরকমে নার্ভাসনেসটা কাটিয়ে বলল, 'রানা, স্যর।'

'ইয়েস, এমআরনাইন, কী খবর?'

উইলার্ড হোটেলে আণ্ডারসেক্রেটারি এডওয়ার্ড ব্যাগলির সঙ্গে সাক্ষাতের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলল রানা। শুনে কিছুক্ষণের জন্য চুপ হয়ে গেলেন রাহাত খান। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'কী মনে হয় তোমার, ইরিত্রিয়ায় হীরা থাকবার সম্ভাবনা কতটুকু?'

'এ-ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারব না, স্যর,' বলল রানা। 'জিয়োলজিস্টদের জিজ্ঞেস করে দেখা যেতে পারে। কিছু বইপত্র ঘেঁটেছি, তবে আশাব্যঞ্জক কিছু পাইনি। ওখানকার মাটিতে অমন দামি একটা মিনারেল থাকলে মনে হয় অনেক আগেই খোঁজ পাওয়া যেত।'

'কিন্তু স্যাটেলাইটের ছবিগুলো তো অন্য কথা বলছে।'

'জী, স্যর। কিন্তু ওগুলো অথেনটিক কি না, সেটা বুঝতে পারিনি। হতে পারে, হীরার খনির লোভ দেখিয়ে আমাকে অন্য কোনও কাজে লাগাতে চাইছে ওরা।'

'হুম, তা হলে ঠিকই করেছ ব্যাগলিকে আপাতত মানা করে দিয়ে,' বললেন রাহাত খান, তারপর একটু চুপ হয়ে গেলেন। কিছু ভাবলেন যেন। খানিক পর বললেন, 'পুরো ব্যাপারটা এতই অদ্ভুত যে, একেবারে অবিশ্বাস করতে পারছি না। তোমাকে ইরিত্রিয়াতে পাঠানোই যদি ওদের মূল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তা হলে বিশ্বাসযোগ্য অন্য কোনও গল্প বলতে পারত। গোপন স্যাটেলাইট, কিংবা কিম্বারলাইট পাইপের কাহিনি শোনাতে গেল কেন?'

'ওটা সত্যি বলে ভাবছেন আপনি, স্যর?'

'ঠিক তা নয়,' বললেন রাহাত খান। 'তবে... মেডিউসা নামে একটা ব্যর্থ প্রজেক্ট সম্পর্কে কিছু কথা আমাদের কানেও এসেছিল সে-সময়। ...দাঁড়াও, আমাদের ডেটাবেজে আণ্ডারসেক্রেটারি ব্যাগলির উপর একটা ফাইল আছে, ওটা দেখে নিই। এতদিন পর আবার সে স্যাটেলাইট নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি কেন! লোকটা উল্টোপাল্টা কিছুর সঙ্গে জড়িত কি না, সেটা বোঝা দরকার।'

কিছুক্ষণ নীরবতায় কাটল, রানা পরিষ্কার টের পেলেন, রাহাত খান সামনে রাখা কম্পিউটারে ব্যাগলির ফাইল দেখছেন। একটু পর তিনি বললেন, 'হুম, খুবই ঐতিহ্যবাহী একটা পরিবারের সন্তান এই ব্যাগলি। সেই আমেরিকান স্বাধীনতার সময় থেকে রাজনীতির সঙ্গে ওরা জড়িত। ইন ফ্যাক্ট, আমেরিকার ইতিহাসের প্রতিটা গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টে ওদের ভূমিকা রয়েছে। আমেরিকান গৃহযুদ্ধ, যুদ্ধ-পরবর্তী পুনর্গঠন থেকে শুরু করে চল্লিশ আর পঞ্চাশের দশকে আমেরিকার সুপার-পাওয়ারে পরিণত হওয়ার পিছনে ওদের অবদান কম নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্যাগলির বাবা আইজেনহাওয়ারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন। সিআইএ-র প্রতিষ্ঠার সময় অ্যালেন ডালেস আর জাতিসংঘের অ্যাডেলাই

স্টিভেনসনের সঙ্গেও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছেন ভদ্রলোক।'

ফাইলটা আরেকটু দেখলেন রাহাত খান। তারপর বললেন, 'তোমার এই এডওয়ার্ড ব্যাগলি তার পরিবারের সবচেয়ে ব্যর্থ মানুষ, রানা। আণ্ডারসেক্রেটারির পোস্টটা ধরে রাখতেই সে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে, পারিবারিক প্রতিপত্তির কারণে পদটা পেয়েছে সে, নিজের যোগ্যতায় নয়। খুব বেশিদিন হয়নি দায়িত্বটা এডওয়ার্ড কাঁধে নিয়েছে, কিন্তু এরই মধ্যে চরম ব্যর্থতা দেখিয়ে ফেলেছে। গত বছর জাম্বিয়ার অভ্যুত্থানের ব্যাপারে সে আগে থেকে আঁচ করতে পারেনি; দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রদূতকেও এমন অপমান করে বসেছে যে, ভদ্রলোক প্রতিবাদ হিসেবে দু'সপ্তাহের জন্য আমেরিকা ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। কূটনৈতিক পর্যায়ে রীতিমত ক্ষমা চেয়ে তাকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।'

'এরপরও ব্যাগলিকে পদচ্যুত করা হয়নি?' রানা বিস্মিত।

'উঁহু, আমেরিকাতেও পারিবারিক প্রভাব একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার,' বললেন রাহাত খান। 'তবে নতুন প্রেসিডেন্ট অন্য ধাতের মানুষ। আফ্রিকান অ্যাফেয়ার্সের মত একটা ডিপার্টমেন্ট তিনি অকর্মণ্য কারও হাতে ফেলে রাখবেন বলে মনে হয় না। আর কোনও ঘাপলা হলে ব্যাগলিকে নির্ঘাত গদি ছাড়তে হবে... অন্তত আমাদের ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট তা-ই বলছে।'

'কিন্তু কিম্বারলাইট পাইপটা পুরো পরিস্থিতি পাল্টে দিতে পারে!' আচমকা রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল রানার কাছে। উত্তেজিত কণ্ঠে ও বলল, 'ব্যাগলির জন্য ওটা একটা বিরাট অ্যাচিভমেন্ট হতে পারে, সার! ক্যারিয়ার বাঁচাতে পারবে, পরিবারের মান-সম্মানও রক্ষা করতে পারবে সে। সেজন্যেই ওটা খুঁজে বের করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে।'

'মনে হচ্ছে, ঠিকই আন্দাজ করেছ তুমি, রানা,' একমত হলেন রাহাত খান। 'ক্যারিয়ার বাঁচানোর জন্যই তোমার সাহায্য চাইছে সে। ওর সঙ্গে নিজেকে না জড়িয়ে ভাল করেছ। তবে...' একটু ইতস্তত করলেন তিনি, '...ব্যাপারটার মধ্যে সত্যতা থাকলে শুধুমাত্র ব্যাগলির কথা ভেবে চুপচাপ বসে থাকাও ঠিক বলে মনে করি না। যদিও এতে আমাদের কোনও স্বার্থ নেই, তবুও সময়-সুযোগ পেলে একটু খোঁজখবর নিয়ে দেখো। আমিও দেখি। ইরিত্রিয়ানদেরকে সাহায্য করলে তো ক্ষতি নেই। গরীব একটা দেশ উপকৃত হবে তাতে, বাংলাদেশের একটা বন্ধু বাড়বে।'

'ঠিক আছে, সার। আমি খোঁজখবর নিয়ে দেখব তা হলে।'

'এবার শোনা যাক, তোমার নতুন ব্রাঞ্চের খবর।' প্রসঙ্গ পাল্টে ফেললেন তিনি।

মিনিট দশেক পরে ফোন নামিয়ে রাখল রানা। মনটা চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। সত্যিই কি তা হলে কিম্বারলাইট পাইপ আছে ইরিত্রিয়াতে?

বেশিক্ষণ বিষয়টা নিয়ে মাথা ঘামাতে পারল না ও, বেরসিকের মত বেজে উঠল মোবাইল ফোন। কলটা রিসিভ করতেই শোনা গেল সোহেলের গলা। 'কী রে, শালা? ডিনার-টিনার করবি, নাকি শুকনো কাগজ চিবিয়ে রাতটা পার করার মতলব করেছিস?'

হাসল রানা। 'তুই কোথায়?'

'বার্নি-র রেস্টুরেন্টে বসে আছি, খিদেয় নাড়ি-ভুঁড়ি জ্বলছে। তুই কি আসবি, নাকি শুরু করে দেব আমি?'

'দশ মিনিট অপেক্ষা কর্, দোস্ত। এই এলাম বলে!'

কাপড় বদলে বেরিয়ে পড়ল রানা। রেস্টুরেন্টটা পাড়ার মাথাতে, ওখানেই সাধারণত ডিনার করে রানা। পৌঁছুতে বেশি সময় লাগল না। ভিতরে ঢুকতেই সোহেলকে দেখতে পেল ও, এক কোণে একটা টেবিল দখল করে বসেছে; হাতছানি দিয়ে ডাকল ওকে।

বন্ধুর মুখোমুখি বসল রানা, ওয়েইটারকে ডেকে খাবারের অর্ডার দিল। সোহেল জিজ্ঞেস করল, 'বুড়োর সঙ্গে কথা হয়েছে?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তুই ফোন করবার ঠিক আগেই কথা হলো।'

'কী বলল কিম্বারলাইট পাইপের কথা শুনে?'

'অবিশ্বাস করছে না, আমাকে বলল সম্ভব হলে খোঁজখবর নিয়ে দেখতে।'

ভুরু কুঁচকে গেল সোহেলের। 'এজেন্সির ঝামেলা আমার ঘাড়ে গছিয়ে দিয়ে কেটে পড়বার তাল করছিস নাকি?'

'না, না। স্রেফ অ্যাকাডেমিক রিসার্চ, কোথাও যাব না। তা ছাড়া এখানকার কাজ প্রায় শেষ। তোকে পস্তাবার মত কিছু অবশিষ্ট রাখিনি। আমি না থাকলেও ব্রাঞ্চ ওপেন করায় কোনও অসুবিধেয় পড়বে না তিশা। তাই বলে আলেয়ার পিছনে ছোটাছুটি করবার মোটেও ইচ্ছে নেই আমার। পাইপের ব্যাপারটা ভুয়া হবার সম্ভাবনাই বেশি। সারাদিন বইপত্র ঘেঁটে অমন ধারণাই জন্মেছে আমার মনে।'

খাবার এসে গেছে। চামচ তুলে নিয়ে সোহেল বলল, 'জানিস তো, গ্যালিলিও-র মতবাদের আগে পৃথিবীকে স্থির বলে ভাবত লোকে—স্থির বিশ্বাস ছিল ওদের।'

'জানি। কিন্তু সেটার সঙ্গে হীরার কী সম্পর্ক?'

'বলতে চাইছি যে,' খাবার চিবুতে চিবুতে বলল সোহেল, 'গ্যালিলিও নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষের "ধারণা" পাল্টে দিয়েছিলেন। প্রমাণ করে দিয়েছিলেন—পৃথিবী স্থির নয়, সূর্যের চারপাশে ঘুরছে। হীরার ব্যাপারটাও তেমন হতে পারে না? অবস্থাদৃষ্টে মনে হতে পারে, ওখানে পাইপ থাকা সম্ভব নয়; কিন্তু ব্যাপারটার হয়তো একটা ব্যাখ্যা আছে।'

'আমার তা মনে হয় না,' রানা মাথা নাড়ল।

'অমন কথা পরমাণু সম্পর্কেও বলেছিল বিজ্ঞানীরা। ভেবেছিল, ওটাই পদার্থের মূল; ওটাকে ভাঙা সম্ভব নয়। পরে কিন্তু ঠিকই পরমাণু ভেঙে প্রোটন, নিউট্রন আর পজিট্রন বের করেছে।'

'তুই দেখি আমার ধারণাকে ভুল প্রমাণ করবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিস,' বিরক্ত গলায় বলল রানা। 'এত শখ হলে নিজেই ইরিত্রিয়ায় চলে যা না! কে মানা করছে? ব্যাগলির ফোন নম্বর দেব?'

হেসে ফেলল সোহেল। প্রসঙ্গ পাল্টাল।

খাওয়া শেষ হবার খানিক পরেই রানার পায়ে হালকা একটা লাথি দিল সোহেল, দরজার দিকে ইশারা করল। ভুরু কুঁচকে ওদিকে তাকাল রানা, সঙ্গে সঙ্গে ভাষা হারাল।

অপূর্ব সুন্দরী এক তরুণী এসে ঢুকেছে রেস্টুরেন্টে। বেশ লম্বা—অন্তত পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি। তন্বী, একহারা শরীর বলে আরও লম্বা লাগছে। সাদা রঙের একটা ঢোলা স্ল্যাকস্ আর ধূসর রঙের ব্লাউজ পরে আছে; সোয়েটার খুলে বেঁধে রেখেছে গলায়। মুখের গড়ন আর চেহারায় কৃষ্ণাঙ্গদের আদল, তবে চামড়া তাদের চেয়ে অনেক ফর্সা—দুধ দেয়া কফির মত। মাথাভর্তি একরাশ ঘন কালো চুল, ঢেউ খেলে নেমে গেছে ঘাড় ছাড়িয়ে। চোখদুটো বাদামি। হাবভাবে আভিজাত্য। মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল রানা ও সোহেল। বার্নির রেস্টুরেন্টে বেশ কিছুদিন থেকে আসা-যাওয়া করছে রানা, কিন্তু এমন সুন্দরী কখনও চোখে পড়েনি।

ভিতরে বসা সমস্ত পুরুষের বুকে কাঁপন তুলে বারের কাছে গেল মেয়েটি, বারটেণ্ডারকে কিছু জিজ্ঞেস করল, তারপর সোজা এগিয়ে এল ওদের টেবিলের দিকে।

'মি. মাসুদ রানাকে খুঁজছি আমি,' রিনরিনে কণ্ঠে বলল তরুণী। 'বাড়িতে গিয়েছিলাম, পাইনি। একজন পড়শি বলল এখানে খোঁজ নিতে।'

রানা জবাব দেয়ার আগেই ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল সোহেল। 'আমিই মাসুদ রানা,' বলল ও। পুরনো অভ্যাস—বন্ধুর মুখের গ্রাস কেড়ে নেবার পাঁয়তারা করছে। 'কীভাবে সাহায্য করতে পারি, বলুন?'

হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করল তরুণী। 'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মি. রানা। আমি দিনা আবান... ফ্রম ইরিত্রিয়ান এম্বাসি—মি. এডওয়ার্ড ব্যাগলির লিয়াজোঁ। আজ দুপুরে আপনার সঙ্গে লাঞ্চে আমারও থাকার কথা ছিল, কাজে আটকা পড়ে যাওয়ায় আসতে পারিনি।'

'আপনি এলে ভালই হতো,' দিনার হাতটা ধরে রেখে বলল সোহেল, মেয়ে-পটানোর ভঙ্গিতে কথা বলছে। আসলে খেপাচ্ছে রানাকে। 'নীরস লাঞ্চটাতে অন্তত প্রাণের ছোঁয়া পেতাম।'

'দুঃখিত, ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আসতে পারিনি। তবে মি. ব্যাগলির কাছে শুনেছি সব। আপনার যদি খুব বেশি অসুবিধে না হয়, তা হলে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই আবার... এবার আমাদের জনগণের পক্ষ হয়ে।'

সোহেলকে আর সুযোগ দিল না রানা। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এক্সকিউজ মি, মিস আবান। মাসুদ রানা আসলে আমি। এ হলো আমার বন্ধু সোহেল আহমেদ। এর আচরণে কিছু মনে করবেন না, আসলে বেচারা মালটিপল-পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডারে ভুগছে। এই তো, আপনি আসার একটু আগেই ও নিজেকে মেরিলিন মনরো ভাবছিল।'

সপ্রতিভ মেয়ে দিনা, দুষ্টুমিটার তাল বজায় রাখল। হাসি ফুটিয়ে সোহেলকে বলল, 'নাইস টু মিট ইউ, মিস মনরো। *নায়াগ্রা* ছবিটা দেখার পর থেকে আমি আপনার অন্ধভক্ত।'

সোহেলের চেহারায় বিরক্তি ফুটল। 'আরে, আপনাদের জন্য দেখছি শান্তিতে ঠাট্টা-মশকরাও করা যাবে না! আমাকে মেরিলিন মনরো বানিয়ে দিলেন?' রানার দিকে তাকাল ও, দৃষ্টি দিয়ে শাসাল—*দাঁড়া, তোর খবর আছে!*

'প্লিজ, বসুন, মিস আবান।' চেয়ার টেনে ধরল রানা।

'ওয়াইন দিতে বলি?' সোহেল জিজ্ঞেস করল।

'না, ধন্যবাদ,' মাথা নাড়ল দিনা। 'শুধু কফি। আর ইয়ে... কিছু যদি মনে না করেন, মি. রানার সঙ্গে আমি একটু একান্তে কথা বলতে চাই...'

'কফির অর্ডারটা দিয়ে কেটে পড়,' সোহেলকে বাংলায় বলল রানা। 'আমাকে গোপন কথা বলবে সুন্দরী।'

'বলতে হবে না,' হাত নাড়ল সোহেল। 'প্রেমালাপ কি আর আমার সামনে জমবে?'

গটমট করে হেঁটে চলে গেল ও।

ওয়েইটার কফি পরিবেশন করে চলে যেতেই রানা বলল, 'দেখুন মিস আবান, মি. ব্যাগলির প্রস্তাবটা আমি খুব ভালমত খতিয়ে দেখেছি। দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, ওটা গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ওই ফটোগ্রাফগুলোর ব্যাপারে আমি কোনও মন্তব্য করতে চাই না, কিন্তু এটুকু বুঝতে পারছি—ইরিত্রিয়ায় একটা হীরা-ভর্তি কিম্বারলাইট পাইপ থাকার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ... অলমোস্ট নিল্।'

'আপনি এতটা নিশ্চিত হচ্ছেন কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল দিনা।

'আমি নিশ্চিত নই, কারণ আমি জিওলজিস্ট নই। আমি শুধু আমার ধারণার কথা বলছি। সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছুটা পড়াশোনা করেছি আমি; বইপত্র তো বলছে—আপনাদের দেশে হীরা থাকতে পারে না। প্রাচীন ভলকানিক অ্যাক্টিভিটির কারণে ছিটেফোঁটা দু-এক টুকরো পাওয়া গেলেও যেতে পারে, তবে সেটা আপনাদের বা আমার সময় নষ্ট করবার মত কিছু নয়।'

'আপনি কি টাকার কথা ভাবছেন?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল দিনা। 'জানি, আপনার এজেন্সির ফি অত্যন্ত চড়া; কিন্তু অন্তত ছ'সপ্তাহ আপনার ফিল্ড-টাইম কেনার মত ফাণ্ড আছে আমাদের।'

'এটা ভুল ধারণা,' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'আমরা কেবল টাকার জন্য কাজ করি না। তা ছাড়া, আপনারা যদি মাত্র ছ'সপ্তাহের এক্সপিডিশনের জন্য প্ল্যান করে থাকেন, তা হলে এখুনি টাকাটা বাঁচিয়ে দিতে পারি আমি। শুনুন, আপনার ওই পাইপের ডগায় যদি একটা সাইনবোর্ড-ও লাগানো থাকে, তবু ছ'সপ্তাহে ওটা খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। খামোকা টাকাটা পানিতে ঢালবেন না প্লিজ।'

'মানে!'

'মানেটা খুব পরিষ্কার, মিস আবান। দুইশ' বর্গমাইলের সার্চ-এরিয়া আপনাদের... বলতে গেলে প্রতিটা ইঞ্চি খুঁজে দেখতে হবে। যত বড় টিমই দায়িত্ব নিক, মাত্র ছ'সপ্তাহে কাজটা শেষ করা এক কথায় অসম্ভব। দুনিয়ার যত বড় এক্সপার্ট-ই আনুন, কপাল তার যত ভালই হোক... তারপরও মাসের পর মাস লেগে যাবে রেজাল্ট পেতে।'

'বুঝতে পারছি, সময়টা একটু কম হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সবকিছু জেনেশুনেও আমরা যদি টাকা খরচ করতে চাই, তাতে আপনার আপত্তি কেন?'

কথা বলার ফাঁকে দিনার মুখের উপর দৃষ্টি আটকে যাচ্ছে রানার। ঠোঁটদুটো আশ্চর্য নিখুঁত ও আবেদনময়। মেয়েটা কথাও বলছে মোহনীয় ভঙ্গিতে। একটু সন্দেহ জাগল ওর মনে—একে টোপ হিসেবে ব্যবহার করছে না তো ব্যাগলি? পুরুষমানুষকে যে-কোনও প্রস্তাবে রাজি করাতে সুন্দরী মেয়েদের জুড়ি নেই। তবে এত সহজে ওকে ধরা কারও কর্ম নয়। তাই বলল, 'প্রশ্নটার জবাব আমি আগেই দিয়েছি—টাকাটা আমাদের কাছে মুখ্য নয়। যদি কিছু মনে না করেন, এবার আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।'

'ছ'সপ্তাহের ব্যাপারটা কী?'

চেয়ারে হেলান দিল দিনা। 'ফটোগ্রাফ বলছে, পাইপটার লোকেশন সুদান-সীমান্তের খুব কাছে। যত ভাল সিকিউরিটিই অ্যারেঞ্জ করি না কেন, ওখানকার দস্যুদের হাত থেকে কাউকে ছ'সপ্তাহের বেশি ওখানে কাজ করা নিরাপদ নয়। সার্চ-এরিয়াটা আফ্রিকার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জায়গাগুলোর একটা, মি. রানা। কয়েক মাস আগে একজন আর্কিয়োলজিস্ট মারা পড়েছে ওখানে...'

'মি. ব্যাগলি বলেছেন আমাকে,' রানা বলল। 'আমাকে চাইবার পিছনে এটাই নাকি সবচেয়ে বড় কারণ। ওই পরিস্থিতি ট্যাকেল করে নাকি একমাত্র আমিই সার্ভেটা চালিয়ে যেতে পারব।'

'দ্যাটস্ কারেক্ট, মি. রানা।'

'আমি কথাটা মানতে পারছি না,' রানা মাথা নাড়ল। 'বুঝতে পারছি না, আপনারা কানাডিয়ান বা ইয়োরোপের বড় কোনও মাইনিং আউটফিটের কাছে যাচ্ছেন না কেন বুঝতে পারছি না। ওদেরকে স্যাটেলাইটের খবর বলার প্রয়োজন নেই, এমনিতেই হীরার কথা শুনলে লাফিয়ে উঠবে। সার্ভের সময় যে-কোনও ধরনের থ্রেট মোকাবেলা করবার মত নিজস্ব সেটআপ আছে ওদের।'

'ওটা নিয়ে ভেবেছি আমরা, পরে বাতিলও করে দিয়েছি। এ-মুহূর্তে এই পর্যায়ের কারও সঙ্গে চুক্তিতে যাওয়া স্রেফ বোকামি হবে। মাইনিং কোম্পানিগুলোর যথেষ্ট কুখ্যাতি আছে—ওরা শুধু নিজেদের লাভটা দেখে, অন্য কারও নয়। দক্ষিণ আফ্রিকা আর নামিবিয়ার কথাই ধরুন। বছরের পর বছর ওদের খনিগুলোর আয় চলে গেছে ইয়োরোপিয়ানদের পকেটে, দেশদুটোর কোনও লাভই হয়নি। তারচেয়ে চুক্তিতে যাবার আগেই যদি পাইপটা আমরা নিজেরা খুঁজে বের করতে পারি, তা হলে আলোচনার টেবিলে ভালমত দর-কষাকষি করতে পারব।'

'আমি একমত,' বলল রানা। 'সত্যিই যদি ওখানে হীরা থাকে, তা হলে অন্যান্য দেশের ভুল থেকে শিক্ষা নেবার মত চমৎকার একটা পজিশনে রয়েছেন আপনারা। সাফল্য আসতে পারে, কিন্তু তার জন্য আমি বলব তাড়াহুড়ো না করে ধীরে-সুস্থে এগোতে। সিরিয়াসলি যদি পাইপটা খুঁজে বের করতে চান, তা হলে অন্তত এক বছর সময় নিন; আর আপনাদের এখন যা বাজেট আছে, তা তিনগুণ

করুন।

হতাশা ফুটল দিনার চেহারায়। 'সেটা সম্ভব নয়, মি. রানা।'

'তা হলে বাদ দিন আইডিয়াটা,' বিরক্ত গলায় বলল রানা। 'খামোকা টাকাগুলো নষ্ট না করে দেশের কাজে লাগান। পারলে সুদান থেকে কিছু শরণার্থী ফিরিয়ে আনুন, নইলে একটা ইণ্ডাস্ট্রি দিন। চাইলে দান-খয়রাতও করে দিতে পারেন। অন্তত নিশ্চিতভাবে ব্যর্থ হতে চলা একটা এক্সপিডিশনে ঢালার চেয়ে ভালভাবে খরচ হবে টাকাটা।'

কড়া কথাগুলো বলতে খারাপ লাগল রানার, না বলেও উপায় নেই। অর্থহীন এই আলোচনায় আর সময় নষ্ট করবার মানে হয় না। হ্যাঁ, দিনা আবানের দৃঢ়তা ওর মনে দাগ কেটেছে; কিন্তু শুধু মনের জোর দিয়ে অবাস্তব একটা প্রজেক্টকে সফল করা যায় না। কথাটা ওকে বুঝিয়ে দেয়া দরকার ছিল।

কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে রানার দিকে তাকিয়ে রইল দিনা, চোখের তারায় পরাজয় ফুটল। বুঝতে পেরেছে, ওকে রাজি করাতে পারবে না। শান্ত গলায় বলল, 'আমরা হাল ছাড়ছি না, মি. রানা।'

'সেক্ষেত্রে আপনাদের সৌভাগ্য কামনা করছি আমি... সত্যিই করছি। দুঃখিত, আমি সাহায্য করতে পারলাম না।'

চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল দিনা। তাড়াতাড়ি ওর হাত ধরল রানা। খারাপ লাগছে, এতটা কঠিন না হলেও চলত। নরম গলায় বলল, 'শুনুন, আমি ভুলও করতে পারি। হতে পারে, ইতিহাসের সবচেয়ে বড় খনিজ-আবিষ্কারের উপর বসে আছেন আপনারা। কিন্তু হতাশ হবার জন্য তৈরি থাকতে হবে আপনাদেরকে। ওখানে কিছু থাকুক, বা না-ই থাকুক; পুরো কাজটাতে অনেক সময় লাগবে।'

'মি. রানা, আমাদেরকে আপনি যতটা স্বপ্নবিলাসী ভাবছেন, তা কিন্তু মোটেই ঠিক না,' খসখসে গলায় বলল দিনা। 'হ্যাঁ, কাজটা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কঠিন; কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমরা চেষ্টা করব না। ভাল থাকবেন।'

বিদায় নিয়ে চলে গেল দিনা। রানাও উঠে পড়ল, বিল মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল রেস্টুরেন্ট থেকে। সোহেলের দেখা পাওয়া গেল পেভমেন্টে, অলস ভঙ্গিতে পায়চারি করছে। ওকে দেখে বলল, 'আলোচনাটা খুব একটা ফলপ্রসূ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। ডানাকাটা পরীকে খুব আপসেট অবস্থায় চলে যেতে দেখলাম।'

'হ্যাঁ, মানা করে দিয়েছি।' রানা বলল।

'নিশ্চয়ই খুব কাঠখোট্টাভাবে বলেছিস? নইলে অতটা আপসেট হতো না।'

'না বলে উপায় ছিল না,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'বোকার স্বর্গে বাস করছে ওরা, মাটির পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা দরকার ছিল।'

'এতটা নিশ্চিত হচ্ছিস কীভাবে? চিফ নিজেই তো সন্দিহান, তোকে খোঁজখবর নিতে বলেছে।'

'সেটা ভিন্ন ব্যাপার। বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি আর ফিল্ডে নামার মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক আছে। দুনিয়ার সবচেয়ে গরীব দেশগুলোর একটাতে বাস করে ওরা, অথচ জুয়ার মত একটা প্রজেক্টের পিছনে লাখ লাখ ডলার ঢালতে চাইছে। কাজটা অন্যায়... টাকাটা আসলে দরিদ্র জনগণের পিছনে খরচ করা

উচিত। আমার ধারণা, মিস আবানও জানে সেটা।'

'এ-কথা কেন বলছিস?'

'ছ'সপ্তাহের একটা ডেডলাইন দিয়েছে ওরা, ওটাই আমার মনে খুঁতখুঁতানি এনে দিয়েছে। কারণ যেটা বলেছে, তা মোটেই বিশ্বাস হয়নি। স্বাধীনতার পর ষোলো বছর কেটে গেছে ইরিত্রিয়ার, দেশটা বেদখল হয়ে যাবে—এমন কোনও ভয় নেই। পাইপটাও... যদি থেকে থাকে... ওখানে কয়েক হাজার বছর ধরে পড়ে আছে—কোথাও পালিয়ে যাচ্ছে না। তা হলে এত তাড়াহুড়োর কী আছে? শুরুতে যে-বাজে গন্ধটা পাচ্ছিলাম, তা তো এই মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে কমেইনি, বরং বেড়েছে। আমি শিয়োর—আণ্ডারসেক্রেটারি এডওয়ার্ড ব্যাগলি, আর এই রহস্যময়ী দিনা আবান কিছু একটা আমার কাছে গোপন করে যাচ্ছে।'

'কী করতে চাস তা হলে?'

'ন্যাথিং,' বলল রানা। 'ওরা ওদের গোমর নিয়ে থাকুক, আমার কী? আমি বরং চেষ্টা করব ব্যাপারটা যত দ্রুত সম্ভব ভুলে যেতে।'

'তারমানে কাল থেকে আবার স্বাভাবিক জীবনযাপন?'

'হ্যাঁ,' হাসল রানা। 'ভাল কথা... ওপেনিং পর্যন্ত থাকছিস তো এখানে?'

'তুই যদি পায়ে ধরে সাধিস তা হলে তো আর মানা করতে পারব না!' প্যাঁচানো হাসি ওর মুখে।

ওর ঘাড়ে একটা হাত রাখল রানা আলতো করে।

'পায়ে ধরে না,' হাসি মুখে বলল ও, 'ঘাড়ে ধরে হুকুম দিচ্ছি, শালাঃ হোটেল ছেড়ে চলে আয় আমার ওখানে। তিনটে দিন দারুণ কাটবে।'

হাত ঘুরিয়ে বক্সিং মারল সোহেল রানার কাঁধে।

সাত

পরদিন সকালে যথারীতি সূর্য ওঠার আগেই জাগল রানা। ঘুমে জড়িয়ে আছে চোখ। নিয়মমাফিক হাতমুখ ধুয়ে এল বাথরুম থেকে। সোহেল আহমেদকে দোতলার বেডরুম ছেড়ে দিয়ে নীচে লিভিংরুমের সোফায় ঘুমিয়েছে ও গতকাল—আসলে আজ রাত আড়াইটার সময়। ডিনার সেরে কাল অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করেছে অফিসে, তাই সোহেলের ঘুম ভাঙায়নি। সামনের দরজা খুলে পেপারটা নিল, তারপর কিচেনে গিয়ে কফি বানাল। কফির কাপ আর পত্রিকা নিয়ে লিভিং রুমে পা রাখতেই থমকে গেল ও।

সেন্টার-টেবিলের উপর ব্রাউন পেপারে মোড়া একটা প্যাকেট পড়ে আছে—কাল রাতে ছিল না ওটা! সতর্ক হয়ে উঠল রানা, ওর অজান্তে কেউ একজন ঢুকেছিল বাড়িতে, এখনও আছে কি না কে জানে। পত্রিকা আর কফির কাপ সাবধানে টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল ও, সোফার তলার গোপন খোপ থেকে বের করে আনল একটা ওয়ালথার পিপিকে পিস্তল, তারপর তল্লাশি শুরু

করল। প্রথমে নীচতলা, তারপর ওপরে।

দোতলায় উঠে আবার থমকাল রানা। সোহেল গেল কোথায়? বিছানা আলুথালু, কিছুটা যেন ধস্তাধস্তির আলামত। টয়লেটের দরজা হাঁ হয়ে আছে! আস্তে করে ডাকল, 'সোহেল?'

জবাব নেই। সাবধানে এগিয়ে পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল ও রিডিংরুমে, তারপর ব্যালকনিতে। নেই। কোথাও পাওয়া গেল না কাউকে। যে বা যারাই অনুপ্রবেশ করে থাকুক, ঘুমন্ত সোহেলকে কিডন্যাপ করে সঙ্গে নিয়ে প্যাকেটটা রেখে বেরিয়ে গেছে। কখন? ও ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়ার পর? না আগেই? নিশ্চয়ই পরে হবে, কারণ ও শোবার আগে বাতি জ্বেলেছিল এই ঘরের। তখন কোনও প্যাকেট ছিল না টেবিলে।

আর কোথাও হাত দেয়নি ওরা। বাড়িতে ও ছাড়া আর কেউ নেই নিশ্চিত হয়ে লিভিংরুমে ফিরে এল রানা, সোফায় বসে প্যাকেটটার দিকে হাত বাড়াল। এক মুহূর্তের জন্য সন্দেহ জাগল, জিনিসটা বোমা হতে পারে; পরমুহূর্তে বাতিল করে দিল ভাবনাটা। ওকে খুন করতে চাইলে ঢুকেই গুলি করে দিতে পারত, লিভিংরুমে বোমা রেখে যেত না। খুব সম্ভব, এটা একটা মেসেজ... ওর জন্য।

প্যাকেটটা হাতে নিতেই বাবল র‍্যাপের নরম স্পর্শ অনুভব করল রানা। মুখ খুলে উপুড় করতেই বেরিয়ে এল একটা ভিডিও ক্যাসেট। পেটের মধ্যে জট অনুভব করল রানা, এর ভিতর ভাল কিছু থাকতে পারে না।

লিভিংরুমের কোনায় রাখা এন্টারটেইনমেন্ট সেন্টারের দিকে এগোল রানা। ভিসিআর-এ ক্যাসেটটা ঢুকিয়ে টিভি অন্ করল, তারপর রিমোট তুলে নিয়ে চাপল প্লে বাটনটা। এক মুহূর্ত পরই ছবি ভেসে উঠল পর্দায়, আর সেটা দেখে মুখের রক্ত সরে গেল ওর।

সোহেলকে দেখা যাচ্ছে টিভিতে। সম্পূর্ণ নগ্ন, একটা কাঠের চেয়ারে বসিয়ে রুপালি রঙের ডাক্ট টেপ দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছে। বুকের নিপল্‌দুটোতে ক্লিপ দিয়ে লাগিয়ে রাখা হয়েছে ইলেকট্রিকের তার—শক দেবার ব্যবস্থা। মুখটা রক্তে রঞ্জিত সোহেলের, চোখের চারপাশে কালসিটে পড়ে গেছে। কোলের উপর পড়ে আছে আজকের *ওয়াশিংটন পোস্ট*। পত্রিকাটা দেখে অবাক হয়ে গেল রানা। এর অর্থ—ঘটনা আজকেরই!

একটা ধমক শুনে ক্যামেরার দিকে তাকাল সোহেল, কথা বলতে শুরু করল। মনে হলো বক্তব্যটা শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে।

'রানা,' বলল সোহেল, কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে, 'কাল রাতে বিছানা থেকে ধরে এনেছে আমাকে। কে ওরা, কী পরিচয়... কিচ্ছু জানি না। ওরা চায়, তুই ইরিত্রিয়ায় গিয়ে হীরার খনিটা খুঁজে বের করবি। নইলে আমাকে মেরে ফেলবে। ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করে লাভ হবে না, যদি টের পায় যে তুই না-যাবার ফন্দি এঁটেছিস, তা হলে আমার কল্লা কেটে তোর বাড়ির দরজায় রেখে দিয়ে আসবে।' দু'দিকে একটু তাকাল ও, তারপর বলল, 'ওদের কথা শুনিস না, রানা! কিছুতেই...'

কথা শেষ করতে পারল না ও, আড়াল থেকে মুখোশধারী একজন এগিয়ে

এসে সজোরে চড় কষাল ওর গালে। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল সোহেল। দাঁতে দাঁত পিষল রানা।

ক্যামেরার দিকে ফিরে মুখ খুলল মুখোশধারী—স্বাভাবিক কণ্ঠ নয়, ইলেকট্রনিক সিনথেসাইজার দিয়ে বিকৃত করে দেয়া হয়েছে। যান্ত্রিক স্বরে লোকটা বলল, 'মি. রানা, আপনার বন্ধুর অবস্থা দেখতেই পাচ্ছেন। ওকে খুন করতে চাই না আমরা, কিন্তু কথা না শুনলে আমরা নিরুপায়। ওই হীরার খনিটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, ওটার খোঁজ পাবার জন্য দু-চারজন মানুষকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে দ্বিধা করব না আমরা।'

চুপচাপ শুনছে রানা কথাগুলো।

'আপনাকে ছ'সপ্তাহ সময় দেয়া হলো কাজটার জন্য,' বলে চলেছে লোকটা। 'যদি ব্যর্থ হন, সোহেল আহমেদ মারা যাবে। যদি আমাদেরকে খোঁজার চেষ্টা করেন, সোহেল আহমেদ মারা যাবে। যদি এ-ব্যাপারে কারও কাছে মুখ খোলেন, তা হলেও সোহেল আহমেদ মারা যাবে। ওর জীবন এখন আপনার হাতে।'

মুখোশপরা আরেকজন উদয় হলো ফ্রেমে, সোহেলের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। প্রথম লোকটা বলল, 'ইরিত্রিয়ায় পৌঁছানোর পর আমরা আপনার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখব। খনির খোঁজ পেলেই আপনি রিপোর্ট করবেন আমাদের কাছে... শুধুই আমাদের কাছে। যদি আর কেউ ওটার সামান্য আভাস পায়, আপনার বন্ধুকে মরার আগে প্রচণ্ড কষ্ট পেতে হবে।'

'আমার কথা ভাবিস না, রানা!' চেঁচিয়ে উঠল সোহেল। 'মরলে মরব। তা-ও তুই ওদের কথা শুনিস না...'

খপ্ করে ওর ডান হাতটা ধরল দ্বিতীয় মুখোশধারী। রানার বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে কড়ে আঙুলটা উল্টো করে চাপ দিয়ে ভেঙে দিল। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল সোহেল। বাঁধনের ভিতর শরীর মোচড়াতে চাইল, পারল না।

'মনে রাখবেন, মি. রানা—ছ'সপ্তাহ! ঠিক আছে?' বলল প্রথম মুখোশধারী। এরপরই ঝিরঝির করতে শুরু করল স্ক্রিন, টেপটা শেষ হয়ে গেছে।

দুম করে সোফার হাতায় কিল বসাল রানা। মাথায় রক্ত চড়ে গেছে। রাগ অনুভব করছে নিজের উপর... নিজের অসহায়ত্বের উপর। বিপদে পড়েছে সোহেল... ওর প্রিয়তম বন্ধু... ওরই কারণে! কিছুক্ষণ ক্রোধটা চেপে বসে রইল মাথায়, তারপরই সচেতন হয়ে উঠল ও। না, এভাবে নিয়ন্ত্রণ হারালে চলবে না। সামলে নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় কর্মপন্থা ঠিক করতে শুরু করল রানা।

প্রথমেই জানা দরকার, সোহেলকে কারা কিডন্যাপ করেছে। এডওয়ার্ড ব্যাগলির কথা মনে পড়ল ওর। গোপন কাজকর্ম করবার জন্য স্টেট ডিপার্টমেন্টের একটা কভার্ট সেকশন আছে; ওদের জন্য একহাত জলা একজন শক্ত মানুষকে অপহরণ করা, কিংবা রানার বাড়ির সিকিউরিটি সিস্টেম ফাঁকি দেয়া খুব কঠিন কিছু নয়। কথা হলো, আণ্ডারসেক্রেটারি লোকটাই এ-কাজ করেছে কি না। একটু ভেবে সন্দেহটা বাতিল করে দিল রানা। না, ব্যাগলিকে অতটা মরিয়া বলে মনে হয়নি। তা ছাড়া তার মত পজিশনের লোকের জন্য রানার বিকল্প কাউকে খুঁজে বের করতে তেমন অসুবিধে হবার তো কথা নয়। বিনা অজানা

বাইরে রাখল ও। ব্যাগলির সঙ্গে কাজ করছে মেয়েটা, কাজেই তারও মরিয়া হবার প্রয়োজন নেই। তা হলে কারা এরা?

বুঝতে পারছে না রানা। তবে এটুকু বুঝতে পারছে, কিডন্যাপাররা ভয়ঙ্কর লোক; উদ্দেশ্য হাসিল করবার জন্য সবকিছু করবে। আমেরিকায় ওর প্রভাবশালী বন্ধুর অভাব নেই; বিসিআই, কিংবা রানা এজেন্সির ক্ষমতাও কম নয়: এসব ওরা জানে নিঃসন্দেহে। তারপরও সোহেলকে ধরে নিয়ে গেছে ওরই বাড়ি থেকে। এর মানে একটাই—মরিয়া ওরা, তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে ওদের প্রতিটি গতিবিধির উপর, সেই সঙ্গে যে-কোনও ধরনের চ্যালেঞ্জও মোকাবেলা করতে তৈরি। এই ধরনের প্রতিপক্ষই সবচেয়ে মারাত্মক।

আনমনে মাথা নাড়ল রানা, সোহেলকে বাঁচাতে চাইলে আফ্রিকায় না গিয়ে উপায় নেই। কিন্তু কথা হলো, কিম্বারলাইট পাইপটা যদি ওখানে না থাকে, তা হলে কী ঘটবে? কীভাবে বাঁচাবে ও সোহেলকে?

সেলফোনে বিসিআইয়ের স্ক্র্যাম্বলড্ লাইনে মেজর জেনারেল রাহাত খানের সঙ্গে যোগাযোগ করল রানা। খুলে বলল পরিস্থিতি। করণীয় জানতে চাইল।

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা যা-ই অনুভব করুন না কেন, সেটা কণ্ঠে ফুটতে দিলেন না রাহাত খান। বললেন, 'একটু পর ফোন করছি তোমাকে।'

আধঘণ্টা পর কলব্যাক করলেন তিনি। 'জর্জের সঙ্গে কথা বলেছি।' ন্যাশনাল আণ্ডারওয়াটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সি, সংক্ষেপে নুমা-র চিফ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের কথা বলছেন তিনি। 'ওর সাহায্য চেয়েছি। ব্যাপারটা এফবিআইয়ের হাতে তুলে দিতে চাইছে ও। আমারও তা-ই ইচ্ছে।'

'কিডন্যাপাররা টের পেয়ে যাবে, সার,' মৃদু প্রতিবাদ করল রানা।

'মনে হয় না,' বললেন রাহাত খান। 'গোপনে কাজ করবে ওরা। ব্যুরোর নতুন চিফকে তো চেনো? রবার্ট সোয়ান... জর্জ আর আমার, দুজনেরই বিশেষ বন্ধু। ওর সঙ্গেও কথা হয়েছে। গোপনীয়তা বজায় রাখতে রাজি হয়েছে ও। ভাল হয়, তুমি যদি একবার কথা বলে নিতে পারো।'

'চেষ্টা করব, সার,' বলল রানা। 'কিন্তু ইরিত্রিয়ার যাবার ব্যাপারে...'

'যাবার প্রস্তুতি নাও,' বললেন রাহাত খান। 'এফবিআই যদি সোহেলকে খুঁজে বের করতে না পারে, তা হলে তো তোমাকে যেতেই হবে। তা ছাড়া কিডন্যাপারদেরকেও বোঝানো দরকার যে, তুমি অন্য কোনও প্ল্যান আঁটছ না।'

'বুঝতে পেরেছি, সার,' বলল রানা। 'কিন্তু পুরো ব্যাপারটা এফবিআইয়ের হাতে ছেড়ে দেয়া কি ঠিক হবে? আমাদের এজেন্সিতে প্রচুর লোক আছে, কানেকশনও আছে। আমরাও যদি চেষ্টা করি...'

'উঁহুঁ,' রাজি হলেন না রাহাত খান। 'ওদেরকে মাঠে নামালেই টের পেয়ে যাবে কিডন্যাপাররা। তার চেয়ে আমি বিসিআইয়ের আণ্ডারকাভার এজেন্টদেরকে ব্যবহার করব। জর্জও ওর তরফ থেকে সাহায্য করবে যতভাবে সম্ভব। কিন্তু তুমি নিজে কিছু করতে যেয়ো না। কিডন্যাপারদের বেঁধে দেয়া নিয়মে খেলতে থাকো। দেখা যাক কী হয়।'

অসহায় বোধ করল রানা, চিফ ওর হাত-পা বেঁধে দিচ্ছেন। তবে ওঁর যুক্তিও অকাট্য। অগত্যা অর্ডারটা মেনে নিল ও। বলল, 'ইয়েস, সার।'

'ডোন্ট ওয়্যারি, রানা,' ওর মনের অবস্থা বুঝতে পেরে নরম গলায় বললেন রাহাত খান। 'সোহেলকে উদ্ধার করবার জন্য সবকিছু করব আমি।'

'আমি সেটা জানি, সার।'

'গুড। যোগাযোগ রেখো।' লাইন কেটে দিলেন চিফ।

অফিসে আর গেল না রানা, বাড়িতে বসেই ইরিত্রিয়া যাবার প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। এক্সপিডিশনের জন্য যা যা প্রয়োজন হবে, সেগুলোর ব্যাপারে খোঁজ নিল। বিকেল চারটে নাগাদ অভিযানের মোটামুটি একটা আউটলাইন খাড়া করল ও। এবার এডওয়ার্ড ব্যাগলি আর দিনা আবানের সঙ্গে কথা বলা যেতে পারে। ওদেরকে জানানো দরকার, কিম্বারলাইট পাইপ খোঁজার দায়িত্বটা নিতে রাজি আছে ও।

প্রথমে ইরিত্রিয়ান দূতাবাসে ফোন করল ও। অল্পবয়েসী এক রিসেপশনিস্টের গলা শোনা গেল ওপাশে। 'এম্বাসি অভ ইরিত্রিয়া। কাকে চাইছেন, প্লিজ?'

'মিস দিনা আবান।'

ওপাশে একটু নীরবতা বিরাজ করল, মেয়েটা ডিরেক্টরি ঘাঁটছে। পনেরো সেকেণ্ড পর বলল, 'দুঃখিত, সার। ও-নামে এখানে কেউ নেই।'

'আপনি শিয়োর?' প্রশ্নটা বোকার মত হয়ে গেল।

'অবশ্যই, সার।'

'এমন হতে পারে না, মিস আবান এম্বাসিতে কাজ করেন, কিন্তু তাঁর কোনও টেলিফোন এক্সটেনশন নেই?'

'এক্সটেনশন না থাকলেও ডিরেক্টরিতে নাম থাকবে, সার। নতুন একটা ভয়েস-মেইল সিস্টেম চালু করেছি আমরা। টেম্পোরারি এমপ্লয়িরাও ওতে মেসেজ রিসিভ করতে পারে।'

'ধন্যবাদ,' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। চেহারা থমথম করছে। দিনা আবান মিথ্যে বলেছে, ও ইরিত্রিয়ান এম্বাসির কেউ নয়। তা হলে কি কিডন্যাপারদের দলের? আনমনে মাথা নাড়ল রানা, রিসিভার তুলে ডায়াল করল এডওয়ার্ড ব্যাগলির কাছে। দেখা যাক, এখানেও কোনও চমক অপেক্ষা করছে কি না।

তেমন কিছু অবশ্য ঘটল না। অফিশিয়াল চ্যানেল ধরে লাইনটা পেতে মিনিটদুয়েক সময় লাগল, তারপরই শোনা গেল আণ্ডারসেক্রেটারির পরিচিত কণ্ঠ। 'মি. রানা! আই অ্যাম রিয়েলি সারপ্রাইযড! কালকের পর আপনি আবার ফোন করবেন, এটা আশা করিনি।'

'মত পাল্টেছি আমি,' বলল রানা। 'উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেলে কাজটা নেব বলে ঠিক করেছি। সেটা জানাবার জন্যই ফোন করেছি আপনাকে।' দিনা আবানের কথা কিছু বলল না। যা জানতে পেরেছে, সেটা ওর নিজস্ব ব্যাপার: ব্যাগলিকে বলবার দরকার নেই। লোকটা এমনিতেই সম্ভবত জানে মেয়েটার পরিচয়।

'খুব ভাল খবর দিলেন,' খুশি খুশি শোনাল ব্যাগলির গলা।

'শুনুন, প্রজেক্টটার ব্যাপারে আমি ইতোমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছি। দক্ষিণ আফ্রিকাতে বেশ কিছু হেভি ইকুইপমেন্টের জন্য যোগাযোগ করে ফেলেছি—তিনটে *ডি-ইলেভেন* বুলডোজার, দুটো বড় ফ্রন্ট-লোডার, ছ'টা *টেরেক্স* ডাম্প-ট্রাক, আর একটা *ক্যাটারপিলার-ফাইভ ওয়ান থ্রি যিরো* হাইড্রলিক শোভেল। সমস্ত ইকুইপমেন্ট ছ'মাসের জন্য লিজ নেয়া যাবে; ফাইভ ওয়ান থ্রি যিরো বাদে, ওটা ইরিত্রিয়া সরকারকে কিনে নিতে হবে।'

'এক মিনিট, মি. রানা। দিনা আবান আমার সঙ্গে আছে, ও কিছু বলতে চায়। আমি স্পিকারফোন অন্ করছি।'

খুট করে একটা শব্দ হতেই দিনার কণ্ঠ ভেসে এল রিসিভারে। 'মি. রানা, কী বলছেন আপনি? আমি তো এসব অথোরাইজ করতে পারব না। বড্ড বেশি খরচ পড়ে যাবে!'

ব্যাগলির অফিসে মেয়েটার উপস্থিতিতে অবাক হলো না রানা। মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকা সন্দেহটা বরং গাঢ় হলো আরও। শান্ত গলায় ও বলল, 'দেখুন, প্রজেক্টটা আপনাদের মাথা থেকেই বেরিয়েছে, আমার মাথা থেকে নয়; আমাকেও আপনারাই চেয়েছেন। এখন যদি আমার কাছ থেকে রেজাল্ট পেতে চান, তা হলে আমার নিয়মেই কাজ করতে হবে, নতুবা নয়। ছ'সপ্তাহের ডেডলাইনটা আপনাদেরই দেয়া। পাইপটা পাবার জন্য আমাকে প্রচুর খোঁড়াখুঁড়ি করতে হবে, তার জন্য ইকুইপমেন্টগুলো না হলেই নয়। টাকা অপচয় করব না আমি, সবচেয়ে সস্তা ডিল-ই বেছে নেব। শোভেলটা সবচেয়ে দামি জিনিস, কিন্তু এক্সপিডিশন-শেষে ওটা আবার বিক্রি করে দেয়া যাবে। বেশ কিছু টাকা রিকাভ হয়ে যাবে তাতে।'

'আপনি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না, মি. রানা,' বলল দিনা। 'এভাবে কাজটা করা সম্ভব নয়। এতসব ইকুইপমেন্ট... বিরাট একটা টার্গেট খাড়া করে দিচ্ছেন আপনি মন্দলোকদের জন্য। আগেই তো বলেছি, আমরা আপনার নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে পারব না।'

'তার প্রয়োজনও নেই। ইনিশিয়াল সার্ভে করবার সময় আমি একা থাকব। ইকুইপমেন্টগুলো ফিল্ডে নেব পরে, সম্ভাব্য একটা সাইট খুঁজে নিয়ে। একটামাত্র ক্যাম্পকে তখন প্রোটেকশন দিতে হবে আপনাদের। আশা করি তাতে অসুবিধে হবে না?'

'হোয়াটএভার, মি. রানা। আমরা আসলে আরও ছোট মাপের কিছু চাইছিলাম,' বলল দিনা।

'ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন তো?' যোগ করলেন ব্যাগলি। 'ছোট একটা টিম... মিনিমাল ইকুইপমেন্ট ও ম্যাক্সিমাম সিক্রেসি নিয়ে যাতে কাজ করতে পারে। কিন্তু আপনার জন্য তো মনে হচ্ছে পুরো আর্মি ডাকতে হবে!'

'তা হলে তা-ই ডাকুন,' বিরক্ত গলায় বলল রানা। 'কিন্তু এভাবেই করতে হবে কাজটা। আমি আগেই বলেছি আপনাদের—বড় মাপের আয়োজন ছাড়া এ-ধরনের অপারেশন সম্ভব নয়। পছন্দ হোক, বা না-হোক, ব্যাপারটা মেনে নিতে

হবে আপনাদেরকে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?'

'আর আমরা যদি আপনার পুরনো পরামর্শ মেনে নিয়ে প্রজেক্টটা বাতিল করতে চাই?' জিজ্ঞেস করল দিনা।

'তা হলে আমাকে অন্য কারও কাছে যেতে হবে,' শান্ত গলায় হুমকি দিল রানা, দেখা যাক এদের প্রতিক্রিয়া কী হয়। 'এমন কেউ, যে গোটা ইরিত্রিয়াকে চাষের জমির মত খুঁড়ে একাকার করে দিতে পারে। কিম্বারলাইট পাইপটা আমি খুঁজতে যাবোই, মিস আবান। হয় আপনাদের হয়ে, নয়তো অন্য কারও।' প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দিল ও আরেকটা পক্ষের।

বুঝল কি বুঝল না, সেটা দিনার গলা শুনে আঁচ করা গেল না। থমথমে গলায় সে বলল, 'না, মি. রানা! আপনি আর কারও কাছে যাবেন না। গেলে ভাল হবে না!'

'ভয় দেখাচ্ছেন?' বিদ্রূপের ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল রানা।

দু'জনের ঠাণ্ডা লড়াইয়ে তাড়াতাড়ি নাক গলালেন ব্যাগলি। বললেন, 'রিল্যাক্স, মি. রানা। এতটা সিরিয়াস হবার মত কিছু ঘটেনি। আসলে... আমাদেরকে চমকে দিয়েছেন আপনি। বড় ধরনের অপারেশনের জন্য তৈরি ছিলাম না কিনা! একটু সবুর করুন। ভাবনা-চিন্তার জন্য কয়েকটা দিন সময় দিন আমাদেরকে।'

'শুক্রবার পর্যন্ত সময় আপনাদের। ওই দিন বিকেলের ফ্লাইট ধরবার ইচ্ছে আছে আমার, যাতে শনিবারে আসমারায় পৌঁছুতে পারি। সার্চ-এরিয়াতে তা হলে সোমবার নাগাদ চলে যেতে পারব।'

'কিন্তু...'

'শুক্রবার, মি. ব্যাগলি। নইলে এক্সপিডিশনটার খরচের জন্য অন্য কারও কাছে যেতে হবে আমাকে।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা, উত্তেজনায় খানিকটা কাঁপছে। মিথ্যে হুমকি দিয়েছে ও, অন্য কারও কাছে কিম্বারলাইট পাইপের কথা খুলে বলার প্রশ্নই ওঠে না। কিডন্যাপাররা নিষেধ করেছে এ-ব্যাপারে। তবে হেভি ইকুইপমেন্ট ভাড়া করবার জন্য ব্যাগলিকে রাজি করাতে এ ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। ইরিত্রিয়ায় যেতে হবে বলে ধরে নিচ্ছে ও, আর ওখানে গেলে খোঁড়াখুঁড়ির জন্য ওসব ওর দরকার হবেই। এখুনি সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করে না রাখলে পরে সমস্যায় পড়বে।

কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে নতুন একটা নম্বরে ফোন করল ও।

'এ.আর. ক্লিনিক,' বলা হলো ওপাশ থেকে।

'ডা. রহমান আছেন?'

'জী। কে বলছেন, প্লিজ?'

'মাসুদ রানা।'

'হোল্ড অন, প্লিজ।'

রানার কলেজ জীবনের বন্ধু আতিকুর রহমান। কয়েক দেশ থেকে কয়েকটা ডিগ্রি নিয়ে আমেরিকায় এসে ঘর বেঁধেছে, ক্লিনিক দিয়েছে। প্রাইভেট প্র্যাকটিসের

পাশাপাশি ওয়াশিংটন এলাকায় রানা এজেন্সির অপারেটরদের চিকিৎসার দিকটা ও-ই দেখে।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই শোনা গেল আতিকের গলা। 'রানা! হোয়াট আ প্লেজ্যান্ট সারপ্রাইয!'

'কেমন আছিস? কম্পিউটারে গেম খেলা কেমন চলছে?'

'আগের মতই।' কম্পিউটার গেমের পাগল আতিক, অবসর সময়টা ওই নিয়ে কাটায়। 'নতুন টুম-রেইডারটা খেলছি এখন, লাস্ট লেভেলে এসে আটকে গেছি। একটা চাবি খুঁজে পাচ্ছি না। তুই খেলেছিস নাকি? তা হলে একটু হেল্প নিতাম।'

'গেম খেলার সময় কোথায় আমার?' রানা বলল। 'কাজে ফোন করেছি। তুই ব্যস্ত?'

'উঁহুঁ। কী ব্যাপার?'

'আফ্রিকায় যেতে হচ্ছে আমাকে। গামা গ্লবোলিন, কলেরা বুস্টার, আর একটা টিটেনাসের টিকা দরকার। আর হ্যাঁ... মাসদুয়েক চলার মত অ্যান্টি-ম্যালেরিয়া পিল।'

'মাঝে মাঝে কী মনে হয়, জানিস?' বিরক্ত গলায় বলল আতিক। 'ডাক্তার আমি না, তুই! ব্যাটা, কী লাগবে না লাগবে, সেটা তো আমি বলব!'

'কেন, কিছু বাদ দিয়ে ফেলেছি বুঝি?' মুচকি হাসল রানা।

'তা তো দিয়েছিস-ই। হাতুড়ে ডাক্তাররা কি আর সবকিছু জানে? আজ সকালে *সিডিসি* একটা ওয়ার্নিং দিয়েছে—আফ্রিকায় পোলিও-র প্রকোপ বেড়েছে। কাজেই একটা ওরাল বুস্টারও নিতে হবে তোকে।'

'আর কিছু?'

'কনডম-ও দিয়ে দিই এক প্যাকেট,' ঠাট্টা করল আতিক। 'বলা তো যায় না, ওখানে গিয়ে যদি ইটিস-পিটিস করিস, শেষে এইডস্ বাধিয়ে বসবি।'

'তোর মত চরিত্রহীন বদমাশ না আমি,' বলল রানা। 'শোন, একটা মেড-কিট রেডি করে দিস। ছোটখাট চিকিৎসা যেন নিজে করে নিতে পারি। আর প্রেসক্রিপশন দিয়ে দিস একটা—মরফিন আর অ্যান্টিবায়োটিকের।'

'ডিফ্রিবিলেটর আর ক্যাট স্ক্যানার লাগবে না?' আবার ঠাট্টা করল আতিক। 'তুই তো এমন সব কাজে যাস যে, পারলে সঙ্গে একটা অপারেশন থিয়েটার নিয়ে ঘোরা দরকার।'

হেসে ফেলল রানা। 'যা ব্যাটা, কাজ কর্। কাল এসে আমি টিকাগুলো নেব।'

'পকেটে ফিস নিয়ে আসিস, নইলে চেম্বারে ঢুকতে দেব না।'

'দেখা যাবে,' বলে ফোনটা নামিয়ে রাখল রানা।

রানার সঙ্গে কথা শেষ হতেই মুখ চাওয়াচাওয়ি করল দিনা আবান আর এডওয়ার্ড ব্যাগলি। দুজনের মনে একই চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। কিছুক্ষণ কেউ কোনও কথা বলল না।

ওয়াশিংটনের ফগি বটম এলাকায় আণ্ডারসেক্রেটারির অফিসে বসে আছে ওরা। কক্ষটা সুসজ্জিত—আর দশটা সরকারি অফিসের মত নয়, বরং বড় ধরনের ব্যবসায়ীর অফিস বলে মনে হয়। দেয়ালে ঝুলছে বেশ কয়েকটা অ্যান্টিক পেইন্টিং, ব্যাগলির ডেস্কটাও অ্যান্টিক—কয়েক পুরুষ ধরে আছে পরিবারে। কার্পেটটা স্বাভাবিকের চাইতে পুরু ও নরম; সঙ্গে মানানসই উইং-ব্যাক চেয়ারগুলো প্রেসিডেন্ট কেনেডি উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন ব্যাগলির পিতাকে। একটা উইং-ব্যাক চেয়ারে আণ্ডারসেক্রেটারির মুখোমুখি বসে আছে দিনা, চেহারা গম্ভীর।

খানিক পর নীরবতা ভাঙল ও। মুখ তুলে বলল, 'কী মনে হয় আপনার? রানার প্ল্যানটা কি মেনে নেয়া যায়?'

'অসম্ভব!' মাথা নাড়লেন ব্যাগলি। 'এত টাকা পাব কোথায়? মিলিয়ন ডলারের কথা বলছে ও, অথচ আমরা অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে মাত্র তিন লাখ জোগাড় করেছি। এর বেশিরভাগ তো রানা এজেন্সির ফি দিতেই বেরিয়ে যাবে, হেভি ইকুইপমেন্ট ভাড়া করার পয়সা কোথায়? কেনার কথা নাহয় বাদই দিলাম।' চেহারায় হতাশা ফুটল তাঁর। 'আমার মনে হয় ব্যাপারটা ভুলে যাওয়াই ভাল। এমনিতেও আকাশকুসুম কল্পনা ছিল ওটা।'

'এখন যদি পিছু হটেন,' হিসিয়ে উঠল দিনা, 'চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কংগ্রেশনাল কমিটিকে আপনার দরজায় কড়া নাড়তে পাঠাব আমি। মেডিউসা-পিকচারগুলো কীভাবে ন্যাশনাল রিকনিস্যান্স অফিস থেকে হাতিয়েছেন আপনি, সেটা জানার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকবে ওরা।'

মুখ কালো হয়ে গেল ব্যাগলির।

'যেভাবেই হোক, টাকাটার ব্যবস্থা করতে হবে আমাদেরকে,' সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল দিনা।

'কীভাবে?' হাহাকারের ভঙ্গিতে বললেন ব্যাগলি। 'জেফরি ভারগাসের কাছ থেকে ছবিগুলো কিনতে সমস্ত টাকা বেরিয়ে গেছে আমার। আমার বউ যদি টের পায় যে, বাড়িঘর সব মর্টগেজ দিয়ে ফেলেছি, তা হলে ও স্রেফ আমাকে খুন করবে!'

'আপনার ঘরোয়া সমস্যার কথা শুনতে চাই না আমি,' কাঠখোট্টা গলায় বলল দিনা। 'খরচ তো আমার তরফ থেকেও হয়েছে অনেক। কই, তা নিয়ে আমাকে কপাল চাপড়াতে দেখেছেন? রানা আমাদের বেস্ট শট, যেমন করে হোক ওকে সাপোর্ট দিতে হবে। তারমানে টাকা চাই... খুব শীঘ্রি। নইলে প্রজেক্টটা সফল হবে না। শুনুন, আমাদের দুজনেরই প্রচুর কানেকশন আছে, ফাণ্ড ম্যানেজ করতে অসুবিধে হবে না। হ্যাঁ, দু'চারজনকে লাভের ভাগ দিতে হবে আর কী। তাতে কী? রানা সফল হলে আমাদের বিলিয়ন কে বিলিয়ন ডলার আয় হবে। ওখান থেকে কিছু টাকা এদিক-সেদিক চলে গেলে কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না।'

'কিন্তু পুরো ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে,' অভিযোগ করলেন ব্যাগলি।

'যাচ্ছে না। লাগাম এখনও আমাদের হাতেই আছে। মাথাটা শুধু ঠাণ্ডা রেখে

কাজ করতে হবে।'

'কী জানি...' মিনমিন করলেন ব্যাগলি।

'কী জানি মানে?' ধমকে উঠল দিনা। 'দুনিয়ার সবচেয়ে বড় আবিষ্কারগুলোর একটা হতে যাচ্ছে ব্যাপারটা। ওটার ফলে এক ধাক্কায় আমার দেশ একশো বছর এগিয়ে যাবে। আমাদের দুজনের উদ্দেশ্যই পূরণ হবে—জানেন না আপনি? মনের জোরটা শুধু ধরে রাখুন। টাকা আমরা জোগাড় করে ফেলব... ফেলবই।'

'তোমার কথাই হয়তো ঠিক,' ধীরে ধীরে বললেন ব্যাগলি। 'কিন্তু হঠাৎ করে ওই মাসুদ রানা যে আমাদের উপর ছড়ি ঘোরানোর চেষ্টা করছে, সেটাই পছন্দ হচ্ছে না আমার।'

'ওটা ওর স্বভাব। ওভাবেই ও কাজ করে... এবং সফলও হয়। আমাদের অস্থির হলে চলবে না। সবকিছু যেন ঠিকঠাকমত এগোয়, সেটাই নিশ্চিত করতে হবে।'

কয়েক মুহূর্ত দিনার সুন্দর মুখশ্রীর উপর নজর আটকে থাকল ব্যাগলির—খোলস ভেদ করে ভিতরের আসল মানুষটাকে চেনার চেষ্টা করছেন। নিচু গলায় বললেন, 'তোমাকে আমার ভয় হচ্ছে, দিনা।'

'খুব ভাল,' নির্বিকার দিনা। আণ্ডারসেক্রেটারিকে লোভ আর আতঙ্কের মাঝখানে আটকে ফেলেছে ও। লোকটাকে নিয়ে চিন্তিত হবার কিছু নেই, স্রেফ একটা হাতিয়ার এই ব্যাগলি—কার্যোদ্ধারের হাতিয়ার। তারপরও কত সহজে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সেটা জেনে ভাল লাগছে। যদিও সম্ভব নয়, তবুও দেখতে ইচ্ছে করছে—বাড়ি হারাবার পর ওর বউ ওকে নিয়ে কী করে। লোভী বদমাশটার একটা উচিত শিক্ষা হবে তখন।

অন্ধকার রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে রানা, একটা স্ট্রিট লাইটও জ্বলছে না। ওয়াশিংটনের এই এলাকাটা একেবারেই অবহেলিত। দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রের রাজধানীর কোণে এমন একটা জায়গা থাকতে পারে, ভাবাই যায় না।

গোপনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে রানা, শত্রুপক্ষের লোকজনকে ফাঁকি দিয়ে। এসেছে পিছনের আঙিনার সুয়ারেজ পিট হয়ে ড্রেনের ভিতর দিয়ে। এই সুয়ারেজ সিস্টেম ধরে এগোলে তিন মাইল দূরে বেরিয়ে আসা যায়। ওই পথেই ওয়াচারদের চোখ ফাঁকি দিয়েছে ও। একই পথে কিছুক্ষণ আগে রানা এজেন্সির একজন অপারেটর ঢুকেছে বাড়িতে—রানার প্রক্সি দিচ্ছে, আকারে-গঠনে দুজন ওরা একই রকম। বাড়ির ভিতরে না ঢুকলে ধোঁকাটা ধরতে পারবে না কেউ।

একজোড়া হেডলাইট চোখে পড়ল রানার, দূর থেকে এগিয়ে আসছে একটা মার্সিডিজ কার। একেবারে ওর পাশে এসে থামল গাড়িটা, প্যাসেঞ্জার সাইডের কাঁচ নেমে গেল। ভেসে এল একটা ভারি কণ্ঠ।

'মি. রানা?'

'হ্যাঁ।'

'উঠে আসুন।'

দরজা খুলে ড্রাইভারের পাশে বসল রানা, আবার চলতে শুরু করল গাড়ি।

'গুড ইভ্‌নিং, মি. সোয়ান।'

মৃদু হাসলেন এফবিআই-এর নয়া ডিরেক্টর রবার্ট সোয়ান। মাঝারি উচ্চতার মানুষ তিনি, মোটাসোটা শরীর, ক্লিন-শেভড়। পঞ্চান্ন বছর বয়স। অত্যন্ত সৎ ও কর্মঠ মানুষ। এই পর্যায়ে উঠে এসেছেন নিজের যোগ্যতায়, তোষামোদ বা সুপারিশের জোরে নয়। বললেন, 'সন্ধ্যাটা আসলে বোধহয় তেমন গুড নয়, মি. রানা। নইলে এভাবে দেখা করতে হতো না আমাদেরকে।'

'প্লিজ, আমাকে রানা বলে ডাকবেন। আপনি বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়।'

'বেশ, তোমার যা ইচ্ছে।'

'একাকী বেরিয়েছেন, কেউ সন্দেহ করেনি?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আপনি তো বিরাট পদমর্যাদার মানুষ। দেহরক্ষী ছাড়া চলাফেরা করার কথা নয়।'

'খামোকা লজ্জা দিয়ো না। এখনও নিজেকে বড় কিছু ভাবতে শিখিনি। সঙ্গের লোকজনকেও বুঝিয়ে দিয়েছি তা। ওরা আর এখন আমাকে প্রশ্ন করে না।'

'তা হলে তো খুব ভাল,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা। বিকেলেই রানা এজেন্সির ওয়াশিংটন শাখাপ্রধান মাহবুবকে সাঙ্কেতিক মেসেজ দিয়েছিল ও—মি. সোয়ানের সঙ্গে কীভাবে কথা বলা যায়, সেটা জেনে নেবার জন্য। ভদ্রলোক নিজেই আইডিয়া দিলেন সরাসরি দেখা করবার ব্যাপারে। কোথায়- কখন-কীভাবে দেখা হতে পারে—সেটা অবশ্য স্থির করেছে রানাই। কাউকে সঙ্গে আনতে নিষেধ করা যায়নি ওঁর পদমর্যাদা বিবেচনা করে, তবে একটু শঙ্কিত ছিল রানাঃ সোয়ান যদি আর কাউকে সঙ্গে নিয়ে আসেন, তা হলে ওদের সাক্ষাতের খবরটা ফাঁস হবার সম্ভাবনা থাকত। দেখা যাচ্ছে, ভয়টা অমূলক ছিল।

'তোমার বস আর অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন সব বলেছেন আমাকে,' বললেন সোয়ান। 'তারপরও ভাবলাম দুজনের দেখা হওয়া দরকার। তোমার কাছ থেকে পুরো ঘটনা শুনব। বিস্তারিত অনেক কিছু জানা যাবে তাতে। তা ছাড়া কীভাবে কী করা যায়, সেটাও আলোচনা হওয়া দরকার।'

'গোড়া থেকেই সব বলি তা হলে।' এডওয়ার্ড ব্যাগলির ফোন পাওয়া থেকে আজ বিকেল পর্যন্ত যা যা ঘটেছে সব খুলে বলল রানা।

'এই ব্যাগলি লোকটাই তো গোলমেলে,' ওর কথা শেষ হতে বললেন সোয়ান। 'ওর দিন ফুরিয়ে এসেছে, বুঝলে। জাস্টিস ডিপার্টমেন্টে ওর নামে অন্তত চার-ইঞ্চি মোটা একটা ফাইল তৈরি হয়েছে। চাকরিটা হারাবে যে-কোনও মুহূর্তে। আমি যদ্দূর জানি, চেয়ার বাঁচাতে ইদানীং খুব মরিয়া হয়ে উঠেছে লোকটা।'

'হতে পারে,' বলল রানা। 'তবে সোহেলের কিডন্যাপিঙের সঙ্গে ইনি জড়িত আছেন বলে মনে হয় না।'

'তা অবশ্য ঠিক বলেছ,' স্বীকার করলেন সোয়ান। 'লোকটা জাত-ক্রিমিনাল নয়।'

'আমারও সেটাই মনে হয়েছে। সন্দেহ যদি করতে হয়, তা হলে ওই দিনা আবানকে করা দরকার।'

'ইরিত্রিয়ান মেয়েটা?'

'আসলেই ইরিত্রিয়ান কি না, সন্দেহ আছে। মিথ্যে বলেছে ও, এম্বাসিতে কাজ করে না। প্রায় সাড়ে পাঁচফুট লম্বা; চেহারা আর ফিগার দেখে তো মনে হয়, ফ্যাশন ম্যাগাজিনের পাতা থেকে উঠে এসেছে। ব্যাগলির সঙ্গে জোট বেঁধেছে। ওর আসল পরিচয়টা জানা দরকার। সেই সঙ্গে জানা দরকার, ব্যাগলির সঙ্গে তার কানেকশনটা কোথায়।'

'যদি ও-থেকে কিছু বের না হয়?'

'দুঃখিত, আমার হাতে আর কোনও সাসপেক্ট নেই।'

'হুম,' কাঁধ ঝাঁকালেন সোয়ান। 'তা হলে তোমার বাড়িতে একটা টিম পাঠাতে হবে আমাকে। ওখান থেকে এভিডেন্স জোগাড় করে কিডন্যাপারদের পরিচয় জানার চেষ্টা করতে হবে। ভিডিওটেপটাও দরকার অ্যানালাইসিসের জন্য। ওটা এনেছ?'

'টেপ এনেছি। কিন্তু আমার বাড়িতে কেউ ঢুকলেই কিন্তু টের পেয়ে যাবে লোকগুলো।'

'রিল্যাক্স। এ-ধরনের কাজের জন্য আলাদা ট্রেইনিং পাওয়া লোক আছে আমাদের,' আশ্বাস দিলেন সোয়ান। 'কেউ কিচ্ছু টের পাবে না। তা ছাড়া, কাল তুমি যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে, তখন ঢুকবে আমাদের লোক।'

অগত্যা কাঁধ ঝাঁকাল রানা। যুক্তিটা অগ্রাহ্য করার মত নয়। অপহরণকারীদের ব্যাপারে সূত্র পাবার জন্য ওর বাড়িতে চিরুণী-তল্লাশি চালালে কিছু একটা বেরিয়ে আসতে পারে। জ্যাকেটের পকেট থেকে ভিডিও ক্যাসেটটা বের করে দিয়ে ও বলল, 'ঠিক আছে, যা-ভাল বোঝেন করুন।'

'তোমার মাথায় অন্য কোনও আইডিয়া থাকলে বলতে পারো,' সোয়ান বললেন।

'আইডিয়া অবশ্য একটা আছে। কথাবার্তা শুনে ওদেরকে আমেরিকান বলে মনে হয়নি আমার কাছে। সম্ভবত বাইরের কোথাও থেকে এসেছে। সোহেলকে দেশের বাইরে পাচার করবার চেষ্টা চালাবে নির্ঘাত। নুমার কম্পিউটার-এক্সপার্ট ল্যারি কিং আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু; ওকে বলেছি, সব ধরনের এয়ারলাইন আর প্রাইভেট এয়ারক্রাফট কোম্পানিগুলোর নেটওয়ার্ক হ্যাক্ করে দেখতে—গত দু'দিনে যত ধরনের বিমান চার্টার হয়েছে, সেগুলোর ভিতর অস্বাভাবিক কোনোটা আছে কি না, জানার জন্য।' সোয়ান কিছু বলতে চাইছেন দেখে তাড়াতাড়ি যোগ করল, 'জানি, ওভাবে মূল্যবান কোনও সূত্র পাওয়া কঠিন। তারপরও একটা চেষ্টা করে দেখছি আর কী।'

'হুম,' গম্ভীর গলায় বললেন সোয়ান। 'এখন তা হলে কী করবে বলে ভাবছ?'

শ্রাগ করল রানা। 'আমি ইরিত্রিয়ায় যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছি। বসেরও তা-ই নির্দেশ।'

'এ-ধরনের পরিস্থিতিতে সাধারণত কিডন্যাপারদের দাবি মেনে না নেয়ার পরামর্শ দিই আমরা।'

'আফ্রিকাতে গেলেই যে ওদের দাবি পূরণ হয়ে যাচ্ছে, তা তো নয়। ওখানে

কিম্বারলাইট পাইপটা খুঁজে বের করতে হবে। ওটা কঠিন... খুবই কঠিন।'

'তারপরও... চেষ্টা করে দেখো, কোনোভাবে ওদেরকে কিছুদিন ঝুলিয়ে রাখতে পারো কি না।'

'এ-বিষয়টাতে আমি কোনও ধরনের ঝুঁকি নিতে চাই না, মি. সোয়ান,' বলল রানা। 'সোহেল আমার সবচেয়ে কাছের মানুষ... আপন ভাইয়ের মত। ওর জীবন নিয়ে জুয়া খেলব না আমি।'

'সেক্ষেত্রে বাক্স-প্যাটরা গোছাতে শুরু করে দাও,' বিরক্ত গলায় বললেন সোয়ান। 'এসব কেসে ভিকটিমকে চটজলদি উদ্ধার করা যায় না। কিডন্যাপারদেরকে যদি ততদিন ধোঁকা দিতে না চাও, আফ্রিকাতেই যেতে হবে তোমাকে।'

'তা আমি জানি, সার।' শান্ত গলায় বলল রানা।

আট

ডেব্রে আমলাক মঠ। উত্তর ইরিত্রিয়া।

প্রাতঃকালীন প্রার্থনা শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগেই, কিন্তু সূর্য উঠতে এখনও এক ঘণ্টা বাকি। আকাশে এখনও জ্বলজ্বল করছে তৃতীয়ার চাঁদ—বেশ উজ্জ্বল, নিজের আভা দিয়ে ভোরের তারাকে ঢেকে দিয়েছে আকাশের বুক থেকে। এপ্রিল মাসটা বর্ষার মরশুম, তারপরও দেশের নিচু এলাকা এখনও খটখটে শুকনো। আফ্রিকার মধ্যাঞ্চলের বিস্তৃত মরুতে এখন পর্যন্ত এক ফোঁটা বৃষ্টি ঝরেনি। সারাটা দিন প্রচণ্ড গরম পড়ে, ভোরবেলায় আবার ভীষণ শীত। মঠের বারোজন সন্ন্যাসী ও তাদের মঠ-প্রধান তাই এ-মুহূর্তে উলের ভারী আলখাল্লা পরেছেন। শরীরের কিছু করতে না পেরে তাঁদের স্যাণ্ডেল-পরা খোলা পায়ে হামলা চালাচ্ছে ঠাণ্ডা, সারারাতের উপবাস ভাঙার জন্য ডাইনিং হলের নাশতার টেবিলে বসা তেরোজন মানুষ ঠক ঠক করে কাঁপছেন।

মরুভূমির বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা উঁচু একসারি পাহাড়ের কোল ঘেঁষে, ছোট একটা ক্লিফের উপর দাঁড়িয়ে আছে মঠটা—পাহাড়ের ছায়ার কারণে জায়গাটা কিছুটা শীতল থাকে; গরমের তীব্রতা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। ওখান থেকে চারপাশের সমতলভূমির অনেকখানি এলাকা চোখে পড়ে। হঠাৎ দেখায় ভুল বোঝার অবকাশ রয়েছে, মনে হতে পারে—মঠের নির্মাতারা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদের আবাসের চাইতে একটা রক্ষণাত্মক দুর্গ বানাতে বেশি মনোযোগী ছিলেন। আসলে তাঁদের মনে কী ছিল, সেটা জানার কোনও উপায় নেই, কারণ মঠটার বয়স আটশো বছরেরও বেশি। খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকদের ঘাঁটি হিসেবে দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠা হয়েছে এর, ষোড়শ শতাব্দীতে পরিবর্ধন ঘটেছে। বিংশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত কখনও খালি ছিল না জায়গাটা, নিত্যনতুন সন্ন্যাসী এসে আশ্রয় নিয়েছেন ওতে। একবারই শুধু খালি ছিল ওটা—আশির দশকের শুরুতে,

ইথিওপিয়ান আর্মি আর ইরিত্রিয়ান স্বাধীনতাকামীদের প্রচণ্ড লড়াইয়ের সময় সন্ন্যাসীরা নিরাপত্তার খাতিরে মঠ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। যুদ্ধশেষে আবার ফিরে এসেছেন তাঁরা, সৌভাগ্যক্রমে মঠের দেয়ালে এলোমেলো গুলির আঘাত ছাড়া আর কোনও ক্ষয়ক্ষতির চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

পুরু কাঠের তক্তার তৈরি একটা বড় টেবিল ঘিরে বসে আছেন সবাই, ওটার বয়স পাঁচশো বছর। সন্ন্যাসীদের আসনগুলোও কমবেশি পুরনো—কিছু দক্ষ হাতে তৈরি, কিছু আবার কাঁচা হাতে। তবে তা নিয়ে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করছেন না সংসারত্যাগী এই মানুষেরা—জগতের ছোটখাট দুঃখকষ্ট বহুদিন আগেই জয় করে নিয়েছেন তাঁরা। নির্বিকার ভঙ্গিতে দিনের প্রথম আহার সারছেন।

খাবারটাও খুব সাধারণ। দু'টো করে শুকনো রুটি সবার পাতে, সেগুলো ছিঁড়ে সবজির ঝোলে ভিজিয়ে খাচ্ছেন ওঁরা। সঙ্গে আছে ব্ল্যাক কফি—নিজেদের বাগানে চাষ করা।

শুধুমাত্র সকালের নাশতার সময়েই গল্পগুজবে মেতে উঠতে পারেন সন্ন্যাসীরা, বাকি সময়টা কাটে নানা ধরনের প্রার্থনায়। তবে একেবারে খোলামনে কথা বলেন না কেউই, এক ধরনের আনুষ্ঠানিকতা ঠিকই বজায় থাকে—জগৎসংসার ছেড়ে চব্বিশ ঘণ্টা ঈশ্বরের সেবায় নিজেদের ব্যস্ত রাখার প্রভাব ওটা। সন্ন্যাসীদের মধ্যে অবশ্য বিভিন্ন বয়সের মানুষ আছেন: যেমন আছেন শতবর্ষীয়ান, তেমনি আছে একেবারে তরুণ। তারপরও সবার আচার-আচরণ একই ধাঁচের।

১৯৮৩ সালে মঠ ছেড়ে চলে যাবার সময় তৎকালীন মঠ-প্রধান সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, আর কখনও ফিরে আসবেন না এখানে। এক ধরনের অপরাধবোধ কাজ করছিল তাঁর ভিতর—ইতিহাসে প্রথমবারের মত ঐতিহ্যবাহী এই ধর্মালয় ছেড়ে যেতে বাধ্য হওয়াটাকে নিজের ব্যর্থতা বলে ভাবছিলেন তিনি। নির্বাসনে থাকার সময়েই তাঁর মৃত্যু ঘটে। প্রবীণ বেশিরভাগ সন্ন্যাসী তাঁদের মৃত সাথীর প্রতি সম্মান দেখিয়ে ফিরে আসতে অস্বীকৃতি জানান। শেষ পর্যন্ত যাঁরা আসেন, তাঁদের মধ্যেও কেউ নেতৃত্ব নিতে রাজি হননি। উপায়ান্তর না দেখে মঠের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হয় অপেক্ষাকৃত কমবয়সী এক সন্ন্যাসীকে—ইথিওপিয়ায় তাঁর জন্ম, সঙ্গীরা তাঁকে ব্রাদার আব্রাহাম বলে ডাকে। একেবারে কৈশোর থেকে সন্ন্যাস নিয়েছেন তিনি।

নিজের সঠিক বয়স জানা নেই ব্রাদার আব্রাহামের, ধারণা করেন—ষাটের মত হবে। টেবিলের মাথায় সবচেয়ে বড় ও প্রাচীন চেয়ারটায় বসে আছেন তিনি। নীরবে প্লেটের শেষ রুটির কণাটাও মুখে দিলেন তিনি, রুমাল তুলে মুখ আর ধূসর দাড়িতে লেগে থাকা খাবার মুছলেন, তারপর কথা বললেন। ল্যাটিনে কথা বলেন তিনি।

'আমাদের ছোট্ট বন্ধুটি কাল রাতে ফিরে এসেছিল নাকি?' জিজ্ঞেস করলেন ব্রাদার আব্রাহাম। 'মাঝরাতের প্রার্থনার পর মুরগির খোঁয়াড়ে ছুটোপুটি শুনেছি আমি। মনে তো হলো, শেয়ালটা আবার এসেছে।'

'না, ব্রাদার! ও আসেনি। আসবেও না আর কোনোদিন।' দুঃখি গলায়

বললেন এক সন্ন্যাসী। এই অভিশপ্ত এলাকায় শেয়ালের মত একটা উপদ্রবকেও জীবনের আভাস বলে ভাবেন তাঁরা। 'কাল বিকেলে উপত্যকায় পড়ে থাকতে দেখেছি ওকে—গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন অব্রাহাম। 'মানুষের কি শিক্ষা হবে না? যুদ্ধ-বিগ্রহে কত না প্রাণ ঝরেছে এখানে! তারপরও ঈশ্বর মুখ ফিরিয়ে নেননি, আমাদেরকে আলো-বাতাস আর খাবার দিয়ে চলেছেন তিনি। অথচ কারও মধ্যে কোনও রকম কৃতজ্ঞতাবোধ নেই, এখনও নিরীহ প্রাণ কেড়ে নিয়ে চলেছে! এমন চলতে থাকলে তো ঈশ্বর তাঁর কৃপার দৃষ্টি তুলে নেবেন!'

'সেই দিন অতি সন্নিকটে, ভাই,' বললেন দলের সবচেয়ে বয়স্ক সন্ন্যাসী, এই মঠে গত আট দশক ধরে বাস করছেন তিনি। 'তুমি যতটা ভাবছ, তার চেয়েও কাছে! বিচারের সময় সমাগত, ব্রাদার অব্রাহাম!'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, ব্রাদার ডেভিড।' মাথা ঝাঁকিয়ে একমত হলেন অব্রাহাম। বয়স্ক এই মানুষটির সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশ করেন না তিনি কখনোই—ডেভিডের বয়স একশো পেরিয়ে গেছে। চোখের দৃষ্টি হারিয়েছেন তিনি কয়েক বছর আগেই, শরীর একেবারে শীর্ণ হয়ে গেছে। চামড়ায় এত ভাঁজ যে, দলামোচা করা কাগজকেও হার মানাবে। ইদানীং স্বাস্থ্যের অনেক অবনতি ঘটেছে বেচারির, প্রায়ই অসংলগ্ন কথা বলছেন। আজকের এই কথাকেও কেউ যেন তেমনটা মনে না করে, তাই ব্যাখ্যার সুরে যোগ করলেন, 'শেষ-বিচারের দিনকে সবসময়ই সন্নিকট বলে ভাবতে হবে আমাদের।'

'ঈশ্বরের কথা বলছি না, ব্রাদার,' শান্ত সুরে বললেন ডেভিড। 'মানুষের কথা বলছি। ঈশ্বরের প্রশ্নের আগে মানুষের করা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে আমাদেরকে। এবং আমাদের জবাবটাও ওদেরকে মোটেই খুশি করবে না। অস্ত্র ধরবে ওরা আমাদের বিরুদ্ধে, ব্রাদার। রক্তের বন্যা বইয়ে দেবে! যে-গোমর আমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে আগলে রেখেছি, তার বিষয়ে ওরা জানে। হায়, পূর্বপুরুষদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত এবার আমাদেরকে করতে হবে!'

কয়েক মুহূর্ত নীরবতা বিরাজ করল ডাইনিং রুমে। তারপর কিছু বলার চেষ্টা করলেন অব্রাহাম, কিন্তু পারলেন না। পিঠ খাড়া করে বসেছেন বয়োবৃদ্ধ সন্ন্যাসী, দৃষ্টিহীন চোখদুটোর মণি জ্বলজ্বল করছে। থমথমে গলায় বললেন, 'ভাইয়েরা, অতীতের গ্লানি স্বীকার করবার সময় এসে গেছে। ছোট ছোট শিশুদের মৃত্যুর ঘটনা এবার উন্মোচিত হবে। দুনিয়ায় বাস করতে থাকা অশুভ শক্তিরা আবারও হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠবে। হ্যাঁ, মরবে অনেকে, কিন্তু সেটা অন্যদের বাঁচাবার জন্যে। তুমি এসবের কিছুই জানো না, অব্রাহাম; কারণ আমাদের পরম্পরা বিঘ্নিত হয়েছিল। তোমার পূর্ববর্তী প্রধান সবকিছু তোমাকে বলে যেতে পারেননি। কিন্তু জেনে রাখো, আমাদের এই চার দেয়ালের ভিতর এমন এক গোমর লুকানো আছে, যা জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ বাধাতে পারে। ভেবে-চিন্তে কাজ কোরো। শয়তানের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বাহিনীর লড়াইয়ের ভাগ্য এখন তোমার হাতে। কী ভেবেছিলে তুমি? কেন তোমার দায়িত্বটা আমরা কেউ নিতে রাজি হইনি?'

দু'দিকে মাথা ঘোরালেন ডেভিড, যেন দেখতে পাচ্ছেন মঠের অন্যান্য

বয়োবৃদ্ধ সন্ন্যাসীদের। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তাঁর বুক চিরে। বললেন, 'ভেবো না, পুরনো প্রধানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পিছিয়ে গিয়েছিলাম আমরা। মুখে হয়তো স্বীকার করবে না কেউ, কিন্তু ওঁকে আমরা পছন্দ করতাম না। যা তিনি জানতেন, তার ফলে হৃদয়টা ঘৃণায় ভরে গিয়েছিল তাঁর, ধর্মবিশ্বাস টলমলে হয়ে গিয়েছিল। সিদ্ধান্ত নিতেন এই দুনিয়ার কথা ভেবে, পরকালের অনন্ত জীবনের কথা ভেবে নয়। অবশ্য ওটাই তাঁর আর তোমার পদের প্রকৃতি... ওভাবেই চলতে হবে তোমাকেও।'

কালো চামড়ার নীচেও ব্রাদার আব্রাহামের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ডেভিডের কথাগুলো প্রলাপ মনে হচ্ছে না মোটেই, তাতে কীসের যেন ইঙ্গিত। কাঁপা কাঁপা গলায় তিনি জানতে চাইলেন, 'কী সেই সত্য, ব্রাদার? কে আমাদের প্রশ্ন করতে আসবে?'

উত্তেজনায় কাঁপছেন ডেভিড। শীর্ণ দেহের মাঝে বুকটা ওঠানামা করছে ভীষণভাবে। এক লাফে যেন বয়স আরও বেড়ে গেছে তাঁর। বললেন, 'আমি তা জানি না, জানার ইচ্ছেও নেই। তোমার জন্যও ভাল হয়, যদি জানতে না পারো। কিন্তু ভাগ্যের লিখন খণ্ডাবার উপায় নেই আমাদের কারও। ঈশ্বরের ইচ্ছেয় সবকিছু তোমাকে যথাসময়ে জানতে হবে।'

আর কিছু জানা গেল না ব্রাদার ডেভিডের কাছ থেকে। সারাটা দিন অস্থিরভাবে কাটল আব্রাহামের। প্রার্থনায় ঠিকমত মন বসাতে পারলেন না। সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়তেই বেরিয়ে পড়লেন মঠ থেকে, হাঁটতে থাকলেন গন্তব্যহীনভাবে। এখনও বেশ গরম বাইরে, কিন্তু ভারী আলখাল্লাটা খোলেননি তিনি। অন্যমনস্ক হয়ে আছেন। খেয়ালই করছেন না, অত্যন্ত বিপজ্জনক এলাকায় ঘোরাফেরা করছেন—ওখানটায় আগে মাইন-ফিল্ড ছিল। যুদ্ধশেষে জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞরা মঠের চারপাশে তিন মাইল এলাকা পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে, কিন্তু আব্রাহাম সেই সীমানা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন। গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেছেন তিনি, পারিপার্শ্বিকতার কথা ভুলে গেছেন বেমালুম।

জীবনকে ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করে দিয়েছেন আব্রাহাম। এই পেশায় যারা থাকে, তারা কোনও না কোনও পর্যায়ে ধর্মবিশ্বাসের প্রতি সন্দিহান হয়ে ওঠে—কিন্তু তাঁর বেলায় কখনও সেটা ঘটেনি। আজও অটুট তাঁর আস্থা। কিন্তু মরুভূমির মাঝ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে তাঁর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের মত একটা ভয় জেঁকে বসছে মনে। ব্রাদার ডেভিডের কথাগুলো পাগলের প্রলাপ ভেবে উড়িয়ে দিতে পারলে ভাল হতো, কিন্তু কেন যেন পারছেন না। নিজের ভিত কেঁপে উঠেছে তাঁর। না, ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস হারাননি, কিন্তু সন্দিহান হয়ে উঠেছেন নিজের ক্ষমতার ব্যাপারে। যদি বড় ধরনের কিছু মোকাবেলা করতে হয়, তা করবার মত শক্তি কি আছে তাঁর? ডেভিডের কথা শুনে বোঝা গেছে, দৈব কোনও বিপদ নয়, ওঁদের জন্য অপেক্ষা করছে মানুষের তৈরি করা বিপদ। ঈশ্বরের কাছে হাত তুলে সেটা সামাল দেয়া যাবে না।

সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরা ধর্মপ্রচার করেন না, ব্যস্ত থাকেন না নতুন সদস্য জোগাড়েও। শুধুমাত্র প্রার্থনা করা, এবং বিশ্বের সমস্ত মানুষের মঙ্গল কামনা করাই

তাঁদের প্রধান দায়িত্ব। আর সব খ্রিস্টদের সঙ্গে এখানেই তাঁদের পার্থক্য। সমাজের সঙ্গে মিশে থাকা খ্রিস্টরা নিজেদের কাজের ফলাফল দেখতে পান, বুঝতে পারেন—তাঁদের বয়ানে কতজন মানুষ ধর্মের দিকে ঝুঁকেছে, কতজন তাদের মন্দ স্বভাব ত্যাগ করেছে। কিন্তু সভ্যতা-বিবর্জিত মরুর মাঝখানে মঠ-সন্ন্যাসীদের তেমন কোনও সুযোগ নেই। মানুষের সঙ্গে মিশতেই জানেন না তাঁরা, কাজ করা তো অনেক পরের কথা। এই ধরনের সীমাবদ্ধতা নিয়ে তাঁর পক্ষে কীভাবে আসন্ন বিপদটা মোকাবেলা করা সম্ভব?

দুটো কাজ করতে হবে এখন তাঁকে... ব্রাদার ডেভিডের বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝবার জন্য। সন্দেহ নেই, বৃদ্ধ সন্ন্যাসী মিথ্যাচার করেছেন—সবকিছু জানা সত্ত্বেও না জানার ভান করছেন। কিছুই বলতে চাইছেন না যখন, আব্রাহামকে নিজে থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। প্রথম কাজটা একটা নিষিদ্ধ আনন্দ—ইথিওপিয়ায় নির্বাসনে থাকার সময় এর সন্ধান পেয়েছেন তিনি। আর দ্বিতীয় কাজটা একটা মহা-অপরাধ—প্রতিশ্রুতি ভাঙতে হবে তাঁকে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, উল্টো ঘুরলেন আব্রাহাম। দ্রুত পায়ে ফিরতে শুরু করলেন যে-পথে এসেছেন, সে-পথে। দৃঢ় পদক্ষেপ, এখন আর তাঁর মধ্যে কোনও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই।

মঠের ক্লিফটার তলায় একটা গভীর গুহা আছে, প্রবেশমুখটা বেশ কিছু পাথরের আড়ালে অদৃশ্য। এককালে প্রাগৈতিহাসিক মানুষেরা বাস করত এখানে, দেয়ালে আঁকা নানা ধরনের চিত্রলিপি সে-সাক্ষ্য বহন করছে। গুহাটাকে নিজের একান্ত জায়গা বানিয়েছেন আব্রাহাম, একাকী সময় কাটাবার জন্য আসেন তিনি এখানে।

মঠ থেকে বেরুনোর সময় সঙ্গে পানির বোতল, শুকনো সবজি আর লবণ দেয়া মাংস নিয়েছিলেন আব্রাহাম, সেগুলো বের করে একপাশের মেঝেতে নামিয়ে রাখলেন। আগের কয়েকবারের রাখা আরও কিছু খাবার আর পানি রয়ে গেছে ওখানে—দেখা গেল, খাদ্য আর পানীয়ের ছোটখাট একটা ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে ওটা। প্রতিবারই এমন হয়—পরেরবার খাবার আর পানি আনবেন না ভেবে ওগুলো রেখে যান তিনি, কখনোই আর খাওয়া হয়ে ওঠে না। কোনদিন যে মরুভূমি থেকে শেয়াল-কুকুর এসে সব চেটে-পুটে খেয়ে যাবে, কে জানে!

গুহার ভিতরে আলো নেই তেমন, মোমবাতি আনতে ভুলে গেছেন আব্রাহাম। তবে সেজন্য চিন্তিত হলেন না, একটা দিন নাহয় মোমবাতি ছাড়াই মানিয়ে নেবেন। খুব বেশি হলে চোখ-ব্যথা হবে, আর তো কিছু নয়। দেয়ালে ঠেস দিয়ে পাথরের আড়াল থেকে একটা বই বের করে আনলেন তিনি, বুক উত্তেজনায় কাঁপছে। এটাই তাঁর নিষিদ্ধ আনন্দ—বই পড়া... সাহিত্যের বই!

ব্রাদার আব্রাহামের হাতের বইটা বেশ পুরনো। বয়সের ভার এবং আফ্রিকার বিরূপ আবহাওয়ায় জর্জরিত। ইয়োরোপের কোনও ভাল লাইব্রেরিতে ঠাঁই পাবার জন্য জন্ম হয়েছিল এর—আফ্রিকান মরুভূমির মাঝখানে একটা প্রাকৃতিক গুহার ভিতরে থাকার জন্য নয়। ইথিওপিয়ায় নির্বাসনে থাকার সময় যে-বাড়িতে তাঁরা ছিলেন, সেটার চিলেকোঠায় পাঁচটা বই খুঁজে পেয়েছিলেন আব্রাহাম—উইলিয়াম

শেক্সপিয়ারের রচনাসমগ্রের ইটালিয়ান ভাষান্তর। ইটালি অধিকৃত ইথিওপিয়া, বা তৎকালীন আবিসিনিয়ায় জন্ম হয়েছে ব্রাদার আব্রাহামের, ভাষাটা মোটামুটি ভালই জানেন। কৌতূহলবশত পড়তে শুরু করেছিলেন, নেশা ধরে গেল অল্প সময়ের ভিতরেই। সেই থেকে বইগুলো তাঁর নিত্যসঙ্গী। কেউ জানে না, তাঁদের মঠ-প্রধান ধর্মীয় গ্রন্থের পাশাপাশি নিষিদ্ধ জাগতিক সাহিত্যের প্রেমে মজেছেন।

বইটা খুলে পড়তে শুরু করলেন আব্রাহাম। অদ্ভুত একটা ব্যাপারই বলা যায়, *ওথেলো* খুলে বসেছেন তিনি—যে-অংশটা পড়ছেন, সেখানে মুর রাজা জানতে পেরেছেন প্রিয়তম বন্ধু ক্যাসিও-র বিশ্বাসঘাতকতার কথা, আও-বিপদের কথা। বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে বড্ড মানানসই ওটা। ওতে ডুবে গেলেন ব্রাদার আব্রাহাম। শেক্সপিয়ারের নাটক আর সনেটই তাঁর একমাত্র হাতিয়ার—বাইরের পৃথিবীকে জানার জন্য।

কয়েক ঘণ্টা পর তিনি দ্বিতীয় কাজটাতে হাত দেবেন। তবে ব্রাদার আব্রাহামের ধারণাই নেই সেটার ফলাফল কী হতে পারে। অত্যন্ত জটিল একটা পরিস্থিতি প্রকট হয়ে উঠবে তাঁর চোখের সামনে। শেক্সপিয়ারের উর্বর মস্তিষ্কও এমন জটিলতার কথা কল্পনা করতে পারেনি। তা হলে নির্ঘাত একটা মহাকাব্য লিখে ফেলতেন ভদ্রলোক!

নয়

আর্লিংটন, ভার্জিনিয়া।

দিশেহারা বোধ করছে রানা। যে-ধরনের অভিযানে ওকে বেরুতে হচ্ছে, তার জন্য অন্তত দু'মাসের প্রস্তুতি প্রয়োজন; অথচ ও নিচ্ছে তিনদিনেরও কম। চাইলেও বেশি সময় ব্যয় করতে পারছে না, যত দ্রুত সম্ভব ফিল্ডে নামতে হবে ওকে, নইলে দুইশ' বর্গমাইলের বিশাল এলাকা কাভার করতে পারবে না। প্রস্তুতিপর্বের এই ঘাটতি যে কীভাবে ওকে ঝামেলায় ফেলতে পারে, সেটা ভেবেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে ও। জানা কথা, দিনা আবান ওকে ইরিত্রিয়ান সরকারের কাছ থেকে কোনও ধরনের সহযোগিতা এনে দিতে পারবে না। পারলেও খুব একটা লাভ হতো না... আফ্রিকায় পৌঁছুবে ও ইকুইপমেন্ট-স্বল্পতা, ফান্ডের অভাব, এবং জরুরি সব তথ্য ছাড়া।

মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করছে রানা, পারছে না। বার বার মনে পড়ে যাচ্ছে টিভির পর্দায় দেখা সোহেলের রক্তাক্ত মুখ—শরীরের প্রতিটা রন্ধ্রে রন্ধ্রে আগুন জ্বেলে দিচ্ছে স্মৃতিটা। ওকে উদ্ধার করতে হবে মানুষরূপী শয়তানগুলোর হাত থেকে। আর সেজন্যে খুঁজে বের করতে হবে কিম্বারলাইট পাইপটা। কিন্তু প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ছাড়া আদৌ কি সেটা সম্ভব?

যন্ত্রের মত খেটে চলেছে ও। সারাদিন ধরে গুঞ্জন তুলে চলেছে ওর ফ্যাক্স মেশিন, কম্পিউটার আর প্রিন্টারটা। পাতার পর পাতা প্রিন্টআউট বেরিয়ে আসছে

যন্ত্রগুলো থেকে—বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা হর্ন অভ আফ্রিকার ভূ-তাত্ত্বিক রিপোর্ট ওগুলো। একের পর এক ফোন, আর ইন্টারনেটে ব্রাউজিঙের ফাঁকে ফাঁকে রিপোর্টগুলোতে চোখ বুলিয়ে চলেছে রানা। আফ্রিকার বিষয়ে প্রচুর জানে ও, কিন্তু ইরিত্রিয়ার জিয়োলজি ওর জন্যে একেবারেই অজানা। তথ্যের ভাণ্ডার খুঁজে এখন ওকে আঁচ করতে হবে, দেশটার কোথায় একটা কিম্বারলাইট পাইপ থাকতে পারে।

ডেস্কের উপর কয়েক ইঞ্চি পুরু কাগজের স্তূপ জমে গেছে রানার—কিছু আছে গোছানো অবস্থায়, কিছু বা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এলোমেলোভাবে। ওগুলোর তলায় কোথাও পড়ে আছে খাবারের প্লেটটা—ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চ ওই একই পাত থেকে করেছে রানা। কাল রাতে রবার্ট সোয়ানের সঙ্গে দেখা করে ফেরার পর থেকে আর ঘুমোয়নি ও, একটানা কাজ করে চলেছে। পুরো দু'পট কফি সাবাড় করেছে ইতোমধ্যে, ঘুমকে ঠেকিয়ে রেখেছে যোজন যোজন দূরে; কিন্তু ঠেকাতে পারেনি মাথাব্যথাকে। চোখ, কপাল, মগজ... সব টনটন করছে ওর, অ্যাসপিরিন খেয়েও ব্যথাটা দূর হয়নি।

ফ্যাক্স আসা বন্ধ হয়েছে কিছুক্ষণের জন্য। হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলল রানা, ডায়াল করল এডওয়ার্ড ব্যাগলির নাম্বারে। এই নিয়ে কতবার তাকে ফোন করা হলো, তা আর বলতে পারবে না। কাল রাতে ওর প্রস্তাবে লোকটা সম্মতি জানানোর পর থেকে চলছে একের পর এক ফোন, এটা-সেটা দরকারের কথা তাকে জানিয়ে চলেছে রানা।

'হ্যাঁ, মি. রানা, এখন আবার কী?' ব্যাগলির কণ্ঠে বিরক্তি, ওর ফোন পেতে পেতে হাঁপিয়ে উঠেছেন যেন।

'মি. ব্যাগলি, ইরিত্রিয়ায় পৌঁছুনোর পর আমার একটা ব্লাস্টিং লাইসেন্স দরকার হবে,' বলল রানা। 'খোঁড়াখুঁড়ির সময় ডিনামাইট ফাটাতে হতে পারে, আগে থেকে অনুমতি নিয়ে রাখা প্রয়োজন। আসমারায় কারা ওই অনুমতি দেয় জানি না, আপনি একটু দেখবেন ব্যাপারটা?'

'এসব তো দিনা-র সামলাবার কথা,' বললেন ব্যাগলি। 'ওর সেলফোন নাম্বারও আছে আপনার কাছে, আমাকে বিরক্ত করছেন কেন?'

'সারাদিনে একবারও ফোন ধরেনি মেয়েটা, অতএব কাজটা আপনার ঘাড়েই চাপছে।'

দিনা আবানের বিষয়ে এখন পর্যন্ত আণ্ডারসেক্রেটারিকে প্রশ্ন করেনি রানা। ইরিত্রিয়ান এম্বাসির কেউ না হওয়া সত্ত্বেও কেন লোকটা তার মিথ্যে পরিচয় দিয়ে বেড়াচ্ছে, তা জানতে চায়নি। জিজ্ঞেস করে লাভও হবে না, তারচেয়ে চুপচাপ থাকাই ভাল বলে মনে হয়েছে ওর কাছে। যথাসময়ে ঠিকই খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হবে মেয়েটা। আপাতত তাকে যতটা পারে এড়িয়ে চলছে ও, ফোন না-ধরায় কাজটা বেশ সহজ হয়েছে।

নিচু স্বরে নিজের কপালকে গালমন্দ করলেন ব্যাগলি রানার কথা শুনে। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'আর কিছু?'

'হ্যাঁ, এক্সপ্লোসিভের অর্ডার দিয়েছি আমি, ওগুলো শিপিং হবার আগে

এণ্ড-ইউজার সার্টিফিকেট দরকার—আপনাকে ব্যবস্থা করতে হবে সেটা। তা ছাড়া অন-সাইটে ইকুইপমেন্টের রিফুয়েলিঙের জন্য বেশ কিছু কলাপসিবল ফুয়েল ব্লাডারও চাই আমার। সিভিলিয়ান মডেলগুলো নিতে চাইছি না, মিলিটারি ভার্শানগুলো বেশি টেকসই। পারবেন জোগাড় করতে?'

'রিফুয়েলিঙের জন্য ব্লাডার-ফ্লাডারের দরকার কী? ট্যাংকার ট্রাক দিয়ে কাজ চালাতে পারবেন না?'

'ওগুলোকে বসিয়ে রেখে পোষাবে না আমার—প্রচুর ডিজেল খাবে প্রত্যেকটা ইকুইপমেন্ট। ট্রাকগুলোকে রাউণ্ড-দ্য-ক্লক ট্রিপ দিতে হবে ফুয়েল আনার জন্য। আমাদের স্টকটা থাকবে ব্লাডারে।'

'ঠিক আছে, দেখি কী করা যায়। ফরমায়েশ শেষ হয়েছে আপনার?'

'উঁহুঁ। আমার ডেস্কে সাতাশ লাখ ডলারের একটা বিল এসে পৌঁছেছে—হেভি ইকুইপমেন্টের লিজ বাবদ। আমার মুখের কথায় সবকিছু রওনা করিয়ে দিয়েছে ওরা দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে, কিন্তু পেমেন্টটা দ্রুত হয়ে যাওয়া চাই।'

'টাকা নিয়ে ভাববেন না,' আশ্বস্ত করলেন ব্যাগলি। 'দিনা আর আমি ওদিকটা দেখছি। বিলটা ফ্যাক্স করে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন।'

'হুম, আর সকালে যেসব জিনিসের কথা বললাম?'

'দিনার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে আমার একটু আগে। স্মল-ইকুইপমেন্টের যে-চাহিদা দিয়েছিলেন, সেটা নিয়ে কাজ করছে ও। আশা করা যায়, আপনি পৌঁছুবার আগেই একটা ট্রাকে করে ওসব মালামাল টার্গেট-এরিয়ার কাছাকাছি পৌঁছে যাবে। আর মাইনিঙে অভিজ্ঞ একজন স্থানীয় লোককেও ভাড়া করেছে ও—নাম, আবেল আফওয়ার্কি। আপনার গাইড হিসেবে কাজ করবে লোকটা।'

'ওর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা যাবে?'

'দুঃখিত, মি. রানা,' হাসলেন ব্যাগলি। 'ইরিত্রিয়ার টেলিফোন সার্ভিস বড়ই খারাপ। কোনও মেসেজ থাকলে আমাকে বলতে পারেন।'

'থাক, দরকার নেই। পরে আবার কথা বলব আপনার সঙ্গে।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। ডুবে গেল আবার কাগজপত্রের মধ্যে। পড়াশোনা করছে, একই সঙ্গে মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে নানান রকম চিন্তা। মি. সোয়ানের সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন। রানা জানতে চায়, ওঁর এক্সপার্টরা কি কাজে লাগার মত কোনও আলামত সংগ্রহ করতে পেরেছে? কী সেগুলো?

ভাবনাটাতে ছেদ ঘটাল টেলিফোনের তীক্ষ্ণ রিং। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল রানা। 'হ্যালো?'

'কোথায় তুমি?' ওপাশ থেকে নুমার কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ কম্পিউটারমানিক ল্যারি কিং-এর কণ্ঠ ভেসে এল।

'বাড়িতে ফোন করে আবার জানতে চাইছ কোথায় আমি?' বিরক্ত গলায় বলল রানা।

'সরি, সেলফোন থেকে কল করছি—ফোনবুকে তোমার নামটা দেখেই ডায়াল বাটন টিপে দিয়েছি; নাম্বারটা বাসার, নাকি সেলফোনের—তা খেয়াল করিনি।'

'ভাল। এখন রাখো ফোনটা। এই লাইনে কথা বলা যাবে না।'

'না, না,' তাড়াতাড়ি বলল ল্যারি। 'রেখো না। আমার কথা সামান্য, কেউ আড়ি পেতেছে বলেও মনে হয় না। জলদি বেরিয়ে পড়ো। আমি তোমার সেলফোনে একটু পরেই রিং দিচ্ছি।'

'মানে!' বিস্মিত কণ্ঠে বলল রানা। 'কোথায় যাব?'

'ডালেস এয়ারপোর্টের কয়েক মাইল পুবে। ওখানে ছোট একটা প্রাইভেট এয়ারস্ট্রিপ আছে—*ফ্যারেলি এয়ার-চার্টার*-এর সম্পত্তি। ওখানে যাও। কুইক, রানা! তোমার উপর ওরা নজর রাখছে বলে মনে হয় না, রাখলেও কিছু এসে-যায় না। সোহেলের খোঁজ পেয়েছি আমি! ওরা ওকে নিয়ে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে!'

দড়াম করে রিসিভারটা ক্রেডলে আছড়ে রাখল রানা, দৌড়ে বেরিয়ে এল বাড়ির ভিতর থেকে। ওর ফোর্ড টরাস গাড়িটা রাস্তায় পার্ক করা আছে, লাফ দিয়ে উঠে বসল ড্রাইভিং সিটে। ইগনিশনে চাবি ঢুকিয়ে স্টার্ট দিল ও, গিয়ার দিয়ে সবেগে আগে বাড়াল গাড়িকে। রাস্তার অ্যাসফল্টে দুটো রেখা তৈরি করে সচল হলো টরাস।

মিনিটখানেকের মধ্যেই বেল্টওয়েতে পৌঁছে গেল রানা, ঝড়ের বেগে ছোটাচ্ছে গাড়ি, এঁকেবেঁকে ওভারটেক করে চলেছে রাস্তায় চলতে থাকা অন্যান্য গাড়িকে। রিং বেজে উঠল সেলফোনে, কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে ও বলল, 'হ্যাঁ, বলো।'

'অলরেডি দেরি হয়ে গেছে বোধহয়...' বলতে চাইল ল্যারি।

বাধা দিল রানা। 'সেটা আমি বুঝব। বলো, কী জানতে পেরেছ।' একটা মিনিভ্যানকে কাটাবার জন্য স্টিয়ারিং ঘোরাল ও—পাগলাটে ড্রাইভিং দেখে ভিতর থেকে এক মাঝবয়েসী মহিলা বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে।

'কাল রাত আর আজ সকালে সমস্ত মেজর এয়ারলাইনগুলোর রিজার্ভেশন ঘেঁটেছি আমি,' বলল ল্যারি। 'রিগ্যান ন্যাশনাল, ডালেস আর বি.ডব্লিউ.আই. এয়ারপোর্টের বুকিংগুলো দেখেছি। আমার মনে হচ্ছিল, কিডন্যাপাররা তোমার বন্ধুকে রোগী সাজিয়ে অজ্ঞান করে প্লেনে তুলবে, নইলে ও চেঁচামেচি করে ওদের পরিচয় ফাঁস করে দিতে পারে। রোগী নেবার জন্য আলাদা ফর্ম পূরণ করতে হয়, জানো তো? রোগের বর্ণনার পাশাপাশি শারীরিক কোনও অসুবিধে থাকলে, তারও বিবরণ দিতে হয়। সোহেলের একটা হাত না থাকায় একটা সুবিধে পাচ্ছিলাম, ওটার ব্যাপারে উল্লেখ না করে পারবে না ওরা। তাই সব ফ্লাইটের ও-ধরনের যাত্রীদের ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছিলাম...'

'কাজের কথায় এসো, ল্যারি!' অধৈর্য হয়ে বলল রানা।

'ও হ্যাঁ... অবশ্যই। এয়ারলাইনের সার্চে আসলে কিছুই পাইনি আমি, তখন মনে পড়ল চার্টার জেটের কথা। একটু আগে সার্চ করতেই একটা হিট পেয়ে গেছি। গতকাল একটা *গালফস্ট্রিম-ফোর* জেট চার্টার করা হয়েছে ফ্যারেলি এয়ার-চার্টার কোম্পানি থেকে। এয়ার-ট্রাফিক কন্ট্রোলের অনুমোদন সাপেক্ষে এখন থেকে আঠারো মিনিটের মধ্যে টেকঅফ করবার কথা ওটার—কোম্পানির প্রাইভেট এয়ারস্ট্রিপ থেকে।'

'রোগী বহন করছে ওটা?'

'হ্যাঁ। হুইলচেয়ার অ্যাসিসটেন্সের কথা বলা আছে অ্যাপ্লিকেশনে। সেই সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে, রোগীর একটা হাত নেই। তারপরও শিয়োর হবার জন্য ফ্যারেলি চার্টারে ফোন করেছিলাম, ওখান থেকে বলল—ভারতীয় টাইপের একজন রোগীকে নিয়ে বোর্ডিঙের জন্য অপেক্ষা করছে পাঁচজন লোক। রোগীর চেহারার সঙ্গে সোহেলের চেহারা পুরোপুরি মিলে গেছে!'

উত্তেজনায় গলার কাছে হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল রানার। বলল, 'থ্যাঙ্কস, ল্যারি। ঋণী হয়ে রইলাম তোমার কাছে।'

'আগে বন্ধুকে উদ্ধার করো,' বলল ল্যারি। 'ঋণ-টিন নিয়ে পরে কথা বলা যাবে দামি কোনও হোটেলের রেস্তোরাঁয় বসে।'

লাইন কেটে তাড়াতাড়ি এফবিআই ডিরেক্টরের সেলফোনের নাম্বারে রিং দিল রানা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলেন তিনি।

'রবার্ট সোয়ান।'

'মি. সোয়ান, রানা বলছি। সোহেলের খোঁজ পেয়েছি। ও এ-মুহূর্তে ডালেসের পাশে ফ্যারেলি নামে একটা চার্টার কোম্পানির এয়ারস্ট্রিপে আছে।'

'গুড গড!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন সোয়ান। 'আমি তো ডালেসের সামনে দিয়েই যাচ্ছি এখন... বাড়ি ফিরছি। ডোন্ট ওয়ারি, আমি এখুনি যাচ্ছি ওখানে।'

'আপনার সঙ্গে লোক আছে?'

'হ্যাঁ, তিনজন এজেন্ট আর আমার ড্রাইভার। সবার কাছে আর্মস আছে।'

'ঠিক কোথায় আপনারা?'

'ডালেসের পশ্চিমদিকের সীমানার বাইরে, এইমাত্র টোল বুথ পেরিয়ে এলাম।'

জানালা দিয়ে তাকাল রানা। ঝড়ের বেগে গাড়ি চালানোয় ও নিজেও এয়ারপোর্টের কাছে পৌঁছে গেছে; রাস্তায় ট্রাফিক কম থাকায় সুবিধে হয়েছে আরও। এয়ারপোর্টের সীমানা দেখতে পেল ও, দেখতে পেল টোল বুথটাও।

'আপনারা কি একটা সাদা রঙের ক্রাউন ভিক্টোরিয়াতে?'

'হ্যাঁ। তুমি কী করে জানলে?'

'জানালা দিয়ে তাকান।'

মি. সোয়ান মাথা ঘোরাতে না ঘোরাতে উল্কার মত ক্রাউন ভিক্টোরিয়াকে পেরিয়ে চলে গেল রানার টরাস—দ্বিগুণ গতিতে গাড়িটাকে ওভারটেক করেছে ও।

'হা যিশু!' আঁতকে উঠলেন সোয়ান। 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?'

নির্বিকার রইল রানা। বলল, 'আমার সঙ্গে থাকুন।' ফ্লোরবোর্ডের উপর অ্যাকসেলারেটর চেপে ধরল ও। রিয়ারভিউ মিররে তাকিয়ে দেখল, ওর সঙ্গে তাল মেলানোর জন্য এফবিআইয়ের ড্রাইভার যুঝতে শুরু করেছে।

চোখের পলকে ডালেস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট পেরিয়ে এল ওরা। এদিকটাতে গাড়ি-ঘোড়ার সংখ্যা অনেক কম, ফাঁকা রাস্তা পেয়ে গতি আরও বাড়িয়ে দিল রানা। সেলফোনে মি. সোয়ান জানালেন, 'ফ্যারেলির এয়ারস্ট্রিপটা সামনে। স্পিড কমাও, রানা।'

কথাটায় কান দিল না রানা; যেভাবে যাচ্ছে, সেভাবেই যেতে থাকল। একটু

পরেই রাস্তার উপর দেখা গেল সাইনবোর্ড—ডানদিকের শাখা-রাস্তাকে নির্দেশ করছে; বড় বড় হরফে লেখা: *ফ্যারেলি'স এয়ার চার্টার।*

গতি সামান্য কমিয়ে বন বন করে স্টিয়ারিং ঘোরাল রানা। বাম পা হালকা চাপ দিচ্ছে ব্রেকের উপর, আর ডান পা চেপে বসছে গ্যাস পেডালে। ডানদিকের জোড়া চাকার উপর প্রায় দাঁড়িয়ে গেল ফোর্ড টরাস, স্কিড করে ঘুরে গেল পুরো নব্বুই ডিগ্রি, তারপর আবার দড়াম করে নেমে এল বাম চাকাদুটো মাটিতে। গিয়ার বদলে স্পিড ধরে রাখল রানা।

একশো গজের মত এগোতেই গেট দেখা গেল—ওপাশে গার্ডহাউস আছে, দুজন নিরাপত্তারক্ষী দাঁড়িয়ে আছে পাহারায়। গাড়ি আসছে দেখে হাত তুলল তারা, থামতে বলছে। ইশারাটা দেখেও দেখল না রানা, গতি আরও বাড়িয়ে দিল। শেষ মুহূর্তে দুই গার্ড বুঝতে পারল কী ঘটতে চলেছে, জান বাঁচানোর জন্য দু'দিকে লাফিয়ে পড়ল তারা। মাঝখান দিয়ে ছুটে গেল টরাস, আছড়ে পড়ল গেটের উপর।

ফ্রন্ট-এও থেঁতলে গেল গাড়ির, তবে থামল না; গেটের পাল্লা উড়িয়ে দিয়ে ঢুকে পড়ল সীমানার ভিতর। ডানদিকে ছোট একটা টার্মিনাল বিল্ডিং দেখতে পেয়ে গাড়ি সেদিকে ঘুরিয়ে নিল রানা, থামল একেবারে দরজার সামনে এসে। ইঞ্জিন বন্ধ করার ঝামেলায় গেল না ও, লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল, বিল্ডিঙের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

ওর কয়েক সেকেণ্ড পর মি. সোয়ানের ক্রাউন ভিক্টোরিয়াও এসে থামল বিল্ডিঙের সামনে। হাতে অস্ত্র নিয়ে রানার পিছু পিছু ছুটলেন এফবিআই ডিরেক্টর এবং তাঁর তিন সঙ্গী।

প্রাইভেট মালিকানাধীন হওয়ায় টার্মিনালের ভিতরটা চমৎকারভাবে সাজানো—প্রথম দেখায় ওয়েইটিং রুমের চাইতে হোটেলের লবি বলে বেশি মনে হয়। স্বাভাবিক, কারণ নিজস্ব বিমানের মালিক, কিংবা চার্টার করতে সক্ষম অতি-ধনী ছাড়া আর কারও পদধূলি পড়ে না এখানে। টারমাকের দিককার দেয়াল-জুড়ে রয়েছে বিশাল বিশাল পিকচার উইণ্ডো, সেখান দিয়ে দেখা যাচ্ছে সার বেঁধে দাঁড়ানো বেশ কয়েকটা লিয়ারজেট, গালফস্ট্রিম আর সাইটেশন বিমান—কোম্পানির সম্পত্তি। ওদিককার একজিট ধরে কয়েকজন লোককে বেরিয়ে যেতে দেখল রানা, সঙ্গে হুইলচেয়ারে বসানো একজন রোগী। পিছন থেকে দেখেও চিনতে অসুবিধে হলো না মানুষটাকে।

সোহেল!

দশ

ঝট্ করে শোল্ডার হোলস্টার থেকে নিজের ওয়ালথার পিপিকে বের করে ফেলল রানা। পিছু পিছু মি. সোয়ানও সঙ্গীদের নিয়ে পৌঁছে গেছেন। এতগুলো মানুষের

হাতে উদ্যত অস্ত্র দেখে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল একটি মেয়ে—কামরাটার অপরপ্রান্তে কাউন্টারে দাঁড়ানো সে... রিসেপশনিস্ট।

চিৎকারটা কানে যেতেই পাঁই করে ঘুরল কিডন্যাপাররা, অস্ত্র হাতে রানা আর একবিআই এজেন্টদের দেখে যা বোঝার বুঝে নিল। চোখের পলকে তাদের হাতেও বেরিয়ে এল অস্ত্র—*একেএমএস* সাবমেশিনগান গুলো, রাশানদের তৈরি একে-৪৭-এর উন্নততর ভার্শান, লুকিয়ে বহন করবার জন্য মডিফাই করা। অস্ত্রগুলো এতক্ষণ লোকগুলোর পরনের লং কোটের তলায় ছিল, বাইরে থেকে দেখা যায়নি।

হাতের সেমি অটোমেটিক ওয়ালথারের দিকে তাকিয়ে নিজের অসহায়ত্ব বুঝতে পারল রানা—সাবমেশিনগানের সামনে এইটুকু একটা অস্ত্র কিছুই নয়; মি. সোয়ান ও তাঁর সঙ্গীদেরও একই অবস্থা, ওঁদের সবার হাতে *বেরেটা* পিস্তল। সিঙ্গেল শট নিতে হবে ওদেরকে, কিন্তু প্রতিপক্ষ করতে পারবে ব্রাশফায়ার। বাস্তবেও তা-ই ঘটল।

কিডন্যাপারদের মাজলে আলো ঝলকে উঠতেই মি. সোয়ানকে টেনে নিয়ে মেঝেতে ডাইভ দিল রানা। ওদের মাথার উপর দিয়ে বয়ে গেল বুলেটের ধারা। ক্রাউন ভিক্টোরিয়ার ড্রাইভার নড়বার সময় পায়নি, ফলে আধ-ক্লিপ বুলেট বুক পেতে নিতে হলো তাকে, শরীরের ঊর্ধ্বাংশ প্রায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। আরেকজন এজেন্টের কাঁধ আর উরুতে লাগল গুলি, লাটিমের মত আধপাক ঘুরে মেঝেতে আছড়ে পড়ল সে। অন্য দুই এজেন্ট অবশ্য শুয়ে পড়তে পেরেছে।

গুলিবৃষ্টির তীব্রতা কমে যেতেই মাথা তুলল রানা, দেখল—টারমাকের দিকে ছুটে চলে যাচ্ছে শত্রুরা, পালাচ্ছে সোহেলকে নিয়ে। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও, পিছু নিল লোকগুলোর, হাতের ওয়ালথার থেকে দুটো গুলি ছুঁড়ল পলায়নপর জটলাটার দিকে। গুলির শব্দ শুনে ছুটন্ত অবস্থাতেই ঘুরল দুজন—আরেক পশলা গুলি ছুঁড়ল বিল্ডিঙের দিকে।

আবার ডাইভ দিতে বাধ্য হলো রানা। বুলেটবৃষ্টি চুরমার করে দিল টার্মিনালের কাঁচের জানালাগুলোকে, জলপ্রপাতের মত ঝরঝর করে ভাঙা কাঁচের ধারা নেমে এল রানার শরীরের উপর। হামাগুড়ি দিয়ে জানালার নীচে চলে গেল ও, শরীর তুলল না, শুধু হাত তুলে ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি করতে থাকল... লোকগুলোকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে চায় ভয় দেখিয়ে। একটু উঁচুতে ফায়ার করছে, হুইলচেয়ারে বসা সোহেলের গায়ে যাতে গুলি না লাগে।

কৌশলটাতে কতটা কাজ হলো, বোঝা গেল না। আগের মতই গুলি চালিয়ে গেল কিডন্যাপাররা—খানিকটা তীব্রতা কমিয়ে। তবে সেটা পালাক্রমে গুলিবর্ষণের কারণে হতে পারে—একসঙ্গে সবার ক্লিপ খালি করতে চাইছে না হয়তো ওরা। খানিক পরেই অবশ্য থেমে গেল গোলাগুলি। কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে একটু উঁচু হলো রানা, ভাঙা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল।

অপেক্ষমাণ গালফস্ট্রিম বিমানটার কাছে পৌঁছে গেছে কিডন্যাপাররা। একজন ইতোমধ্যে উঠে পড়েছে তাতে, দুজন অস্ত্র হাতে পাহারা দিচ্ছে সিঁড়িটা—অন্যদুজন ধরাধরি করে সোহেলকে নিয়ে উঠতে শুরু করেছে বিমানে।

রানাকে স্পট করল এক পাহারাদার, সাবমেশিনগান তুলে গুলি করল সে। চট করে মাথা নামিয়ে নিল রানা।

বুকের ভিতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে ওর। দাঁতে দাঁত পিষল, লোকগুলোকে থামাবার উপায় দেখতে পাচ্ছে না; তা ছাড়া এখন সোহেলকে হুইলচেয়ার থেকে তুলে ফেলেছে ওরা, গুলি ছুঁড়লে ওর গায়ে লাগতে পারে।

টারমাক থেকে গালফস্ট্রিমের ইঞ্জিন চালু হবার আওয়াজ ভেসে আসতেই সচকিত হলো রানা, চোখের পলকে গগনবিদারী বিকট শব্দে পরিণত হলো তা। বিমানের পাইলট ওদের লোক কি না কে জানে। না হলেও হয়তো মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ইঞ্জিন চালু করতে বাধ্য করা হয়েছে তাকে। আবার মাথা তুলল রানা—কিডন্যাপাররা সবাই ঢুকে গেছে বিমানে, হ্যাচটা বন্ধ না করে অস্ত্রধারী এক শয়তান সেখানে দাঁড়িয়ে সাবমেশিনগান তাক করে রেখেছে টার্মিনাল বিল্ডিঙের দিকে। ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করল গালফস্ট্রিমের চাকা।

আচমকা তীব্র ক্রোধ ভর করল রানার মাথায়। এভাবে সোহেলকে নিয়ে যেতে দেবে না ও! রাগে অন্ধ হয়ে গেল, হারিয়ে ফেলল স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি। একটাই কথা ঘুরপাক খাচ্ছে মাথায়—ওদেরকে থামাতে হবে। ঝট করে উঠে দাঁড়াল রানা, ভাঙা জানালা টপকে নেমে এল টারমাকে, ছুটতে শুরু করল গালফস্ট্রিমের দিকে। পিছনে মি. সোয়ানের চিৎকার শোনা গেল, ওকে ফিরে আসতে বলছেন, কিন্তু কথাটা কানে তুলল না ও।

বিমানের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা অস্ত্রধারীও দেখতে পেয়েছে রানার ছুটে আসা, সাবমেশিনগান তুলে গুলি করতে শুরু করল সে। এঁকেবেঁকে গুলির ধারাকে ফাঁকি দিতে কষ্ট হলো না রানার, চলন্ত অবস্থায় গুলি করছে ব্যাটা, নিশানা ঠিক রাখতে পারছে না। তারপরও ঝুঁকি নিল না ও, চলে এল বিমানের অন্যপাশে, অস্ত্রধারীর ব্লাইণ্ড সাইডে। বাড়িয়ে দিল ছোটার গতি, প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে এখন।

গদাইলস্করি চালে এগোচ্ছে গালফস্ট্রিম—ইচ্ছেকৃতভাবে নয়, গতি বাড়াতে সময় লাগে বিমানটার। ফলে খুব দ্রুত ধাবমান আকাশযানটার পিছনে পৌঁছে গেল রানা। লেজের কাছাকাছি এসে আবার বেরিয়ে এল দরজার দিকটায়, হতচকিত অস্ত্রধারীকে লক্ষ্য করে হাতের ওয়ালথার থেকে ফটাফট গুলি করল। একেএমএস সিধে করবার সময় পেল না লোকটা, তার আগেই দুটো গুলি তার শরীর এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল। খোলা দরজা গলে শক্ত কংক্রিটের উপর আছড়ে পড়ল তার দেহ।

হার্ডল-জাম্পের ভঙ্গিতে লাশটা টপকে গেল রানা, গতি বাড়িয়ে খোলা দরজার কাছে পৌঁছুতে চাইছে। কিন্তু ওর সে-চেষ্টা সফল হলো না। গুলির শব্দে সতর্ক হয়ে গেছে ভিতরের কিডন্যাপাররা, বিমানটার গতি বেড়ে গেল। ওকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল আকাশযানটা। ইঞ্জিনের এগজস্ট দিয়ে বেরুতে থাকা গরম বাতাসের ধাক্কায় নিজের অজান্তেই আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে কিছুটা কুঁজো হয়ে গেল রানা, দৌড়ানোর বেগ কমে গেল; আর এই সুযোগে অনেকটা এগিয়ে গেল গালফস্ট্রিম। টারমাক ছেড়ে উঠে পড়ল মেইন ট্যাক্সিওয়েতে।

দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। অযথা দৌড়ে লাভ নেই আর, ধরতে পারবে না

ওটাকে। বিকল্প কী করা যায়, দেখার জন্য চারপাশে তাকাল।

রানওয়ে ধরে এগোতে থাকা একটা লিয়ারজেট চোখে পড়ল ওর—এইমাত্র ল্যাণ্ড করেছে, গতি কমিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে টার্মিনাল বিল্ডিঙের দিকে। ওদিকে ছুটল রানা, বিমানের একেবারে সামনে গিয়ে পিস্তল তুলে ফাঁকা গুলি করল, পাইলটকে ইশারা করল থামতে।

ভয়ার্ত দৃষ্টি ফুটল বৈমানিকের চোখে—রানাকে টেরোরিস্ট ভাবছে নির্ঘাত। ব্রেক চেপে লিয়ারজেটকে দাঁড় করিয়ে ফেলল সে, তবে ইঞ্জিন বন্ধ করেনি। পাশে গিয়ে দরজায় পিস্তলের বাট দিয়ে আঘাত করল রানা, খুলতে বলছে প্রবেশদ্বার। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে মৃদু শব্দ করে খুলে গেল হ্যাচটা। লাফ দিয়ে ফোকর গলে ঢুকে পড়ল ও। সোজা হতেই দেখল, বিমানের ভিতর হোমরা-চোমরা গোছের চারজন আরোহী আছে, ভীত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে জোর করে বিমানে চড়ে বসা অস্ত্রধারী মানুষটার দিকে।

'রিল্যাক্স,' বলল রানা। 'ভয়ের কিছু নেই। আমি আপনাদের ক্ষতি করব না।'

কথাটা ওরা বিশ্বাস করল কি করল না, তা দেখার জন্য আর অপেক্ষা করল না ও। দৌড়ে গিয়ে ঢুকল ককপিটে। ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত হ্যাণ্ডস্-আপের ভঙ্গিতে তুলে ফেলল পাইলট আর কো-পাইলট।

'হাত নামান,' বলল রানা। 'আপনাদেরকে গুলি করতে আসিনি।'

'তা হলে কী করতে এসেছেন?' বোকা বোকা ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল পাইলট।

'মুখ ঘোরান বিমানের,' বলল রানা। পাইলটের পাশের জানালা দিয়ে আঙুল তুলে দেখাল কিডন্যাপারদের বিমানটাকে। 'ওই গালফস্ট্রিমটাকে ধাওয়া করুন।'

'হোয়াট!'

'যা বলছি করুন!' পিস্তলের হ্যামার টানল রানা, এদেরকে বোঝানোর সময় নেই।

মাথা ঝাঁকাল পাইলট, থ্রটল বাড়িয়ে ফুট পেডাল চাপল। মুখ ঘুরিয়ে আবার ট্যাক্সিওয়েতে উঠে পড়ল লিয়ারজেট, পিছু নিল গালফস্ট্রিমের। ওটার চেয়ে দ্রুত স্পিড ওঠে লিয়ারজেটের, দূরত্বটা কমতে শুরু করল। কয়েক মিনিটেই কিডন্যাপারদের বিমানটার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেল লিয়ারজেট।

খোলা হ্যাচটা বন্ধ করতে ডোরওয়ের কাছে এসেছিল একজন কিডন্যাপার, পিছনে চোখ পড়তেই আঁতকে উঠল। লিয়ারজেটটা ওদের ঘাড়ের উপর চড়ে বসতে যাচ্ছে। দ্বিধা করল না সে, ফাঁকা ডোরওয়ে দিয়ে শরীরের একাংশ বের করে ফায়ার করল লিয়ারজেটকে লক্ষ্য করে।

ধাতব শরীরে বুলেট ঢোকার ঠক ঠক শব্দ হলো। উইণ্ডশিল্ডের কাছ দিয়ে উড়ে গেল লোহার টুকরো। আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল দুই বৈমানিক। ইয়োক ছেড়ে দিয়ে চোখ-মুখ ঢাকল দু'হাতে, যেন এতেই গুলির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

'সামনে তাকান!' ধমকে উঠল রানা। 'আপনাদের উইণ্ডশিল্ড কয়েক ইঞ্চি পুরু, ওটা ফুটো করে গুলি ঢুকতে পারবে না।'

ঝট্ করে ওর দিকে তাকাল পাইলট। রাগত স্বরে বলল, 'দ্যাটস্ ইট,

মিস্টার। টার্গেট প্র্যাকটিসের শিকার হব না আমি!'

'আর ইউ শিয়োর?' পিস্তলটা পাইলটের দিকে তাক করে বলল রানা। পরে বোঝানো যাবে একে, আপাতত ভয় দেখিয়ে কাজ উদ্ধার করতে চাইছে—এতে সময় নষ্ট হয় না।

'ড্যাম ইট!' চেঁচিয়ে উঠল পাইলট। 'বিমানের গায়ে গুলি লেগেছে! ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানি না। এ-বিমান নিয়ে কিছুতেই ফ্লাই করব না আমি।'

'উড়তে হবে না আপনাকে। পিছন থেকে গিয়ে শুধু গুঁতো মারুন ওই গালফস্ট্রিমটাকে। বেশি জোরেও মারতে হবে না; টেইল সেকশনের সামান্য ক্ষতি করতে পারলেই হয়—ওরা তা হলে টেকঅফ করতে পারবে না।'

'আপনি পাগল হয়ে গেছেন!' অবিশ্বাসের সুরে বলল পাইলট।

'না, ক্যাপ্টেন। পাগল হইনি।' জোর গলায় বলল রানা। 'ওই বিমানের প্যাসেঞ্জাররা টার্মিনালে দুজন এফবিআই এজেন্টকে খুন করে এসেছে... আমার এক বন্ধুকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাচ্ছে! ওদেরকে থামাতেই হবে!'

ওর কণ্ঠে এমন কিছু ছিল, যা অগ্রাহ্য করতে পারল না পাইলট। সোজা হয়ে সামনে তাকাল সে। কিছুক্ষণের জন্য গতি কমে গিয়েছিল লিয়ারজেটের, থ্রটল ঠেলে সেটা পুষিয়ে নেবার চেষ্টা করল।

গালফস্ট্রিমের খোলা দরজা দিয়ে শরীর বের করে রাখা কিডন্যাপারও দেখল দৃশ্যটা। বুঝতে পারল, ধাওয়াকারীরা থামবে না। সাবমেশিনগান তুলে আবার গুলি করতে চাইল, কিন্তু খালি চেম্বারে খটাস করে পড়ল হ্যামার—অ্যামিউনিশন ফুরিয়ে গেছে। রিলোড করবার সময় নেই। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে একটা সিদ্ধান্ত নিল সে, ভিতরদিকে ঘাড় ফিরিয়ে সঙ্গীদের জানাল সিদ্ধান্তটা, তারপর হাত থেকে অস্ত্র ফেলে দিয়ে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল রানওয়েতে।

'হোয়াট দ্য...' বিড়বিড় করে উঠল লিয়ারজেটের কো-পাইলট। 'কী করতে চাইছে ও?'

রানারও ভুরু কুঁচকে গেছে। অবাক হয়ে লক্ষ করল, গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে লোকটা। ছুটতে আসতে শুরু করেছে ওদের দিকে... বিপুল বেগে এগোতে থাকা লিয়ারজেটের দিকে!

'ব্যাটার মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি?' বিস্মিত গলায় বলে উঠল পাইলট।

আচমকা রানা বুঝতে পারল কী করতে চলেছে ম্যানিয়াকটা। সেই সঙ্গে এটাও বুঝতে পারল—এরা সাধারণ ক্রিমিনাল নয়, তার চেয়ে অনেক... অনেক গুণ ভয়ঙ্কর ও নিবেদিতপ্রাণ অপরাধী। এরা ধর্মান্ধ সন্ত্রাসী। ওর আশঙ্কাটাই সত্যি বলে প্রমাণিত হলো পরমুহূর্তে। লিয়ারজেটের ডানার কাছে পৌঁছিয়েই লাফ দিল লোকটা... ইঞ্জিনের দিকে!

'ওহ্ গড!' গোঙানির মত শব্দ বেরুল কো-পাইলটের গলা দিয়ে।

বাতাসের টানে সোজা ইঞ্জিনের ভিতর ঢুকে গেল কিডন্যাপার। প্রথমে ঢুকল হাত—টাইটেনিয়ামের তৈরি *গ্যারেট টিএফই-৭৩১* টার্বো-ফ্যানের ব্লেডগুলো বাহুদুটোকে নিমেষে কিমা বানিয়ে ফেলল। কিন্তু মাথা আর কাঁধের হাড় অনেক

শক্ত—ও-দুটো ঢুকতেই হার মানল টারবাইন। গা রিরি করে ওঠার মত হাড় এক
খুলি ভাঙার শব্দ হলো, কিন্তু তারপরই আটকে গেল পাখা। তীব্র ঘূর্ণন থেকে
আচমকা থেমে যেতে বাধ্য হওয়ায় প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হলো ইঞ্জিনে; বোমা ফাটার
মত বিস্ফোরণের আওয়াজ করে টুকরো টুকরো হয়ে গেল ওটা। শাফট থেকে
আলাদা হয়ে ছিটকে গেল ব্লেডগুলো—ইঞ্জিনের শরীর ভেঙেচুরে ছড়িয়ে গেল
চারপাশে। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেল লিয়ারজেট, মোমেন্টামের কারণে এগোল
একটু, তবে ইঞ্জিনের শক্তি না পাওয়ায় থেমে দাঁড়াল অল্পক্ষণেই।

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ককপিটের ভিতর বসে আছে দুই পাইলট, রানাও হতভম্ব
হয়ে গেছে। যা ঘটল, তা অবিশ্বাস্য। কল্পনা করা যায় না, কেউ জীবন দিয়ে
এভাবে কাউকে ঠেকিয়ে দিতে পারে! কন্ট্রোল প্যানেলে আগুন ধরে যাবার সঙ্কেত
দেখা যাচ্ছে—লাল একটা বাতি জ্বলছে, অ্যালার্ম বাজছে বিপ বিপ করে। মূর্তিতে
পরিণত হওয়া দুই বৈমানিকের দিকে তাকাল রানা—নড়তে-চড়তে ভুলে গেছে
তারা, ঘোর কাটতে সময় লাগবে। ঝুঁকে একটা বোতাম চাপল ও—তার
ইঞ্জিনটার ভিতরে অগ্নি-নির্বাপনী গ্যাসের প্রবাহ বয়ে গেল, নিভে গেল আগুন।

সোজা হয়ে এবার উইণ্ডশিল্ড দিয়ে তাকাল রানা—দূরে সরে গেছে
গালফস্ট্রিম, গতি বাড়ছে প্রতি মুহূর্তে। চলে যাচ্ছে ওরা সোহেলকে নিয়ে হ্যাচটা
বন্ধ হয়ে যেতে দেখল ও; দেখল রানওয়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছে ওটাকে টেকঅফ
করে আকাশে উঠতে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ও। মনের ভিতর চলছে প্রচণ্ড
ঝড়।

একটু পরেই শোনা গেল কয়েকটা সাইরেনের শব্দ—ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ
আর অ্যাম্বুলেন্স আসছে। বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল রানার।

বিশ মিনিট পর।

ক্যারেলি এয়ার-চার্টারের টার্মিনালে মাথা নিচু করে বসে আছে রানা।
চারপাশে পুলিশ আর এফবিআইয়ের ব্যস্ততা, রয়েছে ইমার্জেন্সি সার্ভিসের
ক্রু-রাও; কিন্তু ওসব দিকে কোনও নজর নেই ওর।

মি. সোয়ান ফোনে কথা বলছিলেন কার সঙ্গে যেন, আলাপ শেষ হতেই
এগিয়ে এলেন ওর দিকে।

'রানা, তুমি ঠিক আছ?'

চোখ তুলে এফবিআই ডিরেক্টরের দিকে তাকাল রানা, চেহারায় হতাশা ফুটে
রয়েছে। বলল, 'নিজেকে জুতোপেটা করতে ইচ্ছে করছে। নাগালে পেয়েও
থামাতে পারলাম না ওদের। সোহেলকে নিয়ে গেল ওরা...'

'শুধু শুধু নিজেকে দোষারোপ কোরো না, রানা,' নরম গলায় বললেন
সোয়ান। 'যথেষ্ট চেষ্টা করেছ, ঝুঁকি নিয়েছ... এর বেশি আর কী-ই বা করতে
পারতে?'

আনমনে মাথা নাড়ল রানা। 'এরা সাধারণ কোনও ক্রিমিনাল নয়। যেভাবে
একজন আত্মহত্যা করল বাকিদের পালাতে দেয়ার জন্য, তাতে রিলিজিয়াস
ফ্যানাটিক বলেই মনে হচ্ছে। আরও সাবধানে এগোনো দরকার ছিল।'

'ওদের পরিচয় জানা ছিল না আমাদের,' বললেন সোয়ান। 'কাজেই ব্যাপারটা নিয়ে খামোকা আক্ষেপ কোরো না। এখন কী করা যায়, সেটা নিয়ে ভাবো।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ঠিকই বলেছেন। আপনার লোকদের কী অবস্থা?'

'একজন তো মারাই গেছে। অন্যজনের অবস্থাও খারাপ, টিকবে বলে মনে হয় না। ওই হারামজাদাদের ধরবার জন্য আমিও অস্থির হয়ে আছি।'

'বিমানটাকে ট্র্যাক করতে পেরেছেন?'

'এখনও না। কারও না কারও রেইডারে নিশ্চয়ই আছে, এখনও সব জায়গায় যোগাযোগ করতে পারিনি।'

'লো-ফ্লাই করে বেরিয়ে যাবে নাগালের বাইরে, কারও রেইডারে ধরা পড়বে না।'

'জানি,' স্বীকার করলেন সোয়ান। 'ধরে নিচ্ছি ওরা দেশের সীমানা পেরিয়ে যেতে পারবে। ইন্টারন্যাশনাল টেরিটরিতে গেলেই কেসটা আর আমি হ্যাণ্ডেল করতে পারব না, তাই ভাবছি সিআইএ-র ডিরেক্টর হ্যারল্ড গ্যাভিলানের সঙ্গে এখুনি যোগাযোগ করব। ট্র্যাকিঙের ব্যাপারে ওদের সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশি।'

'তারপরও কাজটা সহজ হবে না,' বলল রানা। 'বিমানটায় বাড়তি ফুয়েল থাকলে ওরা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ইয়োরোপ, আফ্রিকা, বা দক্ষিণ আমেরিকায় পৌঁছে যেতে পারবে। এত অল্প সময়ে কোনও এয়ারক্র্যাফটকে ট্রেস করা খুবই কঠিন।'

'রিল্যাক্স, রানা,' বললেন সোয়ান। 'সিআইএ-র দিকে তাকিয়ে বসে থাকব না আমরা। এদিকেও কাজ চলবে। তোমার বাড়ি থেকে কিছু এভিডেন্স সংগ্রহ করা হয়েছে। লোকগুলো পালিয়েছে বটে, কিন্তু বিমান চার্টার করতে গিয়ে প্রচুর পেপার-ট্রেইলও রেখে গেছে। ওগুলোর উৎস খুঁজে বের করব। তা ছাড়া একজনকে ঘায়েল করেছ তুমি; ওরটা... সেইসঙ্গে আত্মহত্যা করা লোকটার অস্ত্র হাতে আছে আমাদের। ওগুলো থেকেও সূত্র পাওয়া যেতে পারে। আমি অলরেডি ব্যুরোর ফরেনসিক টিমকে ডেকে পাঠিয়েছি। দেখা যাক, ওরা কী বের করতে পারে।'

'হুম,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'কিন্তু ওসবের আশায় চুপচাপ বসে থাকা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।' উঠে দাঁড়াল ও। 'আমি ইরিত্রিয়ায় যাব। এ-মুহূর্তে কিডন্যাপারদের শর্ত মেনে নেয়া ছাড়া আর কোনও উপায় দেখছি না।'

'আমি এখনও বলব না-যেতে।' পরামর্শ দিলেন সোয়ান।

'দুঃখিত, স্যার। সোহেলের প্রাণের উপর যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছি এরই মধ্যে। আজকের ঘটনাতেই না-জানি ওরা ওকে নিয়ে কী করে। আমি যদি পাইপটা খুঁজতে না-যাই, তা হলে তো মেরেই ফেলবে।'

'ব্যাপারটা শুধু সোহেল আর তোমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, রানা,' অস্বস্তিভরে বললেন সোয়ান। 'আরও অনেক গুণ সিরিয়াস এবং জটিল ওটা। সেজন্যেই মানা করছি তোমাকে।'

'ঠিক বুঝলাম না,' ভুরু কোঁচকাল রানা।

'সময় পাইনি তোমাকে বলার। ওই দিনা আবানের ব্যাপারে খোঁজ নিতে গিয়ে যা জেনেছি, তাতে এর ভিতর তোমাকে জড়াতে দিতে মন চাইছে না।'

'কী জেনেছেন?'

'ইরিত্রিয়ান এম্বাসিতে খোঁজখবর নিতে শুরু করেছিলাম, স্বয়ং অ্যাম্বাসেডর ফোন করলেন আমাকে। বললেন, মিস আবান তাঁর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে এ-দেশে কাজ করছে। ও কোনও অবৈধ কাজ করছে না, অতএব ব্যাপারটা নিয়ে আমরা যেন মাথা না ঘামাই।'

'কী কাজ করছে, সেটা জানতে চাননি?'

'অ্যামব্যাসেডরের ভাষ্যমতে, ইরিত্রিয়ায় মানবকল্যাণমূলক কার্যক্রমের জন্য প্রাইভেট ফাণ্ড জোগাড় করছে। প্যাঁচ দিয়ে ভদ্রলোককে ধরব ভেবেছিলাম, কিন্তু তিনি আর কিছু বলতে রাজি হলেন না, ফোন রেখে দিলেন। আমি বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠলাম স্বভাবতই। সিআইএ-র ডেটাবেজে দিনা আবানের ব্যাপারে কিছু আছে কি না জানার চেষ্টা করলাম। কিন্তু নামটা কম্পিউটারে টাইপ করতেই আরেকটা খেপা ফোন পেলাম...'

'আবার ইরিত্রিয়ান অ্যাম্বাসেডর?'

'উঁহু,' তিক্ত হাসি ফুটল মি. সোয়ানের ঠোঁটে। 'হ্যারল্ড গ্যাভিলান—সিআইএ ডিরেক্টর!'

'কী!'

'ঠিকই শুনছ। দিনা আবানের ব্যাপারে তথ্য চাইবার সঙ্গে সঙ্গে রেড সিগনাল চলে গেছে বিভিন্ন জায়গায়—এর মধ্যে একটা গেছে তেল আবিবে; সিআইএ-র ডেটাবেজ *মোসাদ* আংশিক শেয়ার করে কি না! ওদের চিফ খেপে গিয়ে ফোন করেছে গ্যাভিলানকে; আর গ্যাভিলান করেছে আমাকে। মোদ্দা কথা হলো, এফবিআই কর্তৃক মিস আবানের ব্যাকগ্রাউণ্ড চেকটাকে ইজরায়েল পছন্দ করছে না।'

খবরটা অপ্রত্যাশিত। বিস্মিত কণ্ঠে রানা বলল, 'ইরিত্রিয়ান একজন নাগরিক নিয়ে ইজরায়েলের এত মাথাব্যথা কেন?'

'কারণ দিনা আবানের দ্বৈত-নাগরিকত্ব আছে—একটা ইরিত্রিয়ার, অন্যটা ইজরায়েলের। ইন ফ্যাক্ট, ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সের কমিশন পাওয়া অফিসার ও; গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদে আছে। কী সেটা, তা অবশ্য ঠিক জানতে পারিনি।'

'সরকারি?' গম্ভীর হয়ে গেল রানা। সোহেলের কিডন্যাপাররা কি তবে ইজরায়েল-বিরোধী কোনও গোষ্ঠী? মুসলিম চরমপন্থী?

'হ্যাঁ,' সায় দিলেন সোয়ান। 'পদটাও খুব টপ লেভেলের সঙ্গে কানেক্টেড নিঃসন্দেহে। কারণ গ্যাভিলানের সঙ্গে কথা শেষ হবার দশ মিনিট পর মি. ড্যানিয়েল প্রেসকট কল করেন আমাকে।'

'আপনাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী?' বিস্ময় আরও বাড়ল রানার। কতটা উঁচু লেভেলের লোক জড়িত পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে?

'হ্যাঁ, ঠিকই শুনছ,' বললেন সোয়ান। 'গ্যাভিলানের মত তিনিও একটা ফোন পেয়েছেন ইজরায়েল থেকে—ওদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিমন বারস্টিনের কাছ থেকে!

দিনা আবানের কাছ থেকে একশো হাত দূরে থাকতে বলেছেন বার্নস্টিন, নইলে দু'দেশের সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে বলেও হুমকি দিয়েছেন। মেয়েটা নাকি তাঁদের নিজস্ব এজেন্ট, বিশেষ মিশন নিয়ে আমেরিকায় এসেছে। ভদ্রলোকের ভাষায়: ব্যাপারটার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনও স্বার্থ জড়িত নেই, কাজেই ওর ভিতর নাক গলানো আমাদের উচিত হবে না। আমি নাকি ওর ব্যাপারে ইনভেস্টিগেশন চালাতে গিয়ে দুই বন্ধুপ্রতিম দেশের মধ্যে তিক্ততার জন্ম দিচ্ছি।'

'শুধু ডেটাবেজে ওর নাম লেখাতেই এই অবস্থা?' রানার কাছে সবকিছু ঘোলাটে মনে হচ্ছে। মোসাদ, কিংবা ইজরায়েলের বিপক্ষে আগে বহুবার কাজ করতে হয়েছে ওকে; কখনও ওদেরকে কোনও এজেন্টের ব্যাপারে এমন আচরণ করতে দেখেনি। প্রকাশ্যে মন্ত্রীপর্যায়ের কেউ ফোন করবে, কিংবা আমেরিকার মত গার্জেনকে হুমকি দেবে—এ তো আরও অবিশ্বাস্য। 'হচ্ছেটা কী এখানে, মি. সোয়ান?'

'আই হ্যাভ নো আইডিয়া। দিনা আবানের ব্যাপারে রুটিন এনকোয়্যারি করছিলাম, তাতেই আমার শিকড় ধরে টান দিয়েছে ওরা। এর মানেটা ভাল কিছু হতে পারে না। অনেক বড়... অনেক গভীর কিছু ঘটছে তলে তলে। হীরার খনি বিশাল একটা ব্যাপার, তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু ওটা তো... যদি থাকেও... আফ্রিকায়! খুঁজে পাওয়া না পাওয়ায় ইজরায়েলের কী? রিলিজিয়াস ফ্যানাটিকরাই বা ওটা নিয়ে পাগল হচ্ছে কেন? বিরাট একটা রহস্য আছে এতে... সেই সঙ্গে রয়েছে ভয়ঙ্কর বিপদ। তুমি আর এর ভেতর থেকো না। সোহেলের ব্যাপারে কী করা যায়, না-যায়, সেটা আমি দেখব।'

'পিছিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে, মি. সোয়ান,' বলল রানা। 'সোহেলের জীবন-মরণের প্রশ্ন এখন ব্যাপারটা। আমি চাইনি, ওরাই তো আমাকে টেনে এনেছে এর ভিতর। এখন ইরিত্রিয়ায় যেতেই হবে আমাকে। শুধু সোহেলকে বাঁচাবার জন্য নয়, পুরো রহস্যটার জড় খুঁজে বের করতে। আমারও জানা দরকার—আসলে কী ঘটছে।'

'সেক্ষেত্রে পিছনে একটা চোখ খোলা রাখতে পরামর্শ দেব আমি,' বললেন সোয়ান। 'যাদের সঙ্গে কাজ করতে যাচ্ছ, তাদের কেউই তোমার মিত্র নয়। পিঠে ছুরি বসাবে ওরা সুযোগ পেলেই।'

'আমিও পাল্টা আঘাত হানতে জানি,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল রানা। 'এডওয়ার্ড ব্যাগলি, দিনা আবান, কিংবা মোসাদ... যে-ই আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়ুক না কেন; ওদের আমি ছাড়ব না। এর শেষ দেখব!'

এগারো

ভেনিস, ইটালি।

জানালার দিকে ফিরে গ্র্যাণ্ড ক্যানালের পারে গড়ে ওঠা প্রাচীন, ঐতিহ্যবাহী

পারিবারিক ম্যানশনের সুবিশাল ড্রয়িংরুমে বসে আছে মার্সেলো মানসিনি। জানালাগুলো বিশাল—মেঝে থেকে উঁচু ছাদ পর্যন্ত ছুঁয়েছে, তৈরি হয়েছে পুরু কাঁচ দিয়ে, কাঠামো রট আয়রনের: প্রত্যেকটার বয়স তিনশো বছরের বেশি। সে-আমলে কাঁচ-শিল্পের ব্যাপক উন্নতি হয়েছিল, তার সাক্ষী হয়ে আছে জানালাগুলো। স্বাভাবিক স্বচ্ছতা সামান্য কমে এসেছে, ওগুলো ভেদ করে ঢোকা সূর্যের আলো তাই অনেকটাই মোলায়েম: হালকাভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে মার্বেলপাথরে গড়া চকচকে মেঝেতে পড়ে।

শুধু জানালাই নয়, কামরার প্রতিটি আসবাবপত্র এক একটা অ্যান্টিক। প্রত্যেকটারই আলাদা গুরুত্ব, আলাদা ইতিহাস রয়েছে। তারপরও এই কামরায় একত্র হয়ে নিজস্বতা যেন হারিয়ে গেছে ওগুলোর মধ্য থেকে, নতুন একটা জীবন পেয়েছে। সামঞ্জস্য আর নিখুঁত সজ্জার শ্রেষ্ঠ উদাহরণে পরিণত হয়েছে গোটা ড্রয়িং রুম। এই উদাহরণ ছড়িয়ে আছে বাড়ির অন্য বেয়াল্লিশটা কামরাতেও।

মূর্তির মত বসে থাকা মানসিনিও যেন এই অভিজাত পরিবেশের একটা সংযোজন—পোশাক-আশাক আর অবয়বের দিকে তাকিয়ে অমনটাই মনে হতে পারে। স্পোর্টস্ কোটটা বিশেষভাবে মিলানে তৈরি করা হয়েছে, শার্টটা ইজিপশিয়ান কটনের, আর টাই-টা প্রয়াত বিখ্যাত ডিজাইনার জিয়ান্নি ভারসাচি নিজ হাতে উপহার দিয়েছিলেন তাকে। এসবের সঙ্গে বনেদি চেহারা মিলে মানসিনিকে দেখাচ্ছে পুরনো আমলের ইতালীয় মার্চেন্ট-প্রিন্সের মত। বাস্তবেও তার মর্যাদা অনেকটা সে-রকমই।

পৃথিবী বদলে গেছে—ভাবছে মানসিনি: আকাশভ্রমণ, সেই সঙ্গে টেলিফোন-ইন্টারনেটের বদৌলতে দূরত্ব এখন আর কোনও প্রতিবন্ধকতা নয়। একটা সময়ে সাহসিকতার মূল্য ছিল; ঝুঁকি নিয়ে দূর-দূরান্তে বেরিয়ে পড়ত অভিযাত্রীরা, ফিরে আসত অতুল সম্পদ নিয়ে। কিন্তু সেসব দিন এখন গতপ্রায়; টাকা কামানো অনেক কঠিন হয়ে পড়েছে; কঠিন হয়ে পড়েছে ক্ষমতাবান হওয়াও। তার ওপর রয়েছে নানা রকম বিধি-নিষেধ আর শৃঙ্খল—ট্যাক্স দিতে হবে, সরকারের কাছে আয়-ব্যয়ের হিসেব দিতে হবে, আরও কত কী! লোভী ব্যাঙ্কার, আইনজীবী, কিংবা ঘুষখোর আমলাদের মত লোকজনও কম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। সবদিক রক্ষা করে ক্ষমতা আর প্রতিপত্তির অধিকারী হওয়া কঠিন, তার চেয়েও কঠিন হচ্ছে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা। খুব কঠিন। সাহসিকতা, কিংবা ব্যক্তিত্বের চেয়ে এখন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কূটবুদ্ধি—অন্যকে দমিয়ে নিজেকে শীর্ষে রাখার কৌশল।

হাতে গোনা অল্প কিছু লোক শুধু পারে এতসব সামলে নিজেদের সিংহাসন অটুট রাখতে—তেমনই একজন মানুষ এই মার্সেলো মানসিনি। কিন্তু তবু শান্তি নেই। এ মুহূর্তে ড্রয়িংরুমে বসে নিজের অবস্থান অক্ষুণ্ন রাখবার, এবং নতুন কিছু মানুষের উপর ছড়ি ঘোরাবার এক মহা-পরিকল্পনার ছক কাটছে সে।

ছয়শো বছরের পুরনো এক বনেদি পরিবারের শেষ সন্তান মানসিনি, পারিবারিক ইতিহাসের সবচেয়ে সফল পুরুষ... এবং হয়তো বা বংশের শেষ পুরুষ! অনেক সাধ্য-সাধনার পরও তার স্ত্রী তাকে একটি পুত্র দিতে পারেনি;

ছয়-ছয়বার গর্ভবতী হয়েছে মহিলা, প্রতিবারই একটি করে মেয়ের জন্ম দিয়েছে। শেষ মেয়েটির বিয়ে হয়ে যাবে দু'মাস পর—সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে। এরপর মানসিনি বংশের প্রদীপ বহন করবার আর কেউ থাকবে না। জারজ দুটি পুত্র অবশ্য আছে তার, কিন্তু তাদেরকে পারিবারিক সাম্রাজ্যে প্রবেশ করতে দেবার প্রশ্নই ওঠে না। বয়স ষাট হয়ে গেছে মানসিনির, এখন আর নতুন করে সন্তান নেবারও ইচ্ছে বা সময় নেই। সব মিলিয়ে অদৃষ্টকে মেনে নিয়েছে সে, সেইসঙ্গে বেপরোয়াও হয়ে উঠেছে—মরার আগে নিজেকে এমন একটা উচ্চতায় নিয়ে যেতে চায়, যাতে মানসিনি বংশের নামটা কেউ ভুলতে না পারে। উত্তরাধিকারী না থাকুক, কাজের মাধ্যমেই দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকবে সে। এটাই তার এখনকার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান।

গত শতাব্দীটা অবশ্য মানসিনি পরিবারের জন্য বেশ ভালই গেছে। মার্সেলোর পিতামহ পিয়েত্রো মানসিনি দু-দু'টো মওকা পেয়েছিলেন অর্থ-বিত্ত বাড়াবার—কোনোটাই হাতছাড়া করেননি। শতাব্দীর শুরুতে শিল্প-বিপ্লবের সময় বেশ ক'টা কারখানা খোলেন তিনি, ওগুলো রমরমা ব্যবসা করেছে। পরে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সখ্য গড়ে তোলেন বেনিটো মুসোলিনির সঙ্গে; ইটালীয় সামরিক বাহিনীর জন্য যুদ্ধাস্ত্র আর অন্যান্য সরঞ্জাম তৈরি করে ফুলে-ফেঁপে বিরাট ধনকুবের বনে যান। ত্রিশ আর চল্লিশের দশকে *ফিয়াট*-এর সঙ্গে পাল্লা দেবার মত অবস্থায় ছিল মানসিনি কর্পোরেশন, সৈনিকদের মেসকিট থেকে শুরু করে সাবমেরিন পর্যন্ত তৈরি করেছে ওরা!

১৯৫৫ সালে মার্সেলোর পিতা ওদের ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যের হাল ধরেন। ষাট, সত্তর ও আশির দশকের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ বাজারেও ঠিকই কোম্পানিকে টিকিয়ে রাখেন। ৮৭-র অক্টোবরে আমেরিকান স্টক মার্কেট ক্র্যাশ করার ঠিক আগ-মুহূর্তে কোম্পানির দায়িত্ব নিয়েছে মার্সেলো। শুরুর কয়েকটা বছর রীতিমত যুদ্ধ করতে হলেও নিজের মেধা আর কূটবুদ্ধির জোরে আজও মানসিনি কর্পোরেশনকে ইটালির সবচেয়ে বড় ও সফল প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি হিসেবে টিকিয়ে রাখতে পেরেছে সে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে মানসিনি, অন্যমনস্ক। গ্র্যাণ্ড ক্যানালের বুকে বেশ কয়েকটা গনডোলা ঘুরে বেড়াচ্ছে, বেশিরভাগই খালি। ওগুলো টুরিস্টদের বাহন, এখনও তাদের ভ্রমণে বেরুনোর সময় হয়নি—সকাল সাতটা বাজে মাত্র। যাত্রী দেখা যাচ্ছে শুধু অল্প কিছু *ভ্যাপোরেত্তি*-তে; ওগুলো পুরনো আমলের দেশি নৌকা, পাবলিক ট্রান্সপোর্টের মত ব্যবহার করে ভেনিসের অধিবাসীরা—অফিসগামী লোকজন চড়েছে ওতে। গুটিকয়েক ওয়াটার-ট্যাক্সিও যাত্রী নিচ্ছে বটে, তবে ওগুলোতে উঠছে অপেক্ষাকৃত ধনী ব্যবসায়ীরা, সাধারণ লোক ওতে চড়তে পারে না। দূরে... আবছাভাবে চোখে পড়ে ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত *রিয়ালটো* ব্রিজ, বড় একটা ধনুকের মত খালের উপর রাজত্ব করছে।

ভেনিসের এপ্রিল মাস, মোহনীয় একটা সময়। রোদের তাপ আছে, তবে সেটা এত তীব্র নয় যে ঘেমে-নেয়ে যাবে লোকে; ঘোরাঘুরি করতে পারবে না। বর্ষা-বাদলবিহীন সহনীয় তাপের এই সময়টা টুরিস্টরা সবচেয়ে বেশি পছন্দ

করে। জল বেচাকেনার কারণে এ-সময়টাতে দোকানদারদের মুখে হাসি ফুটে থাকে; জুলাই নাগাদ হাসিটা ফিকে হয়ে ওঠে, আর আগস্টে পুরোপুরি মুছেই যায়। সারা বছরের মূল রোজগার তাই আগস্ট আসার আগেই করে নিতে হয় ব্যবসায়ীদের।

কোন বেজে উঠল।

রিসিভারটা কানে ঠেকাতেই ওপাশের কণ্ঠটা কোনও রকম কুশল বিনিময় বা ভূমিকা না করে বলল, 'দু'দিনের মধ্যে রওনা হচ্ছে ও, মি. মানসিনি।'

'ওর সফল হবার সম্ভাবনা কতটুকু?' জানতে চাইল মানসিনি।

'আমার ব্যক্তিগত মতামত চাইছেন?' বলল ওপাশের কণ্ঠটা। 'ওয়েল... লোকটা স্মার্ট, দক্ষ, অভিজ্ঞও বটে। তারপরও মনে হয় না পাইপটা ও খুঁজে বের করতে পারবে।'

'একথা কেন বলছ?' জিজ্ঞেস করল মানসিনি।

'সময়, মি. মানসিনি... ওটাই সবচেয়ে বড় বাধা। ব্যাগলি রানাকে মাত্র ছ'সপ্তাহের একটা উইণ্ডো দিয়েছে। সময়টা এত কম যে, প্রিপারেশনের দিকে নজর না দিয়ে ফিল্ডে যাবার জন্য উতলা হয়ে পড়েছে ও। এ-ধরনের অপ্রস্তুত লোকের পক্ষে খড়ের গাদায় সুঁই খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।'

বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করল মানসিনি। 'কিন্তু ইকুইপমেন্ট জোগাড়ের দিক থেকে তো অনেক এগিয়ে গেছে মাসুদ রানা!'

'তা ঠিক,' বলল টেলিফোনের লোকটা। 'তবে সেটা স্রেফ ভাল কানেকশনের জোরে। তা ছাড়া শুধু ইকুইপমেন্ট ভাড়া করলেই তো হবে না; ওগুলো লোকেশনে নিতে হবে, লজিস্টিকসের ব্যবস্থা করতে হবে, শ্রমিক জোগাড় করতে হবে... ঝক্কি কম নয়। সবকিছু ঠিকমত এগোলেও যথেষ্ট সময় নেই ওর হাতে। ম্যাপে ইরিত্রিয়াকে ছোট দেখাতে পারে, কিন্তু বাস্তবে ওটা অনেক বিশাল আর কঠিন একটা জায়গা—মাসুদ রানার মত নিঃসঙ্গ একজন মানুষ কোনও থই খুঁজে পাবে না।'

'তা হলে ওকে নিয়ে অযথা ভেবে লাভ নেই। কাজের কথায় এসো। মেডিউসা ফটোগ্রাফগুলোর কপি জোগাড় করতে বলেছিলাম, তার কদ্দূর? ছবিগুলো পেলে আমাদের সার্চটাও অনেকটা সংক্ষিপ্ত করে আনা যেত।'

'সরি, এখন পর্যন্ত কিছুই করতে পারিনি, মি. মানসিনি,' বলল ওপাশের লোকটা। 'ন্যাশনাল রিকনিস্যান্স অফিসের আর্কাইভে খোঁজ নিয়েছি... ওরা ওই একটা সেট-ই তৈরি করেছিল। ব্যাগলি যখের ধনের মত আগলে রেখেছে ওগুলোকে। চুরি করবার সুযোগ নেই; সুযোগ নেই কপি করবারও। কপি-প্রোটেক্টেড এক ধরনের কাগজে প্রিন্ট নেয়া হয়েছে ছবিগুলোর—ওগুলো থেকে ফটোকপি, বা স্ক্যান করা যায় না।'

'ছবিগুলো নিশ্চয়ই ব্যাগলি রানাকে দেবে?'

'তা তো দেবেই। তবে রওনা হবার আগে নয়।'

'ব্যাগলি দেখা যাচ্ছে খুবই সতর্ক লোক,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল মানসিনি।

'কিংবা প্যারানয়েড।'

'হুম, তা হলে আসমারায় ওগুলো রানার হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে,' আনমনে বলল মানসিনি। পরক্ষণেই সংবিৎ ফিরে পেল। এসব ওপাশের লোকটার জানবার দরকার নেই। তাই প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'দিনা আবানের খবর বলো। সে আসমারায় ফিরছে কবে?'

'ঠিক জানি না, রানার সঙ্গেই যেতে পারে। আমি ওর ট্রাভেল প্ল্যানটা জানতে পারলে আপনাকে কল করব।'

'ওকে সন্দেহ করছিলে তুমি, প্রমাণ-ট্রমাণ কিছু পেয়েছ?'

'না। তবে আমার মন বলছে, ভিতরে-ভিতরে আরও কোনও মতলব আঁটছে মেয়েটা।'

'ওই মনটার উপর গুরুত্ব দিয়ো না,' বিরক্ত গলায় বলল মানসিনি। 'মনের কথায় তো ব্যাগলির কাছেও বেচে দিয়েছ ছবিগুলো। আমি যা দিতাম, তার চার ভাগের এক ভাগ টাকাও দেয়নি তোমাকে লোকটা। কম ঠকোনি!'

টেলিফোনের অপরপ্রান্তে ন্যাশনাল রিকনিসান্স অফিসের মেজর জেফরি ভারগাসের কণ্ঠে তিক্ততা ফুটল। বলল, 'ঠিকই বলেছেন। এত অল্পে ছবিগুলো হাতছাড়া করা উচিত হয়নি।'

'থাকুক ওসব,' বলল মানসিনি। 'ওয়াশিংটন ছেড়ে শীঘ্রি চলে আসবে দিনা আবান। ওকে নিয়ে তখন আমিই মাথা ঘামাব। ব্যাপারটা নিয়ে তুমি আর মাথাটাকে গরম কোরো না, আসল কাজে মন দাও। হয়তো ব্যাগলির সঙ্গে শোয়া ছাড়া আর কিছুই করছে না সে।'

'সেটা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়,' বলল ভারগাস। 'ব্যাগলি একটা শুয়োর, আর মেয়েটা একটা জলজ্যান্ত হুরপরী।'

'হুরপরীরা স্বার্থোদ্ধারের জন্য কত কী করতে পারে, সেটা সম্ভবত জানা নেই তোমার,' মানসিনি হাসল। 'এনিওয়ে, এখন রাখি। নতুন কিছু পেলে জানিয়ো। হয়তো ছবি বেচায় যে-ভুল করেছ, সেটা পুষিয়ে নিতে পারবে।'

ফোন রেখে দিয়ে চিন্তায় ডুবে গেল ইটালিয়ান টাইকুন। এডওয়ার্ড ব্যাগলি তা হলে রানাকে ম্যানেজ করে ফেলল? খুব বড় কোনও সমস্যা নয় ওটা, বরং রানার উপস্থিতিটা সে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবে। মেডিউসা ফটোগ্রাফগুলো হাতে পাবার ইচ্ছে ছিল তার, ইচ্ছেকৃতভাবে না হলেও ব্যাগলি তাকে এই ক্ষেত্রে হারিয়ে দিয়েছে—ভারগাসের কাছ থেকে আগেই কিনে নিয়েছে ছবিগুলো। এখন রানা নিয়ে আসবে ওগুলো; আসমারায় ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে ছবিগুলো। ইরিত্রিয়ায় তার নিজের লোকজন খেটে মরছে, ফটোগুলো পেলে কাজ অনেক এগিয়ে যাবে। তাই ছবিগুলো হাতে পাওয়া অত্যন্ত জরুরি—রানা যদি বাধা দিতে চায়, ওকে মরতে হবে।

রিসিভার তুলে ইরিত্রিয়ার একটা নাম্বারে ডায়াল করল মানসিনি। ওপাশের রিঙের শব্দ শুনতে শুনতে মনে পড়ে গেল, কীভাবে পুরো ব্যাপারটার সূচনা হয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ইটালির উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল ইরিত্রিয়া। ১৯৩৫ সালে ইথিওপিয়ার বিরুদ্ধে চালানো হামলায় দেশটাকে স্ট্র্যাটেজিক

এরিয়া হিসেবে ব্যবহার করেছিল ইটালিয়ানরা। নির্দয়, একপেশে একটা লড়াই ছিল ওটা—ভারি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একটা বাহিনীর বিরুদ্ধে অশ্বারোহী যোদ্ধাদের পক্ষে কী-ই বা করা সম্ভব ছিল? তার ওপর ছিল অস্ত্র-আমদানির ব্যাপারে লিগ-অভ-নেশনস্-এর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা—যুদ্ধ থামাবার একটা হাস্যকর চেষ্টা। ইটালি ওটাকে মোটেই গুরুত্ব দেয়নি, দেয়ার প্রয়োজনও পড়েনি। মানসিনিদের মত অসংখ্য অস্ত্র-নির্মাতা ছিল তাদের হাতে; অপরদিকে ইথিওপিয়ানরা ওই নিষেধাজ্ঞার ফলে একেবারেই অসহায় হয়ে পড়েছিল। কাতারে কাতারে মারা পড়ে তারা, শেষে পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হয়।

ইরিত্রিয়ান উপনিবেশকে আধুনিক একটা রাষ্ট্রে পরিণত করবার স্বপ্ন ছিল মুসোলিনির। সেটা হয়নি বাস্তবে, উল্টো দেশটাকে উন্নত করবার নামে চুটিয়ে ব্যবসা করেছে সুযোগসন্ধানী ইটালিয়ানরা, দেশের সম্পদ চুরি করেছে, অর্জন করেছে অঢেল সম্পদ—এর বেশিরভাগ করেছে মানসিনি কর্পোরেশনই। ওখানকার প্রজেক্টগুলো এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, অ্যাঞ্জেলো মানসিনি... মার্সেলোর পিতামহের ছোট ভাই... রাজধানী আসমারার উপকণ্ঠে একটা ভিলা নিয়ে স্থায়ীভাবে বাস করতে লেগে যান, ইরিত্রিয়ায় কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজ্য দেখাশোনা করতেন তিনি।

বড় ভাইয়ের মত বুদ্ধিমান, কিংবা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন না হলেও ব্যবসাটা ভালই বুঝতেন অ্যাঞ্জেলো। চা ও ফলের বাগান, লবণ উৎপাদন, কাঠের ব্যবসা, ইটালীয় মালামালের আমদানি—এসব প্রতিটা প্রজেক্টকে লাভজনক রেখেছিলেন তিনি। তবে টাকা কামানোর পারিবারিক নেশার বাইরে আরেকটা নেশা ছিল তাঁর। অ্যাঞ্জেলো ছিলেন শৌখিন জিয়োলজিস্ট, নিত্যনতুন খনিজ সম্পদের খোঁজে ইরিত্রিয়ার আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াতেন তিনি। বড় ভাই পিয়েত্রোকে বুঝিয়েছিলেন, সুদান-সীমান্তবর্তী পাহাড়গুলোতে সোনার খনি আছে; সেগুলো খুঁজে বের করতে পারলে মানসিনিদের আয়ের একটা নতুন উৎস সৃষ্টি হতে পারে। প্রথমদিকে বেশ উৎসাহী হয়ে ওঠেন পিয়েত্রো কথাটা শুনে, সুযোগটা কাজে লাগান অ্যাঞ্জেলো। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে একটার পর একটা পাহাড় খুঁড়েছেন তিনি, সোনা আর পাননি। এসব কাজের রেকর্ড রাখায় খুব একটা মন দেননি অ্যাঞ্জেলো, ফলে একটা সময়ে এসে দেখা গেল—লাখ লাখ লিরার আর হিসেব পাওয়া যাচ্ছে না। বিরক্ত হয়ে টাকা দেয়া বন্ধ করে দেন পিয়েত্রো, অ্যাঞ্জেলো তখন বার বার বলার চেষ্টা করেছেন—সোনা পাননি বটে, কিন্তু বিশেষ একটা জায়গায় তিনি হীরার মজুত আছে বলে নিশ্চিত হয়েছেন। তবে সেসব কানে তোলেননি পিয়েত্রো, তাঁর ধারণা ছিল—ছোট ভাই আবার তাঁকে বোকা বানিয়ে ফালতু শখের পিছনে টাকা খরচ করাবার ফন্দি আঁটছে।

অ্যাঞ্জেলোর রিসার্চের কাগজপত্র পারিবারিক আর্কাইভে খুঁজে পায় মার্সেলো মানসিনি। ওগুলো পড়ে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, কিন্তু দুঃখের বিষয়—দলিলগুলোতে হীরার শ্যাফটটার লোকেশন সম্পর্কে কোনও আভাস দেয়া ছিল না। অ্যাঞ্জেলো সম্ভবত রেগে গিয়েই ও-সম্পর্কিত কোনও তথ্য লিখিতভাবে রাখেননি। কারণটাও একেবারে অবোধগম্য নয়।

১৯৪১ সালের শুরুতে প্রকাশ পেয়ে যায়, কোম্পানির তহবিল তসরুপ করে চলেছেন অ্যাঞ্জেলো। বড় ভাইয়ের কাছ থেকে টাকা না পাওয়ায় ব্যবসার টাকা এদিক-সেদিক করে নিজের তল্লাশি চালু রেখেছেন তিনি। হিসেব করে দেখা গেল, এর পিছনে খরচ করা টাকার পরিমাণ তাঁর পুরনো সবক'টা প্রজেক্টের চাইতে কয়েক গুণ বেশি; ইরিত্রিয়ায় মানসিনি কর্পোরেশনের পুরো আয়ের উপরই ভীষণভাবে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে এর ফলে। খেপে গিয়ে অ্যাঞ্জেলোকে ইটালিতে ফিরে আসবার জন্য নির্দেশ দেন পিয়েত্রো। শোনা যায়, ভাই যাতে টালবাহানা করতে না পারে, সেজন্যে ফাইটার এসকর্টসহ একটা প্রাইভেট বিমান পাঠান তিনি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে তখন, সেই সময়টাতে জেনারেল প্ল্যাটের নেতৃত্বে ব্রিটিশ বাহিনী ইরিত্রিয়ার দখল নিতে শুরু করেছে। অ্যাঞ্জেলো একটা কেইবল্ করে জানান, ভেনিসে ফিরতে তিনি নিজেও মুখিয়ে আছেন—যুদ্ধের কবল থেকে বাঁচার জন্য, সেই সঙ্গে বড় ভাইয়ের সঙ্গেও নাকি সামনাসামনি কথা বলা দরকার তাঁর।

কেইবলের ওই কপিটা অসংখ্যবার পড়েছে মার্সেলো মানসিনি—বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে। কারণ ওটাই ছিল অ্যাঞ্জেলো মানসিনির কাছ থেকে পাওয়া তাদের পরিবারের শেষ বার্তা। তাকে নিয়ে ফিরতে থাকা বিমানটাকে ভূমধ্যসাগরের উপর আক্রমণ করে ব্রিটিশ হারিকেন ফাইটারের একটা গ্রুপ, গুলি করে ডুবিয়ে দেয় সাগরে। ওটার সঙ্গে তলিয়ে যায় ইরিত্রিয়ায় হীরার মজুত সংক্রান্ত সমস্ত গোপন তথ্য।

এসব জানার পর সেই অল্প বয়সেই মার্সেলো প্রতিজ্ঞা করেছিল, কোনও একদিন যাবে সে ইরিত্রিয়ায়, অ্যাঞ্জেলোর সেই হীরার খনি খুঁজে বের করবে। এই স্বপ্ন বহুদিন ধরে মনের গভীরে পুষে রেখেছে সে, কিন্তু বাস্তবে পরিণত করতে পারেনি। যখন ওই খনি খোঁজার মত বয়স তার হলো, তখনই হাল ধরতে হয়েছে পারিবারিক সাম্রাজ্যের, কিছুতেই সময় বের করতে পারেনি। তা ছাড়া একের পর এক যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকা দেশটাতে খনিজ-অনুসন্ধানের খুব একটা সুযোগও ছিল না। কিন্তু এখন... এত বছর পর সবকিছু অনুকূলে এসেছে। ইরিত্রিয়া স্বাধীনতা পেয়েছে—পরিস্থিতি অনেকটাই শান্ত; শেষ কন্যাটির বিয়ে দেবার মাধ্যমে পারিবারিক বাধ্যবাধকতাও শেষ হতে চলেছে তার। মরার আগে স্বপ্নটা পূরণ করে যেতে চায় সে—এতে ক্ষমতা আর প্রাচুর্যের নতুন একটা সোপানে পৌঁছুবে মানসিনি সাম্রাজ্য। সে থাকবে না, তার নামটা অক্ষয় হয়ে থাকবে। আর কী চাইবার থাকতে পারে একজন মানুষের?

কত টাকা এই বিশেষ কাজটির পিছনে খরচ হবে, সেটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না মার্সেলো মানসিনি। এক বিলিয়ন? দশ বিলিয়ন? টাকা বড় কথা নয়, যে-ঐশ্বর্য পাওয়া যাবে—সেটার মূল্য শুধু টাকা দিয়ে মাপা যাবে না। খরচ তো উঠে আসবেই, সেই সঙ্গে আসবে অবিশ্বাস্য একটা ক্ষমতা—দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী ও অভিজাত ব্যবসায়ী সমাজ... হীরক-ব্যবসায়ীদের উপর ছড়ি ঘোরানোর ক্ষমতা!

সময়টা অত্যন্ত মূল্যবান। দু'মাস পর লণ্ডনের ডায়মণ্ড-সিণ্ডিকেট তাদের

বাৎসরিক মিটিঙে বসতে যাচ্ছে—তখনই বেড়াল মারতে হবে তাকে। এজন্যে সিন্ডিকেটের সামনে দেখাবার মত যথেষ্ট পরিমাণ হীরা চাই তার—অন্তত কয়েক হাজার ক্যারাট। সিন্ডিকেটকে জিম্মি করবে সে, দুনিয়ার ইতিহাসে সবচেয়ে সফল ব্যবসায়ীতে পরিণত হবে।

সেজন্যে হীরার ভাণ্ডারটা চাই তার—চাই সে-অতুল ঐশ্বর্য। ছলে, বলে, কৌশলে... যেভাবেই হোক না কেন! ব্যর্থতার কোনও আশঙ্কাই করছে না মানসিনি, কারণ সে বুঝতে পেরেছে—অ্যাঞ্জেলোর স্বপ্নের খনি, আর মেডিউসা স্যাটেলাইটের ছবিতে দেখা যাওয়া কিম্বারলাইট পাইপ... দুটো একই জিনিস। আছে ওটা ইরিত্রিয়ায়। আর ওটার দখল পেতে কোনও কিছুতেই পিছপা হবে না সে।

•

বারো

ডেব্রে আমলাক মঠ। উত্তর ইরিত্রিয়া।

আলোকস্বল্পতার কারণে সূর্য ডোবার পর পরই নীরব হয়ে যায় মঠ, সন্ন্যাসীরা ঘুমিয়ে পড়েন; শুধুমাত্র মাঝরাতের সম্মিলিত প্রার্থনা থাকলে জেগে ওঠেন তাঁরা—সেটা সবসময় হয় না। আলোর তেমন কোনও ব্যবস্থা নেই ওখানে—একশো মাইলের ভিতর শুধুমাত্র *নাক্ফা* শহরে রয়েছে পাওয়ার-প্ল্যান্ট, এতদূরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব নয় ওদের পক্ষে। সন্ধ্যার পর তাই মোমবাতি আর তেলের প্রদীপই ভরসা—দুটোই দুষ্প্রাপ্য এই সভ্যতা-বিবর্জিত এলাকায়। ফলে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের মাঝখানে আটকে আছে সন্ন্যাসীদের জীবন। কদাচিৎ দু-একজনকে রাত জাগতে দেখা যায়।

ব্রাদার অব্রাহাম সেই সংখ্যালঘুদের একজন। ডেভিডের সেই আবেগময়ী বক্তৃতার পরদিন আরেক বয়োবৃদ্ধ সন্ন্যাসী গোপনে আলাপ করেছেন তাঁর সঙ্গে। স্বীকার করেছেন, সত্যিই এক অতি-গোপনীয় রহস্য রয়েছে তাঁদের মঠে; বিবেকের দংশনে তাড়িত হয়ে অব্রাহামের কাছে এসেছিলেন তিনি—মঠ-প্রধানের সবকিছু জানা প্রয়োজন বলে মনে হয়েছিল তাঁর কাছে। রহস্যটা অবশ্য খুলে বলেননি বয়োবৃদ্ধ সন্ন্যাসী, শুধু জানিয়ে গেছেন ওটার অস্তিত্বের কথা। সেটা শুনে নিজের সিদ্ধান্তে আরও অটল হয়েছেন অব্রাহাম—বুঝতে পেরেছেন, রহস্যটা জানতে হলে কী করতে হবে তাঁকে।

সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেলেও দ্বিধায় ভুগছেন মঠ-প্রধান। প্রতিজ্ঞাভঙ্গের মত একটা মহা-অন্যায় করবার সাহস খুঁজে পাচ্ছেন না। সেদিনের পর থেকে রাতে আর ঘুমোচ্ছেন না তিনি, ছোট্ট একটা মোমবাতি জ্বেলে প্রতি রাতে প্রার্থনায় মগ্ন থাকছেন। বেশভূষা ইতোমধ্যে অবিন্যস্ত হয়ে পড়েছে তাঁর, ঠিকমত স্নান না করায় শরীরে ময়লার আস্তর পড়ে গেছে... তারপরও ওসব নিয়ে ভাবছেন না: ঈশ্বরের কাছে করুণা চাইছেন, ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য অন্যায় করবার শক্তি চাইছেন।

এসবের মূলে যে-জিনিসটা, সেটা এ-মুহূর্তে তাঁর ডেস্কের উপর পড়ে আছে। জানালা দিয়ে আসা চাঁদের ম্লান আলোয় দেখা যাচ্ছে প্রাচীন একটি বই—চামড়ায় মোড়া, সামনের আর পিছনের মলাটটা একটা ঘষা-খাওয়া পিতলের ক্লিপ দিয়ে আটকানো। বয়স হতে হতে পাতাগুলো ফুলে গেছে, হয়ে গেছে এবড়ো-খেবড়ো। আটশো বছর ধরে পরম যত্নে সংরক্ষণের পরও বইটাকে দেখে এখন অতি ব্যবহারে জীর্ণ বলে মনে হয়।

প্রার্থনা থেকে উঠে এসে ডেস্কে বসলেন আব্রাহাম, মোমবাতি রাখলেন বইয়ের মাথার কাছে, তারপর করুণ দৃষ্টিতে তাকালেন ওটার দিকে। নির্বাসনে থাকার সময় প্রাক্তন মঠ-প্রধান মৃত্যুশয্যায় তাঁকে দিয়ে গেছেন বইটা। জিনিসটা হাতে নেবার আগে শপথ করতে হয়েছে তাঁকে—জীবন দিয়ে বইটা আগলে রাখবেন, নিজের সময় শেষ হলে পরবর্তী প্রধানের হাতে তুলে দেবেন ওটা। সবচেয়ে বড় প্রতিজ্ঞা হলো, কোনও অবস্থাতে... কোনও পরিস্থিতিতেই তিনি বইটা খুলবেন না, কোনোদিন পড়বার চেষ্টা করবেন না ওর ভিতর যা লেখা আছে। আজ পর্যন্ত অঙ্গীকারটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন তিনি। সে-কারণেই বুঝতে পারছেন, এই মঠে যে-রহস্য লুকিয়ে আছে, সেটার উৎস, বা জ্ঞান এই প্রাচীন গ্রন্থটির ভিতরেই চাপা পড়ে আছে। রহস্যটা জানতে হলে প্রতিজ্ঞা ভাঙতে হবে, পড়তে হবে বইটা।

মলাটের ওপর লেখা নামটা পড়লেন ব্রাদার আব্রাহাম। ইথিওপিয়ার প্রাচীনতম ভাষাগুলোর একটি... *গিজ*-এ লেখা হয়েছে ওটা। অনেকটা আরবি হরফের আদলে লেখা নামটা পড়তে পারলেন সহজে, ওটার সরল অনুবাদ করলে দাঁড়ায়: ***সম্রাটদের লজ্জা।***

হাত কাঁপতে শুরু করল তাঁর, গলা শুকিয়ে এল। মনে হলো, স্বর্গের বাগানে দাঁড়ানো আদম তিনি; নিষিদ্ধ গন্দম ফল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কীভাবে যেন আব্রাহাম জেনে গেলেন, তাঁর সামনে রাখা বইটাতে ভয়াবহ এক পাপ লুকিয়ে আছে; যা গন্দম খাওয়ার চেয়ে কোনও অংশেই কম নয়। প্রাক্তন মঠ-প্রধানও তেমনই একটা ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। বইটা দেয়ার সময় বিছানায় শোয়া ছিলেন তিনি, শরীর কঙ্কালসার হয়ে গিয়েছিল রোগ-শোকে, হাঁপাচ্ছিলেন সারাক্ষণ; তারপরও কথা বলে গেছেন, জানিয়েছেন বইটার রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত নিয়মকানুন। ভিতরে ভিতরে প্রচণ্ড কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন আব্রাহাম, তখনই জানার ইচ্ছে হয়েছিল বইয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে। নীরবে তাই প্রশ্নবোধক একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন শেষশয্যায় শায়িত মঠ-প্রধানের দিকে।

'হ্যাঁ,' বড় বড় শ্বাস টানতে টানতে জবাব দিয়েছিলেন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী, 'ওটা পড়েছি আমি, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। সৃষ্টিকর্তা সেজন্যে শাস্তি দিয়েছেন আমাকে... আমাদের সবাইকে। প্রথমে ভেবেছিলাম, ঈশ্বরেরই ইচ্ছে ওটা—বইটা আমি পড়ি, ভিতরের গোমরটাকে এত বছর পর দুনিয়ার সামনে প্রকাশ করি। কিন্তু পড়া শেষ করার পর... ১৯৬২ সালের ১৩ই নভেম্বর রাত সেটা... বুঝতে পারি, আসলে শয়তান আমাকে প্ররোচিত করেছিল বইটা পড়বার জন্য।'

কথাটার অর্থ বুঝতে না পেরে বিস্মিত দৃষ্টিতে মঠ-প্রধানের দিকে

তাকিয়েছিলেন আব্রাহাম।

'তারিখটা চিনতে পারছ না?' বলেছিলেন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী। 'যে-রাতে আমি বইটা পড়া শেষ করলাম, তার পরদিনই ইরিত্রিয়াকে দখল করে নেয় ইথিওপিয়া। আমাদের প্রাণপ্রিয় দেশের অন্তিম দশার সূচনা ছিল ওটা, আব্রাহাম। ইথিওপিয়ার আগ্রাসন: হত্যা-ধর্ষণ-নির্যাতন; *দার্গ* পার্টির শোষণ-নিপীড়ন... কী না ঘটেছে আমাদের দেশে! যুদ্ধ, হানাহানি, মৃত্যু... সবকিছুর জন্য আমিই দায়ী, আব্রাহাম। আমার স্বেচ্ছাচারিতাই ঈশ্বরের ক্রোধ ডেকে এনেছে। বইটা পড়ার জন্য তিনি শাস্তি দিয়েছেন আমাকে—আমাদের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে দিয়েছেন, মাতৃভূমিকে নরকে পরিণত করেছেন, জীবন কেড়ে নিয়েছেন শত-সহস্র মানুষের! শুধু আমি নিজের কৌতূহল দমন করতে পারিনি বলে! শুধু আমি আমাদের শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর এই অশুভ সহচরকে সামলে রাখতে পারিনি বলে!!'

ইথিওপিয়ান সন্ন্যাসীদের ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি, দুটো প্রাচীন বইয়ের কথা বলছিলেন তিনি। একটি হচ্ছে *কেব্‌রা নাগাস্ট*, মানে সম্রাটদের বিজয়; অন্যটি *ফেতাহ্‌ নাগাস্ট*, মানে সম্রাটদের ন্যায়বিচার। পশ্চিমা বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষই জানে না, এই বইদুটো প্রাচীন সমস্ত খ্রিস্টান ধর্মীয় গ্রন্থের চেয়ে কয়েকশো বছরের পুরনো। ইজিপশিয়ান কপ্ট চার্চের কাছ থেকে এসেছে বইদুটো। ওতে ইজরায়েলে দক্ষিণের রানী *মাকেদা*-র ভ্রমণের বিবরণ রয়েছে; সেই সঙ্গে রয়েছে মাকেদার পুত্র *মেনেলিক*-এর জীবনবৃত্তান্ত। এই সন্তান ছিল ইজরায়েলের রাজার সঙ্গে দক্ষিণের রানীর মিলনের ফসল। বইদুটোতে বলা হয়েছে, মেনেলিক কীভাবে ইজরায়েল থেকে আবিসিনিয়া পর্যন্ত ঈশ্বরের আইনকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; কীভাবে তিনি তৎকালীন *আকসুম*, মানে বর্তমান উত্তর ইথিওপিয়ায় নিজের রাজধানী স্থানান্তর করেছিলেন। আজ পর্যন্ত এই বইদুটোই হলো একমাত্র ও অকাট্য প্রমাণ—সম্রাট হাইলে সেলাসি এবং তাঁর বংশ ছিল প্রাচীন পয়গম্বরদের সরাসরি বংশধর।

ধর্মগতভাবে ব্রাদার আব্রাহাম একজন খ্রিস্টান—যিশুর শিক্ষা ও আদর্শের অনুসারী। তবে তাঁর ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি রয়েছে অনেক গভীরে—প্রাচীন ইহুদি ধর্মের মাঝে, যারা সৃষ্টিকর্তার এক ও অদ্বিতীয় সত্তায় বিশ্বাস করত, পৃথিবীর ইতিহাসে ওদের মাঝেই প্রথম এ-ধরনের ধর্মবিশ্বাসের উৎপত্তি হয়েছিল। পরবর্তী যুগের ইহুদি-গ্রন্থগুলো সম্পর্কে জানা না থাকলেও পুরনোগুলোর বিষয়ে ভালই জ্ঞান আছে ব্রাদার আব্রাহামের। তাই ওল্ড টেস্টামেন্টের পাশাপাশি কেব্‌রা নাগাস্ট আর ফেতাহ্‌ নাগাস্টকেও ধর্মের শিকড় বলে মেনে নিয়েছেন।

আবিষ্কৃত হবার পর বহু বছর কেব্‌রা নাগাস্ট ছিল বিতর্কের বস্তু—ওটার বিষয়বস্তু নিয়ে সন্দিহান ছিলেন ধর্মীয় পণ্ডিতেরা। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে আফ্রিকা থেকে ফিরে আসা খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকেরা শোনালেন অদ্ভুত এক গল্প—ওখানে নাকি কালো চামড়ার একদল ইহুদি আছে, যারা ধর্মটার অত্যন্ত প্রাচীন এবং... কারও কারও মতে শুদ্ধতর... ধারা অনুসরণ করে। *ফালাশা*, মানে বহিরাগত বলে আখ্যা দেয়া হয় ওদের; প্রশ্ন ওঠে, এরা সত্যিই ইহুদি কি না। তবে ইজরায়েলিদের কাছ থেকে তারা পরোক্ষভাবে স্বীকৃতিটুকু পেয়ে যায় ১৯৮৪-তে। *অপারেশন মোজেস* নামে মোসাদের একটি গোপন অভিযানের

মাধ্যমে শত-শত ফালাশা-কে ইজরায়েলে নিয়ে যাওয়া হয়, যাতে তারা ইথিওপিয়ান অত্যাচার ও নিগ্রহে মারা না পড়ে। ওদেরকে ইহুদি বলে মনে না করলে ইজরায়েল কখনোই এ-কাজ করত না।

তবে এতকিছুর মাঝে তৃতীয় একটি ধর্মগ্রন্থের অস্তিত্বের কথা কেন ফাঁস হলো না; কিংবা কীভাবেই বা ওটা খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের হাতে এসে পড়ল—তা জানা নেই ব্রাদার আব্রাহামের। ইথিওপিয়ার নির্বাসনের সেই রাতে বইটা প্রথম দেখেন তিনি, তখন থেকে আজ পর্যন্ত কখনও ওটাকে ভুয়া বলে মনে হয়নি তাঁর কাছে। মৃত্যুপথযাত্রী প্রাক্তন মঠ-প্রধান তাঁর হাত ধরে মিনতি করেছিলেন, 'কথা দাও তুমি, আব্রাহাম, কোনোদিন তুমি এ-বই পড়বে না। এর পাতায় যা আছে, তা মানুষের জন্য নয়। ওটা পড়ে আমি আমার বিশ্বাস হারাতে বসেছিলাম। কিছুতেই মানতে পারিনি, আমাদের ঈশ্বর এমন নির্দয়... নৃশংস ঘটনা ঘটতে দিয়েছেন পৃথিবীর বুকে। আর তাঁকেই কিনা পুজো করছি আমরা!'

পরম মমতায় বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর হাত চেপে ধরেছিলেন আব্রাহাম। বলেছিলেন, 'আমি প্রতিজ্ঞা করছি, ব্রাদার... আপনাকে স্পর্শ করে, ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে... এ-বই আমি কোনোদিন উল্টে দেখব না।'

ডেস্কে বসে সেই স্মৃতি মনে পড়ে গেল আব্রাহামের। কিছুতেই ঠেকাতে পারলেন না শরীরের কাঁপুনি। বিড়বিড় করতে থাকলেন আপন মনে। ঈশ্বর কি তাঁর পরীক্ষা নিচ্ছেন? শয়তানের কাছে প্রমাণ করে দিতে চাইছেন যে, ঈশ্বরের প্রতি মানুষের আনুগত্য টলবার নয়? এত শক্তি কি তাঁর আছে? কী চাইছেন আসলে ঈশ্বর? বইয়ের পাতায় লুকানো সত্যকে আড়াল করে রাখতে, নাকি সেটা পৃথিবীর মানুষের সামনে প্রকাশ করে দিতে?

রাত গভীর হতে থাকল। কেঁপে কেঁপে উঠল আগুনের শিখা, নিভে গেল মোমবাতি। চাঁদের আলোয় চিরচেনা ঘরটাকে অন্যরকম লাগল ব্রাদার আব্রাহামের কাছে। ছায়ায় লুকানো আসবাবপত্র আর অন্যান্য জিনিস যেন ফিসফিসিয়ে কিছু বলতে চাইছে তাঁকে। হঠাৎ মাথা ঘোরাতেই দেখতে পেলেন পবিত্র ক্রুশটা—তাঁর বিছানার মাথার কাছে দেয়ালে ঝোলানো আছে ওটা, চন্দ্রালোকে জ্বলজ্বল করছে।

আচমকা নিজের জিজ্ঞাসার জবাব পেয়ে গেলেন আব্রাহাম। মহান যিশু বলে গেছেন—*পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়।* মুক্তির পথ খোলা রেখেছেন তিনি। এখন যদি প্রতিজ্ঞাভঙ্গের মত অন্যায়টুকু করেন আব্রাহাম, তাতে ক্ষতি নেই; ক্ষমা চাইতে পারবেন; পারবেন আবার ঈশ্বরের কৃপা চাইতে।

বুকটা হালকা হয়ে গেল মঠ-প্রধানের। নতুন একটা মোমবাতি জ্বাললেন, তারপর খুলে ফেললেন বইয়ের ক্লিপটা। ঠিক সেই মুহূর্তে মঠের দূরপ্রান্তের একটি কক্ষে চিৎকার করে উঠলেন ব্রাদার ডেভিড—প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল তাঁর। তবে ব্যাপারটা নিয়ে ভাববার কিছু রইল না আব্রাহামের। পরদিন সকাল নাগাদ বইটা পড়া শেষে তিনি এমন কিছু জানলেন, যার সামনে একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর মৃত্যু খুব বড় কোনও শোকের বিষয় নয়।

তেরো

আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে বিমান, গন্তব্য রোম। ফার্স্ট ক্লাসের দুটো সিট রানার দখলে—একটায় বসেছে, অন্যটায় ছড়িয়ে রেখেছে কাগজপত্র। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখদুটো লালচে। গতকালও অনেক রাত পর্যন্ত জেগেছে ও, আসমারার পথে রোমগামী এই কানেক্টিং ফ্লাইটটা ছেড়েছে খুব ভোরে, তাই ঘুমানোর সময় পায়নি। এক্সপিডিশনের সমস্ত খুঁটিনাটি রিভিউ করতে হচ্ছে ওকে, মেলাতে হচ্ছে শেষ মুহূর্তে এডওয়ার্ড ব্যাগলির কাছ থেকে পাওয়া মেডিউসার তোলা ফটোগ্রাফগুলোর সঙ্গে। দুটো সিটের টিকেট কেনার পিছনে ওটাই কারণ, ফ্লাইটের সময়টা কাজ চালিয়ে যাবে ভেবেছিল। কিন্তু শরীর এখন ভেঙে পড়তে চাইছে ক্লান্তির মুখে। কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে কয়েকবারই ঘুমিয়ে পড়েছে ও, দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছে বার বার।

রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল রানা, মাথা ধরেছে খুব। কী যেন একটা খুঁতখুঁত করছে মনের ভিতর—ঘুমের মধ্যে আবছা ভাবে মাথাচাড়া দিয়েছে চিন্তাটা, কিন্তু জেগে ওঠার পর আর মনে করতে পারেনি। কিছুক্ষণ মাথা খাটাল, বোঝার চেষ্টা করল—ব্যাগলি, দিনা, কিংবা কিডন্যাপারদের কথাবার্তায় কি কোথাও কোনও অসঙ্গতি ছিল? কিন্তু বোঝা গেল না।

মাথা ঝাড়া দিয়ে ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টকে ডাকল ও, দু'কাপ ব্ল্যাক কফির অর্ডার দিল—মাথাব্যথা দূর করতে কফির জুড়ি নেই। তারপর গিয়ে ঢুকল রেস্টরুমে। হাতমুখ ধুয়ে ফিরে আসতেই দেখল, কফি এসে পড়েছে। ওগুলোর পাশাপাশি উদয় হয়েছে দিনা আবান—ওর সিটটাই দখল করে দিব্যি বসে আছে, মুখে বরাবরের মত রহস্যময় হাসি।

'আশা করি কিছু মনে করছেন না?' কটাক্ষ করে বলল মেয়েটা। 'আপনার মত এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট নেই আমার। পিছনের ইকোনমি ক্লাসে চাপাচাপি করে বসতে হয়েছে... খুবই অস্বস্তিকর। মি. ব্যাগলির কাছে শুনলাম, আপনার কাছে একটা বাড়তি সিট আছে।'

'আপনিও যে এই প্লেনে যাবেন, তা আগে বলেননি তো?' ভুরু কোঁচকাল রানা। কাগজপত্র ব্রিফকেসে ভরে পাশের সিটটা খালি করল। বসতে বসতে বলল, 'আমার এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট থেকে আরেকটা টিকেট কাটতে কোনও অসুবিধে ছিল না। আফটার অল, টাকাগুলো তো আপনাদেরই।'

মুচকি হাসল দিনা। 'একটা ফ্যান্টাসি বলতে পারেন—টিকেট ছাড়া চুপি চুপি ফার্স্ট ক্লাসে ট্র্যাভেল করবার শখ আমার অনেকদিনের।'

'আর আমি ভেবেছিলাম, ডিপ্লোম্যাটরা সবসময় ভাল সুযোগ-সুবিধা পায়!'

কথাটা মনে হলো দিনার অন্তরে বিঁধেছে। মন খারাপ করা গলায় বলল, 'ওটা ধনী দেশগুলোর ডিপ্লোম্যাটদের বেলায় খাটে। আমার সরকার যে আমাকে

বিদেশে পাঠাচ্ছে, সেটাই ঢের। মাঝে মাঝে তো গাঁটের পয়সা খরচ করে যাতায়াতের ভাড়া দিতে হয়।'

কৌতূহল অনুভব করল রানা—মেয়েটা এখন কার হয়ে কাজ করছে? মাতৃভূমি ইরিত্রিয়া, নাকি দ্বিতীয় আবাস ইজরায়েলের হয়ে? পুরো ব্যাপারটাতে এডওয়ার্ড ব্যাগলির ভূমিকা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই—রাজনৈতিক ক্যারিয়ার বাঁচাবার পাশাপাশি নগদ প্রাপ্তিযোগের প্রত্যাশাও নিশ্চয়ই করছে লোকটা। কিন্তু দিনা আবানের স্বার্থ কী? সত্যিই কি ইরিত্রিয়ার জনগণের মঙ্গল নিয়ে ভাবছে ও? নাকি ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্স, অথবা মোসাদের হয়ে গভীর কোনও পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নেমেছে?

আনমনে মাথা নাড়ল রানা। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা বাকি আছে ল্যাণ্ড করবার আগে; এই সময়টাতে চেষ্টা করে দেখতে হবে, দিনার মুখ থেকে কৌশলে কিছু বের করা যায় কি না।

পাশে তাকিয়ে মুখে হাসি ফোটাল ও। বলল, 'ডোন্ট ওয়ারি, মেয়েদের গোপন ফ্যান্টাসি পূরণে আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে... একটা ফ্যান্টাসি আমারও আছে। এখানে বসার বিনিময়ে ওটা পূরণ করে দিতে হবে আপনার। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবেন, প্লেনেই পরিচয় হয়েছে আমাদের; পরস্পরের প্রেমে পড়ে গেছি। তাই ল্যাণ্ড করার পর রোমান্টিক একটা সময় কাটাব বলে ঠিক করেছি আমরা। দেখার মত একটা চেহারা হবে সবার!'

'রাজি আমি,' হাসল দিনাও, 'যদি আমাকে *আপনি* করে ডাকা বন্ধ করেন; নাম ধরে ডাকেন।'

'নো প্রবলেম। তোমাকেও একই কাজ করতে হবে।'

'ডিল,' হাত বাড়িয়ে দিল দিনা।

'নাইস টু সি ইউ এগেইন,' করমর্দন করল রানা। 'শেষবার যখন মুখোমুখি হয়েছিলাম, তখন খুব কড়া কিছু কথা বলে ফেলেছি। তুমি কিছু মনে করোনি তো?'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল দিনা। 'অসম্ভব একটা প্রস্তাবই দিয়েছি আমরা, ওটা ফিরিয়ে দেয়ায় দোষ দিতে পারছি না তোমাকে। আমি বরং অবাক হয়েছি তুমি মত পাল্টানোয়।' রানার চোখে চোখ রাখল ও, যেন কিছুর জবাব খুঁজছে ওখানে। 'আচ্ছা, তুমি শেষ পর্যন্ত রাজি হলে কেন?'

জবাব না দিয়ে রানা পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ল, 'তোমরাই বা কাজটার জন্য আমাকে পছন্দ করলে কেন?'

'খুব সহজ,' সিটে হেলান দিল দিনা। 'তোমার রেপিউটেশনের জন্য। আজ পর্যন্ত তুমি কোনও এক্সপিডিশনে ব্যর্থ হওনি বলে শুনেছি। এমন কথাও বলেছে অনেকে: অসম্ভব কাজ একমাত্র মাসুদ রানাই সম্ভব করতে পারে।'

'তুমি ওভাবে কথা বলতে শুরু করলে আমার ইগো রাখবার জন্য আরও একটা সিট নিতে হবে,' রানা ঠাট্টা করল।

'তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি,' বলল দিনা। 'মত পাল্টালে কেন?'

পাকা অভিনেতার মত আচরণ করল রানা। দিনার দিকে তাকিয়ে সিরিয়াস

গলায় বলল, 'অনেকটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় বলতে পারো। তোমাদের সঙ্গে কথা হবার পর বইপত্র ঘেঁটেছি... যদিও কিম্বারলাইট পাইপ থাকবার কোনও সম্ভাবনা দেখতে পাইনি, তারপরও মন বলল ব্যাপারটা মিথ্যে না-ও হতে পারে। অনুভূতিটা বোঝানো মুশকিল... তবে এ-ধরনের অনুভূতি সাধারণত মিথ্যে হয় না আমার ক্ষেত্রে। তা ছাড়া কঠিন একটা চ্যালেঞ্জ হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। ঠাণ্ডা মাথায় পুরো ব্যাপারটা ভাবার পর আর প্রস্তাবটা ফেলতে পারলাম না।'

'তার মানে এখন তুমি বিশ্বাস করছ, কিম্বারলাইট পাইপটা আছে?' জিজ্ঞেস করল দিনা।

'তা বলছি না,' মাথা নাড়ল রানা, মিথ্যে আশ্বাস দিতে চায় না। 'তবে ওটার খোঁজে ছ'সপ্তাহ ইরিত্রিয়ায় ঘুরে বেড়াতে আপত্তি নেই আমার।'

'ওসব বলে নিজেকে প্রবোধ দিচ্ছ তুমি, রানা। আমাকে না। সত্যি করে বলো, কী মনে হচ্ছে তোমার?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ঠিক আছে, যাও, স্বীকার করছি—হীরা থাকাটা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে না আমার কাছে। তবে সম্ভাবনাটা খুবই ক্ষীণ। খুশি?'

হেসে মাথা ঝাঁকাল দিনা।

'যাক গে,' বলল রানা। 'তোমার সম্পর্কে বলো। বন্ধুত্ব গাঢ় হবার জন্য একে-অন্যকে ভাল করে চেনা দরকার।'

জবাব দেবার আগে চা আনাল দিনা, রানাও নিজের কফিতে চুমুক দিতে দিতে শুনতে থাকল ওর কথা।

'আমার মা ইরিত্রিয়ান। স্নায়ুযুদ্ধের সময় আসমারার উপকণ্ঠে ক্যাগনিউতে মার্কিনিদের একটা মিলিটারি বেস ছিল—ওখানকার এক সৈনিকের প্রেমে পড়ে যান তিনি। ব্যাপারটা জানতে পেরে মা'কে ঘরে বন্দি করে রাখেন আমার দাদু, যাতে ওই আমেরিকানের সঙ্গে আর দেখা-সাক্ষাৎ করতে না পারেন তিনি। তবে ততদিনে দেরি হয়ে গেছে, আমি এসে গেছি মায়ের পেটে। মান-ইজ্জত বাঁচানোর জন্য ইটালিতে মা'কে পাঠিয়ে দেন দাদা, ওখানে আমাদের কিছু আত্মীয়-স্বজন ছিল; আমার জন্মও হয় ওখানেই। পরে অবশ্য মা'কে ক্ষমা করে দেন দাদু, আমরা ফিরে আসি ইরিত্রিয়ায়। বাবার খোঁজ আর পাওয়া যায়নি, আমেরিকায় ফিরে এসেছিলেন তিনি, চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন। এখনও বেঁচে আছেন কি মরে গেছেন—কিচ্ছু জানি না।'

চায়ে চুমুক দেয়ার জন্য একটু থামল দিনা। রানার মনে হলো, এই প্রথমবারের মত সত্যি কথা বলছে মেয়েটা।

'শুরুতে ইটালিতে লেখাপড়া করেছি আমি,' খেই ধরল দিনা। 'পরে দু'বছর ছিলাম লণ্ডনে—ইকনমিক্স পড়ার জন্য। লেখাপড়া শেষ হতেই জড়িয়ে গেছি রাজনীতির সঙ্গে। ইয়োরোপে ইরিত্রিয়ান সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ শুরু করেছিলাম, মানবাধিকার-সংস্থাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতাম। পরে ফরেন ডিপার্টমেন্টে যোগ দিয়েছি। অবশ্য এসবের পিছনে দাদুর ভূমিকা ছিল প্রচুর—ইরিত্রিয়ান পিপলস্ লিবারেশন ফ্রন্টের উঁচু সারির নেতা ছিলেন তিনি।'

'তারপরও...' বলল রানা, 'আফ্রিকার একটি মেয়ের জন্য সরকারের উঁচু পদে

পৌঁছুনো সহজ হবার কথা নয়। ওখানকার পরিস্থিতি জানি আমি, মেয়েদের ভীষণভাবে অবমূল্যায়ন করা হয়। তোমাকেও নিশ্চয়ই অনেক কষ্ট করতে হয়েছে?'

'শুধু কষ্ট বললে ভুল বলা হয়,' স্বীকার করল দিনা। 'আফ্রিকার বেশিরভাগ দেশেই পুরুষাঙ্গ হচ্ছে নেতৃত্বের জন্য প্রধান যোগ্যতা। সঙ্গে মগজ আছে কি নেই, সেটা নিয়ে মাথা ঘামায় না কেউ। আমাদের মহাদেশে সেজন্যেই একনায়কদের দৌরাত্ম্য বেশি।'

'কেউ সেটা প্রকাশ্যে বলছে না কেন?'

'পশ্চিমা বিশ্বকে সবকিছুর জন্য দোষারোপ করতে পছন্দ করি আমরা,' তিক্ত কণ্ঠে বলল দিনা। 'নিজেদের দোষটা দেখি না।'

'কথাটা বোধহয় তৃতীয় বিশ্বের সব দেশের জন্যই প্রযোজ্য,' মন্তব্য করল রানা। 'আত্ম-সমালোচনার অভ্যেস নেই কারও।'

'আফ্রিকার জন্য সবচেয়ে বেশি, রানা,' বলল দিনা। 'কেউ দেশের মঙ্গল নিয়ে ভাবে না। একে-অন্যকে খুন করবার নেশায় মেতে আছে। ঠেকাবার উপায় নেই।'

কয়েক মুহূর্ত নীরবতায় কাটল। রানা লক্ষ করল, দিনার চোখের কোণ চিকচিক করছে—দেশের দুর্দশার কথা ভেবে পানি এসে গেছে ওর চোখে। ব্যাপারটা অভিনয়, নাকি সত্যি—কে জানে! তারপরও অশ্রুটাকে অগ্রাহ্য করতে পারল না ও। দিনার হাত ধরে মৃদু গলায় বলল, 'শান্ত হও। আশা এখনও ফুরিয়ে যায়নি।'

ওর দিকে মুখ ঘোরাল দিনা। 'আশার প্রদীপটা এখন তোমার হাতে, রানা... অন্তত ইরিত্রিয়ার জন্যে। পরিস্থিতি ওখানেও ভাল নয়, সারাটা জীবন যুদ্ধবিগ্রহ করে নিঃস্ব হয়ে গেছে আমাদের জনগণ—স্বাধীনতা, কিংবা শান্তিতে আজও অভ্যস্ত হতে পারেনি। বাইরের শত্রু নেই এখন, তাই নিজেদের মাঝেই শত্রু খুঁজে বেড়াচ্ছে সবাই। নিজেদের মধ্যকার মতবিভেদ দেশটাকে টুকরো টুকরো করে দেবে ভবিষ্যতে—আর এর পিছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা হবে ধর্মের। আফ্রিকার অন্যান্য দেশের মত গোত্রীয় দ্বন্দ্ব নেই আমাদের দেশে, তারপরও ধর্মীয় সংঘাত সবকিছু ধ্বংস করে দেবে। ইতোমধ্যে গোঁড়া মুসলিম আর গোঁড়া খ্রিস্টান নেতারা হাঁকডাক ছাড়তে শুরু করেছে একে অন্যের বিরুদ্ধে। সুদানের ফ্যানাটিসিজম এসে জেঁকে বসছে ইরিত্রিয়ায়। সীমান্ত এলাকায় সুদানিজ দস্যুরা এসে নিয়মিত হানা দিচ্ছে—ইসলামের নামে অমুসলিমদের খুন করছে... ঠিক আরেকটা সুদান যেন তৈরি হচ্ছে ওখানে! তুমি কখনও সুদানে গেছ?'

'অনেক আগে।'

'প্রার্থনা করো, এখন যেন যেতে না হয়। ওখানকার বিভিন্ন রিফিউজি ক্যাম্পে বহুবার গেছি আমি; যেসব দৃশ্য দেখেছি, তা দুঃস্বপ্নের মত। মি. ব্যাগলি তোমাকে কিছু ছবি দেখিয়েছেন, তাই না? ওগুলো আমারই একটা ট্রিপে তোলা।'

দিনার আশঙ্কাটা অমূলক নয়, বুঝতে পারছে রানা। সতর্ক না হলে সুদানের খ্রিস্টান ও মুসলিমদের মধ্যকার ধর্মীয় সংঘাত ইরিত্রিয়ায় পৌঁছে যেতে পারে খুব

সহজে। এর ফলাফল হবে ভয়াবহ। সুদানের যুদ্ধের ধ্বংসলীলা ছবিতে দেখেছে ও। ইরিত্রিয়া ছেড়ে যাবার সময় ইথিওপিয়ানরা কম ধ্বংসযজ্ঞ চালায়নি, কিন্তু তা-ও সুদানের তুলনায় কিছুই না। আইন-শৃঙ্খলা বলতে কিছুর আর অস্তিত্ব নেই ওখানে। ছোট ছোট গেরিলা-দল ঘুরে বেড়াচ্ছে সবখানে—যা-খুশি-তাই করে বেড়াচ্ছে। কেউ সরকারের সমর্থন পাচ্ছে, কেউ বা সমর্থন পাচ্ছে বিপ্লবী দলের। এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা কারোরই অনুগত নয়, স্রেফ যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট অরাজকতার ফায়দা লুটছে। সত্যি, ইরিত্রিয়াতেও তেমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়।

'তুমিই এখন আমাদের একমাত্র ভরসা, রানা,' আবেগপ্রবণ কণ্ঠে বলল দিনা। 'তুমি... মানে ওই কিম্বারলাইট পাইপটা। শুধু ওটাই ঠেকাতে পারে আমার দেশের সর্বনাশ। পুরনো একটা প্রবাদ আছে—*অভাবীরা ঘৃণার রসদে বেঁচে থাকে, আর সচ্ছলরা জন্ম দেয় শান্তির।* কথাটা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি আমি। কোনও সন্দেহ নেই, সমৃদ্ধি এলে হানাহানির কথা ভুলে যাবে সবাই।'

দিনার অভিব্যক্তি ভাল করে যাচাই করল রানা, কিন্তু তাতে কোনও ভণিতা দেখতে পেল না। বোঝা যাচ্ছে, ইজরায়েলি এজেন্ট হলেও ইরিত্রিয়ার প্রতি গভীর টান আছে ওর—নইলে চেহারা বা কণ্ঠে এত আবেগ ফোটাতে পারত না। এবারকার মিশনে মেয়েটার সত্যিকার লক্ষ্য কী, সেটা জানে না রানা; কিন্তু দুঃখী জনগণকে সাহায্য করবার জন্য দিনার যে সত্যিকার ইচ্ছে আছে, সেটা পরিষ্কার। অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে এই আফ্রিকান সুন্দরীর ভিতরে, তারপরও অন্তত দেশপ্রেমের মত একটা মহৎ গুণের সন্ধান পেয়ে খুব ভাল লাগল রানার কাছে।

নতুন চিন্তা হানা দিল রানার মনে। দিনা আবানের দিকটা কিছুটা হলেও আলোকিত হয়ে উঠেছে, কিন্তু গোটা রহস্যের বাকি সমস্ত দিকই নিকষ আঁধারে ছাওয়া। প্লেনে চড়ার আগে রবার্ট সোয়ানের সঙ্গে কথা বলে এসেছে ও—এখনও তিনি সোহেলকে উদ্ধার করবার ব্যাপারে মোটেও এগোতে পারেননি। গালফস্ট্রীম বিমানটার চার্টারের কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে—সেটা ভুয়া এক কোম্পানির নামে ভাড়া করা। বিমানটাকে অবশ্য ট্র্যাক করা গেছে—লাইবেরিয়ায় রিফুয়েলিঙের জন্য নেমেছিল ওটা, তারপর আবার উড়াল দিয়ে চলে গেছে লেবাননে। গন্তব্যটা আগে থেকে আঁচ করা যায়নি, ফলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাহায্য নিয়ে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি কিডন্যাপারদের। সিআইএ-র একজন লোকাল এজেন্টকে শেষ মুহূর্তে পাঠানো হয়েছিল বৈরুত এয়ারপোর্টে, তার চোখের সামনে দিয়ে অজ্ঞান সোহেলকে একটা ভ্যানে তোলে অপহরণকারীরা, বেরিয়ে যায় এয়ারপোর্ট থেকে। সিআইএ-র এজেন্ট তাদেরকে অনুসরণ করছিল, কিন্তু বৈরুতের খ্রিস্টান-অধ্যুষিত এলাকায় পৌঁছে হারিয়ে ফেলে ভ্যানটাকে। লেবানিজ পুলিশের সাহায্য চাওয়া হয়েছে ইতোমধ্যে, ওখানকার বিসিআই কন্ট্যাক্টদেরকেও কাজে লাগানো হয়েছে; তবে এখনও সন্ধান পাওয়া যায়নি সোহেলের।

কিডন্যাপাররা লেবাননে গিয়ে আশ্রয় নেয়ায় এফবিআই ভাবছে—ওরা মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম চরমপন্থী। তবে কথাটা ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না রানার।

চরমপন্থী... তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মুসলিম হতে পারে না। মুসলমান সংগঠনগুলো ওসামা বিন লাদেনের মত ধনী নেতাদের কারণে এমনিতেই যথেষ্ট সচ্ছল; আজ পর্যন্ত ফাণ্ড নিয়ে ওরা কখনও সমস্যায় পড়েছে বলে শোনা যায়নি, কাজেই কিম্বারলাইট পাইপ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠার কোনও কারণ নেই ওদের। টাকার অভাবে যেসব অর্গানাইজেশন ঠিকমত চলতে পারছে না, শুধু তারাই ওটার ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে উঠবে—খ্রিস্টান ও ইহুদিদের অমন বহু নড়বড়ে চরমপন্থী সংগঠন আছে।

ধর্ম যা-ই হোক, টেরোরিস্টরা যে মধ্য-প্রাচ্যের লোক, তা মোটামুটি নিশ্চিত। চাক্ষুষ প্রমাণও মিলেছে তার। রানা নিজেই দেখেছে ওদেরকে ফ্যারেলি কোম্পানির এয়ারস্ট্রিপে—গায়ের রঙ আর চেহারা মিডল-ঈস্টার্ন মানুষের মতই ছিল। রানার দুজন পড়শি কিডন্যাপিঙের রাতে লোকগুলোকে ওর বাড়িতে ঢুকতে দেখেছে, তখন নাকি আরবি-ধরনের কোনও ভাষায় কথা বলছিল ওরা। ভোরের দিকে আরেকবার এসেছিল, তবে শুধু একজন।

মৃত টেরোরিস্টের পরিচয় জানার চেষ্টা করছে এখন এফবিআই, সেই সঙ্গে ফেলে যাওয়া অস্ত্রের মাধ্যমে সূত্র খুঁজছে। ব্যালিস্টিক্স এভিডেন্স থেকে একটা অস্ত্রের পরিচয় পাওয়া গেছে—১৯৮৪-তে ওটার গুলিতে বৈরুতের একটা পানশালায় একজন আর্মি সার্জেন্ট খুন হয়েছিল। অস্ত্রটা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এখানেও সেই লেবানিজ কানেকশন দেখা যাচ্ছে।

লেবাননে ঘাঁটি গাড়া অমুসলিম টেরোরিস্টদের ব্যাপারে কী জানে, স্মরণ করবার চেষ্টা করল রানা—সফল হলো না। বহুদিন যাওয়া হয় না ও-দেশে। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জানে না তাই। অবশ্য চাইলেও মাথা ঘামাতে পারছে না, রওনা হবার আগে রাহাত খান ফোন করে ওকে ইরিত্রিয়ার কাজটার দিকে মনোযোগী হতে বলেছেন। সোহেলকে উদ্ধার করবার দায়িত্বটা চিফ নিজে নিয়েছেন, রানাকে শুধু নিশ্চিত করতে হবে—টেরোরিস্টরা যেন ওর ক্ষতি না করে। সেটার জন্য কিম্বারল্যাইট পাইপটা খুঁজতে হবে ওকে।

'কী হয়েছে, রানা?' দিনার ডাকে বাস্তবে ফিরে এল ও। 'কোথায় হারিয়ে গেলে?'

'কই, কোথাও না তো!' তাড়াতাড়ি বলল রানা।

'উঁহু, মিথ্যে বোলো না,' ধোঁকা খেতে রাজি নয় দিনা। 'কী যেন ভাবছিলে তুমি, চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল খুব কষ্ট পাচ্ছ।' রানার বাহুতে হাত রাখল ও। 'কী হয়েছে, খুলে বলো আমাকে।'

দিনার চোখে চোখ রাখতেই দুর্বলতা অনুভব করল রানা। মণিদুটোতে অসীম মায়া, হাতের স্পর্শটাতেও আন্তরিকতা মিশে আছে। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো, খুলে বলে সব; মনটা তা-ই চাইছে। গত কয়েকদিনের রুদ্ধশ্বাস টেনশন সইতে পারছে না আর স্নায়ু। ঘনিষ্ঠ কাউকে নিজের কষ্ট, ভয় আর দুশ্চিন্তার কথা বলে বুক হালকা করতে ইচ্ছে হচ্ছে। ভাবনাটা মাথায় আসতে সচকিত হয়ে উঠল ও। তাই তো! দিনা আবার তো ওর ঘনিষ্ঠ কেউ নয়; কেন ওকে খুলে বলবে ও সব? রহস্যময়ী এই নারীকে তো এতক্ষণ পর্যন্ত শত্রুপক্ষ বলে ভাবছিল, হঠাৎ

অনুভূতিটা বদলে যেতে চাইছে কেন? মনে মনে নিজেকে শাপ-শাপান্ত করল রানা—পোড়-খাওয়া একজন এসপিয়োনাজ এজেন্টের জন্য ওটা একটা অমার্জনীয় অপরাধ।

সাবধানে হাতটা সরিয়ে নিল রানা। বলল, 'কিছু হয়নি আমার। মানে... তোমার উদ্বিগ্ন হবার মত কিছু না।'

দূরত্ব বজায় রাখার ইঙ্গিতটা বুঝতে অসুবিধে হলো না দিনার। আহত চোখে মুখ ফিরিয়ে নিল সে, গম্ভীর হয়ে গেল। কেন যেন তাতে মন খারাপ হয়ে গেল রানার, দিনা জোর করে ওর হাতটা আরেকটু ধরে রাখলেই বোধহয় খুশি হতো।

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। নিদ্রাহীনতায় মাথা খারাপ হয়ে গেছে নিশ্চয়ই, নইলে এমন দুর্বল হয়ে পড়ছে কেন? যে-কঠিন কাজ অপেক্ষা করছে সামনে, তাতে এ-ধরনের আবেগ শুধু জটিলতাই বাড়াবে। কিন্তু মেয়েটিকে বন্ধু ভাবতে ইচ্ছে করছে ওর।

দক্ষিণ লেবানন।

বুক-ফাটা তৃষ্ণা নিয়ে জেগে উঠল সোহেল আহমেদ। সংজ্ঞার পাশাপাশি ফিরে এসেছে ব্যথাবোধটাও—ভাঙা আঙুলটা ফুলে ঢোল হয়ে আছে। সারা শরীর কাঁপছে সে-ব্যথায়। চারপাশে চোখ বোলাল—বারো ফুট বাই বারো ফুট আকারের একটা কুঠুরিতে রাখা হয়েছে ওকে। দেয়ালগুলো পাথরের। জানালা নেই কোনও, মাথার উপর নিঃসঙ্গভাবে জ্বলছে একটা বালব। আসবাবপত্র বলতে একটামাত্র ক্যাম্পখাট—ওটায় শোয়ানো হয়েছে ওকে। আর আছে একটা ছোট টেবিল। দিন কি রাত এখন, সেটা বুঝতে পারছে না। অজ্ঞান করা হয়েছিল ওকে, কতটা সময় পেরিয়েছে—বলতে পারবে না। ঘড়ি নেই সঙ্গে। কোথায় নিয়ে আসা হয়েছে, সেটাও বুঝতে পারছে না।

শীত শীত করছে—জ্বর এসেছে কি না কে জানে। পায়ের কাছে ভাঁজ করা একটা কম্বল পড়ে আছে, ওটা খুলে শরীরে জড়াল সোহেল। সেলের ভিতর আস্তে হাঁটতে শুরু করল ও। দেয়াল আর মেঝের প্রতিটি ইঞ্চি খুঁটিয়ে দেখল। তারপর দরজা পরীক্ষা করল। পাল্লাটা খুবই ভারি, কী-হোলটাও অতিরিক্ত বড়। পাল্লাটা বাইরের দিকে খোলে। বাইরে থেকে পাল্লায় লোহার দণ্ডও লাগিয়ে রাখা হতে পারে, বোঝা যাচ্ছে না। খুট করে একটা শব্দ পেতেই মাথা তুলল। দরজার উপরদিকটায় একটা ছোট ফোকর আছে, ওটার ঢাকনা সরে গেছে। গাঢ় চামড়ার একটা রুক্ষ মুখ উদয় হয়েছে ওখানে।

'হাই।' বলল সোহেল। 'একটু পানি হবে?'

জবাব না দিয়ে ফোকরটা আবার বন্ধ করে দিল লোকটা। পায়ের শব্দ শোনা গেল ওপাশে। ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিছানায় এসে বসল সোহেল। নিজের উপর রাগ হচ্ছে খুব। একটা হাত নেই তো কী হয়েছে, এখনও মনে-প্রাণে একজন এসপিয়োনাজ এজেন্ট ও। এভাবে ধরা পড়া মোটেই উচিত হয়নি। জেগেই ছিল ও, গড়াগড়ি করছিল রানার বিছানায় শুয়ে। কলিং বেল শুনে রানা ফিরেছে মনে করে দরজা খুলে ফেলেছিল, এবং ওটাই ছিল সবচেয়ে বড় ভুল। বে

এসেছে, বুঝেশুনে খোলা দরকার ছিল দরজা। মাথায় আসেনি ব্যাপারটা। অনেকদিন থেকে ডেস্কজব করতে করতে আসলে মরচে ধরে গেছে ট্রেইনিঙে, সারাক্ষণ বিপদের আশঙ্কা করতে ভুলে গেছে। মাশুলও দিতে হয়েছে ভীষণভাবে—গায়ের জোরে ভিতরে ঢুকে পড়ে লোকগুলো, পাঁচজনের সঙ্গে একা আর কুলিয়ে উঠতে পারেনি। ওকে মেঝেতে চেপে ধরে একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে বেহুঁশ করে ফেলে লোকগুলো। জ্ঞান ফেরার পর দেখে, ভিন্ন একটা বাড়িতে ভিডিও ক্যামেরার সামনে বসিয়ে রাখা হয়েছে ওকে... রানাকে পাঠাবার জন্য মেসেজ রেকর্ড করছে অপহরণকারীরা।

আনমনে মাথা নাড়ল সোহেল। বড্ড ভুল করেছে, বিরাট বিপদ ডেকে এনেছে রানার জন্য। ইরিত্রিয়ায় হাওয়া খেতে ওকে যেতে বলেনি এই লোকগুলো, নিঃসন্দেহে ওখানে বড় ধরনের বিপদ রয়েছে, নইলে নিজেরাই তো যেতে পারত। তবে যত বড় বিপদই থাকুক, রানা পিছু হটবে না। পাগলাটে বন্ধুটাকে ভাল করেই চেনে সোহেল, ওকে বাঁচাবার জন্য দরকার হলে নরকেও যাবে রানা।

তালা খোলার শব্দ হলো। দুজন লোক ঢুকল কামরার ভিতর—একজনের হাতে খাবারের ট্রে, অন্যজন সাবমেশিনগান নিয়ে দাঁড়াল প্রবেশপথে, হাবভাবে বাড়তি সতর্কতা। ভাল করে লোকদুটোকে দেখল সোহেল—মাথায় হুডঅলা লাল-সাদা রঙের আলখাল্লা ওদের পরনে, চেহারা-সুরতে আরব বলে মনে হচ্ছে।

টেবিলের উপর ট্রে-টা নামিয়ে রাখল প্রথম লোকটা। ওতে একটা প্লেটে শুকনো দুটো রুটি আর সবজি রয়েছে; সঙ্গে একটা প্লাস্টিকের গ্লাস আর পানির জগ। আহামরি কিছু নয়, তবে খাবার যে এনেছে, তা-ই ঢের।

'থ্যাঙ্ক ইউ,' ইংরেজিতে বলল সোহেল।

কথাটা যেন বুঝতে পারল না লোকটা, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

'একটা সিগারেট দিতে পারো?' জিজ্ঞেস করল সোহেল।

সঙ্গীর দিকে তাকাল খাবারবাহী লোকটা, চোখে চোখে কী যেন কথা হলো ওদের মধ্যে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে আলখাল্লার ভিতর থেকে একটা চাপ-খাওয়া প্যাকেট বের করে টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল লোকটা। প্যাকেট খুলে দুটো সিগারেট পেল সোহেল।

'ম্যাচ হবে?'

দেশলাইয়ের বাক্স দিল লোকটা, তবে দুটো বাদে সব কাঠি বের করে নিল।

'অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাদের,' বলল সোহেল।

একটু মাথা ঝোঁকাল লোকটা, সঙ্গীকে নিয়ে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে। দরজায় আবার তালা লাগানোর শব্দ হলো। পানি খেয়ে একটা সিগারেট ধরাল সোহেল, আয়েশ করে টান দিতে দিতে ডুবে গেল চিন্তায়। সন্দেহ নেই, ওকে উদ্ধারের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো হচ্ছে বিসিআই থেকে। কিন্তু রানা কী করছে? ইরিত্রিয়ায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে নিশ্চয়ই? হয়তো চলেও গেছে ইতোমধ্যে। উদ্বেগ অনুভব করল সোহেল—নিজের জন্য নয়, প্রাণের বন্ধুর জন্য। ওর জন্য রানাকে কাজ ফেলে অহেতুক ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে ঝাঁপ দিতে হচ্ছে। এ কথা ভেবে বুকটা ফেটে যেতে চাইছে ওর।

সিগারেটের আগুনটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে একটা শপথ নিল গোয়েন্দা। কারও অপেক্ষায় বসে থাকবে না ও, নিজেই এখান থেকে উদ্ধারের একটা পথ বের করে নেবে। এখন গার্ডরা সিগারেট দিয়েছে ওকে, কিন্তু খুব শীঘ্রি ওদের হাত থেকে নিজের স্বাধীনতাও আদায় করে নেবে ও।

চোদ্দ

ওয়াশিংটন ডিসি।

এফবিআই হেডকোয়ার্টারে নিজের অফিসে বসে কাজ করছেন ডিরেক্টর রবার্ট সোয়ান, ইন্টারকম বেজে উঠল হঠাৎ করে। সামনে রাখা ফাইল থেকে দৃষ্টি সরালেন না তিনি, হাত বাড়িয়ে আলগোছে তুলে নিলেন রিসিভারটা। কানে ঠেকিয়ে বললেন, 'ইয়েস?'

'এক্সকিউজ মি, সার,' ওপাশ থেকে সেক্রেটারির কণ্ঠ ভেসে এল। 'বিরক্ত করতে মানা করেছিলেন আপনি, কিন্তু একটা জরুরি কল আছে...'

'কে করেছে?'

'অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন, নুমা-র চিফ।'

'ঠিক আছে, লাইন দাও।'

খুটখাট শব্দ হলো, কয়েক সেকেণ্ড পরেই শোনা গেল হ্যামিলটনের অতি-পরিচিত কণ্ঠ। 'হাই রবার্ট! কেমন আছ?'

'ভাল, অ্যাডমিরাল। কী ব্যাপার?'

'তুমি কি ব্যস্ত?'

'কিছুটা তো বটেই। কেন?'

'রানার ওই ব্যাপারটা নিয়ে খোঁজখবর নিচ্ছিলাম, খুব ইন্টারেস্টিং কিছু তথ্য বেরিয়ে এসেছে। আমার সঙ্গে এয়ারফোর্সের ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টের কর্নেল টম ডুগান আছে। ও তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। আমাদের তিনজনের একসঙ্গে বসা দরকার।'

'কোথায় আপনারা?'

'রাস্তাতে... তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছি। দশ মিনিটের মধ্যেই হুভার বিল্ডিঙে পৌঁছুব।'

'এখুনি?' একটু দ্বিধা করলেন সোয়ান। বেশ কয়েকটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে তাঁর আগামী আধঘণ্টার মধ্যে।

'ব্যাপারটা খুব ইম্পরট্যান্ট, রবার্ট,' জোর দিয়ে বললেন হ্যামিলটন। 'দেরি করা চলবে না।'

'ঠিক আছে, আসুন।'

সেক্রেটারিকে অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো রি-শিডিউল করবার নির্দেশ দিয়ে অপেক্ষায় রইলেন ডিরেক্টর। মিনিট পনেরো পরেই এসে গেলেন নুমা চিফ, সঙ্গে

চাই ঐশ্ব:

হালকা-পাতলা গড়নের এক এয়ারফোর্স অফিসার। পরিচয় আর কুশল বিনিময় শেষে মুখোমুখি বসলেন সবাই।

'বলুন অ্যাডমিরাল, কী জানতে পেরেছেন?' সরাসরি কাজের কথায় এলেন মি. সোয়ান।

'রানাকে দেখানো ওই ফটোগ্রাফগুলোর ব্যাপারে এয়ারফোর্সের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম আমি,' বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'ওরা একেবারে আকাশ থেকে পড়ল। ওই ধরনের কোনও কিছু নাকি স্টেট ডিপার্টমেন্টের কাছে সরবরাহ করা হয়নি।'

'তা হলে ছবিগুলো কোথায় পেয়েছেন এডওয়ার্ড ব্যাগলি?' ভুরু কোঁচকালেন সোয়ান।

'ন্যাশনাল রিকনিসান্স অফিস থেকে,' বললেন হ্যামিলটন। 'এয়ারফোর্স জানিয়েছে, মেডিউসা স্যাটেলাইটের ছবিগুলো ওখানকার আর্কাইভে ছিল। এখন নেই।'

'সেটা কীভাবে সম্ভব?' অবাক হলেন সোয়ান। 'ব্যাগলি যত বড় পদমর্যাদার লোকই হোন না কেন, টপ-লেভেলের ক্লিয়ারেন্স ছাড়া তো *এনআরও* থেকে কিছু নিতে পারেন না!'

'ওয়েল, এখানেই কর্নেল ডুগান ব্যাপারটায় *ইন* করছে,' সোফায় হেলান দিলেন হ্যামিলটন। 'মেডিউসা পিকচারগুলো আর্কাইভ থেকে গায়েব হয়ে যাওয়ায় কেসটা ওর হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। ও-ই সব ব্যাখ্যা করুক।'

গলা খাঁকারি দিলেন কর্নেল টম ডুগ্যান। 'মি. সোয়ান, ন্যাশনাল রিকনিসান্স অফিসে বড় ধরনের লিক আছে। গত তিন বছর ধরে এর উপর কাজ করছি আমি—ওখান থেকে পাচার হওয়া বিভিন্ন ক্লাসিফায়েড তথ্য কারা বিক্রি করছে, সেটা জানার চেষ্টা করছি। একটা সময়ে অত্যন্ত গোপন আর সুরক্ষিত অর্গানাইজেশন ছিল ওটা, ইনফরমেশন প্রোটেকশনের জন্য আলাদা ইন্টারনাল সিকিউরিটি ছিল ওদের। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পর থেকে *এনআরও*-র গুরুত্ব অনেকটা কমে এসেছে, ফলে আস্তে আস্তে সিকিউরিটিতে ঢিল পড়তে শুরু করে। আর সেটারই সুযোগ নিতে শুরু করেছে ওখানকার অসৎ কর্মচারীরা। এয়ারফোর্সের তত্ত্বাবধানে রয়েছে প্রতিষ্ঠানটা, আমাদের লোকজনই ওখানে সবচেয়ে বেশি... তাই আমাদের ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টকে দেয়া হয়েছে লিক বন্ধ করবার দায়িত্ব...'

'কী ধরনের লিকের কথা বলছেন আপনি?' বাধা দিয়ে প্রশ্ন করলেন সোয়ান। 'আরেকটা *অল্ডরিচ অ্যামেস* কেস নয়তো? মানে... সিআইএ-তে যেটা ঘটেছিল?'

'ঠিক তা নয়,' মাথা নাড়লেন ডুগান। 'চুরিগুলোর পিছনে পলিটিক্যাল মোটিভেশন নেই, স্রেফ টাকা কামানোর ধান্ধায় বিক্রি করা হচ্ছে তথ্যগুলো।'

'কী ধরনের তথ্য বিক্রি হচ্ছে?'

'একটা উদাহরণ দিলে পরিষ্কার হবে ব্যাপারটা। দু'বছর আগে আমাদের এক স্যাটেলাইট ফটো-অ্যানালিস্টের সেক্রেটারিকে অ্যারেস্ট করেছিলাম আমরা, তার স্বামী শিকাগো মার্কেন্টাইল এক্সচেঞ্জে কাজ করত। আমাদের *কি-হোল ১১*

স্পাই স্যাটেলাইটের ইনফরমেশন অ্যানালাইজ করে ওরা বুঝতে সমর্থ হয়, পোকার আক্রমণে আর্জেন্টিনার শীতকালীন ভুট্টা ফলনে সিরিয়াস একটা ধস হতে যাচ্ছে। এই তথ্য বিক্রি করে প্রায় সাতাশ মিলিয়ন ডলার আয় করে ওরা।'

'হুম!' গম্ভীর গলায় বললেন সোয়ান। 'ব্যাগলির কেসটাও এই জাতীয় ভাবছেন?'

'ভাবছি না শুধু, মি. সোয়ান, আমাদের হাতে প্রমাণও আছে,' বললেন ডুগান। 'মেজর জেফরি ডারগাস নামে *এনআরও*-র একজন স্টাফ বেশ কিছুদিন থেকেই আমাদের সন্দেহের তালিকায় ছিল, কিন্তু স্পেসিফিক কোনও অভিযোগ ছিল না তার বিরুদ্ধে। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন মেডিউসা স্যাটেলাইটের ফটোগ্রাফগুলোর ব্যাপারে যোগাযোগ করায় কেস পেয়ে গেছি—ডারগাসের দায়িত্বে থাকার কথা ছবিগুলো, ওগুলো নেই। কাল রাতে ওকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, জেরার মুখে সব ফাঁস করে দিয়েছে সে।'

'এডওয়ার্ড ব্যাগলির কাছে ওগুলো বিক্রি করেছে সে, তাই না?'

'একজ্যাক্টলি... পাঁচ লাখ ডলারের বিনিময়ে। ব্যাপারটা অত্যন্ত সিরিয়াস, মি. সোয়ান। জাতীয় নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়েছে এর ফলে। এ-মুহূর্তে তিনটে মেডিউসা স্যাটেলাইট চক্কর দিচ্ছে পৃথিবীকে ঘিরে। চাইনিজ বা কোরিয়ানরা যদি ওগুলোর কথা জানতে পারে, তা হলে কী ঘটবে আন্দাজ করতে পারেন? সাহারা মরুভূমির কয়েকটা ফালতু ছবির চাইতে অনেক বড় একটা ব্যাপার জড়িত এর সঙ্গে।'

'তা তো বটেই।' অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের দিকে তাকালেন সোয়ান। 'আপনি ওঁকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলেননি?'

মাথা নাড়লেন হ্যামিলটন।

'কী খুলে বলেননি?' বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলেন ডুগান। 'কী করেছে ব্যাগলি ওই ছবিগুলো নিয়ে?'

'জানবেন সবই,' আশ্বস্ত করলেন এফবিআই ডিরেক্টর। 'আগে আপনার বক্তব্য শেষ করুন। ডারগাস আর কোথাও বিক্রি করেছে ছবিগুলো?'

'ছবি বিক্রি করতে পারেনি, ওগুলো কপি-প্রোটেক্টেড। তবে তথ্যটা সম্ভবত করেছে। ফোন-রেকর্ড বলছে—গত কয়েকদিনে বেশ কয়েকবার ইয়োরোপে কল করেছে ও, লম্বা সময় নিয়ে কথা বলেছে। শেষ কলটা ছিল অ্যারেস্ট হবার ঘণ্টাখানেক আগে। ওগুলোর ব্যাপারে কিছুই জানতে পারিনি, ব্যাগলির নাম বলার পর থেকে মুখে তালা এঁটেছে ডারগাস। কলগুলোও এনক্রিপ্টেড এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে করা হয়েছিল, টার্গেট-নাম্বারটা ট্রেস করা যাচ্ছে না।'

'কোন এরিয়ায় করেছে, সেটা জানতে পেরেছেন?'

'বিশাল বড় এক সার্কেল ওটা: ইটালি, গ্রিস, ইউগোস্লাভিয়া আর আলবেনিয়া।'

চকিতে একটা চিন্তা খেলে গেল সোয়ানের মাথায়—আলবেনিয়া মুসলিম রাষ্ট্র; টেরোরিস্টরা ওখানকার নয়তো? মেডিউসা ফটোগ্রাফের ব্যাপারে হয়তো ওরা ডারগাসের কাছেই খবর পেয়েছে।

'এনিওয়ে, আমার কথা শেষ,' বললেন ডুগান। 'এখন আপনার সাহায্য চাই। মি. ব্যাগলি একজন সিভিল-সার্ভেন্ট, এয়ারফোর্স তাঁকে গ্রেফতার করতে পারে না। কেসটা এত বড় যে, এফবিআইয়ের মাধ্যমেই এগোতে হবে আমাদেরকে। অ্যাডমিরালকে ও-কথা বলতেই আপনার কাছে নিয়ে এলেন। কাজটা খুব দ্রুত করা দরকার, ছবিগুলো বিদেশি কোনও শক্তির হাতে চলে যাবার আগেই!'

'আপাতত দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে তোমার,' বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'ব্যাগলি ওগুলো কারও কাছে বিক্রি করবার জন্য কেনেনি। ওর মতলব সম্পূর্ণ অন্যকিছু। তবে হ্যাঁ, আমাদের তাড়াতাড়ি এগোনো অবশ্যই দরকার...'

ইরিত্রিয়ার কিম্বারলাইট পাইপ আর রানার ওতে জড়িত হওয়া সংক্রান্ত সবকিছু খুলে বললেন তিনি, মাঝে মাঝে কথা জোগালেন মি. সোয়ান। শুনতে শুনতে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ডুগান। কথা শেষে মি. সোয়ান জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা আগে কখনও অ্যানালাইজ করে দেখেননি ছবিগুলো?'

'না,' বিস্ময় সামলে বললেন ডুগান। 'স্যাটেলাইটটার ক্যালিব্রেশন করা ছিল না। তাই ওগুলো বাতিল জিনিস বলে ফেলে রেখেছিলাম আমরা। নইলে ভারগাসের মত লোক ওগুলোর দায়িত্বে থাকত না।'

'বাতিল মাল হলে একজন টেরোরিস্ট বিমানের ইঞ্জিনের ভিতর আত্মাহুতি দিত না,' তিক্ত কণ্ঠে বললেন সোয়ান।

'ছবিগুলো উদ্ধার করতে হবে, অ্যাডমিরাল,' জোর গলায় বললেন ডুগান। 'হাইলি ক্লাসিফায়েড মেটেরিয়াল ওগুলো। মাসুদ রানা লোকটা যত বিশ্বস্তই হোক, অমন জিনিস হাতে নিয়ে তাকে আমরা আফ্রিকার মাটিতে ঘুরে বেড়াতে দিতে পারি না।'

'রানার কাছ থেকে ছবিগুলো নিয়ে নেয়ার মানে হচ্ছে, পাইপটা খুঁজে পাবার সম্ভাবনা শেষ করে দেয়া,' গম্ভীর গলায় বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'সোহেল আহমেদ তা হলে খুন হয়ে যাবে নিঃসন্দেহে। জেনেশুনে সেটা আমি হতে দিতে পারি না। মেজর জেনারেল রাহাত খানকে আমি কথা দিয়েছি, সোহেলকে উদ্ধারের জন্য যা যা দরকার, সব করব। এর জন্য যদি রানাকে কিছু আলট্রা-সিক্রেট ফটোগ্রাফ নিয়ে ঘুরতে দিতে হয়, তবে তা-ই সই!'

'আপনি আমাকে নিরুপায় করে দিচ্ছেন, অ্যাডমিরাল,' থমথমে গলায় বলল ডুগান। 'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করতে হবে আমাকে।'

'রানাকে যদি ঘাঁটাবার চেষ্টা করো, টম,' রাগী গলায় বললেন হ্যামিলটন, 'তা হলে আমি ব্যাপারটা ভালভাবে নেব না।'

'প্লিজ, থামুন আপনারা,' তাড়াতাড়ি বললেন সোয়ান। 'নিজেদের মধ্যে বিবাদ করে লাভ নেই। আমাদেরকে কৌশলে এগোতে হবে। আমার পরামর্শ শুনুন—আসুন, আগে এডওয়ার্ড ব্যাগলিকে ধরে নিয়ে আসি। ওঁর মুখ খোলাতে পারলে পুরো রহস্যটা অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে আসবে। রানা আপাতত যেমন আছে থাকুক। কিছুটা সময় দিই ওকে, ছবিগুলোর সাহায্য নিয়ে যতটা পারে কাজ করুক। খুব দরকার হলে নাহয় ওগুলো ওর কাছ থেকে আনিয়ে নেয়া যাবে।'

'আ... আমাকে পারমিশন নিতে হবে এ-ধরনের ছাড় দিতে চাইলে,' তোতলালেন ডুগান।

'পারমিশন আমি জোগাড় করছি,' বললেন হ্যামিলটন। 'দরকার হলে জয়েন্ট চিফ অভ স্টাফ, অথবা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলব।' এফবিআই ডিরেক্টরের দিকে তাকালেন তিনি। 'ব্যাগলিকে কখন তুলে আনতে চাও?'

'যত দ্রুত সম্ভব,' বললেন সোয়ান। 'মেজর ভারগাসের জবানবন্দির কপি দরকার হবে আমার, তা হলে জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট থেকে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট পেতে দেরি হবে না। আপত্তি না থাকলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা তিনজনে গিয়ে আণ্ডারসেক্রেটারিকে দুঃসংবাদটা শোনাতে পারি।'

ডুগানের দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'ইজ দ্যাট ওকে, কর্নেল?'

'যদি আপনি পারমিশন নিতে পারেন,' বললেন ডুগান, 'তা হলে আমার আপত্তি নেই।'

'ঠিক আছে,' এফবিআই ডিরেক্টরের দিকে ফিরলেন হ্যামিলটন। 'রবার্ট, তোমার ফোনটা একটু ব্যবহার করব।'

ভার্জিনিয়ার ফেয়ারফ্যাক্সের উদ্দেশে চারটে সেডানের একটা ছোট কনভয় রওনা হয়ে গেল তিন ঘণ্টা পর। একসারিতে ছুটল ওগুলো—প্রথম গাড়িটার পিছনের সিটে বসেছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর ডিরেক্টর সোয়ান, ড্রাইভারের পাশে কর্নেল ডুগান। পিছনের তিনটে গাড়িতে মোট বারোজন স্পেশাল এজেন্ট। রওনা হবার আগে আণ্ডারসেক্রেটারির অফিসে ফোন করেছিলেন সোয়ান, ওখান থেকে বলা হয়েছে—ব্যাগলি আজ অফিসে আসেননি। কেন আসেননি, তা জানে না কেউ। এ-কথা শুনে বাড়িতেও ফোন করেছিলেন সোয়ান। কিন্তু সেখানেও লাইন ডিসকানেক্টেড হয়ে আছে। লোকটা পালিয়ে গেল কি না এ-ব্যাপারে সন্দেহ জেগেছে সবার মনে; তাই দ্রুত গ্রেফতারি পরোয়ানা জোগাড় করে ছুটেছেন ওঁরা ব্যাগলিকে অ্যারেস্ট করতে।

সেডানের পিছনে বসে নিচু গলায় পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর ডিরেক্টর সোয়ান। সন্দেহ নেই, মেডিউসা পিকচারগুলো চুরির মাধ্যমে সবকিছুর সূচনা ঘটিয়েছে মেজর ভারগাস। ছবিগুলো প্রথমে ব্যাগলির কাছে বিক্রি করেছে সে, ইয়োরোপিয়ান পক্ষটা পরে এসেছে দৃশ্যপটে। ওরাই সম্ভবত কিডন্যাপ করেছে সোহেলকে। ছবিগুলো পায়নি বটে, কিন্তু রানা কিম্বারলাইট পাইপটা খুঁজে বের করলেই ওদের কাজ হাসিল হয়। ওকে বাধ্য করবার জন্যই কিডন্যাপিংটা করেছে ওরা। নিজের থিয়োরিটা অ্যাডমিরালকে জানালেন সোয়ান।

'কিন্তু রানার প্রতিবেশীরা আরবি-টাইপের কথা শুনতে পেয়েছে লোকগুলোর মুখে,' বললেন হ্যামিলটন। 'অমন ভাষা মিডল-ইস্টে প্রচলিত, ইয়োরোপে নয়।'

'আলবেনিয়ান আর সার্বিয়ান টেররিস্টদের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর কানেকশন আছে,' পাল্টা যুক্তি দেখালেন সোয়ান। 'ওখান থেকে হয়তো ভাড়া করা হয়েছে ওদেরকে।'

'খামোকা লোক ভাড়া করতে যাবে কেন?' হ্যামিলটন এখনও সন্দিহান। 'ওসব অর্গানাইজেশনের নিজস্ব লোকের অভাব হয় না।'

'অন্য কোনও ব্যাখ্যা আছে আপনার কাছে?' ভুরু নাচালেন সোয়ান।

'তা অবশ্য নেই,' স্বীকার করলেন হ্যামিলটন। 'থাক, ওদের পরিচয় নিয়ে পরে মাথা ঘামানো যাবে। ব্যাগলির ব্যাপারটা আগে বোঝা দরকার। ধরে নিলাম, আর্থিক লোভ আর রাজনৈতিক ক্যারিয়ার বাঁচাবার জন্য পাইপটা খুঁজে বের করতে চাইছে সে। কিন্তু এক্সপিডিশনটার জন্য এত টাকা কোথায় পাচ্ছে সে?'

'ইজরায়েলের কাছ থেকে,' বললেন সোয়ান। 'ওই দিনা আবান মেয়েটা মোসাদের হয়ে কাজ করছে। ওরাই পুরো অপারেশনের ফাণ্ড জোগাচ্ছে।'

'তাতে ওদের লাভটা কী?'

'সিম্পল, অ্যাডমিরাল। কিম্বারলাইট পাইপটা খুঁজে বের করতে পারলে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকবে ওরা, ওটার লোকেশন জানাবার বদলে ইরিত্রিয়ার সঙ্গে চুক্তি করতে পারবে হীরা তোলার জন্য। আফটার অল, ইরিত্রিয়া একটা গরীব মুসলিম দেশ, ওখানে মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদের উত্থান সময়ের ব্যাপার মাত্র... এমন একটা দেশের হাতে হীরার খনির মত অফুরন্ত টাকার উৎস থাকতে দেয়া যায় না!'

'সেক্ষেত্রে ওদের উচিত ছিল ব্যাপারটা আমাদেরকে জানানো! আফটার অল, আবিষ্কারটা তো আমাদের।'

'জানালে ওদেরকে এর ভাগ দিতাম আমরা?' হাসলেন সোয়ান। 'কিছু মনে করবেন না, অ্যাডমিরাল। তবে সত্যি কথা হলো, কাউকে বেশি মাথায় তুলে রাখলে তারা মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খেতে শুরু করে। ইজরায়েলিরা তা-ই করছে।'

গম্ভীর হয়ে গেলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।

আধঘণ্টার মধ্যে ফেয়ারফ্যাক্সে পৌঁছে গেল গাড়িবহর। হঠাৎ করেই সচকিত হয়ে উঠল আরোহীরা, বিপদসঙ্কেত শুনতে পেয়েছে। সাইরেন বাজাতে বাজাতে এফবিআইয়ের গাড়িগুলোকে ওভারটেক করে তুমুলগতিতে ছুটে চলে গেল কয়েকটা ফায়ার-ট্রাক আর পুলিশের গাড়ি।

মাথার ভিতর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের ডাক শুনতে পেলেন অ্যাডমিরাল আর এফবিআই ডিরেক্টর। পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন তাঁরা। তারপরই ড্রাইভারকে সোয়ান বললেন, 'ওগুলোর পিছনে থাকো!'

মাথা ঝাঁকিয়ে অ্যাকসেলারেটর চাপল ড্রাইভার।

একটু পরেই ফেয়ারফ্যাক্সের আভিজাত আবাসিক এলাকায় পৌঁছে গেল গাড়িগুলো। চওড়া রাস্তার দুপাশে বড় বড় প্লট—একেকটা দেড়-দু'একরের কম নয়। উঁচু-উঁচু গাছপালা আর চমৎকার নয়নাভিরাম বাগানের মাঝখানে ছবির মত মাথা তুলে রেখেছে চার-পাঁচ বেডরুমের একটা করে ডুপ্লেক্স বাড়ি। তবে এসব সৌন্দর্য দেখার সুযোগ পেলেন না ওঁরা। দৃষ্টি আটকে গেল রাস্তায়—দাঙ্গাক্ষেত্রের মত পরিস্থিতি ওখানে। মানুষের ভিড়, দূরে আকাশে পাক খেয়ে উঠছে কালো ধোঁয়া। নাকে ভেসে আসছে কাঠ আর প্লাস্টিকের বিশ্রী পোড়া গন্ধ। কর্ডন দিয়ে পুলিশ আটকে রেখেছে কৌতূহলী দর্শকদেরকে, এগোতে দিচ্ছে না। আইডি

দেখিয়ে পথ করে নিলেন সোয়ান। কর্ডন পেরিয়ে এগিয়ে চলল তাঁদের গাড়িবহর। গোলমালের উৎসের কাছে পৌঁছুতেই বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন সবাই।

'ও... ওটাই কি...' তোতলাতে তোতলাতে প্রশ্ন করবার চেষ্টা করলেন কর্নেল ডুগান।

'হ্যাঁ,' শান্ত স্বরে বললেন সোয়ান।

দৃশ্যটা ভয়াবহ—দাউ দাউ করে জ্বলছে এডওয়ার্ড ব্যাগলির আবাস, ওটা এখন স্রেফ একটা অগ্নিকুণ্ড। ফায়ার সার্ভিস আর ইমার্জেন্সি ক্রু-রা প্রাণপণ চেষ্টাতেও বিন্দুমাত্র কমাতে পারছে না আগুনের তীব্রতা। আরসন-স্পেশালিস্ট নন মি. সোয়ান, তারপরও বুঝতে পারলেন—বাড়তি ফুয়েল ছাড়া এমন আগুন লাগানো সম্ভব নয়। সম্ভবত আগুন দেয়ার আগে পুরো বাড়ির দেয়াল গ্যাসোলিনে ভিজিয়ে নেয়া হয়েছিল।

দুইশ' গজ দূরে গাড়ি থামিয়েছে ড্রাইভার। দরজা খুলে নামলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন ও মি. সোয়ান, পিছু পিছু কর্নেল ডুগান। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন জ্বলন্ত বাড়িটার দিকে। ওঁদের চোখের সামনে ধসে পড়ল দোতলার একটা অংশ, বাতাসে ভেসে এল আগুনের ফুলকি আর উত্তাপের হলকা। নিজের অজান্তেই একটু পিছিয়ে গেলেন তিনজনে।

ফায়ার-ফাইটিং সুট পরা একজন মানুষকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল—সারা গায়ে কালিঝুলি মাখা। কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'এক্সকিউজ মি, আপনারা কি ডিরেক্টর সোয়ান আর অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন?'

'হ্যাঁ।'

'আমি কমাণ্ডার জিম পোলাস্কি—ফেয়ারফ্যাক্স ফায়ার ডিপার্টমেন্টের চিফ।' হেলমেট আর হাতের গ্লাভ খুলে করমর্দন করলেন ভদ্রলোক। 'কর্ডনের ওখান থেকে আপনাদের আসার খবর জানানো হয়েছে আমাকে। কিছু মনে না করলে জানতে পারি, আপনারা এখানে কী করছেন?'

'বাড়িটা কার, সেটা জানেন, কমাণ্ডার?' প্রশ্ন করলেন অ্যাডমিরাল।

'জী, স্যার। তবে আগুনটা লেগেছে তো আধঘণ্টাও হয়নি। আপনারা এত তাড়াতাড়ি খবর পেলেন কীভাবে?'

জবাব না দিয়ে সোয়ান জানতে চাইলেন, 'কীভাবে ঘটল দুর্ঘটনাটা?'

'দুঃখিত,' মাথা নাড়লেন পোলাস্কি। বুঝে নিয়েছেন, এঁরা প্রশ্ন করবেন—জবাব দেবেন না। 'এখুনি বলা সম্ভব নয়।'

'ভিতরে কেউ ছিল?'

'ড্রাইভওয়েতে দুটো গাড়ি পুড়ছে,' বললেন পোলাস্কি। 'তারমানে বাড়ির লোক যায়নি কোথাও। ফরেনসিক টিম হয়তো হাড়গোড় উদ্ধার করতে পারবে, তবে বেশিকিছু আশা করা ঠিক হবে না।'

'কী ধারণা আপনার?' জিজ্ঞেস করলেন হ্যামিলটন। 'কী ঘটেছে ওখানে?'

'দুর্ঘটনা বলে মনে হচ্ছে না,' কাঁধ ঝাঁকালেন পোলাস্কি। 'দুর্ঘটনা হলে কেউ না কেউ বেরিয়ে আসতে পারত, আমরাও প্রতিবেশীদের বদলে বাড়ির লোকের

কাছ থেকে ফোন পেতাম। স্রেফ আইডিয়া, স্যার... তবে আমার মনে হচ্ছে, আগেই ভিতরের লোকজনকে খুন করা হয়েছে, আগুন লাগানো হয়েছে সমস্ত সূত্র মুছে ফেলার জন্য। আগেও দেখেছি এমন।'

একমত হলেন সোয়ান। হতাশ চোখে তাকিয়ে থাকলেন জ্বলন্ত বাড়িটার দিকে। পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে যারাই জড়িত থাকুক, নিঃসন্দেহে তারা এক পা এগিয়ে আছে ওঁদের চেয়ে। ব্যাগলিকে সরিয়ে দিয়ে সত্যিই সব সূত্র মুছে ফেলেছে ওরা। এখন আর কিছু জানার উপায় রইল না। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনও একই কথা ভাবছেন।

'ভেরিফিকেশনের জন্য ওখানে কখন লোক ঢোকাতে পারবেন?' ফায়ার-চিফকে প্রশ্ন করলেন কর্নেল ডুগান।

বাড়ির দিকে একবার নজর বোলালেন পোলান্স্কি, তারপর বললেন, 'মাঝরাতের আগে নয়।'

'আমরা কিছু করতে পারি?'

'হ্যাঁ। প্রার্থনা করুন যাতে বৃষ্টি নামে।'

উল্টো ঘুরে আবার কাজ তদারক করতে চলে গেলেন পোলান্স্কি।

পনেরো

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এয়ারপোর্ট। রোম, ইটালি।

আসমারাগামী ফ্লাইট ধরতে ইথিওপিয়ান এয়ারলাইনের গেটের দিকে এগোচ্ছে রানা ও দিনা। হাঁটছে পাশাপাশি। রানার হাতে ওর দুটো ব্রিফকেস, দিনা কাঁধে ঝুলিয়েছে একমাত্র লাগেজ চামড়ার ব্যাগটা। দ্রুত পদক্ষেপে হাঁটছে দুজন, দীর্ঘ বিমানযাত্রায় বসে থাকতে থাকতে পা ধরে গেছে, দ্রুত হেঁটে জড়তা কাটাচ্ছে—সামনে আরও অনেকটা সময় বিমানেই বসে থাকতে হবে। হাঁটার ফাঁকে গল্প করছে ওরা, ইতোমধ্যে অনেকটাই সহজ হয়ে এসেছে ওদের সম্পর্ক।

ইথিওপিয়ান এয়ারলাইনের কাউন্টারে বয়স্কা এক কৃষ্ণাঙ্গী এয়ারলাইন-এজেন্ট দাঁড়ানো। ওখানে পৌঁছে মহিলার সঙ্গে আমহারিক ভাষায় কথা বলতে শুরু করল দিনা, একটু উত্তেজিত হতে দেখা গেল ওকে। কান পেতে আলাপচারিতা একটু শুনল রানা, কিন্তু কিছু বুঝতে পারল না। ওর দিকে ফিরে টিকেট চাইল দিনা, রানা বের করে দিতেই সেটা জমা দিল কাউন্টারে। বয়স্ক এজেন্টের সঙ্গে আরও মিনিটখানেক কথা বলল, তারপর সন্তুষ্ট হয়ে বোর্ডিং পাস-সহ ফেরত নিল টিকেটটা। রানাকে নিয়ে চলে এল ওয়েইটিং লাউঞ্জে।

ইরিত্রিয়ান ও ইথিওপিয়ান প্রচুর যাত্রী বসে আছে ওখানে, কৌতূহলী হয়ে মুখগুলোর উপর চোখ বোলাল রানা। লক্ষ করল—দিনা একাই নয়, অপেক্ষমাণ বেশিরভাগ তরুণীই আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী। ইরিত্রিয়ান মেয়েরা জাতিগতভাবেই সম্ভবত সুন্দরী। পুরুষরা তেমন একটা সুদর্শন নয়—অন্তত রানা

চোখে।

'কপাল ভাল তোমার, আমি সঙ্গে ছিলাম,' বোর্ডিং পাস আর টিকেট ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল দিনা। 'তোমাকে স্ট্যাণ্ডবাই প্যাসেঞ্জার হিসেবে রেখেছিল ওরা। আমি যদি বকাঝকা দিয়ে চেক-ইন না করাতাম, তা হলে ফ্লাইট থেকে বাদ পড়ে যেতে।' কাউন্টারের দিকে আড়চোখে তাকাল ও। 'ডাইনিটা হয়তো প্লেনে চড়ার আগে খবরটা বলতই না তোমাকে।'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুমি আমার সঙ্গে যাচ্ছ না।'

মাথা ঝাঁকাল দিনা, হাত দিয়ে মুখের উপর পড়ে থাকা চুল সরাল। 'ঠিকই ধরেছ। সরি, তোমাকে আগে বলা হয়নি—আগামীকাল লণ্ডনে একটা মিটিং আছে আমার। একদিন পর আসমারায় যাব... যদি কাজ শেষ করতে পারি আরকী!'

'নো প্রবলেম।'

'ভাল কথা, তুমি উঠছ কোথায়?'

'*অ্যাম্বাসয়রা* হোটেলে রিজার্ভেশন দেয়া আছে।'

'গুড চয়েস,' মাথা দোলাল দিনা। 'আসমারার সবচেয়ে ভাল হোটেলগুলোর একটা। তবে ইয়োরোপ-আমেরিকার সঙ্গে মেলাতে যেয়ো না। সেই বিদেশি শাসনামলে তৈরি হয়েছে *অ্যাম্বাসয়রা*, বড্ড পুরনো।'

'কোন শাসনামল—ইথিওপিয়ান?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'উঁহুঁ,' হাসল দিনা। 'ইটালিয়ান। বিশের দশকে বানানো হোটেল ওটা। কয়েকটা পরামর্শ দিই—পাকস্থলির উপর যদি যথেষ্ট আস্থা না থাকে, তা হলে ওদের কফি খেয়ো না; পানির ব্যাপারেও সাবধান! বটলড্ ওঅটর ছাড়া আর কিছু মুখে দিয়ো না।'

'সেরা হোটেলের এই নমুনা?' ঠাট্টার সুরে বলল রানা।

'তা হলেই বোঝো, দেশটার কী অবস্থা!' কাঁধ ঝাঁকাল দিনা। 'যাক গে, ওসব নিয়ে চিন্তা কোরো না। তোমার গাইড—আবেল আফরাকিকে বলে দেয়া হয়েছে, এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে আসবে। ওর সঙ্গে পরিচয় নেই, তবে যদ্দূর শুনলাম... ভাল লোক। সমস্যা হলে ওকে বোলো, সাহায্য করতে পারবে।'

ব্যাগটা ঠিকমত কাঁধে ঝোলাল ও। তারপর হাত বাড়িয়ে দিল হ্যাণ্ডশেকের জন্য। 'গুড বাই, মি. রানা। হ্যাভ আ নাইস ফ্লাইট।'

ভুরু কোঁচকাল রানা। বড্ড ফর্মাল হয়ে গেল বিদায়টা। দীর্ঘ ট্রান্স-আটলান্টিক ফ্লাইটে গড়ে ওঠা ঘনিষ্ঠতা যেন ভুলেই গেছে দিনা। কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাতটা ধরল ও। একই ভঙ্গিতে বলল, 'সেইম টু ইউ। আশা করি আবার দেখা হবে।'

অপ্রত্যাশিতভাবে ওর কাছে ঘেঁষে এল দিনা। গালে চুমু দিয়ে বলল, 'ভেবো না তোমাকে ইচ্ছাকৃতভাবে এভাবে ফেলে চলে যাচ্ছি। একসঙ্গে যেতে পারলে আমিও খুশি হতাম, কিন্তু কী করব... হাত-পা বাঁধা! সরি!'

'ইটস্ ওকে,' তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলল রানা। দিনার লোভনীয় ঠোঁটদুটোর স্পর্শ পেয়ে বুকের ভিতর ধক করে উঠেছিল। 'আমি কিছু মনে করিনি।'

'যাই তা হলে। আশা করি পরশুই আবার দেখা হচ্ছে।' মাথা ঝাঁকিয়ে বিদায় দিল রানা। উল্টো ঘুরে চলে গেল দিনা। ওর গমনপথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ও অনেকক্ষণ, যখন নিশ্চিত হলো—চলে গেছে মেয়েটা, তখনই আবার ফিরে গেল ইথিওপিয়ান এয়ারলাইনের কাউন্টারে।

'ভুল বোঝাবুঝির জন্য অত্যন্ত দুঃখিত, ম্যা'ম,' মুখে হাসি ফুটিয়ে বোর্ডিং পাস আর টিকেটটা বাড়িয়ে ধরল রানা। 'আসলে আমিই ফোন করে ফ্লাইটটা পিছাতে বলেছিলাম। আমার বান্ধবী বোধহয় বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা। যদি কিছু মনে না করেন, আমি পরের ফ্লাইটে আসমারায় যেতে চাই।'

ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল বয়স্কা এয়ারলাইন-এজেন্ট, বিড়বিড় করে কী যেন বলল, তবে হাত বাড়িয়ে নিল টিকেটটা।

এয়ারপোর্টে নেমেই রেস্টরুমে গিয়েছিল দিনা, তখনই পে-ফোন থেকে রিং দিয়ে ফ্লাইট বদলেছে রানা। মেয়েটার হাবভাব দেখে আগেই ওর সন্দেহ হয়েছে, আসমারায় যাচ্ছে না সে। গেলে রওনা হবার আগেই জানাত, একসঙ্গে টিকেট কাটত। হঠাৎ করে বিমানে, বা এয়ারপোর্টে ওকে দেখে যেন রানা অবাক না হয়, সেটা সামাল দেবার জন্য প্লেনে পাশে এসে বসেছে। আসলে দিনা কোথায় যায়, সেটা দেখার ইচ্ছে রানার। সেজন্যেই ফ্লাইট পিছিয়ে নিয়েছে।

কম্পিউটারে কয়েকটা বোতাম চাপল বয়স্কা মহিলা। তারপর ফিরিয়ে দিল টিকেটটা। 'এই নিন, আজ রাতের ফ্লাইট আপনার—সাতটা বিশে ছাড়বে, আসমারায় পৌঁছুবে লোকাল টাইম রাত ন'টা পনেরোতে। বাড়তি ভাড়া ছাড়া ফার্স্ট ক্লাসে আপগ্রেডও করে দিয়েছি আপনাকে, রাতের ফ্লাইটে যাত্রী খুব কম থাকে কি না!'

'অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে,' টিকেটটা ফেরত নিল রানা। 'বাই দ্য ওয়ে, *এল আল*-এর ওয়েইটিং এরিয়াটা কোথায়, বলতে পারেন?' ওটা ইজরায়েলি ন্যাশনাল এয়ারলাইন।

'এই কনকোর্সেই। শেষ মাথায়, হাতের ডানে।'

মহিলাকে আবার ধন্যবাদ জানাল রানা। হাঁটতে শুরু করল প্যাসেজ ধরে। তাড়াহুড়ো করল না, দিনাকে ফলো করবার দরকার নেই। ও মোটামুটি নিশ্চিত, মেয়েটাকে *এল আল*-এর লাউঞ্জেই পাওয়া যাবে। ছ'জন সদস্যের একটা পরিবারের আড়াল নিয়ে লাউঞ্জটাতে ঢুকল ও, সতর্ক দৃষ্টিতে দৃষ্টি বোলাল ভিতরে। কিন্তু দিনাকে কোথাও দেখা গেল না। গেটের দিকে নজর পড়ল—একটা বিমানে বোর্ডিং চলছে, তবে এম্বারকেশন টিউবের সামনে লাগানো প্ল্যাকার্ড বলছে, ওটার গন্তব্য লিসবন। আনমনে মাথা নাড়ল রানা—দিনা পর্তুগালে যাবে না। ফ্লাইট ইনফরমেশন মনিটরের দিকে তাকাল—তেল আবিবের বেন গিউরিয়ন এয়ারপোর্টের উদ্দেশে দেড় ঘণ্টা পর আরেকটা ফ্লাইট আছে। অপেক্ষা করবার সিদ্ধান্ত নিল ও, দেখা যাক ওটায় দিনা ওঠে কি না।

লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে টার্মিনাল-প্রান্তের একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে ঢুকল রানা, এক কোণের একটা টেবিল দখল করে বসল। রেস্টুরেন্টের ভিতর নানা জাত ও বর্ণের প্রচুর মানুষ, সহজে ওকে আলাদা করা যাবে না। কফি আর টোস্টের অর্ডার

দিয়ে *এল্ আল্*-এর লাউঞ্জের প্রবেশপথের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখল ও রেস্টুরেন্টের জানালা দিয়ে।

খাবার এসে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যে। টোস্টে হাত না দিয়ে কফি তুলে নিল রানা। মাথার ভিতরে ধীরে ধীরে আগুন জ্বলতে শুরু করেছে ওর। জীবনে অসংখ্য মিথ্যেবাদী দেখেছে ও, দিনা আবান তাদের প্রথম সারির একজন। প্লেনে বসে অম্লানবদনে গল্প শুনিয়ে গেছে সে, রানাও প্রায় বিশ্বাসই করে ফেলছিল ওর বানোয়াট কাহিনি। মোহনীয় নারী, সন্দেহ নেই।

মেয়েটির প্রতি কিছুটা দুর্বলতা এসে গিয়েছিল বলে নিজেকে গাল দিল ও। দিনা আবান কিংবা এডওয়ার্ড ব্যাগলি—এদের কাউকে বিশ্বাস করা চলে না। বিশ্বাস করা যাবে না ওদের ভাড়া করা গাইড আবেল আফরাকিকেও। লোকটা নিশ্চয়ই সময় ও সুযোগমত ওর পিঠে ছোরা মারার জন্য অপেক্ষা করছে।

পর পর তিন কাপ কফি খেল রানা। খিদে লাগায় টোস্টও খেল কয়েক কামড়। তারপর হঠাৎ করেই সচকিত হয়ে উঠল। ইরিত্রিয়ান সুন্দরীর একহারা দেহটাকে দেখতে পেয়েছে লাউঞ্জে ঢুকে যেতে। বিল চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল ও রেস্টুরেন্ট থেকে। সতর্ক পদক্ষেপে গিয়ে ঢুকল *এল্ আল্*-এর ওয়েইটিং লাউঞ্জে, নজর বোলাল ভিড়ের উপর।

প্রবেশপথের দিকে পিঠ দিয়ে একটা চেয়ারে বসে আছে দিনা, দৃষ্টি নিবদ্ধ লাউঞ্জের বিশাল ভিউয়িং উইণ্ডোর ওপারে—নীল-সাদা একটা জেটলাইনার দাঁড়িয়ে আছে টারমাকে, কিছুক্ষণের মধ্যে দিনাকে নিয়ে যাবে ইজরায়েলে... ওর রহস্যময় নিয়োগকর্তাদের কাছে। এতক্ষণ ধরে মাথায় চেপে থাকা সন্দেহটা সত্যি বলে প্রমাণিত হওয়ায় গম্ভীর হয়ে গেল রানা। সাবধানে আরেকটা আসন বেছে নিয়ে বসে পড়ল ও—দিনার দৃষ্টির আড়ালে।

শান্ত মাথায় ভাবতে শুরু করল রানা—সোহেলের অপহরণ, বৈরুত-ভিত্তিক টেরোরিস্ট, আর ওর বিশ্বাস অর্জনে সচেষ্ট ইজরায়েলি এজেন্টের মধ্যে যোগসূত্রটা কী হতে পারে? কিম্বারলাইট পাইপ নিয়ে সবাই এত মেতে উঠেছে কেন? ছোটখাট জিনিস তো নয় যে, খুঁজে পেলেই পকেটে ভরে নিয়ে আসা যাবে। মধ্যপ্রাচ্য থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরের একটা খনি থেকে ইজরায়েলি সরকার, বা টেরোরিস্ট গ্রুপ... কারও পক্ষেই তো হীরা কেড়ে আনা সম্ভব নয়! তা হলে কী চাইছে ওরা? অনেক ভেবেও এ রহস্যের কোনও থই পেল না রানা।

একটু পরেই দিনাকে উঠে দাঁড়াতে দেখল ও। এম্বারকেশনের টিউব ধরে বিমানের দিকে চলে গেল মেয়েটা। রানাও উঠে পড়ল, এখানে আর দেখার কিছু নেই। লাউঞ্জ থেকে বেরুতে গিয়েই নিজের নাম শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল। মাথার উপর, ছাদ থেকে ঝুলছে অ্যানাউন্সমেন্ট সিস্টেমের স্পিকার—ওখান থেকেই শোনা যাচ্ছে নামটা। প্রথমে ইটালিয়ান, তারপর ইংরেজি ভাষায় নির্লিপ্তভাবে ঘোষণা করা হচ্ছে: 'মি. মাসুদ রানা, আপনার একটি কল আছে। দয়া করে সাদা রঙের যে-কোনও একটি ফোন তুলুন।'

মাথা ঘোরাতেই ওয়াকওয়ের একপাশে টেলিফোন বুদের সারি দেখতে পেল রানা। তাড়াতাড়ি একটা সাদা রঙের সেটের রিসিভার তুলল ও। বলল, 'মাসুদ

রানা বলছি।'

'একটু অপেক্ষা করুন, সার,' ওপাশ থেকে বলল অপারেটর।

খুটখাট শব্দ হলো, তারপর ওপাশ থেকে ভেসে এল নতুন একটা কণ্ঠ। অচেনা, আগে শোনেনি রানা। ভদ্রতাসূচক কথাবার্তায় গেল না লোকটা, সোজাসাপ্টা ভাষায় বলল, 'আপনার সঙ্গে কয়েকটা বিষয়ে আলোচনা করে নেয়া দরকার, মি. রানা। আমার সন্দেহ হচ্ছে, আপনার মোটা মাথায় এখন পর্যন্ত সবকিছু ভাল মত ঢোকেনি, নইলে বন্ধুর জীবন নিয়ে ওভাবে ছিনিমিনি খেলতেন না।'

স্থির হয়ে গেল রানা, দম ফেলতে ভুলে গেছে। উদ্বিগ্ন গলায় বলল, 'সোহেল... ওর কোনও ক্ষতি করোনি তো তোমরা?'

প্রশ্নটা না শোনার ভান করে লোকটা বলল, 'ওয়াশিংটনে যা ঘটেছে, সেটা আমরা ভুলব না। শাস্তি দেয়া হবে অবশ্যই, তবে সেটা আপনাকে নয়, সোহেল আহমেদকে! ওকে এখন পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে স্রেফ আপনাকে একটা শেষ সুযোগ দেবার জন্য। কিন্তু ফের যদি কোনওরকম তেড়িবেড়ি দেখা যায়, তা হলে ওর এমন অবস্থা করা হবে, যাতে ওর জন্মদাত্রী মা-ও লাশটা চিনতে না পারে।'

জবাব দিল না রানা, ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে ওর মাথায়। দিনা যাবার পর পরই এসেছে ফোনটা, ও থাকতে নয়! ব্যাপারটা কো-ইনসিডেন্স হতে পারে না। অপহরণকারীরা ব্যাগলি আর দিনার সামনে নিজেদের খবর ফাঁস হতে দিতে চায় না, সেটা আগেই জানিয়েছে। এর মানে হতে পারে একটাই। ওর উপর নজর রাখছে লোকগুলো, টেলিফোনের লোকটাও নিশ্চয়ই কাছাকাছিই আছে—দিনাকে চলে যেতে দেখেছে। পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে তবেই রিং দিয়েছে ওকে।

আশপাশে নজর বোলাল রানা। পে-ফোনের সামনে অসংখ্য মানুষ, মোবাইল নিয়েও ঘুরছে অনেকে। এদের মধ্যে কে যে শত্রু, সেটা বুঝতে পারল না।

'ওয়েল ডান, মি. রানা,' হেসে উঠল টেলিফোনের কণ্ঠটা। 'ঠিকই ধরেছেন, আমি আপনার খুব কাছেই আছি। তবে ওভাবে আমাকে খোঁজাখুঁজি করে কাজটা ঠিক করছেন না। এমন চলতে থাকলে সোহেল আহমেদ আজকের রাতটাও দেখতে পাবে না।'

ঘাড়ের খাটো চুলগুলো খাড়া হয়ে গেল রানার। ওকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে লোকটা, অথচ নিজে অদৃশ্য! লোকটার দৃষ্টি যেন অনুভব করতে পারছে রানা নিজের শরীরে। স্থির হয়ে দাঁড়াল ও।

'গুড,' বলল লোকটা। 'ইচ্ছে করেই মিস দিনা আবান চলে যাবার পর ফোন করেছি আমি। ওর ব্যাপারে কিছু বলার আছে আমার। কান খাড়া করে শুনুন—যদি ওর কোনও ক্ষতি করেন আপনি, সেটা খুব খারাপভাবে নেব আমরা। ওর ইজরায়েলি কানেকশনের ব্যাপারে জেনেছেন আপনি, তা-ই না? খবরটা নিজের মধ্যে চেপে রাখুন। ওকে বিষয়টা নিয়ে প্রশ্ন করতে যাবেন না... উল্টোপাল্টা কিছু বলে ওর কাছ থেকে কিছু জানবার চেষ্টা করবেন না, ক্লিয়ার? যে-কাজ করতে এসেছেন, চুপচাপ সে-কাজ করবেন। নইলে আপনার বন্ধু মরবে।'

'দিনার জন্য তোমাদের এত দরদ কেন, জানতে পারি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'দরদটা আপনার স্বার্থেই, মি. রানা। বিশ্বাস হয়তো করবেন না, কিন্তু জেনে রাখুন—এ-মুহূর্তে ওই দিনা আবানই আপনার একমাত্র মিত্র। আপনারা দুজন একই লক্ষ্যের পিছনে ছুটছেন, ওর সাহায্য প্রয়োজন হবে আপনার। খামোকা ওর সঙ্গে ঝামেলা করলে সাহায্যটা হারাবেন—আমরা সেটা চাই না। কারণ, আপনাদের সাফল্যের মধ্যেই লুকিয়ে আছে আমাদের সাফল্য।'

'তা হলে সামনে এসে হাত মেলাচ্ছ না কেন?'

হাসল লোকটা। 'ওটা শুধু আপনার স্বপ্নে সম্ভব হতে পারে। যাক গে... কী বলেছি আমি, বুঝতে পেরেছেন? যদি রাজি থাকেন, তা হলে মাথাটা ঝাঁকান।'

ঝাঁকাল রানা।

'এতক্ষণে একটা বুদ্ধিমানের মত কাজ করলেন,' সন্তুষ্টি ফুটল লোকটার কণ্ঠে। 'আপাতত বিদায় নিচ্ছি, আপনি *অ্যাম্বাসয়রা* হোটেলে ওঠার পর আবার নির্দেশ পাবেন। ফিল্ডে কাজ করার সময় কীভাবে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন, সেটা তখন জানিয়ে দেয়া হবে। গুড বাই, মি. রানা। ফোন রাখার পর যেভাবে আছেন, ওভাবেই থাকবেন কিছুক্ষণ। আমার টিমের আরেকজন লোক নজর রাখছে আপনার ওপর; যদি দেখে আপনি আমাকে ধাওয়া করবার চেষ্টা করছেন, তা হলে স্রেফ খুন হয়ে যাবেন।'

নীরব হয়ে গেল ফোন। রিসিভার কানে ঠেকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল রানা। অচেনা লোকটাকে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যাবার সুযোগ দিচ্ছে। দ্বিতীয় আরেকজন ওয়াচার আছে বলে বিশ্বাস হচ্ছে না ওর, তারপরও ঝুঁকি নেয়ার কোনও মানে হয় না।

পঞ্চাশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে হাসাব—সেলফোনটা ঢুকিয়ে ফেলেছে জ্যাকেটের পকেটে, চোখের সামনে ক্যামেরা তুলে জুম লেন্সের মাধ্যমে দেখছে রানাকে। চেহারায় সন্তোষ ফুটল তার—নড়ছে না রানা, নির্দেশটা মেনে নিয়েছে। ক্যামেরাটা নামিয়ে ফেলল সে। উল্টো ঘুরে মিশে গেল টার্মিনালের জনস্রোতে।

দলের সমস্ত লোক আগেই আমেরিকা ছেড়েছে—একটা গ্রুপ গেছে [illegible] আহমেদের সঙ্গে, বাকিরা সাধারণ ফ্লাইটে। কিন্তু এয়ার-চার্টারের ওখানে ফেঁসে যাওয়া ঝামেলাটার কারণে বাড়তি কয়েকটা দিন থাকতে হয়েছে হাসাবকে, মুছে দিয়ে আসতে হয়েছে সব সূত্র; যাতে কিডন্যাপিং বা গোলাগুলির ঘটনার ক্ষেত্রে ওদের সম্পৃক্ততার প্রমাণ না পায়। চেষ্টার ক্রটি করেনি সে, তারপরও পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। শহীদ হয়ে যাওয়া দুই সাথীর মৃতদেহ আর অস্ত্রগুলো রয়ে গেছে এফবিআই-এর কাছে। ওগুলো থেকে ওদের পরিচয় ফাঁস হয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রবল। আশা শুধু এটুকুই—একগাদা মিথ্যে সূত্র ছড়িয়ে রেখেছে ওরা, যাতে সন্দেহটা আরব সন্ত্রাসীদের ওপর পড়ে। এমনকী [illegible] আহমেদকে কিডন্যাপ করবার সময়ও আরবিতে কথা বলেছে ওরা বাকি আশপাশের লোকজনকে শোনাবার জন্য। এই মিথ্যে সূত্রগুলো এফবিআই[illegible] চাই [illegible]।

কিছুদিন ভিন্নপথে পরিচালিত করলেই ওদের উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে।

ওয়াশিংটনের সস্তা একটা হোটেলে গত দু'দিন ছিল হাসাব—থাকা বলতে শুধু রাতে ঘুমিয়েছে, বাকি প্রায় পুরোটা সময় একাকী সার্ভেইলান্স চালিয়ে গেছে রানার উপর... ওর প্রতিটা পদক্ষেপ মনিটর করেছে। রোমগামী একই ফ্লাইটে সিট বুক করতে মোটেই অসুবিধে হয়নি তার, রানার পিছনে আঠার মত সেঁটে থাকছে সে। দক্ষ একজন অপারেটিভ এই হাসাব—জানে, নিখুঁত পরিকল্পনাও সবক্ষেত্রে সফল হয় না। প্রতিপক্ষের চাল আন্দাজ করতে পারে অনেকে, সে-অনুসারে কয়েক ডজন পাল্টা-চালও তৈরি রাখা যেতে পারে... তারপরও মাঠে নামার পর সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত একেকটা পরিস্থিতির উদয় হয়। তখন সবকিছু নিজের নখদর্পণে না থাকলে মস্ত বিপদ দেখা দেয়।

রানার প্রতিটা পদক্ষেপ নিজের নখদর্পণে রাখার জন্যই খাটছে হাসাব। শুরুতে ভেতো বাঙালিটার চেয়ে কয়েক কদম এগিয়ে ছিল সে, ইচ্ছেমত তাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে পারছিল; কিন্তু পরিস্থিতি দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। রানা খুব দ্রুত ওর নিয়ন্ত্রণের বলয় ভেদ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। এখনও ওকে সিধে রাখবার লাঠি হাসাবের হাতে রয়েছে বটে, তবে কতদিন থাকবে, সেটাই প্রশ্ন—রানা যে-কোনও সময় সোহেল আহমেদের আশা ছেড়ে দিতে পারে।

তবে এতকিছুর পরও সব কষ্ট, সব ঝামেলার শেষে যে-পুরস্কার অপেক্ষা করছে, সেটাই শক্তি জোগাচ্ছে হাসাবকে। শুধু ওদের, কিংবা মধ্যপ্রাচ্যের মানুষদের নয়; বরং সারা বিশ্বের মানুষের মনে সত্যিকার ধর্মবিশ্বাস জাগাবার মত সহস্র বছরের পুরনো এক ধর্মীয় নিদর্শন হাতে পাওয়া যাবে, যার কথা শুধু গল্পগাথাতেই শোনা যায়। আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে ওদের পয়গম্বর যেভাবে অবিশ্বাসীদের সামনে ঈশ্বরের বাণী নিয়ে গিয়েছিলেন, ঠিক একইভাবে হাসাবও সেই বাণী নিয়ে যেতে পারবে আজকের মানুষের সামনে। স্বপ্নে বিভোর হয়ে হাঁটতে থাকল ও।

আচমকা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ে বিপদসঙ্কেত টের পেল হাসাব। ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল। লম্বা-চওড়া এক আফ্রিকান লোক আসছিল ওর পিছু পিছু—হাসাব ঘুরে দাঁড়াতেই থমকে গেছে সে। এয়ারলাইন ক্যাটারিং সার্ভিসের ইউনিফর্ম পরে আছে লোকটা, কিন্তু হাসাবের অভিজ্ঞ চোখ ঠিকই চিনে ফেলল তাকে—ওকে অনুসরণ করছিল ব্যাটা। প্রথমে ভড়কে গেল আফ্রিকান ধরা পড়ে যাওয়ায়, তারপর কেন যেন খেপে গেল—হিংস্রতা ফুটল চেহারায়। চোখের পলকে পোশাকের আড়াল থেকে বের করে আনল একটা শর্ট-ব্যারেল মেশিন-পিস্তল। নিজের কপালকে শাপ-শাপান্ত করল হাসাব—বিরাট বোকামি করে ফেলেছে সে, রানার উপর নজর রাখতে গিয়ে ভুলে গেছে, কেউ ওর উপরও নজর রাখতে পারে!

কয়েক সেকেণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল হাসাব, অস্ত্রধারীও ইতস্তত করছে। কিন্তু হঠাৎ মেশিন-পিস্তলটা চোখে পড়তে চিৎকার করে উঠল এক মহিলা, আর সঙ্গে সঙ্গে নার্ভ হারাল আফ্রিকান লোকটা। ট্রিগার চেপে দিল সে।

ঠিক সচেতনভাবে নয়, স্রেফ প্রবৃত্তি আর ট্রেইনিঙের বশে মেঝেতে ঝাঁপ দিল হাসাব। গুলির প্রথম ধাক্কা থেকে বাঁচল বটে, তবে সেটা দ্রুত রিঅ্যাক্ট করতে

পারার জন্য নয়; হামলাকারীর তাড়াহুড়োর কারণে। নিশানা ঠিক না করে ট্রিগার চেপে দিয়েছে কালো লোকটা, লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলি চলে গেল এদিক-সেদিক। দেয়াল আর আসবাবে বিঁধল কিছু বুলেট, একটা টিভি মনিটর চুরমার হয়ে ভাঙা কাঁচ ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।

আতঙ্কের একটা ঢেউ বয়ে গেল কনকোর্সের ভিতর। সাধারণ যাত্রীরা চেঁচামেচি করতে করতে ছুটে পালাতে শুরু করেছে। সঙ্গে কোনও অস্ত্র নেই, তাই হামাগুড়ি দিয়ে সরে যেতে চাইল হাসাব—কাজটা অসম্ভব... কাভার বলতে কিছু নেই আশপাশে; রয়েছে শুধু ছুটন্ত মানুষ, পালাবার সময় মেঝেতে পড়ে থাকা হাসাবকে মাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। আবার গুলি করল কালো লোকটা—দু'জন নিরীহ যাত্রীর গায়ে লাগল বুলেট, ছিটকে পড়ে গেল তারা। অন্যান্য যাত্রীরা ঝটপট ওখান থেকে সরে গিয়ে হাসাবকে পুরোপুরি উন্মুক্ত করে দিল।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল হাসাব, দৌড়ে পালাতে চাইল... কিন্তু পিছন থেকে তৃতীয়বারের মত গর্জে উঠল মেশিন-পিস্তল। উরুতে আঘাত পেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ও। চোখ ফেরাতেই ওখানে চওড়া একটা গর্ত দেখতে পেল, কলকল করে রক্ত বেরুচ্ছে। হতবুদ্ধি হলো না হাসাব, উপুড় হয়ে পজিশন ঠিক করল—আহত পায়ের উপর যেন চাপ না পড়ে। তারপর দু'হাত আর বুকে ভর দিয়ে সরীসৃপের মত এগোতে শুরু করল সামনে। জানে, বাঁচার উপায় নেই, তারপরও অসহায়ভাবে মৃত্যুকে বরণ করবে না ও।

আবার গর্জে উঠল আততায়ীর আগ্নেয়াস্ত্র। এক ঝাঁক বুলেট এসে হাসাবের শরীরটাকে ঝাঁঝরা করে দিল। থামল না আফ্রিকান লোকটা, ট্রিগার চেপে রাখল—তালগোল পাকানো মাংসের পিণ্ড বানিয়ে দিচ্ছে দেহটাকে। কষ্ট বা ব্যথা অনুভবের সময় পেল না হাসাব, তার আগেই পাড়ি জমাল পরপারে।

ওর মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে টারমাকের দিককার ভিউয়িং উইণ্ডোর দিকে ফিরল কালো লোকটা। পরপর দু'ক্লিপ খালি করল জানালার উপর। পুরু ডাবল-প্লেটের কাঁচ ওখানে, তারপরও বুলেটের এই বিরতিহীন আঘাত সইতে পারল না, চুরমার হয়ে গেল—নীচের অ্যাসফল্টের ট্যাক্সিওয়ের উপর ঝরে পড়ল ঝর ঝর করে।

মহা-হট্টগোলের ভিতর ভাঙা জানালা টপকে লাফ দিল অস্ত্রধারী, দক্ষ জিমন্যাস্টের মত নেমে এল ট্যাক্সিওয়েতে। একটা গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর একটা বোয়িং ৭৩৭-এর তলা দিয়ে ছুটে চলে গেল। কারও সাহস হলো না উঁকি দেবার। সুযোগটা হাতছাড়া করল না লোকটা, আরেকটা বিমানের আড়ালে গিয়ে খুলে ফেলল ক্যাটারিং সার্ভিসের ইউনিফর্ম। প্রথমটার তলায় আরেকটা ইউনিফর্ম আছে তার—এটা ক্লিনিং ক্রু-র। খুলে ফেলা পোশাক বিমানের চাকার পিছনে গুঁজে রাখল সে, সহজ ভঙ্গিতে বেরিয়ে এসে যোগ দিল টারমাকের আরেক প্রান্তে কাজ করতে থাকা পরিচ্ছন্নতা-কর্মীদের সঙ্গে। কেউ চোখ তুলে তাকাল না লোকটার দিকে, ওখানে সবাই কালো কিংবা শ্যামলা বর্ণের... সবাই বিদেশি। শ্বেতাঙ্গ ইয়োরোপিয়ানরা ময়লা পরিষ্কারের মত ছোট কাজ করতে চায় না।

অস্ত্রধারী লোকটা পালিয়ে যাবার কয়েক সেকেণ্ড পর অকুস্থলে পৌঁছুল রানা। হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে ওর। শুরুতে ভেবেছিল গুলিবর্ষণটার টার্গেট ও-ই, ভুলটা ভেঙে যেতেই ছুটে এসেছে। পড়ে থাকা তিনটে মৃতদেহের দিকে চোখ সরু করে তাকাল ও, একনজরেই বুঝতে পেরেছে—আসল টার্গেট কে ছিল। রক্তমাংস তালগোল পাকিয়ে গেছে, তারপরও হাসাবের দেহটার দিকে তাকিয়ে ভিডিও টেপে দেখা নেতা গোছের লোকটার সঙ্গে উচ্চতা আর দৈহিক গঠনের মিল খুঁজে পেল রানা।

নিচু হয়ে দ্রুত লাশটার শরীর-তল্লাশি করল রানা। কিন্তু কোনও ধরনের আই.ডি. পেল না। পকেটে রয়েছে শুধু সেলফোনটা, ওটাই বের করে নিল—চেষ্টা করে দেখবে, ফোন থেকে কোনও সূত্র পাওয়া যায় কি না। সেলফোনটা নিজের পকেটে গুঁজে রক্তাক্ত দেহটার দিকে শেষবারের মত তাকাল ও। বিড় বিড় করে বলল, 'মরে গিয়ে বেঁচেছ তুমি, মিস্টার। যদি আমার হাতে পড়তে, তা হলে এরচেয়ে অনেকগুণ খারাপ অবস্থা করে ছাড়তাম!'

পুলিশের গাড়ি আসছে সাইরেন বাজিয়ে। উল্টো ঘুরে ওখান থেকে সরে গেল রানা।

ষোলো

আসমারা, ইরিত্রিয়া।

এমনিতে নিজেকে কার্পেন্টার বলে পরিচয় দেয় আবেল আফরাকি। চাপাচাপি করলেই শুধু স্বীকার করে—মাইনিঙের ব্যাপারেও মোটামুটি জ্ঞান আছে তার, ইথিওপিয়ান শাসনের সময় জাপানিদের অধীনে দেশের দক্ষিণভাগে বেশ কয়েকটা তামার খনিতে কাজ করেছে সে। সত্য গোপন করার স্বভাবটা মজ্জাগত নয় তার, তবে অনেক কিছুই বাঁচার তাগিদে চাপা দিয়ে রাখতে হয়। এবং চেপে রাখবার মত অনেক অধ্যায় রয়েছে তার জীবনে।

লড়াকু স্বভাবের মানুষ আবেল। শৈশব-কৈশোর থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত প্রচুর ঝড়-ঝাপটা সইতে হয়েছে তাকে, সব মোকাবেলা করতে হয়েছে নিজের চেষ্টায়... আজও টিকে আছে ও। কঠিন সে-অভিজ্ঞতার কথা কাউকে বলে না ও, অনেকটা সচেতনভাবে নিজেকে গুটিয়ে রাখে।

স্বাধীনতা যুদ্ধে আবেলের ভূমিকার বিষয়ে গুটিকয়েক লোক শুধু জানে—তারা সবাই ইরিত্রিয়ান পক্ষের। দীর্ঘ পনেরো বছরের সৈনিক জীবনে যত ইথিওপিয়ান, কিউবান আর রাশান সৈনিক ওর মুখোমুখি হয়েছিল, তাদের বেশিরভাগই গল্প শোনাবার জন্য ফিরতে পারেনি। ইরিত্রিয়ার যুদ্ধের সেরা যোদ্ধাদের একজন এই আবেল, অথচ প্রমাণ হিসেবে দেখাবার মত বড় কোনও আঘাত তার শরীরে নেই—ব্যাপারটা দুর্ভাগ্য, নাকি অলৌকিক কোনও আশীর্বাদ, কে জানে!

দেশের মানুষের মুক্তির জন্য সারাটা জীবন লড়াই করেছে আবেল, কিন্তু

চাই ঐশ্বর্য-১

নতুন এই পৃথিবীতে ওর নিজেরই জায়গা নেই। অনেকটা ইচ্ছা করেই সমাজ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে ও, গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসায়নি। অন্যদের মত নিরুদ্বেগে থাকতে পারে না আবেল, বিশ্বাস করে—শান্তি চিরস্থায়ী নয়। এখনও অনেক লড়াই বাকি আছে ওদের।

খুব একটা লম্বা নয় ও—টেনেটুনে পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি হবে। হঠাৎ দেখায় আফ্রিকার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যোদ্ধাদের একজন বলে মনেই হয় না ওকে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, অন্তত পঁচাত্তরজন শত্রুকে নিশ্চিতভাবে খতম করেছে সে।

স্রেফ সাদাসিধে একজন মানুষের মত দেখায় ওকে, নার্ভাস ভঙ্গিতে সারাক্ষণ ধূমপান করতে থাকা একজন নিরীহ মানুষ! স্বাভাবিকের তুলনায় একটু লম্বা হাতদুটো সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকে একের পর এক সিগারেট রোল করার কাজে।

নাকটা বেশ খাড়া আবেলের, দাড়ি-গোঁফ নেই। ঠিক সুদর্শন বলা যাবে না তাকে, তবে ভাল করে তাকালে বোঝা যায়—চেহারার কোথায় যেন একটা জৌলুস আছে। আসমারা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে আছে সে এ মুহূর্তে, অপেক্ষা করছে রোম থেকে ইথিওপিয়ান এয়ারলাইনের ফ্লাইট পৌঁছুবার। ওর মত অপেক্ষা করছে অনেকেই, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে ওকে সবার চাইতে আলাদা দেখাচ্ছে ওই বিশেষ জৌলুসের কারণেই। আশপাশের লোকজন তাই অনেকটা অবচেতনভাবেই ওর কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রাখছে, কাছে ঘেঁষছে না।

আসমারার এয়ারপোর্টটা সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনার ফসল। এমন একটা ভবিষ্যতের কথা ভেবে এটা তৈরি করা হয়েছে, যার দেখা পেতে বহু সময় লাগবে। বর্তমানে ধারণক্ষমতার মাত্র চারভাগের একভাগ ফ্লাইট হ্যাণ্ডেল করে এয়ারপোর্টটা। একতলা টার্মিনাল ভবন বেশ বড়, ইঁট ব্যবহার করা হয়নি, পাথরের ঢালাই দিয়ে গড়া; তারপরও রোমের ফ্লাইট সগর্জনে রানওয়েতে নেমে আসতেই শব্দের তীব্রতায় থর থর করে কেঁপে উঠল। অপেক্ষমাণ জনতা খুশি হয়ে উঠল, বেশ অনেকটা সময় ধরে প্রিয়জনদের অপেক্ষায় বসে থাকতে হয়েছে তাদের—বিমানটা ইয়োরোপ থেকে ছাড়তে দেরি করেছে, এ-খবর আগে পায়নি কেউ। একযোগে অ্যারাইভাল লাউঞ্জের দিকে এগোতে শুরু করল সবাই, আবেল থাকল ভিড়ের পিছনে। হঠাৎ করেই খটকা অনুভব করল ও। এবং সতর্ক হলো।

ভিড়টার মাঝে কয়েকজন সুদানিজ লোককে দেখা যাচ্ছে, সবাই পুরুষ। সেটা অবশ্য অস্বাভাবিক নয়, ওদের সমাজে মেয়েরা প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করে না। আবেলকে সন্দিহান করে তুলল ওদের চেহারা-সুরত। প্রত্যেকে ভাল জামাকাপড় পরে আছে—স্ল্যাকস্ আর গলা খোলা শার্ট। ওটাই অস্বাভাবিক, আবেলের মত মানুষের সন্দিহান হয়ে ওঠার জন্য যথেষ্ট। শান্ত চোখে লোকগুলোকে লক্ষ করল ও, বুঝতে পারল—এরা আসলে *শিফটা*... সুদানিজ দস্যু। পোড়-খাওয়া যোদ্ধা আবেল, আরেকজন যোদ্ধাকে চিনতে অসুবিধে হয় না ওর।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে ভিড়ের সঙ্গে মিশে গেল আবেল, কায়দা করে চার সুদানিজের বাম পাশে গিয়ে দাঁড়াল, আড়চোখে তাকাল লোকগুলোর দিকে। একজনের হাতে একটা সাদা-কালো ছবি দেখতে পেল ও—সুদর্শন এক যুবককে

দেখা যাচ্ছে ছবিতে, চোখদুটো মায়াময়, মাথার কালো চুল ব্যাকব্রাশ করা। মাসুদ রানা নামে যাকে ও রিসিভ করতে এসেছে, তার সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে চেহারাটা। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল আবেল—লোকগুলোর ঢোলা শার্টের তলায় অস্ত্র আছে, কোমরে গোঁজা একটা পিস্তলের বাটও দেখতে পেল ও পলকের জন্য।

প্যাসেঞ্জাররা টার্মিনালে ঢুকতে শুরু করতেই ব্যস্ত হয়ে উঠতে দেখা গেল সুদানিজ গেরিলাদের। সবার মুখ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে, মিলিয়ে নিচ্ছে হাতে ধরা ফটোগ্রাফের সঙ্গে। শেষ যাত্রীটি টার্মিনালে ঢুকতেই চঞ্চল হয়ে উঠল ওরা, আড়চোখে তাকাল একে অপরের দিকে। তরতাজা এক যুবক, গায়ের রং তামাটে, আড়াইশো যাত্রীর ভিতর তার মত গায়ের রঙ আর কারও নেই।

অসহায় বোধ করল আবেল। অস্ত্র নেই ওর সঙ্গে, ইরিত্রিয়ায় অস্ত্র বহন করা নিষিদ্ধ। অ্যারাইভাল লাউঞ্জে দুজন তরুণ সৈনিক পাহারায় আছে বটে, কিন্তু তাদের সাহায্য পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস হলো না ওর। অল্প বয়েস দুজনেরই, অস্ত্র ধরা দেখে বোঝা যাচ্ছে একেবারেই আনাড়ি। বাধা দেওয়া তো দূরের কথা, শিফটা দস্যুদের বিরুদ্ধে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতেও পারবে না ওরা। তা ছাড়া ওর কথায় কিছু করতে চাইবে কি না তাতেও সন্দেহ আছে। কী করবে ভেবে পেল না আবেল, যুদ্ধের সময় তাৎক্ষণিকভাবে অনেক কিছু করতে পারত, চর্চার অভাবে সেই দক্ষতায় মরচে পড়ে গেছে। ঠোঁট কামড়ে তাকিয়ে রইল সে ভারতীয় চেহারার যাত্রীটির দিকে—কাস্টমস চেকিঙের জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছে লোকটা।

শিফটাদের আগে রানার কাছে পৌঁছুনোর জন্য এগোতে শুরু করল আবেল। ভিড়ের মধ্যে নির্মমভাবে কনুই চালাল, সরে যেতে বাধ্য করল প্রিয়জনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ব্যগ্র মানুষদের। প্রায় একই সময়ে শিফটাদের নেতাও এগোতে শুরু করেছে, তাকে অনুসরণ করছে অন্য তিনজন। ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিচ্ছে সামনে পড়া মানুষজনকে। বিরক্তিসূচক গুঞ্জন উঠল ভিড়ের মধ্যে, সেসবে কান দিল না সুদানিজ নেতা—নজর টার্গেটের উপর। আরেক দিক থেকে আবেলও যে এগোচ্ছে, সেটাও দেখতে পেল না।

আড়চোখে তাকাল আবেল, শিফটা-রা ওর চেয়ে দ্রুত এগোচ্ছে। চলার গতি বাড়িয়ে দিল ও, পিছিয়ে পড়লে চলবে না। কাস্টমস ডেস্কের সামনে পৌঁছে গেছে রানা—কর্তব্যরত কর্মকর্তার সামনে বাড়িয়ে ধরেছে পাসপোর্ট, খুলে ফেলেছে লাগেজ। এগোতে এগোতে আবার আড়চোখে তাকাল আবেল—শিফটাদের পিস্তল এখনও বেরিয়ে আসেনি হাতে; তার মানে ওরা রানাকে খুন করতে চায় না, চায় জ্যান্ত ধরতে। সামান্য স্বস্তি পেল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে।

দিক বদলে সুদানিজদের দিকে সরে যেতে শুরু করল আবেল, নাগালে পৌঁছেই মুঠো পাকিয়ে সজোরে ঘুসি চালাল এক দস্যুর মুখে। প্রচণ্ড আঘাত... পাক খেয়ে মেঝেতে আছড়ে পড়ল লোকটা—চোয়াল ভেঙে না গেলেও অন্তত হাড় নড়ে গেছে। দৃশ্যটা দেখে ভিড়ের ভিতর কয়েকজন মহিলা চেঁচিয়ে উঠল, শুরু হয়ে গেল হট্টগোল। সুযোগটা হাতছাড়া করল না আবেল, হামলা চালাল আরেক দস্যুর উপর। ইতোমধ্যে হাতঘড়ির ক্যাচটা খুলে যাওয়ায় মুঠোর উপর চলে এসেছে ওটা, ফলে ঘুসি চালানোয় চেইনের ঘষায় গালের চামড়া কেটে গেল

দ্বিতীয় সুদানিজের, চেহারা রক্তাক্ত হয়ে গেল। তৃতীয় আঘাতে প্রথমজনের মত মুখ থুবড়ে পড়ল এ-ও।

ঘটনার আকস্মিকতায় বোকা বনে গেছে শিফটা নেতা আর তার শেষ সঙ্গী। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে পড়ে থাকা দুই সহচরের দিকে, পিস্তল বের করতে ভুলে গেছে। ডিউটিতে থাকা দুই সৈনিকের চিৎকার শোনা গেল—গোলমালের উৎসের দিকে ছুটে আসছে তারা। ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে ওদেরকে ফাঁকি দিল আবেল। বিদেশি যুবক কাস্টমস্ ডেস্কের সামনে থেকে উল্টো ঘুরতেই খপ্ করে চেপে ধরল হাত, টান দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করল।

গুলির শব্দ হলো, তবে ওদের দিকে নয়। সৈনিকদের উদ্দেশে ফায়ার করছে সুদানিজ দস্যুরা। নরক ভেঙে পড়ল টার্মিনালের ভিতর। চেঁচাতে শুরু করল আতঙ্কিত যাত্রীরা, ছোটাছুটি শুরু করল প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে। গোলমালের ভিতর দিয়ে পথ করে টার্মিনালের মূল ফটকের কাছে পৌঁছে গেল আবেল, সঙ্গীর হাত ছাড়েনি। ছিটকে বেরিয়ে এল বাইরে। বিল্ডিং থেকে সামান্য দূরে পার্ক করে রেখেছে নিজের ফিয়াট সেডান, ওটার পিছনের দরজা খুলে ধাক্কা দিয়ে ওঠাল রানাকে। তারপর নিজে গিয়ে বসল ড্রাইভিং সিটে। ইঞ্জিন চালু করে গিয়ার দিল, সবেগে ধূলিধূসরিত রাস্তার উপর দিয়ে ছুটল ফিয়াট।

এয়ারপোর্টটা রিয়ারভিউ মিরর থেকে হারিয়ে যেতেই স্বস্তি অনুভব করল আবেল, কেউ অনুসরণ করছে না ওদেরকে। পুলিশি ঝামেলা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই—এদেশে ওরা এ-জাতীয় বিচ্ছিন্ন ঘটনা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় না... গোলাগুলি ওদের নিত্যদিনের রুটিনে পরিণত হয়েছে।

বড় করে শ্বাস ফেলল আবেল। মাথা না ঘুরিয়েই বলল, 'ইরিত্রিয়ায় স্বাগতম, মি. রানা। আমার নাম আবেল আফরাকি।'

'কওন মি. রানা?' হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত বলল পিছনের যাত্রীটি, আতঙ্কের ঠেলায় মাতৃভাষা হিন্দিতে কথা বলছে সে। *'মেরা নাম আমারজিৎ সিং হ্যায়, কওন হো তুম? কিঁউ মুঝে পাকাড়কে লে আয়ে হো?'*

আঁই? চমকে উঠে পিছনে তাকাল আবেল। বিরাট ভুল করে ফেলেছে সুদানিজদের মত ও-ও গায়ের রঙ দেখে অস্থির হয়ে পড়েছিল... এ লোক রানা নয়, মেরে-কেটে ভিন্ন এক লোককে উঠিয়ে নিয়ে এসেছে সে!

রোম, ইটালি।

আকাশ কালো করে নেমেছে বৃষ্টি, তীব্র ঝোড়ো বাতাসের ধাক্কায় প্রবল আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ছে এয়ারপোর্টের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা ওয়্যারহাউসগুলোর গায়ে। টিনের চালে এত জোরে শব্দ তুলছে যে, তা-তে এয়ারপোর্টে গজরাতে থাকা জেট ইঞ্জিনগুলোর আওয়াজও চাপা পড়ে যাচ্ছে। এপ্রিল মাসের তুলনায় আবহাওয়াটা বড্ড ঠাণ্ডা—সচরাচর যা ঘটে না, তা-ই ঘটেছে; উত্তর দিক থেকে এসেছে ঝড়টা, ক্যাবাটিক উইণ্ডের মত আল্পসের গা থেকে খাবলা দিয়ে নিয়ে এসেছে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস। বৃষ্টির সঙ্গে তাই হালকা তুষারও পড়ছে। মাঝরাতের শান্ত প্রহরটা হয়ে উঠেছে হিমেল ও রুদ্র।

ওয়্যারহাউসগুলোর মাঝখানের রাস্তা ধরে এগোচ্ছে গাড়িটা। মার্সিডিজ থ্রি হানড্রেডের ভিতর চুপচাপ বসে আছে মার্সেলো মানসিনি। এখানকার সবই বণ্ডেড-বিল্ডিং, মানে ভিতরে রাখা জিনিসগুলো কাস্টমস্ পার হয়ে এসেছে। কাস্টমস্-এর অফিসার ও কর্মচারীরা সেজন্য দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা ওগুলোর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকে। তবে আজ রাতে মোটা অঙ্কের ঘুষ দিয়ে ওদের চোখকান বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে; মাঝে মাঝেই করা হয় এমনটা।

বড় একটা ওয়্যারহাউসের সামনে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা ডিজেল-ট্রাক, সবগুলোর সঙ্গে ট্রেইলার আছে—মালামাল লোডিঙের জন্য তৈরি। অন্ধকারের ভিতর প্রাগৈতিহাসিক দৈত্যের মত লাগছে ওগুলোকে। ওয়্যারহাউসের গায়ে বিশাল আকারের দরজা আছে, বড় বড় ট্রাক আর ট্রেইলার ঢোকানো যায়; মানসিনির গাড়ির সামনের সিটে বসা সহচর একটা রিমোটে চাপ দিতেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে গেল অমন একটা দরজা, গাড়ি ঢুকে যেতেই বন্ধ হয়ে গেল আবার।

ব্রেক কষে চটপট গাড়ি থেকে নেমে পড়ল ড্রাইভার, ছুটে গিয়ে যন্ত্রচালিতের মত খুলে ধরল রিয়ার-ডোর। পাশ ফিরে গাড়ি থেকে পা বের করল মানসিনি, সঙ্গে সঙ্গে নিখুঁত মহড়া দেয়া স্টেজ-শো'র মত একসঙ্গে জ্বলে উঠল অজস্র বাতি, ওয়্যারহাউসের ভিতরটা ভাসিয়ে দিল আলোর বন্যায়।

বাক্স আর ক্রেট সাজিয়ে তৈরি করা বিশ ফুট উঁচু অনেকগুলো চওড়া কলাম সমান্তরালভাবে দখল করে রেখেছে ওয়্যারহাউসের ভিতরটা। মাঝখান দিয়ে রাখা হয়েছে ফর্কলিফট আর ক্রেন যাবার মত জায়গা। যে-দিকেই তাকানো হোক, প্যাকিং কেস ছাড়া আর কিছু চোখে পড়বে না। একটা অংশে রয়েছে বিশেষ আকারের কেস—কমার্শিয়াল এয়ার লাইনারের কার্গো স্পেসে সর্বোচ্চ মালামাল বহনের জন্য ডিজাইন করা; লোডিং কিংবা আনলোডিঙের অপেক্ষায় আছে ওগুলো। ভেজা আবহাওয়ার সোঁদা ভাব, যন্ত্রপাতির তেল-কালি আর শ্রমিকদের ঘাম মিশে বিচিত্র এক গন্ধে ভরে আছে পুরো জায়গাটা।

গাড়ি থেকে নেমে পা-পর্যন্ত লম্বা ওভারকোটটার ভাঁজ ঠিক করল মানসিনি—চার হাজার ডলার দাম ওটার, ওয়্যারহাউসের মেঝের তেল-পানি লাগতে দেয়া চলে না। ওভারকোটের তলায় পরে থাকা সুটের দাম ওটার দ্বিগুণ। নিজেকে কেমন দেখাচ্ছে, সে ব্যাপারে মাত্রাতিরিক্ত সচেতন মানসিনি, তাই গুদামের মত বদ্ধ পরিবেশেও নিজের আভিজাত্য বজায় রেখেছে।

অলস পায়ে হাঁটতে হাঁটতে পাশের একটা ক্রেটের উপর নজর বোলাল মানসিনি। গায়ে সাঁটা লেবেল বলছে—ওগুলো ম্যালেরিয়ার ওষুধ, কঙ্গোতে যাবে। হাসি ফুটল তার মুখে: নামেই ওষুধ, আসলে আটার গুঁড়ো ছাড়া পিলগুলোতে কিছু নেই। টেস্ট করা হলে দু-একটা কেমিক্যাল হয়তো পাওয়া যেতে পারে, তবে তা দিয়ে ম্যালেরিয়া সারানো সম্ভব নয়। অবশ্য সেটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে বলেও মনে হয় না—বিনে পয়সায় দেওয়া হচ্ছে ওষুধগুলো, তা ছাড়া আফ্রিকান অফিশিয়ালরা ওগুলো পার করে দেবার জন্য ফাও টাকা পাবে... এরপর টেস্ট-ফেস্ট করার দরকার কী! মাঝখান থেকে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের

কাছ থেকে ওষুধ বানানো বাবদ বেশ কিছু নগদ-নারায়ণ আয় হবে মানসিনির ফার্মাসিউটিকাল কোম্পানির।

মিলিয়ন ডলারের ওষুধ মাত্র বিশ হাজার ডলারে তৈরি করছে মানসিনি... পুরোটাই লাভ বলতে গেলে। এ-মুহূর্তে বিশটা শিপমেন্ট রেডি আছে ওর হাতে। প্রায় বিশ মিলিয়ন ডলার লাভ করতে যাচ্ছে অশিক্ষিত, অসভ্য কিছু কালো আফ্রিকানের মৃত্যুর বিনিময়ে—সঠিক ওষুধ পেলেও যারা অন্য কোনও না কোনও উপায়ে মারা পড়তই। নকল ওষুধের এই ব্যবসায় নতুন নেমেছে মানসিনি, তবে দ্রুত এ-লাইনের শীর্ষে উঠে আসছে।

সামনের দিকের কলামগুলো পেরিয়ে ওয়্যারহাউসের মাঝখানে চলে গেল মানসিনি, আজ রাতের জন্য ওখানটা খালি করে ফেলা হয়েছে। খোলা জায়গাটায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে দুটো শক্তিশালী ক্রেন, মুভিং আর্মদুটো পরস্পরের সঙ্গে লেগে রয়েছে প্রায়। বেশ কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে ওখানে, মানসিনির জন্য অপেক্ষা করছে। দুই ক্রেনের মাঝখানে ন্যাংটো করে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে দীর্ঘদেহী এক সুদানিজ আফ্রিকানকে, আজ বিকেলে এ-লোকটাই লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এয়ারপোর্টে খুন করেছে হাসাব ও নিরীহ দুই যাত্রীকে। সারা গা ঘামে চকচক করছে কৃষ্ণাঙ্গ লোকটার—তবে এ-ঘাম পরিশ্রম বা উত্তাপের কারণে সৃষ্ট নয়। আতঙ্কে সারা শরীর ভিজে গেছে তার। সভয়ে ক্রেনদুটোর দিকে তাকাচ্ছে সে—ওগুলোর মুভিং আর্ম থেকে নেমে এসেছে দুটো শক্ত দড়ি; ফাঁস হয়ে একটা আটকে রেখেছে দু'পা, অন্যটা বগলের তলা দিয়ে আটকে রেখেছে শরীরের উর্ধ্বাংশ।

বিরক্ত একটা চেহারা নিয়ে জটলাটার দিকে এগোল মানসিনি, ছোট্ট কাজটার জন্য তাকে এই রাতদুপুরে আসতে হওয়ায় মেজাজটা খাপ্পা হয়ে আছে। ভূমিকা না করে দাঁড়িয়ে থাকা একজনকে ইশারা করল সে, সঙ্গে সঙ্গে একটা ভিডিও ক্যামেরা চালু হলো, ছবি তুলবে পালাক্রমে মানসিনি ও বন্দি লোকটার।

নিজের উপর ক্যামেরা স্থির হতেই মুখ খুলল মানসিনি। ধীর-স্থির ও থমথমে গলায় বলল, 'গত কয়েক বছরে চমৎকার একটা ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল আমাদের মধ্যে। ভাল সার্ভিস পাচ্ছিলাম আমি, বিনিময়ে তোমরাও আমার কাছ থেকে যথেষ্ট টাকা পাচ্ছিলে—এতই বেশি যে, তোমাদের বিপ্লবী আন্দোলন সাফল্যের মুখ দেখতে শুরু করেছিল, ক্ষমতাসীন সরকারকে গদিছাড়া করবার পথে অনেকদূর এগিয়েছ তোমরা।'

স্পষ্ট, কাটা কাটা ভঙ্গিতে কথা বলছে সে; যেন ক্যামেরায় নয়, সরাসরি কারও সঙ্গে আলাপ করছে। 'গতকাল পর্যন্ত সব ঠিকঠাক মতো চলছিল; তবে আজ বিকেলে যে-কেলেঙ্কারিটা তোমরা ঘটালে, সেটা ক্ষমার অযোগ্য।' আঙুল তুলে বন্দি সুদানিজকে দেখাল মানসিনি। 'এই গর্দভটাকে পাঠানো হয়েছিল মাসুদ রানার উপর নজর রাখতে—কেউ ওর সঙ্গে, বা ও কারও সঙ্গে যোগাযোগ করে কি না, সেটা দেখার জন্য। ন্যাশনাল এয়ারপোর্টের মত একটা জায়গায় গোলাগুলি করার অনুমতি দিইনি আমি ওকে। ওর গাধামির জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হারিয়েছি আমরা—কারা রানার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল, তা জানা আর সম্ভব

নয়। যে-পরিস্থিতি তৈরি করেছিল ও, তাতে শুধু ওই তিনজনই নয়, রানাও মার পড়তে পারত!'

ক্যামেরা থেকে মুখ ফিরিয়ে বন্দি সুদানিজের দিকে তাকাল মানসিনি আচমকা রাগে ফেটে পড়ল সে। 'কোন্ হারামজাদা পাঠিয়েছে তোকে, শুয়োর তোর কারণে কত বড় ক্ষতি হয়েছে আমার, জানে তারা? রানা সতর্ক হয়ে গেছে ইরিত্রিয়ায় ওকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পাবার আর কোনও সম্ভাবনা নেই! গুলি করার আগে কী ভাবছিলি, তা জানতে চাই না। কারণ আমি জানি, তোর ভাবনা-চিন্ত করবার ক্ষমতাই নেই।' ক্যামেরার দিকে আবার তাকাল মানসিনি। 'ব্যাপারট তোমাদের বাকি সবার জন্য একটা শিক্ষা হয়ে থাকুক।'

দুই ক্রেন অপারেটরের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল ইটালিয়ান টাইকুন। মাথা ঝাঁকিয়ে ইঞ্জিন চালু করল লোকদুটো, গুম গুম আওয়াজে ভরে গেল পুরো ওয়্যারহাউস। সুদানিজ লোকটা বিড় বিড় করতে শুরু করল, নিঃশব্দে সৃষ্টিকর্তাকে ডাকছে। পরমুহূর্তেই হ্যাঁচকা টানে তাকে শূন্যে তুলে ফেলল দুই ক্রেনের মুভিং আর্ম। দড়ির টানে দুই গাছের মাঝখানে ঝুলতে থাকা হ্যামকের মত অবস্থা এখন তার।

অপারেটরদের দিকে তাকিয়ে আবার ইশারা করল মানসিনি। লিভার চাপল তারা, পরস্পরের বিপরীতে ভাঁজ হয়ে যেতে শুরু করল আর্মদুটো। প্রচণ্ড টান পড়ল বন্দি সুদানিজের দেহে, যেন রবারের মত টেনে লম্বা করা হচ্ছে তার রক্তমাংসের শরীরটাকে। ব্যথায় আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে।

ক্যামেরার দিকে তাকাল মানসিনি। বলল, 'ভাল করে দেখো, হিলাল,' প্রত্যাশিত শ্রোতার উদ্দেশে বলল সে। 'গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজে এই হারামজাদার মত একটা বেকুবকে পাঠিয়ে অন্যায় করেছ তোমরা। আবার যদি এ-জাতীয় অন্যায় করো, তা হলে এর চেয়েও ভয়ঙ্কর পরিণতি অপেক্ষা করছে তোমাদের জন্য!'

বন্দি সুদানিজের দেহ ততক্ষণে সহনশীলতার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। দুই যন্ত্রদানবের শক্তিশালী টানে শরীরের মাঝখানটায় চামড়া টান খেয়ে ধূসর হয়ে যেতে শুরু করেছে, নীচে হাড়ের অবয়ব বোঝা যাচ্ছে স্পষ্ট—বীভৎস একটা দৃশ্য। দড়ির বাঁধন কেটে বসে গেছে গোড়ালি আর বগলের নীচে, রক্ত গড়াচ্ছে ক্ষত থেকে। চিৎকার থামিয়ে এখন একটানা গোঙাচ্ছে লোকটা, চিৎকার করবার শক্তি হারিয়েছে।

কয়েক সেকেণ্ড পরই সবার শরীর রি রি করে উঠল মাংস আর চামড়া ছেঁড়ার বিচ্ছিরি শব্দে। মড়মড় করে ছুটতে শুরু করল অস্থিসংযোগগুলো। চাপা একটা দুর্বোধ্য শব্দ বেরোল, তারপর ছিঁড়ে দু'টুকরো হয়ে গেল দেহটা। এক রাশ রক্ত আর শরীরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা নাড়িভুঁড়ি আছড়ে পড়ল কংক্রিটের মেঝেতে। পাশ ফিরে দলের একজনের সঙ্গে কথা বলছিল মানসিনি, ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটল যে সরে যাবার সময় পেল না, ছিটকে আসা রক্ত আর মাংসখণ্ডে শরীরের একটা পাশ ভিজে গেল তার।

রাগত চেহারায় দলের লোকজনের দিকে তাকাল ইটালিয়ান টাইকুন, সবাই কুঁকড়ে গেল ভয়ে। খেপাটে ভঙ্গিতে ওভার-কোটটা খুলে একপাশে ফেলে দিল

মানসিনি, রুমাল বের করে মুখ মুছল। তারপর তাকাল ক্যামেরাম্যানের দিকে।
'বন্ধ করো ওটা,' খেঁকিয়ে উঠল সে। 'সবকিছু পরিষ্কারের ব্যবস্থা করো।'

উল্টো ঘুরে গাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল মানসিনি। অনুসরণ করতে থাকা সহচরকে বলল, 'আমার পাইলটকে খবর দাও, আজ রাতটা রোমেই থেকে যেতে হবে আমাদেরকে। বিকেলের ঘটনার কারণে এয়ারপোর্টের স্বাভাবিক অপারেশন বন্ধ করে রাখা হয়েছে। ওকে বলো, আগামীকালের জন্য ফ্লাইট. প্ল্যান ফাইল করতে।'

মার্সিডিজের গদিমোড়া সিটে বসে চিন্তায় ডুবে গেল মানসিনি। মানুষটাকে খুন করতে বিন্দুমাত্র বিবেকের দংশন অনুভব করেনি সে, তবে খুন যে করতে হলো—সেটাই একটা বাজে ব্যাপার। ওর ভাড়াটে সুদানিজ মার্সেনারিরা অত্যন্ত অনুগত, বিনা প্রশ্নে প্রতিটা নির্দেশ পালন করে। ভুল-ত্রুটি করে না মোটেই, কয়েক মাস আগে ওই অস্ট্রিয়ান আর্কিয়োলজিস্টকে খতম করবার সময় নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দেখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাই বলে লাগামে ঢিল দেওয়া চলে না, অপারেশনটা পূর্ণোদ্যমে চালু হতে চলেছে, কালো দস্যুগুলোকে প্রতিনিয়ত ব্যবহার করতে হবে তাকে। এখন যদি নরম হতে শুরু করে, শেষ পর্যন্ত অসভ্যগুলো ওর মাথায় . চড়ে বসবে। ওদেরকে ঝাঁকি দেয়ার জন্য আজকের রাতের ডেমোনস্ট্রেশনটা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

তবে এয়ারপোর্টের গণ্ডগোলটার চেয়েও মানসিনিকে বেশি ভাবাচ্ছে রানার সঙ্গে কথা বলা অন্য লোকটা। কে ছিল সে? কার হয়ে কাজ করছিল? ব্যাপারটা উদ্বেগ জাগাবার মতই বটে—পুরো অপারেশনে নতুন আরেকটা পক্ষের উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে, এদের উপর মানসিনির কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। অচেনা এই পক্ষটার পরিচয় আন্দাজ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করল সে কিছুক্ষণ। একটা প্রশ্নই শুধু করে গেল নিজেকে—কীভাবে ওরা জানল হারানো খনিটার ব্যাপারে? ওটা তো ওর... শুধুই ওর!

সতেরো

লেবানন।

হাসাবের মৃত্যুর খবর চব্বিশ ঘণ্টা দেরিতে পেল ইয়াশাদ। আগের রাতটা চলার উপর ছিল ওরা, দেরি হবার কারণ সেটাই। আগের লোকেশনটা ছেড়ে বন্দিকে নগর-কেন্দ্রের আরেকটা সেফ-হাউসে নিয়ে এসেছে; আগেরটার চেয়ে অনেক নিরাপদ এটা। প্রতিবেশীরা সবাই ওদের আদর্শের অনুসারী, দরকার হলে জান দেবে, তাও ওদের উপস্থিতির খবর ফাঁস করবে না। দলে মোট দশজন রয়েছে ওদের, বন্দিকে সহ এগারোজন; এখানে খাওয়াদাওয়া থেকে শুরু করে অবসর-বিনোদনের জন্য নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা আছে। তারপরও এখানে যে বেশিদিন থাকা যাবে না, সেটা ইয়াশাদ খুব ভাল করেই জানে। ওদের খবর ফাঁস

হবার দরকার নেই, এই এলাকায় মাঝে মাঝেই পুলিশ আর স্পেশাল ইনভেস্টিগেটিভ সার্ভিসের রেইড চলে। ওদের হাতে ধরা পড়লে নামকাওয়াস্তে বিচারশেষে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়াতে হবে। বাধ্য হয়ে এখন থেকেই পরের রিলোকেশন স্পট নিয়ে ভাবতে হচ্ছে তাকে, সেফ-হাউস বদলানোর নিয়মকানুন ঠিকমত মানতে গেলে সাতদিনের ভিতর আবার সরে যেতে হবে ওদেরকে।

ভাইপোর মৃত্যুর খবর পেয়ে প্রকাশ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাল না ইয়াশাদ। তবে ওর ঘনিষ্ঠ সঙ্গীরা ঠিকই টের পেল, তাদের বয়স্ক নেতার বুকটা দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে ভিতরে ভিতরে। সেটা গোপন করতে নতুন একটা খোলসের মধ্যে ঢুকে যেতে হলো ইয়াশাদকে—আগের চেয়ে কঠিন... আগের চেয়ে পুরু একটা খোলসে!

সময়টা সকাল, সেফহাউসের ডাইনিং রুমে একসঙ্গে বসে নাশতা সারছে দলের বেশ ক'জন সদস্য। বাকিরা হয় রুটিন মোতাবেক ঘুমাচ্ছে, নয়তো বাজারসদাই করতে গেছে। সকাল বেলাটা সাধারণত হালকা মেজাজে থাকে ওরা, কিন্তু আজ তা ঘটেনি। এ-মুহূর্তে গম্ভীর, শোকসন্তপ্ত হয়ে আছে সবাই হাসাবের মৃত্যুর খবরে। ওদের প্রিয় নেতা ছিল হাসাব।

এই বিশেষ সেফহাউসটা আগে কখনও ব্যবহার করেনি ইয়াশাদ, তবে সারাজীবনে দেখা অন্যান্যগুলোর সঙ্গে কোনও পার্থক্য নেই এর। এমন ধরনের হাজারো সেফহাউসে অসংখ্য রাত কাটিয়েছে সে, কাজ করেছে, কিংবা করেছে মানবহত্যা। স্বাভাবিক জীবনযাপন ছেড়ে স্বেচ্ছায় এ-জীবন বেছে নিয়েছে ইয়াশাদ, কখনও এতে আক্ষেপ করেনি, তবে আজ বুঝতে পারছে—এর জন্য কম মূল্যও চুকাতে হয়নি তাকে। হাসাবকে হারিয়ে অদ্ভুত এক শূন্যতায় খাঁ খাঁ করছে বুক, মনে হচ্ছে এ-আঘাত বুঝি আর সইতে পারবে না।

টেবিলের কেউ কোনও কথা বলছে না। ইয়াশাদ এখন দলের নতুন লিডার, তার বক্তব্য শোনার অপেক্ষায় আছে ওরা। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল প্রবীণ টেরোরিস্ট, একটার পর একটা সিগারেট টেনে সামনে রাখা অ্যাশট্রে ভরিয়ে ফেলল। আজকের সকালটা তার বয়স দশ বছর বাড়িয়ে দিয়েছে।

এক সময়ে মুখ খুলল সে। আসল প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে অন্য কথা পাড়ল। 'বন্দির খবর কী?'

'ভাল,' জানাল দলের এক সদস্য। 'সিগারেট দেবার পর থেকে অনেকটাই শান্ত হয়ে এসেছে। হইচই করছে না আর।'

'ভাঙা আঙুলটা?'

'তাগড়া লোক, দ্রুত সেরে উঠছে,' জানাল আরেকজন... মেডিক্যাল ট্রেইনিং রয়েছে তার। 'ওষুধও দিচ্ছি আমরা।'

আরেকটা সিগারেট ধরাল ইয়াশাদ। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ছাতের ভারী কাঠের বিমের দিকে উড়ে যাওয়া ধোঁয়ার পানে। কিচ্ছু আর ভাল্লাগছে না তার, সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে পালিয়ে যেতে চাইছে মন। তবে কর্তব্যবোধের তাড়নাও অগ্রাহ্য করতে পারছে না। আর কিছু না হোক, প্রাণপ্রিয় ভাইপোর মৃত্যুর জন্য

রানাকে প্রায়শ্চিত্ত করাতে হবে তার।

সংবিৎ ফিরে পেল ইয়াশাদ। সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'যা ঘটেছে, তা নিয়ে আলোচনা করে লাভ নেই কোনও। হাসাব মারা গেছে, এটাই বাস্তবতা। দলের নেতৃত্ব এখন আমার হাতে এসে পড়েছে। দায়িত্বটা আমার পছন্দ নয়, কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না।' নীরস ভঙ্গিতে কথা বলছে সে। দলের মনোবল বাড়াতে হলে সেটা অন্য কেউ বাড়াক। 'আগের মতই এগিয়ে যাব আমরা। প্ল্যানের একমাত্র রদবদল হিসেবে হাসাবের পরিবর্তে রানার উপর নজর রাখার জন্য আমি নিজে ইরিত্রিয়ায় যাব। আর হ্যাঁ, অপারেশনটা শেষ হবার পর বন্দি লোকটাকে খতম করে দেবে তোমরা। আর রানা... ওর সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে বোঝাপড়া করব। ক্লিয়ার?'

দলের এক সদস্য প্রতিবাদ করে উঠল। 'আপনার সিদ্ধান্তকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চাই না আমি, ইয়াশাদ। কিন্তু বাড়তি দুটো মৃত্যুর মাধ্যমে পরিস্থিতিকে আরও ঘোলাটে করলে আমাদের আদর্শের কোনও লাভ হবে না। আমরা যে-ইনফরমেশন পেয়েছি, তাতে তো মনে হচ্ছে হাসাবের খুন হবার পিছনে মাসুদ রানার কোনও হাত ছিল না। ওকে খুন করে খামোকা আমাদের উপর সবার মনোযোগ টেনে আনার দরকার কী?'

রাগী চোখে লোকটার দিকে তাকাল ইয়াশাদ। কাটা কাটা স্বরে বলল, 'রানাকে খুন করবার সঙ্গে আমাদের আদর্শের কোনও সম্পর্ক নেই। ওটা সম্পূর্ণই একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। আর লোকের মনোযোগের কথা বলছ? ইরিত্রিয়া একটা বিশাল দেশ... পদে পদে বিপদ ওখানে। মরুভূমিতে পড়ে থাকা আরেকটা লাশ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না।'

বাকি সদস্যদের উপর নজর বোলাল ইয়াশাদ, কিন্তু ওর চোখে চোখ রাখার সাহস হলো না কারও। দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে, আর মাত্র কয়েকটা সপ্তাহ দলটাকে অবিচল রাখতে হবে তাকে—নির্বাচনের আগ পর্যন্ত। এরপর ওর, কিংবা এদের... এমনকী ইজরায়েলের কপালে কী ঘটে না ঘটে, তা নিয়ে মোটেই পরোয়া করে না সে।

অতীত রোমন্থনে ডুবে গেল ইয়াশাদ। স্মৃতি তাকে নিয়ে গেল বহু বছর আগেকার সেই দিনটিতে, যে-দিন হাসাবের বাগদত্তা সাবিহ্ খুন হলো। ইজরায়েলি এক সৈনিকের ছোঁড়া গুলিতে মারা পড়েছিল মেয়েটি, সৈনিকটি নিজেও ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চেয়েছিল। কিন্তু মনটা ভেঙে গিয়েছিল হাসাবের, ইয়াশাদের ভয় হচ্ছিল—ছেলেটা না আবার কোনও ফিলিস্তিনী বিপ্লবী দলে ভিড়ে যায়। তবে ওই ঘটনার কয়েকদিন পরেই তেল আবিবের এক বাস-স্টপে এক মুসলিম আত্মঘাতী বোমা হামলায় মারা যায় এগারোজন ইজরায়েলি। টেলিভিশন রিপোর্টে দেখানো হয়, আত্মদান করা সেই বোমারুকে নিয়ে উল্লাসে ফেটে পড়েছে গাজার মুসলিম ছাত্ররা, নাচানাচি করছে এগারোজন নিরীহ ইজরায়েলি মারা যাওয়ায়। সেই সন্ধ্যাতেই ইয়াশাদের সঙ্গে দেখা করে হাসাব—মোসাদে যোগ দেয়ার আগ্রহ দেখায়। ইজরায়েলি সৈনিক আর ফিলিস্তিনী ছাত্রদের বিপরীতমুখী আচরণ দেখে ওর মনকে আচ্ছন্ন করে রাখা মেঘ কেটে গিয়েছিল। সিদ্ধান্ত

নিয়েছিল, ধর্মই ওর জন্য সব; শক্তিশালী ও সার্বভৌম ইহুদি রাষ্ট্রের সেবাতেই নিজেকে নিয়োজিত করবে... যে-কাজ বহু বছর থেকে তার চাচা ইয়াশাদ করে আসছে।

সেই থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম আর কঠোর অধ্যবসায় নিয়ে মোসাদের হয়ে কাজ করতে শুরু করে হাসাব। শুধু ইজরায়েলি ছিল না ও, ছিল একজন চরমপন্থী ইহুদিও। ধীরে ধীরে মোসাদের সেরা অপারেটরদের একজনে পরিণত হয় সে। একদিন হাসাবের উপর চোখ পড়ে যায় ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী ইয়োরাম রাবাকের—মিলিটারি ও ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটি থেকে বাছাই করা লোক নিয়ে গোপনে নিজের একটা আলাদা সংগঠন তৈরি করছিলেন তিনি। এই লোকের উদ্দেশ্য জানতে পেরে মোসাদ ছেড়ে তাতে ভিড়ে যায় হাসাব ইয়াশাদকে নিয়ে। শুরু করে মন্ত্রী-মহোদয়ের স্বপ্নপূরণের অভিযান। যদিও সবটাই ইয়োরাম রাবাকের মহা-পরিকল্পনার অংশ, কিন্তু সেটাকে বাস্তবে পরিণত করবার গুরুদায়িত্ব এখন ইয়াশাদের ঘাড়ে এসে চেপেছে।

দলের সদস্যদের দিকে তাকাল প্রবীণ টেরোরিস্ট। 'আমি জানি তোমরা কী ভাবছ। ভাবছ, বুড়ো লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তাই না? হয়তো এমনটাও মনে হচ্ছে, ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে গিয়ে পুরো মিশনের বারোটা বাজাতে যাচ্ছি আমি... খুন করতে চাইছি এমন এক লোককে, যে আসলে আমাদের সাহায্য করছে! আমি কথা দিচ্ছি, খনিটা খুঁজে বের করবার আগে... আমাদের হারানো সম্পদ ফিরে পাবার আগে মাসুদ রানার কোনও ক্ষতি করা হবে না।' গ্লাস তুলে নিয়ে এক চুমুক পানি খেল সে। 'হাসাবের মৃত্যু আমাদের সবার জন্যই বিরাট একটা আঘাত। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমরা থেমে যাব। মাত্র কয়েকটা সপ্তাহ বাকি... যদি এই মিশন সফল হয়, তা হলে আমাদের দেশকে আমরা একটা নতুন জীবন দিতে পারব। এমন একটা ভিত্তি গড়ে দিতে পারব, যাতে আর কোনোদিন কোনও ইহুদি নিজেকে এই পৃথিবীতে অবাঞ্ছিত না ভাবে।

'হ্যাঁ, এটা সত্যি যে, আমাদের একটা দেশ আছে... রক্তের বিনিময়ে কেনা; রক্ত দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা! কিন্তু জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের দেশ তার আত্মা খুঁজে পায়নি। অনেকে ভেবেছিল সাতষট্টি সালে জেরুসালেমের দখল নেবার পর আমরা সেই আত্মা খুঁজে পাব। পশ্চিম প্রাচীর আছে ওখানে—রাজা ডেভিডের তত্ত্বাবধানে তৈরি করা প্রাচীর... এককালে আমাদের যে শৌর্য-বীর্য ছিল, তার সবচেয়ে বড় নমুনা!

'হ্যাঁ, ওটা পেয়েছি আমরা,' তিক্ত গলায় বলল ইয়াশাদ। 'স্যাণ্ডস্টোনের তৈরি এক উঁচু দেয়াল... একটা মসজিদের ছায়ায় দাঁড়ানো! একবার মাত্র গেছি আমি ওখানে, সাতষট্টিতে, সৈনিক হিসেবে। লড়াই করেছি আমি ওই প্রাচীরের দখল নিতে, নির্দ্বিধায় শত্রুর প্রাণ নিয়েছি। কিন্তু কেন? একটা তামাশা ওটা এখন আমার চোখে! প্রার্থনারত ইহুদির চেয়ে ওখানে এখন টুরিস্টদের ভিড় বেশি! ভাবলেই অসুস্থ বোধ করি আমি।

'স্রেফ একটা লোক-দেখানো প্রতীকের জন্য যুদ্ধ করেছি আমি, নিজের জীবন

বিপন্ন করেছি। ভেবেছিলাম প্রাচীরটা একটা শুরু, এরপর অনেক কিছু হবে আমাদের। কিন্তু হয়েছে কি? আমাদের সেই প্রতিশ্রুত ভূমির দেখা কি পেয়েছি আমরা? না, পাইনি। উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় ইরাকিরা মিসাইল ছুঁড়েছে আমাদের দিকে, কী করতে পেরেছি আমরা? কিছুই না। কারণ স্বাধীন-সার্বভৌম ইজরায়েল এখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। মনের জোরটাই এখনও তৈরি হয়নি আমাদের, তাই গলা উঁচিয়ে বলতে পারি না, জেরুসালেম আর আশপাশের সমস্ত এলাকা আমাদের। আমরাই ওখানকার ন্যায্য হকদার।

'তবে পরিস্থিতি পাল্টাতে শুরু করেছে, বন্ধুরা। কয়েক সপ্তাহের ভিতর ইয়োরাম রাবাক আমাদের প্রধানমন্ত্রী হবেন। ক্ষমতায় বসেই শান্তিচুক্তি বাতিল করবেন তিনি, *পিএলও*-কে অবৈধ ঘোষণা করবেন। পশ্চিম তীর আর গাজার সীমানা বন্ধ করে দেয়া হবে, যাতে মুসলমানের বাচ্চারা আর আমাদের পবিত্রভূমিকে কলঙ্কিত করতে না পারে। আর কোনও আত্মঘাতী বোমাবাজ দেখা যাবে না আমাদের দেশে, ফিলিস্তিনীদেরকে ঝাড়ে-বংশে শেষ করে দেব আমরা। অল্প সময়ের ভিতর মুসলমানদের *হারাম-শরীফ* ভেঙে জেরুসালেমের পাহাড়চূড়ায় পুরনো ভিত্তির উপর গড়ে তুলব তৃতীয় মহামন্দির। ইহুদি-ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবে ওটা, সারা বিশ্বে আমাদের সমস্ত ভাইকে একত্র করে তুলবে। আর কোনোদিন কেউ আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে সাহস পাবে না।

'এই বিশ্বাসের জন্য জীবন দিয়েছে হাসাব। ওর মৃত্যুতে তাই আমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা টলবার নয়, টলা উচিত নয় তোমাদেরও। এই মুহূর্তে লক্ষ্যের অনেক কাছে রয়েছি আমরা, বন্ধুরা; গত দু'হাজার বছরে এত কাছে কেউ আসতে পারেনি। হ্যাঁ, রানাকে খুন করতে চাই আমি, কিন্তু সেটা এই মহান আদর্শের বিনিময়ে নয়।'

জীবনের সবচেয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে হাঁপাতে শুরু করল ইয়াশাদ—দম ফিরে পাবার তাড়না ও উত্তেজনায়। কিছুটা খারাপ লাগছে ভিতরে ভিতরে... অন্তঃসারশূন্য একটা ভাষণ দিয়েছে, সত্যি কথা হলো—আদর্শ-টাদর্শ নিয়ে মোটেই মাথাব্যথা নেই তার, মাথাব্যথা নেই ইয়োরাম রাবাককে নিয়েও। রিটায়ার্ড জীবন কাটাচ্ছিল কিছুদিন আগে, সেই আরাম-আয়েশ ছেড়ে এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল শুধু হাসাবের টানে। সেই প্রাণপ্রিয় ভাইপোর মৃত্যু এখন নতুন একটা লক্ষ্য দাঁড় করিয়ে দিয়েছে তার সামনে—প্রতিশোধ নিতে হবে... খুন করতে হবে মাসুদ রানাকে!

'ইরিত্রিয়ায় যাবার জন্য টিম ঠিক করা আছে,' বলল ইয়াশাদ। 'ওদের নিয়ে আজ রাতেই রওনা হব আমি। যাবার আগে মিনিস্টার রাবাকের সঙ্গে কথা বলে নেব নতুন একটা সেফহাউসের ব্যাপারে। এখানে বেশিদিন থাকা চলবে না আমাদের—*মোসাদ* আর *শিন বেট*... দু'পক্ষই খুঁজে বেড়াচ্ছে আমাদেরকে, ওদের হাতে ধরা পড়া যাবে না। আরও নিরাপদ একটা জায়গা খুঁজে দেবার জন্য চাপ দেব আমি—চেষ্টা করব যাতে নেগেভ মরুভূমির কোনও একটা পরিত্যক্ত মিলিটারি বেসের ব্যাপারে রাজি করাতে পারি। রাবাক নিরাপত্তার খাতিরে আমাদের কাছ থেকে দূরত্ব রাখতে চাইছেন বটে, কিন্তু আমাদের প্রোটেকশনও

তো তাঁকেই দিতে হবে।'

একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল দলের সদস্যরা। করুণার চোখে ওদের দিকে তাকাল ইয়াশাদ—সব ধর্মান্ধ ফ্যানাটিক, বাস্তবতা জানে না। ইয়োরাম রাবাককে চেনে না এরা, ধর্মকে স্রেফ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে লোকটা, ক্ষমতায় বসার সোপান বানিয়েছে। কেলেঙ্কারি বাধার সামান্যতম সম্ভাবনা দেখা দিলেই ওদের সবাইকে কোরবানির খাসি বানাবে চরিত্রহীন রাজনীতিকটা, তাতে ওর কোনও সন্দেহ নেই।

'মোশে,' দলের কনিষ্ঠতম সদস্যকে ডাকল ইয়াশাদ। 'খোঁজ নিয়ে দেখো, আমাদের বন্দির কিছু দরকার কি না। রাবাকের সঙ্গে কথা হবার পর ওকে আবার সরিয়ে নিতে হবে, লম্বা জার্নির জন্য সুস্থ থাকা দরকার ওর। তা ছাড়া, রানার জন্য যদি নতুন একটা ভিডিও তৈরি করতে হয়, ওতেও তরতাজা দেখানো দরকার ওকে; নইলে রানা খেপে গিয়ে কাজ বন্ধ করে দিতে পারে।'

'জী, লিডার।' বলে উঠে দাঁড়াল মোশে। চলে গেল সেলারের দিকে।

প্যাকেট থেকে আরেকটা সিগারেট ধরাল ইয়াশাদ।

নতুন এই সেফহাউসের কয়েদখানাটা আগেরটার চেয়ে খারাপ—আকারে ছোট, আলো-বাতাসও নেই একেবারে। দীর্ঘদিনের অব্যবহারে মেঝের উপর জমেছে আধইঞ্চি পুরু ময়লার স্তর—জমে প্রায় সিমেন্টের মত শক্ত হয়ে গেছে। অসহ্য পরিবেশটার হাত থেকে বাঁচার জন্য চারপায়াতে শুয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করছিল সোহেল, দরজা খোলার শব্দ পেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল।

এই দরজাটার গায়ে কোনও ফোকর নেই, তাই ছিটকিনি খোলার আগে ভিতরটা দেখে নিতে পারছে না মোশে; হাতে পিস্তল নিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পা দিয়ে ফাঁক করল পাল্লাটা, তাকাল ভিতরে। তরুণ টেরোরিস্টকে চিনতে অসুবিধে হলো না সোহেলের, আগেও দেখেছে—কয়েকবার খাবার নিয়ে এসেছে। একটু উদ্বেগ অনুভব করল ও—চেহারা ঢেকে রাখার কোনও চেষ্টাই দেখা যাচ্ছে না এদের ভিতর; এর অর্থটা ভাল কিছু হতে পারে না।

জোর করে মুখে একটু হাসি ফোটাল সোহেল। বলল, 'খাবার দিতে পারো? খুব খিদে পেয়েছে।'

মাথা ঝাঁকাল মোশে। 'আর কিছু?'

'একটু ড্রিঙ্ক পেলে ভাল হয়,' বলল সোহেল। 'হাতটা খুব ব্যথা করছে।'

'ঠিক আছে,' বলে উল্টো ঘুরে চলে গেল মোশে।

দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল আবার। বিছানায় বসে দেয়ালে হেলান দিল সোহেল। ওর সন্দেহটাই সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে—এরা মুসলিম নয়, মুসলমানের সাজ নিয়ে রয়েছে। ধর্মের প্রতি টান থাকলে মদের কথা শুনলে খেপে যেত, দেবার আশ্বাস দিয়ে চলে যেত না।

কাল রাতের কথা মনে পড়ল ওর—আবারও ইঞ্জেকশন দেয়া হয়েছিল। তিনজন লোক চেপে ধরে রেখেছিল ওকে, আরেকজন হাতে ফুটিয়েছে সুঁই। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল, ফিরে পেয়েছে নতুন এ-জায়গায়। কীভাবে আনা হয়েছে ওকে,

কিচ্ছু মনে নেই; জানে না কতটা সময় পেরিয়েছে।

ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি বিচার করল ও। দুটো সুবিধা রয়েছে ওর হাতে। প্রথমটা হলো, মৃত্যুকে ভয় পায় না ও; কিডন্যাপাররা সেটা জানে না। একটা হাত নেই বলে ওকে ননীর পুতুল ভাবছে ওরা, ভাবছে চোখ রাঙিয়ে দমিয়ে রাখতে পারবে। কিন্তু বিসিআইয়ের এককালের সেরা এজেন্টকে অসহায় ভাবাটা মোটেই উচিত হচ্ছে না ওদের, বিরাট ভুল করছে। সাধারণ মানুষ হলে এতক্ষণে ভয়ে-আতঙ্কে পাগল হয়ে যেত, তবে সোহেল আহমেদের কিছুই হয়নি; সারাক্ষণ ও ছক কেটে চলেছে এখান থেকে পালিয়ে যাবার। পালাতে না পারলেও ক্ষতি নেই, রানা আছে... আছে গোটা বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স। আগে হোক, বা পরে... ওরা ঠিকই ওকে খুঁজে বের করবে। বিশেষ করে রানা তো কিছুতেই থামবে না, দরকার হলে সারা দুনিয়া তছনছ করে ফেলবে ওকে উদ্ধার করবার জন্য... আগেও করেছে। রানাকে খেপিয়ে দিয়ে ওরা যে খাল কেটে কুমির ডেকে এনেছে, সেটাই ওর দ্বিতীয় সুবিধা।

ভাবনাটায় ডুবে গিয়েছিল সোহেল, দরজায় আবার শব্দ হতে বাস্তবে ফিরে এল। ফিরে এসেছে তরুণ টেরোরিস্ট, চাকা লাগানো একটা ট্রলি ঠেলে কামরার ভিতর ঢুকল—তাতে বরাবরের মত দুটো শুকনো রুটি আর সবজির লাবড়া। মদও এনেছে—নীল রঙের একটা বোতল, আগে কখনও দেখেনি সোহেল, লেবেলে ইংরেজি কোনও শব্দ নেই।

'ধন্যবাদ,' বলল সোহেল। বিছানা থেকে পা নামিয়ে দিয়ে প্রথমেই নিল মদের বোতলটা, ছিপি খুলে কয়েক চুমুক খেল আয়েশ করে... তরুণ টেরোরিস্টকে লোভী করে তুলছে।

কাজ হলো প্ল্যানটাতে, ওর দিকে তাকিয়ে ঠোঁট চাটল মোশে। চুমুক দেবার খায়েশ জেগেছে।

বোতলটা নামিয়ে ঢেঁকুর তুলল সোহেল। 'আহ্, প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। কী হে ভায়া, তুমিও চেখে দেখবে নাকি?' বাড়িয়ে ধরল বোতলটা।

একটু দ্বিধা করল মোশে, তারপরই ছোঁ মেরে মদের বোতলটা নিয়ে নিল সোহেলের হাত থেকে। মুখ ঠেকিয়ে দু'চুমুক খেল। আশান্বিত হয়ে উঠল সোহেল, তবে সেটা স্থায়ী হলো মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। সামান্য একটু মদ গিলেই লোভের লাগাম টেনে ধরল তরুণ টেরোরিস্ট, বোতলটা ফিরিয়ে দিল ওকে।

'কী হলো? আরেকটু খাও!' সাধল সোহেল।

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল মোশে। 'ডিউটির সময় মদ খাওয়ার ব্যাপারে নিষেধ আছে। আপনি খাওয়া-দাওয়া করুন, আমি আসছি।'

দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল সে। ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোহেল। অল্পবয়েসী টেরোরিস্টকে মদ খাইয়ে মাতাল করতে চেয়েছিল, তা হলে সহজে ওকে কাবু করে বেরিয়ে যেতে পারত—কিন্তু লাভ হয়নি। সন্দেহ করেনি বটে, কিন্তু বোঝা গেল, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে জানে এরা, অসময়ে তাই খেতে রাজি হলো না। নতুন কোনও প্ল্যান আঁটতে হবে, শুকনো রুটি চিবুতে চিবুতে ভাবল সোহেল।

আঠারো

ইরিত্রিয়া।

আকাশ থেকে আফ্রিকাকে দেখায় ইয়োরোপের তলায় ঝুলে থাকা একটা ঘোড়ার মুখের মত। যেন জীবনের রেসে হেরে গেছে ওটা, মাথা নিচু করে রেখেছে লজ্জা আর গ্লানিতে। মহাদেশটার আকৃতিতেই ফুটে আছে ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি। সেই মহাদেশের পানে লোহিত সাগরের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে ইথিওপিয়ান এয়ারলাইনের লাল-সাদা রঙের বোয়িং জেট। সুদানের এয়ারস্পেস এড়াবার জন্য একটু ঘুরপথ ধরেছে, কারণ উনত্রিশ হাজার ফুট উচ্চতাতেও দুনিয়ার সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের রণভূমি থেকে ছুটে আসা লক্ষ্যভ্রষ্ট মিসাইল থেকে নিরাপদ নয় বিমানটা।

লোহিত সাগরের পারে প্রায় খাড়াভাবে পাথুরে পাঁচিলের মত গ্রেট রিফট্ ভ্যালির পূর্বপ্রান্ত উঠে গেছে আকাশের দিকে, বিস্তৃত হয়ে আছে এক হাজার মাইল জুড়ে। যেন এক প্রতিরক্ষা-ব্যূহ, আফ্রিকার অভ্যন্তরকে শত-সহস্র বছর ধরে আড়াল করে রেখেছে বাইরের লোকের কাছ থেকে। প্রাকৃতিক এই প্রাচীর পেরুনোর সময় জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল রানা। এক মুহূর্তের জন্য অনেক নীচে বিছিয়ে থাকা তীরবর্তী মরুভূমি দেখা গেল, পরমুহূর্তে সেই উচ্চতা হারিয়ে গিয়ে মাত্র একশো ফুট নীচে উদয় হলো রুক্ষ পাহাড়শ্রেণী। আঁকাবাঁকা কিনারে ধাক্কা খেয়ে উপরে উঠে আসা উষ্ণ বায়ুর টার্বিউলেন্সে কাঁপতে শুরু করল বিশাল বিমানটা।

উপকূলের কাছটায় কালো মেঘ ছিল, সাগরের উদ্দাম ঢেউয়ের সঙ্গে জোট বেঁধে স্নান করিয়ে দিচ্ছিল সৈকত আর আশপাশের এলাকাকে। কিন্তু ইনল্যাণ্ডে প্রবেশ করতেই পরিষ্কার আকাশ পাওয়া গেল। মেঘ-টেঘ নেই, অদ্ভুত একটা নীল রঙ ছেয়ে রেখেছে ওখানটা—মানুষের তৈরি রঙ-তুলিতে অমন আভা ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব। আফ্রিকান আকাশ এ-কারণেই অনেক বেশি রহস্যময়, মনে পড়ল রানার।

ফ্লাইটের শেষ কয়েকটা মিনিট যুদ্ধ চলল প্রকৃতি আর পাইলটের মধ্যে—অবাধ্য মানুষটা যেন পণ করেছে, যেভাবেই হোক, কাঙ্ক্ষিত স্থানেই নামিয়ে আনবে বিমানটাকে। দমকা হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অ্যাপ্রোচের জন্য বোয়িংকে রানওয়ের সঙ্গে অ্যালাইন করা হলো। কয়েক মিনিট পর ডানদিকে সামান্য কাত হয়ে নেমে এল বিমান, সিধে হবার আগে ওপাশটার টায়ার থেকে বাড়তি চাপের কারণে রাবারের কালচে গুঁড়ো ছিটকাল। বাকি চাকাগুলো অ্যাসফল্টের স্পর্শ পেতেই অবশ্য স্বাভাবিক হয়ে এল আকাশযানটার নড়াচড়া, মসৃণ গতিতে চলে গেল টার্মিনাল ভবনের সামনে, থেমে দাঁড়াল।

ব্র্যাণ্ডির গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে ওটা সিটের সামনের ম্যাগাজিন পাউচে গুঁজে

রাখল রানা। উঠে দাঁড়িয়ে লাইন ধরল বাকি যাত্রীদের সঙ্গে... নামবে বলে।
গোলাগুলির কারণে গতকাল রোম এয়ারপোর্ট সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল, রাতের ফ্লাইটটা ছাড়েনি। তবে বিশেষ অসুবিধে হয়নি ওর, রানা এজেন্সির ভাড়া করা অ্যাপার্টমেন্টে থেকেছে রাতে, পরদিন সকালের ফ্লাইট ধরেছে। বোর্ডিং কাউন্টারের সেই মহিলা তার কথা রেখেছে, দিনের ফ্লাইট হলেও রানাকে ফার্স্ট ক্লাসের একটা টিকেট ম্যানেজ করে দিয়েছে সে।

কাস্টমসের ফর্মালিটি সম্পন্ন করতে দেরি হলো না, রানার সঙ্গে মাত্র দুটো ব্রিফকেস, বাকি মালামাল আগেই এক্সপ্রেস-শিপিঙের মাধ্যমে আসমারায় পাঠিয়ে দিয়েছে। ওগুলো ইতোমধ্যে ওর হোটেলে পৌঁছে যাবার কথা। কাস্টমস্ থেকে বেরুতেই এয়ারপোর্টে বাড়তি সিকিউরিটি চোখে পড়ল ওর। দশজন সশস্ত্র সৈনিক সতর্ক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে পাহারায়, আগত যাত্রী ও তাদের রিসিভ করতে আসা আত্মীয়-স্বজনের উপর কড়া নজর রাখছে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে টার্মিনাল থেকে বেরিয়ে এল ও।

পুরো একটা দিন দেরি করেছে আসতে, তাই আবেল আফরাকি ওকে রিসিভ করতে আসবে বলে ভাবেনি। কিন্তু রাস্তার পাশে ট্যাক্সির খোঁজে দাঁড়াতেই একটা সবুজ রঙের ভ্যান এসে থামল পাশে।

'মি. মাসুদ রানা?' জানতে চাইল তরুণ ড্রাইভার।

'হ্যাঁ,' বলল রানা, একটু বিস্মিত। 'আবেল আফরাকি?'

'জী না,' হাসল কালো তরুণ। 'আমি ওঁর ভাইপো। আবেল চাচা আপনার জন্য হোটেলে অপেক্ষা করছে। এখানে আসতে পারেনি, গতকাল বিরাট গোলমাল হয়েছে কি না! ওর সঙ্গে দেখা হলেই জানতে পারবেন সব।'

ছেলেটার হাবভাবে সন্দেহজনক কিছু পেল না রানা, তাই দরজা খুলে উঠে এল ভ্যানে। বলল, 'ঠিক আছে, চলো।'

এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে মূল শহর। রাস্তার দুপাশে ভাঙাচোরা, প্রায় বাতিল হয়ে যাওয়া বাড়িঘর চোখে পড়ল রানার। ইথিওপিয়ান শাসনামলে চিনের সহায়তায় গড়া একটা হাউজিং প্রজেক্ট ওটা—অযত্নে, অবহেলায় এ-দশা হয়েছে। ভ্যানের খোলা জানালা দিয়ে হু হু করে ঢুকছে মরুর বাতাস, শহুরে যান্ত্রিকতার গন্ধ নেই তাতে—বড়ই নির্মল। আসমারাতে পাঁচ লাখ মানুষ বসবাস করে, কিন্তু স্বাভাবিকের চেয়ে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি; তারপরও একেবারে ঝকঝকে তকতকে শহর ওটা, ভিতরে ঢুকতেই অবাক হয়ে গেল রানা—আফ্রিকান একটা অনুন্নত দেশে এমন পরিচ্ছন্নতা আশা করেনি। রাস্তায় বিভিন্ন বয়সী মহিলা ক্লিনার দেখা গেল—ঝাড়ু আর ছোট ঠেলাগাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোথাও ময়লা দেখলেই পরিষ্কার করে ফেলছে।

ইটালীয় স্থাপত্যরীতিতে গড়া হয়েছে পুরো আসমারা শহর। বেশিরভাগ ভবন পুরনো, তবে যুদ্ধের ঝাপটা খুব একটা না লাগায় মোটামুটি ভাল অবস্থায় আছে। চারতলার চাইতে উঁচু বিল্ডিং বেশি চোখে পড়ে না, সবচেয়ে উঁচু স্থাপনাটা হলো ক্যাথলিক চার্চের ইঁটের তৈরি বেল-টাওয়ার। মাঝে মাঝে মাথা তুলে থাকা মসজিদের গম্বুজ, আর স্থানীয় লোকজনের গায়ের কালো চামড়া দেখা না গেলে

বোঝাই যেত না, আফ্রিকার দরিদ্রতম দেশগুলোর একটির রাজধানী এটা। মনে হতো, আমেরিকার কোনও ছোট শহরে এসে পড়েছে।

মোটরগাড়ির সংখ্যা নগণ্য, রাস্তা দখল করে রেখেছে গাধায় টানা যানবাহন। পিছনে একটা চোখ রাখল রানা, কেউ ওদেরকে অনুসরণ করছে কি না বোঝার চেষ্টা করল, তবে দেখতে পেল না কিছু। ঘটনাবিহীন যাত্রাশেষে হোটেলে পৌঁছে গেল ভ্যান। ওটাও দেখার মত একটা জায়গা বটে! ক্লাসিকাল কলোনিয়াল ডিজাইনে গড়া চারতলা উঁচু একটা ভবন, থামগুলো মোটা মোটা, চারপাশে বাগান আছে। এতকিছুর পরও আসমারার *সেরা* হোটেল *অ্যাম্বাসয়রা*-কে বদ্ধ ও গুমোট মনে হলো রানার কাছে। ভিতরের জীর্ণ দশা, আর প্রাচীন আসবাবপত্র-ই তার কারণ।

রানা যখন চেক-ইনের ফর্মালিটি সারছে, তখন হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে নিল আবেলের ভাইপো। এসে জানাল, আমেরিকা থেকে এক্সপ্রেস-শিপিঙে পাঠানো সমস্ত মালামাল ঠিকমতই পৌঁছেছে *অ্যাম্বাসয়রা-য়*। এরপর লবির পিছনে একটা ছোট বারে রানাকে নিয়ে গেল সে। ডজনখানেকের বেশি মানুষ বসার জায়গা নেই ওখানে, বারটেণ্ডারের পিছনেও রয়েছে মাত্র সাত-আট রকমের ড্রিঙ্ক। অবাক হবার কিছু নেই, বলতে গেলে খালি পড়ে রয়েছে বার-টা। একটা টেবিলে দুজন ইয়োরোপিয়ান ব্যবসায়ী বসে নিচু গলায় শলাপরামর্শ করছে, তাদের থেকে একটু দূরে আরেকটাতে বসে আছে নিঃসঙ্গ একজন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ। রানা সামনে যেতেই উঠে দাঁড়াল সে, হাত বাড়িয়ে দিল।

'মি. মাসুদ রানা, আমি আবেল আফরাকি,' হাসিমুখে বলল লোকটা। 'ইরিত্রিয়ায় স্বাগতম। দুঃখিত, এয়ারপোর্টে যেতে পারিনি। ওখানে গতকাল একটা গোলমালে জড়িয়ে পড়েছিলাম, এখন আর চেহারা দেখাবার উপায় নেই। লোকে চিনে ফেলবে।'

করমর্দন করল রানা, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখল আবেলকে। জীবনের ঝড়-ঝাপটা সওয়া একজন সৎ মানুষের মুখ, কেন যেন প্রথম দর্শনেই ভাল লেগে গেল ওর। ইতোমধ্যে রানা এজেন্সির রোম শাখার মাধ্যমে হবু-গাইডের ব্যাকগ্রাউণ্ড চেক চালানো হয়েছে, রিপোর্টে তাকে অকুতোভয় যোদ্ধা ও ভালমানুষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। চোখে দেখার পর কথাটা বিশ্বাস হলো ওর। দিনা আবান আর এডওয়ার্ড ব্যাগলি একে ভাড়া করেছে বটে, কিন্তু রানার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা বলল—ওর মত আবেলও অন্ধকারে। আপাতত ওর উপর আস্থা রাখার সিদ্ধান্ত নিল রানা, উল্টোপাল্টা কিছু ঘটলে পরে নাহয় বিকল্প কিছু ভেবে দেখা যাবে।

'কী ঘটেছিল?' চেয়ার টেনে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করল রানা।

ভাতিজাকে বিদায় দিয়ে ওর মুখোমুখি বসল আবেল। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলতে শুরু করল এয়ারপোর্টে ঘটে যাওয়া সুদানিজ দস্যু আর ওর মধ্যকার সংঘর্ষের ঘটনা। ভুল করে রানার বদলে উদ্ধার করা অমরজিৎ সিং-এর কথাও বলল সে—ভারতীয় একজন ব্যবসায়ী ছিল লোকটা, সেই অভিজ্ঞতার পর আজ সকালেই আরেকটা ফ্লাইট ধরে পালিয়ে বেঁচেছে।

ঘটনাটা শুনে গম্ভীর হয়ে গেল রানা। একটু দ্বিধায় ভুগল ও, তারপর ঠিক

করল—সব খুলে বলবে আবেলকে। নিরীহ একজন মানুষকে বিপদের মাঝখানে টেনে আনার আগে সব খোলাসা করে দেয়া দরকার। এরপর কী করবে না করবে, সেটা আবেলের নিজস্ব সিদ্ধান্ত।

গলা খাঁকারি দিয়ে বলতে শুরু করল রানা। অপ্রয়োজনীয় অংশগুলো বাদ দিয়ে সোহেলের কিডন্যাপিং আর রোম এয়ারপোর্টের ঘটনা পর্যন্ত সব খুলে বলল। জানতে চাইল, এতকিছুর পর, সামনে আরও বিপদ আছে জেনেও আবেল ওর গাইড হিসেবে কাজ করতে রাজি আছে কি না।

'অবশ্যই, *এফেন্দি*,' নির্দ্বিধায় বলল আবেল। 'সবকিছু শুনে আমার তো আগ্রহ আরও বেড়ে গেল। আছি আমি আপনার সঙ্গে।'

'বিপদ শুধু হতে পারে না, হবেই!' হুঁশিয়ার করল রানা।

'বিপদ-আপদের ভয় এই আবেল আফরাকি করে না, *এফেন্দি*,' বুক চাপড়ে বলল প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধা। 'আপনারও করা উচিত নয়। তা ছাড়া... ওরা আপনাকে মারতে চাইছে বলেও মনে হয় না। যদি তা-ই হতো, আজ আপনি এ-পর্যন্ত পৌঁছুতে পারতেন না।'

'কিন্তু ব্যাপারটায় আরও কোনও পক্ষ জড়িত রয়েছে বলে মনে হচ্ছে আমার,' রানা একটু যেন বিভ্রান্ত। 'আমাকে যে-লোক ফোন করল, তাকেই আবার খুন করল কে?'

'আমার তো মনে হয়, আসমারা এয়ারপোর্টে যারা আপনার অপেক্ষায় ছিল, আর রোমের খুনি একই পক্ষের লোক। আপনার বন্ধুকে যারা কিডন্যাপ করেছে, তাদের থেকে আলাদা একটা গ্রুপ এরা—তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ভরা গাল চুলকাল। 'কিন্তু কারা এরা? সুদানিজ বিপ্লবী? ওরা ব্যাপারটার মাঝখানে আসছে কীভাবে?'

'সাধারণ সুদানিজ ছিল না ওরা,' মাথা নাড়ল আবেল। 'উঁচু শ্রেণীর লোকজনের মত পোশাক পরে ছিল—ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক। তা ছাড়া... রোমে যেভাবে অপারেট করেছে, তাতে বাইরের কন্ট্যাক্ট বা সাহায্য থাকতে বাধ্য। আমার মনে হয়, ওদেরকে মার্সেনারি হিসেবে ভাড়া করা হয়েছে।'

'সেক্ষেত্রে টাকাটা কে দিচ্ছে?'

'সেটাই খুঁজে বের করতে হবে আমাদেরকে,' বলল আবেল।

'ডিটেকটিভ সাজার সময় নেই আমাদের, আবেল,' মাথা দোলাল রানা। 'সোহেলকে বাঁচাতে চাইলে সোমবারের ভিতর ফিল্ডে নামতে হবে আমাকে। তাতেও কিম্বারলাইট পাইপটা খোঁজার জন্য মাত্র পাঁচ সপ্তাহ সময় পাচ্ছি।'

'এলাকাটার জিয়োলজি সম্পর্কে নতুন কিছু জানাতে পারব না আপনাকে,' আবেল বলল। 'তবে ওখানে কখনও হীরা পাওয়া গেছে বলে জানা নেই আমার। এলাকাটা অবশ্য আমার পরিচিত। মরুভূমির ওই এলাকায় যুদ্ধের সময় বহু বন্ধুকে কবর দিতে হয়েছে আমাকে।' ওর চোখে বিষাদের মেঘ ঘনাল।

'ও নিয়ে পরে কথা বলব আমরা,' প্রসঙ্গ পাল্টাল রানা। 'দিনা আবান সম্পর্কে কী জানো?'

'পরিবারটাকে চিনি, মেয়েটাকে নয়,' বলল আবেল। 'ইরিত্রিয়ার হিসেবে বেশ

ধনী একটা পরিবার। বেশ প্রাচীন এবং সম্মানিত। আমাকে ভাড়া করার সময় ফোনে কথা হয়েছে মিস আবানের সঙ্গে, সামনাসামনি দেখিনি কখনও।'

'ওর ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে আমাদেরকে,' বলল রানা।

'কেন?' আবেল একটু অবাক হলো।

দিনার ইজরায়েলি কানেকশনের ব্যাপারে খুলে বলল রানা। মেয়েটা প্রতি পদে কীভাবে ওর সঙ্গে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে—জানাল সেটাও।

'চিন্তায় ফেলে দিলেন,' গম্ভীর গলায় বলল আবেল। 'এই মেয়ে কি আমাদের সঙ্গে ফিল্ডে যাবে নাকি?'

'না চাইলেও আমি নিয়ে যাব,' রানা বলল। 'সবকিছু শেষ হবার আগে ওকে আমি চোখের আড়াল করতে চাই না।'

দিনের বাকি সময়টা বারে বসে এক্সপিডিশনের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করল রানা আর আবেল। প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধা জানাল, ইতোমধ্যে ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য ভাল দেখে একটা টয়োটা ল্যাণ্ড-ক্রুজার ভাড়া করে ফেলেছে সে, দু'জন স্থানীয় কুলি নিয়েছে। আমেরিকা থেকে দিনার মাধ্যমে পাঠানো রানার নির্দেশ অনুসারে ক্যাটারপিলার ট্র্যাকের দুটো ট্রান্সপোর্টার আর এক্সক্যাভেটরও ম্যানেজ করে রেখেছে আবেল, ওগুলো এখন ওদের টার্গেট এরিয়ার কাছাকাছি *নাক্ফা* শহরে অপেক্ষা করছে। লিজ নেয়া অন্যান্য হেভি ইকুইপমেন্ট অবশ্য ইরিত্রিয়ায় পৌঁছুতে আরও দেরি হবে।

অতিরিক্ত সেদ্ধ হওয়া *পাস্তা*, টমেটো সস আর অচেনা কোনও মাংসের তরকারি দিয়ে খাওয়া সারল ওরা। তারপর হোটেলের স্টোরেজ থেকে দরকারি কয়েকটা জিনিস বের করে রুমে চলে গেল রানা, বিদায় দিল আবেলকে। যাবার আগে বলে দিল, পরদিন সকালে আবার মিলিত হবে ওরা।

শাওয়ার নিয়ে রুমের সঙ্গে লাগোয়া ব্যালকনিতে বেরিয়ে এল রানা, অলস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রাতের আসমারার দিকে। হঠাৎ করে স্যাটেলাইট ফোনের মৃদু রিং শুনতে পেল ও, জিনিসটা ওর লাগেজের ভিতর রয়ে গেছে, বের করা হয়নি। নিজেকে গাল দিল রানা—ফোনটা *রিসিভ* মোডে রেখে দিয়েছে ও, নরমালে নেবার কথা ভুলে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি ওটা বের করে নিয়ে ভাঁজ খুলতেই দেখল *লো-ব্যাটারি* সঙ্কেত ভেসে উঠেছে। ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই, তাড়াতাড়ি কানে ঠেকাল ফোনটা।

'হ্যালো?'

ভেবেছিল অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, বা, এফবিআই-এর ডিরেক্টর রবার্ট সোয়ানের ফোন; কিন্তু ওপাশের কণ্ঠটা শুনেই ভুল ভাঙল রানার। গলাটা অচেনা, তবে ভিডিওটেপ আর রোম এয়ারপোর্টে শোনা কণ্ঠের মত বাচনভঙ্গি এর-ও। নাম্বারটা ওরা কীভাবে জোগাড় করেছে, কে জানে। একটু অবাক হলো রানা।

কঠিন সুরে লোকটা বলল, 'মি. রানা, ইটালিতে আমাদের বন্ধুর ভাগ্যে যা ঘটেছে, তার জন্য সোহেল আহমেদকে মূল্য দিতে হয়েছে। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার আপনি আমাদের কাজে বাধা দেয়ার চেষ্টা করলেন। মনে রাখবেন, তৃতীয়বার

কিন্তু আর কোনও হুঁশিয়ারি পাবেন না; আপনার বন্ধুকে খুন করে সোজা মাটিতে পুঁতে ফেলব আমরা!'

চোয়াল শক্ত হয়ে গেল রানার। সোহেলের উপর নির্যাতন চালিয়েছে ওরা... অকারণে! তীক্ষ্ণ গলায় ও প্রতিবাদ জানাল, 'কাজটা ঠিক করোনি তোমরা। রোমের ঘটনার জন্য আমি দায়ী নই। তোমাদের বন্ধুকে আমি গুলি করিনি; কে করেছে—তা-ও দেখিনি।'

'তাতে কিছু যায়-আসে না,' নির্লিপ্ত গলায় বলল কণ্ঠটা। 'সোহেল হাতের কাছে ছিল, ওর উপরই রাগটা ঝেড়েছি আমরা। অস্থির হবার কিছু নেই, ও এখনও জ্যান্ত আছে।'

'রাগ ঝাড়ার জন্য ভুল লোক বেছেছ, মিস্টার!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল রানা। 'এর জন্য পস্তাবে।'

'বোলচাল অন্য কোথাও মারুন, মি. রানা; আমাদের কাছে পাত্তা পাবেন না,' ধমকে উঠল কণ্ঠটা। 'কাজের কথায় আসি। শুনুন, আজ থেকে দু'দিন পর পর ঠিক মাঝরাতে এই ফোনে যোগাযোগ করব আমরা। সার্চের অগ্রগতি সম্পর্কে আমাদেরকে রিপোর্ট দিতে থাকবেন আপনি, ক্লিয়ার? আর খনিটা যদি পেয়েই যান, সেক্ষেত্রে শিডিউলের অপেক্ষায় থাকার দরকার নেই; আমার এই নাম্বারটাতে সরাসরি রিং দেবেন।'

'খামোকা কষ্ট করতে যেয়ো না,' বলল রানা। 'কাজ শুরু করতেই এক সপ্তাহ লেগে যাবে। তা ছাড়া দু'দিন পর পর তোমার মত নোংরা শুয়োরের গলা শোনার মানসিকতাও নেই আমার—কাজই করতে পারব না তা হলে। আমার কথা শোনো, দু'সপ্তাহ পর সোমবারে ফোন কোরো, তা হলে হয়তো কিছুটা খবর দিতে পারব। এরপর থেকে প্রতি সোমবারে খবর নিলে আমার জন্য ব্যাপারটা সহনীয় হয়। ঠিক আছে?'

প্রতিপক্ষের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সামান্য চেষ্টা করছে রানা। এতে যদি সফল হয়, ভবিষ্যতে আরও কিছু আদায় করে নেয়া যেতে পারে।

'আপনার কথায় যুক্তি আছে,' একটু ভেবে বলল কণ্ঠটা। 'ঠিক আছে, মেনে নিচ্ছি প্রস্তাবটা। তাই বলে নিজেকে স্বাধীন ভাবতে যাবেন না। সারাক্ষণ আপনার উপর নজর রাখা হবে।'

ফাঁপা হুমকিটা শুনে মনে মনে হাসল রানা। মিছেই ভয় দেখাতে চাইছে এরা, পাহাড়-মরুভূমির মাঝখানে চলে গেলে কারও পক্ষেই ওর উপর নজর রাখা সম্ভব নয়। তবে উপলব্ধিটা নিজের ভিতর চাপা রেখে ও বলল, 'তোমাদের কথামতই হবে সব। কিন্তু খবরদার, সোহেলের যেন কিছু না হয়।'

'দুই সপ্তাহ, মি. রানা।'

ফোনটা নীরব হয়ে গেল এরপর।

রানার জানা নেই, মাত্র বিশ গজ দূরে রয়েছে কলার, ফোন করেছে একই হোটেলের আরেকটা রুম থেকে। ওটাতেই উঠেছে সোহেলের অপহরণকারী দলের সদস্যরা। ওরাই ইয়োরোপিয়ান ব্যবসায়ী সেজে বসে ছিল হোটেলের বারে,

রেকর্ড করে নিয়েছে রানা আর আবেলের সমস্ত কথোপকথন।

স্যাট-ফোনটা বন্ধ করে সঙ্গীর দিকে তাকাল ইয়াশাদ। ছেলেটা ওর চেয়ে ত্রিশ বছরের ছোট এক ইজরায়েলি তরুণ। সোফায় বসে চুপচাপ পয়েন্ট ফাইভ যিরো ক্যালিবারের এক জোড়া ডেজার্ট ঈগল অ্যাকশন-এক্সপ্রেস অটোমেটিক পিস্তল পরিষ্কার করছে। দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী হ্যাণ্ডগান ওগুলো—এক শটে মানুষকে অচল করে দেয়া যায়; মাথায় গুলি করা হলে মুণ্ডুটাই ধড় থেকে আলাদা হয়ে যাবে। আপাতত এ-দু'টো অস্ত্রই ওদের সম্বল। বাকি সমস্ত অস্ত্র আর ইকুইপমেন্ট রাখা হয়েছে অন্য একটা হোটেলে, দলের বাকি সদস্যরা ওখানে উঠেছে।

'হাসাবের আসল খুনিকে নিয়ে চিন্তা হচ্ছে আমার,' তিক্ত গলায় বলল ইয়াশাদ, ধপ্ করে বসল সোফায়। সোহেলের উপর অত্যাচার চালানো হয়নি, রানাকে ভয় দেখাতে কথাটা বলেছে ও। সত্যিকার সমস্যাটা নিজেও বুঝতে পারছে।

'ওকে খুঁজে বের করব আমরা,' স্থির গলায় বলল ওর সঙ্গী—কণ্ঠে তারুণ্যের আত্মবিশ্বাস।

'সেটা ভাবছি না,' ইয়াশাদ বলল। 'খুনি একা কাজ করছিল না, ওর পিছনে আরও কেউ আছে। কারা এরা... রানা, বা আমাদের কাজের সঙ্গে তাদের কানেকশন কী—সেটাই জানতে হবে।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'আমাদের ব্যাপারে কেউ জানে, এমনটা ভাবারই তো অবকাশ দেখছি না। সিকিউরিটিতে খুঁত ছিল না কোনও। তারপরও মারা পড়েছে হাসাব। এমন একটা থ্রেট উদয় হয়েছে, যার বিষয়ে কিছুই জানা নেই আমাদের।'

'আমাদের দলের কেউই বেঈমানী করেনি তো?' সন্দেহ প্রকাশ করল তরুণ টেরোরিস্ট।

প্রশ্নটার মর্মার্থ বুঝতে অসুবিধে হলো না ইয়াশাদের। মাথা নেড়ে বলল, 'নাহ্। মোসাদ বা শিন বেটের পক্ষে আমাদের অপারেশন সম্পর্কে কিছু জানার কথা নয়। ইজরায়েলে দিনা আবান আর ওর কন্ট্রোলারদের মিটিঙের রিপোর্ট পাঠিয়েছে আমাদের ইনফর্মার। তা দেখে তো মনে হচ্ছে না মেয়েটা আমাদের ব্যাপারে কিছু আঁচ করতে পেরেছে।'

চুপ করে রইল ওর সঙ্গী।

ইয়াশাদ বলল, 'অবশ্য ওই দিনা আবানকে নিয়ে ভাবনার কিছু নেই। আগামীকাল এখানে পৌঁছে যাবে ও, মাথার উপর কর্তাদের ছায়া পাবে না। একাকী ও আমাদের জন্য কোনও হুমকি নয়।'

'ও রানার সঙ্গে থাকবে,' মনে করিয়ে দিল তরুণ টেরোরিস্ট।

'যতক্ষণ সোহেল আহমেদ আমাদের হাতে আছে, ততক্ষণ রানাও একটা ঢোঁড়া সাপ। আমাদের মাথা ঘামাতে হবে অচেনা পক্ষটাকে নিয়ে।'

সঙ্গীর কাছ থেকে একটা ডেজার্ট ঈগল নিয়ে বালিশের তলায় গুঁজল ইয়াশাদ।

গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল রানার। রুমটা ঠাণ্ডা, তারপরও শরীর ভিজে জবজবে হয়ে গেছে ঘামে। পায়ের কাছে দলা পাকিয়ে রয়েছে কম্বল আর বিছানার চাদর, যেন ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখে হাত-পা ছুঁড়ছিল। অথচ স্বপ্ন দেখেনি ও... সত্যি বলতে কী, সোহেল কিডন্যাপ হয়ে যাবার পর এই প্রথম একটা শান্তির ঘুম দিয়েছিল। সে-কারণে অবচেতন মনটা ঠিকমত কাজ করতে পেরেছে, গত কয়েকদিন ধরে কী যেন খুঁতখুঁত করছিল মনের ভিতর, সেটা পরিষ্কার হয়ে গেছে হঠাৎ করে। ব্যাপারটা মনে পড়তেই ঝট্ করে উঠে বসল ও, উত্তেজনায় জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে।

কিম্বারলাইট পাইপ... হ্যাঁ, একটা কিম্বারলাইট পাইপ খুঁজে পেতে চাইছে সবাই। ব্যাগলি ওটার কথা বলেছে, বলেছে দিনাও। মেডিউসা স্যাটেলাইটের ছবিতে ওই পাইপটাকেই দেখা গেছে। কিন্তু ব্যতিক্রম হলো সোহেলের কিডন্যাপাররা। ওদের মুখ থেকে একবারও পাইপ শব্দটা শোনেনি রানা। বারবার ওরা ওকে *হীরার খনি* খোঁজার কথা বলেছে, *কিম্বারলাইট পাইপ* নয়! পার্থক্য আছে দুটোতে। কিম্বারলাইট পাইপ হলো প্রাকৃতিক, মানুষ যখন ওটাকে খোঁড়ে, হীরা তুলতে শুরু করে... তখনই কেবল ওটাকে খনি বলা চলে।

একটাই অর্থ হতে পারে এর। কিম্বারলাইট পাইপটা অনাবিষ্কৃত নয়, অন্তত একবার খোঁড়া হয়েছে আগে... ওখানে একটা খনি আছে... হারানো খনি! সেটাই খুঁজে পেতে চাইছে টেরোরিস্টরা। সে-কারণেই ওটার থাকা নিয়ে এত নিশ্চিন্ত ওরা, কোনও ধরনের সন্দেহ নেই মনে, রানার উপর ক্রমাগত চাপ দিয়ে চলেছে।

পরিস্থিতি পাল্টে গেছে, ভাবল রানা। এখনও হাজারটা সমস্যা আছে বটে, তবে মাটির তলায় লুকিয়ে থাকা একটা পাইপের বদলে পুরনো একটা এক্সক্যাভেশন সাইট খুঁজতে হবে বুঝতে পেরে অদ্ভুত একটা আলো জেগে উঠেছে ওর মনে, জেগেছে সফল হবার আশা। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হয়ে গেল রানার মন থেকে। তৈরি এখন ও—চ্যালেঞ্জটা মোকাবেলা করার জন্য।

উনিশ

খার্তুম, সুদান।

আরবিতে *সুদান* শব্দের অর্থ কালো। তবে দেশটাকে যারা নিয়ন্ত্রণ করে, তারা মোটেই কালো চামড়ার নয়; তারা আরব-বংশোদ্ভূত। উত্তরের এই অভিজাত মানুষগুলো যে-কোনও মূল্যে নিজেদের আভিজাত্য আর ক্ষমতা ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর। তারই ফলশ্রুতিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ, রোগ-শোক, আর দমন-নিপীড়নে দক্ষিণাঞ্চলের সত্যিকার কালো আফ্রিকানরা লাখে লাখে মরেছে। ফলে আফ্রিকার সবচেয়ে বড় দেশটা পরিণত হয়েছে ঘৃণায় ভরা নোংরা এক ডাস্টবিনে।

মার্সেলো মানসিনির জন্য এমন একটা দেশ যে টাকা বানানোর একটা বিশাল ক্ষেত্র, তা বলাই বাহুল্য। মানুষের দুর্ভাগ্যকে পুঁজি করে নিজের অর্থ-বিত্ত

বাড়ানোতে তার জুড়ি নেই।

মানসিনির মত ধনীরা সম্পূর্ণ আলাদা এক জগতের মানুষ—প্রাইভেট জেটে ভ্রমণ করে তারা, থাকে প্রাসাদোপম অট্টালিকাতে; কাস্টমস্ বা ইমিগ্রেশনের মত ছোটখাট ফর্মালিটির মধ্য দিয়ে তাদেরকে কখনও যেতে হয় না। আজও তেমনটাই ঘটেছে—খার্তুমে ল্যাণ্ড করবার পর কয়েক মিনিটের মধ্যেই এয়ারপোর্ট ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে মানসিনি, চলে এসেছে নিজস্ব ভিলায়। শহরের অভিজাত এলাকায়, পাহাড়ি ঢালের কোলে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা—ওখান থেকে পুরো খার্তুম শহর দৃষ্টিগোচর হয়। সুদানের অল্প কিছু ধনী ব্যক্তি আর সরকারি আমলা এলাকাটাতে বাস করবার সামর্থ্য রাখে। যদিও খার্তুম মানসিনির খুব অপছন্দের একটি শহর, তারপরও সুদানে ওর এত বেশি ব্যবসা আছে যে, বিশটা রুম আর আঠারোজন স্টাফসহ একটা প্রাসাদ না রাখলে চলে না—মাঝে মাঝেই ওখানে উঠতে হয় তাকে।

মালিকের আসবার খবর আগেই পেয়েছে স্টাফরা, মানসিনির লিমাজিন যখন গেট পেরিয়ে ঢুকছে, তখন দেখা গেল লাইন ধরে অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়ে আছে তারা। ধীরে ধীরে পোর্টিকোর তলায় এসে ঢুকল গাড়িটা, হেডলাইটের আলোয় সবার মুখ উদ্ভাসিত হলো; মেইন ডোর বরাবর থেমে যেতেই হেড বাটলার ঝুঁকে পিছনের দরজাটা খুলে দিল।

'ধন্যবাদ, আলি,' গাড়ি থেকে নেমে বলল মানসিনি। 'কেমন আছ তোমরা?'

বয়স্ক হেড বাটলার সসম্ভ্রমে সালাম ঠুকল। 'চমৎকার, সার। আবার আপনার সেবার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। অবশ্য কতদিন থাকবেন আপনি, সেটা কেউ বলতে পারেনি। আমরা কি লম্বা সময়ের জন্য প্রস্তুতি নেব?'

'না, আলি। খুব অল্প সময়ের জন্য এসেছি।' স্টাফদের উপর নজর বোলাল মানসিনি। মেইডের পোশাক পরা অল্পবয়েসী দুটো মেয়ে নজর কাড়ল তার, আগে দেখেনি ওদেরকে। বাটলারের দিকে ফিরে ভুরু নাচাল।

'মাসখানেক আগে কিনেছি ওদের—আমার পরিচিত এক স্লেভ-ট্রেডারের কাছ থেকে,' বলল আলি। 'দাম একটু বেশি পড়েছে, তবে জিনিস ভাল; আগে থেকেই কাজকর্মে ট্রেইনিং পাওয়া।'

পৃথিবীর যে-অল্প ক'টা দেশে আজও ক্রীতদাসপ্রথা চালু আছে, সুদান তার একটা। কাগজে-কলমে এই ব্যবসা অবৈধ, তবে সরকার সাধারণত চোখ-কান বুজে থাকে এই বিশেষ ইস্যুটির ব্যাপারে। দক্ষিণাঞ্চলের অল্পবয়েসী মেয়েরাই সাধারণত শিকার হয় দাসত্বের; বিদ্রোহীদের খোঁজে বিভিন্ন এলাকায় রেইড চালাবার সময় অপহরণ করা হয় তাদের, খার্তুমে এনে চড়া দামে বিক্রি করা হয় নগরের অভিজাত শ্রেণীর কাছে, কিছু মেয়েকে রফতানি করা হয় মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে। মোটা কমিশন পায় সরকারের উঁচু পদের লোকজন, তা ছাড়া দেশের ভিতর ওরাই মূলত ক্রীতদাস ব্যবহার করে... চোখকান বন্ধ রাখার প্রধান কারণ ওটাই। খাঁটি ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ-ব্যবসাতেও নাম লেখাবার কথা ভেবেছিল একবার মানসিনি, তবে বাজার ধরতে পারবে না ভেবে পিছিয়ে গেছে। তা ছাড়া সুদান থেকে মধ্যপ্রাচ্যে মানব-পাচারেও হাজারটা ঝক্কি-ঝামেলা আছে।

সব মিলিয়ে এ ব্যবসাটা তেমন লাভজনক বলে মনে হয়নি তার কাছে।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেয়েদুটোর একহারা শরীর দেখল মানসিনি। বাটলারকে বলল, 'পরে ওদেরকে আমার রুমে পাঠিয়ে দিয়ো।'

'জী, সার। আর ইয়ে...'

'কী ব্যাপার?'

'আপনার ওই লোকটা এসেছে, সার... ঘণ্টাখানেক আগে পৌঁছেছে,' বলল আলি। 'স্টাডিতে বসিয়ে রেখেছি ওকে। সঙ্গে একজন গার্ড রেখেছি, যাতে ডান-বাম করতে না পারে।'

বাটলারের দূরদৃষ্টি দেখে খুশি হলো মানসিনি। সে নিজেও হিলালকে এক মুহূর্তের জন্য চোখের আড়াল করতে রাজি নয়, বিশেষ করে নিজের বাড়ির ভিতরে। খুশিমনে ভিলায় ঢুকল ইটালিয়ান টাইকুন, এয়ার-কণ্ডিশনারের ঝিরিঝিরি ঠাণ্ডা বাতাসে শরীরে লাগল শীতল পরশ। বাড়িটা কংক্রিটে তৈরি হলেও ইন্টেরিয়রের সমস্ত কাজ করা হয়েছে ইটালিয়ান মার্বেল পাথর দিয়ে। মেডিটারেনিয়ান স্টাইলে শুরুতেই একটা বিশাল ফয়েই—সুন্দর করে সাজানো। চুরি যাবার ভয়ে খার্তুমে ইয়োরোপিয়ান আর্টওঅর্ক আনার সাহস করেনি মানসিনি, তার বদলে স্থানীয় শিল্পকর্ম শোভা পাচ্ছে ফয়েই-এ। অবশ্য ওগুলোও ফেলনা নয়, প্রফেশনাল একজন কালেক্টরের মাধ্যমে গোটা আফ্রিকা মহাদেশ চষে জোগাড় করা হয়েছে। *আশান্তে* মুখোশ, *নডবেল* বর্ম আর হাতে বোনা ওয়াল-কার্পেট থেকে শুরু করে ডিসপ্লে কেস-ভর্তি বিভিন্ন উপজাতির সোনা-রূপার ছোট-বড় অলঙ্কার পর্যন্ত আছে এখন কালেকশনটাতে।

বিশাল বাড়িটার একটা প্রান্তে রয়েছে স্টাডি—ভিতরটা নানা রকম বুকশেলফে সজ্জিত, কয়েক হাজার বই আছে ওগুলোতে। ফায়ারপ্লেস আছে একটা, তার উপর অতিকায় এক হাতির স্টাফ করা মাথা ঝোলানো... দাঁতদুটো আগুনের আভার প্রতিফলনে অদ্ভুত দ্যুতি ছড়ায়—সে এক দেখার মত দৃশ্য। মানসিনির কাছে অবশ্য এসব দৃশ্য পুরনো, গটমট করে স্টাডিতে ঢুকে তাই সে তাকাল তার অতিথির দিকে। সুদানিজ তরুণটি একটা চামড়ার কাউচে আধশোয়া হয়ে আছে, পা তুলে দিয়েছে সামনের নিচু কাঁচের টেবিলের উপর।

কর্তাকে ঢুকতে *দেখেই* সামরিক কায়দায় স্যালিউট ঠুকল দরজার পাশে দাঁড়ানো গার্ড। ইশারায় তাকে চলে যেতে বলল মানসিনি, দরজা বন্ধ হতেই শুদ্ধ আরবিতে হিলালকে বলল, 'বাহ্, বাহ্, আমার স্টাডিটাকে নিজের বেডরুম বানিয়ে ফেলেছ দেখছি!'

হিলালের পরনে পশ্চিমা পোশাক—কালো জিন্স, ঢোলা টি-শার্ট আর উপরে একটা লেদার জ্যাকেট। মাথায় ফিলিস্তিনী মুক্তিযোদ্ধাদের মত লাল রুমাল বেঁধেছে, যদিও সে নিজে একজন খ্রিস্টান ও সুদানের বিপ্লবী আন্দোলনের সদস্য। মানসিনির কণ্ঠে বিদ্রূপ টের পেয়ে সোজা হয়ে বসল হিলাল। ভালমানুষির ভান করে বলল, 'আপনি কি কোনও কারণে আমার উপর নাখোশ হয়েছেন, *এফেন্দি?*'

নিজের ডেস্কে গিয়ে বসল মানসিনি। বলল, 'হ্যাঁ, হয়েছি। একটা গার্ডকে

রোমে পাঠিয়েছিলে তুমি, হারামজাদা আরেকটু হলে মাসুদ রানাকেই খতম করে দিচ্ছিল! ওকে বলেছিলাম শুধু রানার উপর নজর রাখতে, অথচ বেকুবটা এয়ারপোর্টের ভিতর গোলাগুলি করেছে... তিনজন মানুষকে খুন করেছে! কপাল ভাল যে পুলিশ ওর সঙ্গে আমার কানেকশন খুঁজে পায়নি। নইলে এমন একটা কেলেঙ্কারি সামাল দেয়া স্রেফ অসম্ভব ছিল।'

অবাক হলো হিলাল। 'হঠাৎ গুলি ছুঁড়তে গেল কেন ও?'

'তা আমি কী করে বলব?' রাগী গলায় বলল মানসিনি।

'নিশ্চয়ই কোনও কারণ ছিল,' মাথা দোলাল হিলাল। 'আসমেত আমার আপন চাচাত ভাইয়ের শালা, ওর উপর সম্পূর্ণ আস্থা আছে আমার। কয়েক মাস আগের ওই ইয়োরোপিয়ান আর্কিয়োলজিস্টের কথা মনে আছে আপনার? ওই যে... যে-লোকটা আপনার সার্চ এরিয়াতে ঘোরাফেরা করছিল? আসমেত-ই তো খোঁজ বের করেছিল ওর! খুবই যোগ্য লোক আমার বেয়াই। ওকে পরে গোলাগুলির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেননি আপনি?'

'ওটাকে ঠিক জিজ্ঞাসাবাদ বলা চলে না,' নিষ্ঠুর হাসি ফুটল মানসিনির ঠোঁটে। কোটের পকেট থেকে বের করে আনল একটা ভিডিওটেপ। 'এটা তোমার কাছে পাঠাব ভেবে তৈরি করিয়েছি আমি। তবে নিজেই যখন এসে পড়েছ, তখন এখানেই দেখে নিতে পারো, চাইলে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দেখাতে পারো তোমার দলের আর সবাইকে।'

টেপটা নিয়ে এক কোণের টিভির দিকে এগিয়ে গেল হিলাল, ভিসিআরে ঢুকিয়ে চালু করল। একটু পরেই চোখদুটো অবিশ্বাসে ঠিকরে বেরিয়ে আসার উপক্রম হলো তার—আপন চাচাত ভাইয়ের শ্যালককে দুই ক্রেনের টানে ছিঁড়ে দু'টুকরো হয়ে যেতে দেখে, মুখের ভাষা হারাল দুর্ধর্ষ টেরোরিস্ট, টিভি বন্ধ করে হতভম্বের মত বসে রইল।

'আমার আদেশ অমান্য করবার শাস্তি এটা,' কঠিন গলায় বলল মানসিনি। 'তোমার বেয়াই যে-ভুল করেছিল, সেটা থেকে তোমাদের সবাইকে শিক্ষা নিতে হবে, হিলাল। এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, কতটা সিরিয়াস আমি? মেলা টাকা দিই আমি তোমাদের, তবে সেটা আমার সর্বনাশ করবার জন্য নয়!'

জবাব দিল না হিলাল।

ডেস্ক ছেড়ে ফায়ারপ্লেসের পাশের ছোট বার-টার দিকে এগিয়ে গেল মানসিনি। হিলাল হঠাৎ খেপে ওঠে কি না, জানা নেই; তাই দুই দরজায় দুজন রাইফেলধারী দাঁড় করিয়ে রেখেছে। তা ছাড়া শোলডার হোলস্টারে বেরেটা তো আছেই। দুটো গবলেটে মদ ঢালল। একটা বাড়িয়ে ধরল হিলালের দিকে। কথা না বলে পেয়ালাটা হাতে নিল তরুণ সুদানিজ। নিজের ড্রিঙ্কটা নিয়ে ওর মুখোমুখি বসল মানসিনি।

'শোনো,' বোঝানোর ভঙ্গিতে নরম গলায় বলল ইটালিয়ান টাইকুন, 'অনেকদিন হলো চমৎকার একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছে আমাদের মধ্যে।' টিভির দিকে ইশারা করল। 'দুঃখজনক, কিন্তু অপরিহার্য একটা ঘটনার জন্য তাতে তিক্ততা আনা ঠিক হবে না। আমার রাগটা ছিল আসমেতের উপর, তোমার গোটা

দলের উপর নয়। তোমাদের লড়াইয়ের পিছনে অনেক-অনেক টাকা ঢেলেছি আমি; বিনিময়ে শুধু চেয়েছি, তোমরা সুদানকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবার পরেও যেন আমাদের বন্ধুত্বটা অক্ষুণ্ণ থাকে। তোমাদের আদর্শের উপর আমার আস্থা আছে, তাই আরও টাকা দেব... তবে সম্পর্কটা টিকিয়ে রাখার একটা নিদর্শন দেখাতে হবে তোমাকে... যাতে আমি বুঝতে পারি—আমার টাকাগুলো পানিতে পড়েনি, সঠিক লোকের হাতে পড়েছে। ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার কথা ভুলে গিয়ে আদর্শের কথা... বিপ্লবের কথা ভাবতে হবে তোমাকে। আসমেতের ব্যাপারটা ভুলে যেতে হবে!'

রাজনীতি বা কূটনীতির কিছুই বোঝে না হিলাল, সে-কারণেই বিপ্লবীদের লিয়াজোঁ হিসেবে তাকে বেছে নিয়েছে মানসিনি। দক্ষ যোদ্ধা সে, লড়াইয়ের ময়দানে অভিজ্ঞ; বাতচিতে নয়। সহজেই তাকে ম্যানিপুলেট করা যায়। হিলালের নেতারাও সম্ভবত ব্যাপারটা জানে, তারপরও ওর মাধ্যমে টাকা আসছে বলে চুপচাপ রয়েছে। মার্সেলো মানসিনি ওদের কিছু লোককে মার্সেনারি হিসেবে যথেচ্ছ ব্যবহার করছে জানার পরও তাই ওরা উচ্চবাচ্য করছে না।

হিলালকে উঠে দাঁড়াতে দেখে একটু শঙ্কিত হয়ে উঠল ইটালিয়ান টাইকুন, ডান হাতটা চলে এল পিস্তলের বাঁটের কাছে। তবে আগ্রাসী কোনও আচরণ করল না তরুণ বিপ্লবী, হাতের ড্রিঙ্ক শেষ হয়ে গেছে, বারে গিয়ে নতুন আরেকটা ড্রিঙ্ক নিল। বলল, 'আপনার অনুরোধ রক্ষা করার আগে জানিয়ে রাখতে চাই—রানাকে কবজা করা সম্ভব হয়নি। আসমারা এয়ারপোর্টে লোক পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু ওখানে একটা গণ্ডগোল বেধে যাওয়ায় ব্যর্থ হয়েছে ওরা। এখন আমাকেও কি আসমেতের ভাগ্য বরণ করতে হবে?'

ওর মন পড়তে পেরে সন্তোষ অনুভব করল মানসিনি, তবে চেহারায় তার ভাব ফুটতে দিল না। হিলাল একজন সোশিওপ্যাথ, চাচাত ভাইয়ের শ্যালকের মৃত্যুটা তাই দাগ কাটছে না ওর মনে—দীর্ঘ সংগ্রামের আরেকজন শহীদ বলে বিবেচনা করছে প্রয়াত আসমেতকে। নিজের ভুলে মৃত্যুবরণ করেছে ওর আত্মীয়। এ-ধরনের মৃত্যু দেখতে সে অভ্যস্ত, মানসিনির উপর তাই ক্ষোভ নেই মোটেই।

'মোটেই না,' গলার স্বর স্বাভাবিক রেখে বলল মানসিনি। 'রানাকে তো এমনিতেও পাবার কথা ছিল না তোমাদের। নির্ধারিত ফ্লাইটে চড়েনি ও, আসমারার উদ্দেশে আজ সকালে রওনা হয়েছে।'

'কিন্তু প্ল্যানটার তো বারোটা বাজল,' বিরক্ত গলায় বলল হিলাল। 'এয়ারপোর্টে ইরিত্রিয়ান সিকিউরিটি কড়া করে দেয়া হয়েছে, ওখান থেকে ওকে আর তুলে আনতে পারছি না আমরা।'

'ডোন্ট ওয়ারি,' হাসল মানসিনি। 'আসমারা ছোট্ট শহর, মাথা গোঁজার খুব বেশি জায়গা পাবে না রানা। সেরা লোকের আরেকটা টিম পাঠাতে হবে তোমাকে। রানার কাছ থেকে স্যাটেলাইট পিকচারগুলো ছিনিয়ে নিয়ে ওকে কবরে শুইয়ে দিয়ে আসবে। ওর পিছনে আর সময় নষ্ট করতে চাই না আমি।'

'আমি নিজেই...' বলতে শুরু করল হিলাল।

'না, তোমাকে আমার অন্য কাজে দরকার আছে,' বাধা দিয়ে বলল মানসিনি।

'ইরিত্রিয়ান বর্ডারে যাবে তুমি আমার সঙ্গে, মানে... যেখানে খনিটা পাওয়া যাবে বলে সন্দেহ করছি আমি। ছবিগুলো হাতে পাবার পর তা হলে আর সময় নষ্ট হবে না, সরাসরি কাজে নেমে যেতে পারব।'

'এত আগে ওখানে গিয়ে বসে থাকাটা রিস্কি হয়ে যাবে না?' ভুরু কোঁচকাল হিলাল।

'হ্যাঁ, কিছুটা রিস্ক আছে,' স্বীকার করল মানসিনি। 'তবে না গিয়েও উপায় নেই আমাদের। আসমেতের হাতে খুন হওয়া লোকটা রোম এয়ারপোর্টে যোগাযোগ করেছিল রানার সঙ্গে। পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে আমার কণ্ট্যাক্ট জানিয়েছে, ভুয়া পাসপোর্ট নিয়ে লোকটা রানার সঙ্গে একই ফ্লাইটে ইটালিতে এসেছিল। ব্যাপারটা কো-ইনসিডেন্স হতে পারে না, মাসুদ রানার পিছনে আরেকটা গ্রুপ লেগে আছে, ছায়ার মত ওরা অনুসরণ করছে ওকে। আমি শিয়োর, ওরাও খনিটা খুঁজে বের করতে চায়।'

'ওরা কারা?'

'জানি না, জানার প্রয়োজনও বোধ করছি না,' বলল মানসিনি। 'রানা খুন হয়ে গেলে, আর ছবিগুলো আমাদের হাতে এসে গেলে ওরা যারাই হোক, হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। আগামী দু-এক সপ্তাহের মধ্যে ইরিত্রিয়ান সীমান্তে তুমি কতজন লোক দিতে পারবে?'

'ব্যাপারটা রেভল্যুশনারি কাউন্সিলের ওপর নির্ভর করছে,' হিলাল বলল। 'তবে পঞ্চাশের কম হবে না আশা করি।'

'তাতেই চলবে। তবে আরও অন্তত একশো শ্রমিক জোগাড় করতে হবে আমাদেরকে। সাউথ আফ্রিকান মাইনিং স্পেশালিস্ট আছে আমার হাতে, কিন্তু ওদের শ্রমিক দরকার।'

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু খনিটা খুঁজে পাবার পর কতদিন আমরা ওটার দখল রাখতে পারব বলে আশা করছেন আপনি?'

'এতদিন ধরে যখন লুকানো আছে, তারমানে ওটা রয়েছে অত্যন্ত নির্জন কোনও এলাকায়,' বলল মানসিনি। 'রিফিউজি রুট বাদ দিয়ে একেবারে উত্তরের সীমান্তেই শুধু আছে অমন জায়গা। তোমার লোকজন যদি যাযাবর আর রাখালদেরকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে, তা হলে অন্তত দু'মাস আমরা সবার অগোচরে কাজ করতে পারব।'

'দু'মাস... বড্ড কম হয়ে গেল না?' ভুরু কোঁচকাল হিলাল।

'উঁহুঁ,' হাসল মানসিনি। 'আমার কাজের জন্য ওটুকুই অনেক।'

কাল রাতে লণ্ডনের এজেন্ট মেসেজ পাঠিয়েছে—ডায়মণ্ড সিণ্ডিকেট ইতোমধ্যে আফ্রিকায় একটি অনাবিষ্কৃত হীরার খনির ব্যাপারে গুজব শুনতে পেয়েছে। গুজবটা আসলে মানসিনিরই ছড়ানো; ক্ষমতাবান গ্রুপটার ভিতর অস্থিরতা তৈরি করবার কৌশল। কাজেও লেগেছে ওটা। ওর এজেন্ট জানিয়েছে, নার্ভাস হয়ে উঠেছে সিণ্ডিকেট; হীরার ব্যবসায় ওদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে নতুন একটা উৎস কী ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে, সেটা বুঝতে পেরে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছে। মানসিনি জানে, সিণ্ডিকেটকে নতজানু করা সম্ভব, যদি প্রমাণ করতে পারে—খনিটা

ও আবিষ্কার করেছে। ওখান থেকে হীরা তোলা বন্ধ রাখার জন্য কয়েক বিলিয়ন ডলার দিতেও কার্পণ্য করবে না ওরা। বলা যায় না, হয়তো মানসিনিকে সিন্ডিকেটের চেয়ারম্যানই বানিয়ে বসতে পারে! সেটাই তো চাই! তবে এর জন্য প্রমাণ দেখাতে হবে ওদের... পাঁচ হাজার ক্যারাট দেখালেই চলবে। স্বপ্নে বিভোর হয়ে গেল ইটালিয়ান টাইকুন—ডায়মণ্ড সিন্ডিকেটকে হাতের মুঠোয় নেবার ইচ্ছে ওর বহুদিনের।

'সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে, *এফেন্দি,*' বলে উঠল হিলাল। 'আপনি আমার উপর আস্থা রাখতে পারেন।'

'হ্যাঁ,' নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল মানসিনি, তাকাল টেলিভিশনটার দিকে। 'আমি জানি, তুমি আস্থার মূল্য দেবে।'

বিশ

আসমারা, ইরিত্রিয়া।

দিনা আবান যখন হোটেল *অ্যাম্বাসয়রা*-তে ঢুকল, তখন সকাল; রানা আর আবেল আফরাকি নীচতলার রেস্টুরেন্টে বসে ব্রেকফাস্ট সারছে। বরাবরের মত ওর দিকে দৃষ্টি আটকে গেল সবার, সেটা স্বাভাবিকও বটে। চেহারা এবং গায়ের রঙ স্থানীয় মেয়েদের মত হলেও দিনার পরনে রয়েছে অভিজাত পোশাক, হাঁটাচলায় ফ্যাশন মডেলের মসৃণতা। এসবের পাশাপাশি দৃঢ়তা আর আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ ঠিকরে বেরুচ্ছে পুরো অবয়ব থেকে। মেয়েটাকে ইজরায়েলের ফ্লাইট ধরতে দেখে সাময়িকভাবে সমস্ত আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছিল রানা, কিন্তু আবার মুখোমুখি হতেই কেমন যেন ঘোরে পড়ে গেল। দিনার দিকে তাকিয়ে বুকের ভিতর কাঁপন অনুভব করল ও।

পুরুষশাসিত সমাজের মানুষ বলেই হোক, কিংবা রানার দেয়া সতর্কবাণীর কারণে হোক, আবেল খুব দায়সারা ভঙ্গিতে স্বাগত জানাল নবাগতাকে। দিনা সেটা খেয়াল করেও করল না। পশ্চিমা মেয়েদের অনুকরণে রানার গালে আলতো চুমু খেয়ে অভিবাদন জানাল, তারপর টেবিলে বসে পড়ল একটা চেয়ার টেনে।

'দেখতে পাচ্ছি, কফির ব্যাপারে আমার ওয়ার্নিংটাকে সিরিয়াসলি নিয়েছ তুমি,' রানা আর আবেলের সামনে রাখা আধ-খাওয়া ক্যাপাচিনোর মগ দেখিয়ে হাসিমুখে বলল দিনা।

'রেগুলার কফিটা খেয়ে দেখেছি,' মুখ বাঁকাল রানা। 'স্রেফ আলকাতরা!'

'আগেই বলেছিলাম,' হাসিটা বিস্তৃত হলো দিনার। 'তবে এদের খাবারটা মন্দ না, মানে... তুমি যদি ইটালিয়ান পছন্দ করো আর কী! এখানকার সব হোটেলের একই ট্র্যাডিশন—শুধু ইটালিয়ান খাবার রান্না করে। সেই উপনিবেশ আমলের অভ্যাস ছাড়তে পারছে না। দেখি, যদি সময় পাই, তা হলে তোমাকে একটা সাধারণ ইরিত্রিয়ান রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাব। কফি খেয়ে মুখ বাঁকিয়েছ তো? *যিগিনি*

খেয়ে দেখো! এক ধরনের ঝোল ওটা, ছোট ছোট মরিচ দিয়ে বানানো হয়। সাইজে ছোট হলে কী হবে, একেকটায় আগ্নেয়গিরির মত ঝাল!'

'শুনে লোভ লাগছে খুব,' বলল রানা। 'তবে ফিরে আসার আগে সময় করতে পারব বলে মনে হয় না। আবেলের ভাইপো আমাদের ল্যাণ্ড-ক্রুজারটা আনতে গেছে। ওটা এসে গেলে লোডিং সেরে ফেলব আমরা, টুকটাক কিছু কেনাকাটাও করতে হবে। বিকেল নাগাদ রওনা হতে পারব বলে আশা করছি। রাতটা *কেরেন*-এ কাটিয়ে কাল সকালে আবার *নাকফা*-র পথ ধরব।'

'এত তাড়াহুড়ো কীসের?' ভুরু কোঁচকাল দিনা। রানাকে হাসতে দেখে লজ্জা পেল—তাগাদা ও তাড়াহুড়ো তো ওদেরই।

'এখানটা নিরাপদ নয় আমাদের জন্য,' বলল রানা। একটু দ্বিধায় ভুগল ও কতটুকু ব্যাখ্যা করবে তা নিয়ে। সোহেলের কিডন্যাপার অবশ্য বলেছে দিনাকে অবিশ্বাস না করতে, তবে ওর কথায় পাত্তা দেয়ার মানে হয় না। গোপনীয়তা রক্ষা করাটাই আপাতত সবচেয়ে ভাল হবে। দিনা আবান এখনও বিশ্বাস অর্জন করতে পারেনি। কপালকে গালমন্দ করল রানা—এমন একটি মেয়ের প্রতি আকর্ষণ বোধ করতে শুরু করেছে, যে কিনা শুরু থেকেই গোপন মতলব নিয়ে ওর সঙ্গে ক্রমাগত মিথ্যে বলে চলেছে।

একটু ভেবে রোম এয়ারপোর্টের ঘটনাটা চেপে গেল রানা, দিনাকে খুলে বলল শুধু আসমারা এয়ারপোর্টে সুদানিজদের উপস্থিতির কথা, আবেলের সঙ্গে ওদের মারপিটের ঘটনা। কথা শেষ করেই তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করল মেয়েটার অভিব্যক্তি।

প্রত্যাশিত ভঙ্গিতেই অবাক হলো দিনা—সেটায় খুঁত পেল না ও। বলল, 'কী বলছ তুমি! সুদানিজ গেরিলা? আমাদের এয়ারপোর্টে?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ওরা আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। এর মানে হচ্ছে, আমাদের মিশন সম্পর্কে ওরা জানে। কপাল ভাল যে, আগের দিনের ফ্লাইটটা মিস করেছিলাম আমি,' রোমের ঘটনা এড়িয়ে গেল ও, 'নইলে এয়ারপোর্টে নেমেই ওদের হাতে ধরা পড়ে যেতাম।'

দিনার চোখ বিস্ময়ে আরও বড় হয়ে গেল। 'তুমি কি আবারও হামলার আশঙ্কা করছ?'

'হুঁ। এখানে আমরা নাজুক অবস্থায় আছি, তাই যত দ্রুত সম্ভব আসমারা থেকে সরে যেতে চাই। আবেল তো যাচ্ছেই, তোমারও এখানে থাকা ঠিক হবে না।'

'আমি অবশ্য এমনিতেই তোমাদের সঙ্গে যাব ভাবছিলাম,' বলল দিনা। 'এখন তো বেশ ভাল একটা কারণ পেয়ে গেলাম। ঠিকই ধরেছ তুমি, আসমারা মোটেই নিরাপদ নয়। আমাদের পুলিশ আর মিলিটারির কথা কী আর বলব, গেরিলাদের সামনে দাঁড়াবার মত অবস্থা নেই ওদের।'

'আমি একমত,' মুখ খুলল আবেল। 'উত্তরের লো-ল্যাণ্ডে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়াই ভাল।'

'তা হলে তো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েই গেল,' দুই চুমুকে অবশিষ্ট ক্যাপাচিনোটা

শেষ করল রানা। তাকাল আবেলের দিকে। 'তোমার ভাইপো এসে গেলে হোটেলের স্টোরেজ থেকে আমার সমস্ত গিয়ার আর ইকুইপমেন্ট তুলে ফেলো ল্যাণ্ড-ক্রুজারে। নিজের জিনিসপত্রও নিয়ো। দিনা, তৈরি হতে কতটা সময় দরকার তোমার?'

'এক ঘণ্টার মধ্যে লাগেজ নিয়ে ফিরে আসতে পারব,' দিনা জানাল। 'আমার অ্যাপার্টমেন্টটা কাছেই।'

'জিনিসপত্র যেন বেশি না হয়,' বলে দিল রানা। 'আমরা বেড়াতে যাচ্ছি না।'

'ঠিক আছে।'

কথামত ঠিক এক ঘণ্টা পর লাগেজ নিয়ে হোটেলে চলে এল দিনা। আবেলকে মালামাল লোডিঙের জন্য রেখে বাজারে গেল রানা ওকে নিয়ে—অভিযানের জন্য বিশুদ্ধ পানি আর খাবারদাবার কিনবে। ঠিক করা হলো, লোডিং শেষে ল্যাণ্ড-ক্রুজারটা বাজারে নিয়ে আসবে আবেলের ভাইপো—কেনা জিনিসপত্র তুলে আনার জন্য। ইতোমধ্যে ছেলেটার নাম জানা হয়ে গেছে ওদের—পাশা।

প্রথমে পোস্ট অফিসে গেল রানা, দেশে ফোন করবে বলে জানাল দিনাকে। আসলে এফবিআই ডিরেক্টর রবার্ট সোয়ানের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে—সোহেলের কিডন্যাপারদের ব্যাপারে কদ্দুর কী জানা গেল, সেটা জিজ্ঞেস করতে চায়। তবে ইরিত্রিয়ার ভগ্নপ্রায় টেলি-কমিউনিকেশন ব্যবস্থা বিমুখ করে দিল ওকে। অনেক চেষ্টা করেও আমেরিকার লাইন পাওয়া গেল না। ঢাকায়ও চেষ্টা চালাল ও, যদি মেজর জেনারেল রাহাত খানের সঙ্গে কথা বলা যায়... তাতেও ব্যর্থ হতে হলো। হতাশ হয়ে পোস্ট অফিস থেকে বেরিয়ে এল রানা, যোগাযোগ করা গেল না কারও সঙ্গে। দুটো স্যাট-ফোন অবশ্য আছে ওর সঙ্গে, তবে ওগুলোর চার্জ প্রায় শেষ, চার্জারটা ফেলে এসেছে আর্লিংটনের বাড়িতে। সামান্য যেটুকু চার্জ আছে, তা ইমার্জেন্সিতে ব্যবহারের জন্য রাখতে হচ্ছে। বলা বাহুল্য, এখনও ইমার্জেন্সি দেখা দেয়নি। বাজারে চার্জার পাওয়া যায় কি না, খুঁজে দেখতে হবে—ঠিক করে রাখল রানা। নইলে সার্চ-এরিয়ায় যাবার পর সভ্যজগতের সঙ্গে যোগাযোগের কোনও উপায় থাকবে না।

আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকল রানা আর দিনা। নির্দিষ্ট কোনও ছক নেই রাস্তাগুলোর গঠনে। কোনও এককালে চারটে আলাদা গ্রাম ছিল রাজধানী এলাকায়, রাস্তাগুলো তখন ছিল স্রেফ মেঠোপথ—ওগুলোই পরে পাকা করা হয়েছে। গ্রাম-চারটে পরে একত্র হয়ে রাজধানীতে পরিণত হয়েছে, আসমারা শব্দের মানেই হচ্ছে একত্রিত হওয়া। পুরো শহরের মূল সড়কটাই শুধু চওড়া—ওটার নাম লিবার্টি স্ট্রিট; বেশ সুন্দর, পরিচ্ছন্ন... দু'পাশে পাম গাছের সারি। তবে ওটা বাদ দিলে বাকি সব হলো ঘিঞ্জি রাস্তা, ঘর-বাড়ির ফাঁকে ফাঁকে কোনোমতে জায়গা করে নিয়েছে। এই ঘিঞ্জি রাস্তাতেও প্রচুর কর্মচাঞ্চল্য লক্ষ করা গেল। শনিবারটা আসমারার হাটের দিন হলেও সামনে ইস্টার হলিডে থাকায় আজ রবিবারেও ভাল চলছে কেনাকাটা।

খানিক পরেই শহরের মূল কাঁচাবাজারে পৌঁছে গেল ওরা। চারদিক খোলা

চাই ঐশ্বর্য-১

বিশাল একটা ওয়্যারহাউসের ভিতরে গড়ে উঠেছে ওটা—ছাদটা করোগেটেড টিনের। একশো গজ দূরে থাকতেই নাকে ভেসে এল মাছ-মাংস, শাক-সবজি আর নানা রকম মসলার পাঁচমিশালি গন্ধ। পুরনো কিছু আমেরিকান আর রাশান ট্রাক দেখা গেল কাছাকাছি—সদ্য আনা মালামাল নামানো হচ্ছে ওগুলো থেকে। পরিবেশটা একেবারে যাচ্ছেতাই—রাস্তা ঢাকা পড়ে আছে গাধা আর মহিষের বিষ্ঠায়, বাজারের পিছনে সম্ভবত একটা খোঁয়াড় আছে, ওখান থেকে ভেসে আসছে চতুষ্পদী জন্তু-জানোয়ারের বর্জ্যের গন্ধ। হঠাৎ করেই জায়গাটার সঙ্গে ঢাকার কাওরান বাজারের মিল খুঁজে পেল রানা।

পোশাক বদলে এসেছে দিনা—ফুলের ছাপঅলা একটা সনাতন ইরিত্রিয়ান ড্রেস পরেছে, তলায় বাড়তি হিসেবে রয়েছে জিন্স আর বুট। চুল পিছনে টেনে ঝুঁটি করে বেঁধেছে, চওড়া কপাল আর সুন্দর চোখদুটো উন্মুক্ত হয়ে গেছে তাতে। সাধারণ লোকজনের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মিশে গেছে ও, তবে রানার চামড়া আফ্রিকানদের চেয়ে ফর্সা, তাই কিছুটা ব্যতিক্রম দেখাচ্ছে ওকে। সহজেই সবাই ওকে বিদেশি বলে চিনতে পারছে, আলাদা খাতিরদারির পাশাপাশি বাড়তি দাম হাঁকতেও দ্বিধা করছে না।

'কতটা ঘন ঘন তুমি আসো এখানে?' পাঁচ কেজি আলুর দরদাম শেষে দিনাকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'ইরিত্রিয়ায়?'

'হ্যাঁ।'

'খুব একটা আসা হয় না আসলে, বেশিরভাগ কাজ দেশের বাইরেই করতে হয় কি না!' পাশের আরেকটা দোকানের দিকে এগোতে এগোতে বলল দিনা। 'আমি তো বড়ই হয়েছি দেশের বাইরে, লড়াই-টড়াই কিচ্ছু দেখিনি, সেটা এখানকার লোকজন বুঝতে পারে। আমাকে কেন যেন ওদের পছন্দ হয় না, আবেলের আচরণটা দেখেছ নিশ্চয়ই? আমাকে ওরা বহিরাগত ভাবে।' উটে চড়ে যেতে থাকা একজন মানুষকে দেখাল ও—লোকটার একটা হাত আর একটা পা নেই। 'ওরা যখন জীবনমরণ লড়াই করছিল, আমি তখন ইয়োরোপের বোর্ডিং স্কুলে আরামের জীবন কাটাচ্ছি। ওদেরকে আসলে দোষ দেয়া যায় না, এখানকার কঠিন অবস্থার কী-ই বা আমি জানি? কেন আমাকে আপন ভাববে ওরা?'

রাস্তার উপর চোখ বোলাল রানা। সত্যিই অনেক পঙ্গু মানুষ দেখা যাচ্ছে—এতটা আশা করেনি ও।

'যত লোক দেখছ এখানে, তার অর্ধেকের বেশি হলো মুক্তিযোদ্ধা... পুরুষ-নারী সবাই!' বলে চলল দিনা। 'যুদ্ধের কঠিন সময়টা একসঙ্গে পার করায়, অন্যরকম একটা বাঁধন রয়েছে ওদের ভিতর। যোদ্ধাদের একটা পরিবারের মত ওরা; যতই চেষ্টা করি, আমি কোনোদিনই ওদের একজন হতে পারব না।'

'সেজন্যেই কি পাইপটা খুঁজে বের করতে এত মরিয়া হয়ে উঠেছ?' জানতে চাইল রানা। 'ওদের জন্য কিছু করে মনকে সান্ত্বনা দিতে চাইছ?'

'হ্যাঁ,' স্পষ্ট গলায় বলল দিনা, তাকাল রানার চোখে চোখ রেখে। 'তোমার দেশটাও তো আমাদেরই মত যুদ্ধ করে স্বাধীন হয়েছে, রানা। তুমিই বলো, যারা

সেই স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছে, বা পঙ্গু হয়েছে, তাদের জন্য কিছু করতে ইচ্ছে হয় না তোমার?'

আরেকবার মেয়েটার কথায় মুগ্ধ হলো রানা, ঠিক যেভাবে প্লেনে হয়েছিল। মানুষের ভিতরে আবেগের বিস্ফোরণ ঘটাতে জানে দিনা, ও নিজেও বাংলাদেশের ভাগ্যাহত মুক্তিযোদ্ধাদের কথা ভেবে আপ্লুত হয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি নিজেকে সংযত করল রানা, আবেগকে স্থান দেবার সময় নয় এটা, এগোতে হবে যুক্তির পথে। সন্দেহ নেই, অনেক বড় একটা লক্ষ্যের কথা বলছে দিনা, সত্যিকার একজন দেশপ্রেমিকের অন্তরের তাগিদের কথা বলছে—কিন্তু সেটার কতটুকু অভিনয়, আর কতটুকু সত্যি, সেটাই জানতে হবে ওকে।

'তোমার কথা বুঝতে পারছি আমি,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। 'ভয় পাচ্ছি শেষে না হতাশ করতে হয় তোমাকে!'

'এখন পর্যন্ত করোনি,' রানার হাত জড়িয়ে ধরে হাসল দিনা।

কাঁচাবাজার শেষ করে মার্কেটের আরেকটা অংশে চলে এল ওরা—ওখানে সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড জিনিসপত্র বিক্রি হয়। টিনের তৈরি ছোট ছোট অনেকগুলো দোকান আছে ওখানে—হেন কোনও জিনিস নেই, যা বিক্রি হচ্ছে না। পুরনো আমলের অ্যান্টিক ফার্নিচার থেকে শুরু করে আর্টিলারি শেল কেটে বানানো অ্যাশট্রে পর্যন্ত সবই আছে। তৃতীয় বিশ্বের আর সব দেশের মত ইরিত্রিয়াতেও সমস্ত মালামাল বারংবার ব্যবহার হতে থাকে।

পুরনো মালামালের এই গোলকধাঁধায় কিছুক্ষণের মধ্যেই হারিয়ে গেল রানা আর দিনা, ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকল বিভিন্ন দোকান। ওদের সম্ভ্রান্ত পোশাক-আশাক দেখে পিছু নিল এক দল বাচ্চা ছেলেমেয়ে—কৌতূহলের শেষ নেই ওদের, রানা আর দিনার প্রতিটা পদক্ষেপ চরম আগ্রহ নিয়ে দেখছে।

'যুদ্ধ কী জিনিস, জানে না ওরা,' বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে বলল দিনা। 'আমাদের লোকজন লড়াই করেছে এই নতুন প্রজন্মকে লড়াইয়ের হাত থেকে বাঁচাতে। অথচ নতুন আরেকটা লড়াই এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের সামনে... নিজের পায়ে দাঁড়াবার লড়াই! ভাবতেই কষ্ট হয়, স্বাধীন হবার পরও আমাদের ছ'ভাগের এক ভাগ মানুষকে শরণার্থী হতে হয়েছে পাশের দেশে—এখানে খাবার না-জোটার কারণে!'

বুকটা টন টন করে উঠল রানার কথাটা শুনে। মুখে আঙুল পুরে চুষতে থাকা একটা বাচ্চাকে আদর করার জন্য নিচু হলো ও। আর সঙ্গে সঙ্গে কানে ভেসে এল গুলির শব্দ! ওঁর ঠিক পাশে দাঁড় করে রাখা পিতলের পাত্রের স্তূপ ভেঙে পড়ল তাতে।

মাটিতে ঝাঁপ দিল রানা, টান দিয়ে গায়ের উপর ফেলল দিনাকেও। নিজের সৌভাগ্য বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না, বাচ্চাটাকে আদর করার জন্য নিচু না হলে গুলিটা ওর মাথা উড়িয়ে দিত।

আরও দুটো গুলির শব্দ হতেই একটা বাচ্চা চিৎকার করে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে কেয়ামত নেমে এল বাজারে। আতঙ্কিত নারী-পুরুষ-শিশু... সবাই ছুটতে শুরু করল দিগ্বিদিক—যে যেদিকে পারে, পালাচ্ছে। ঠোঁট কামড়ে ধরল রানা, সঙ্গে

পিস্তল আনেনি ও, আনার উপায়ও ছিল না। বাজারের ভিতর পিস্তল নিয়ে ঘোরাফেরা করলে ভিড়ের চাপে প্রকাশ পেয়ে যেত অস্ত্রটার অস্তিত্ব, পুলিশ আটকালে জবাব দিতে পারত না। এদেশে সঙ্গে অস্ত্র রাখার লাইসেন্স নেই ওর। অস্ত্র না থাকায় এখন পাল্টা আঘাত হানা সম্ভব নয়, প্রাণ বাঁচাতে চাইলে পালাতে হবে। চারপাশটা দেখে নিল ও, তারপর দিনাকে নিয়ে হামাগুড়ি দিতে শুরু করল, ঢুকল গিয়ে একটা দোকানের সামনে রাখা টেবিলের তলায়—ওটার উপরটা ভাঙাচোরা যন্ত্রাংশে ভর্তি।

কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে গুলির উৎসটা আন্দাজ করার চেষ্টা করল ও। যখন নিশ্চিত হলো, তখন সেদিকে উল্টে ফেলে দিল টেবিলটা—অজ্ঞাত আততায়ী আর নিজেদের মাঝখানে ব্যারিয়ার তৈরি করতে চাইছে। সঙ্গে সঙ্গে আধ ডজন গুলি ছুটে এল ওদেরকে লক্ষ্য করে। কয়েকটা বুলেট টেবিলের চলটা ওড়াল, বাকিগুলো বিঁধল ভাঙা যন্ত্রাংশের গায়ে।

দোকানটাতে ঢুকে পড়ল রানা, লাথি মেরে ভেঙে ফেলল পিছনের মরচে-পড়া টিনের দেয়াল, ফোকর গলে বেরিয়ে এল পিছনের গলিপথে। ওখানটায় আতঙ্কিত মানুষের ভিড়। ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে পথ করে নিল ও, দিনাকে সামনে ঠেলে নিয়ে এগোতে শুরু করল। নিজের দেহটাকে দিনার বর্ম হিসেবে ব্যবহার করছে, অস্ত্রধারী শত্রু পিছন থেকে ধাওয়া করে গুলি চালালে আগে ওর গায়ে বিঁধবে।

দুটো দোকানের মাঝে ফাঁকা দেখতে পেয়ে মোড় নিল রানা, সংকীর্ণ জায়গাটা গলে চলে গেল আরেকটা গলিতে। ওটা ইতোমধ্যে জনশূন্য হয়ে পড়েছে। প্রমাদ গুনল রানা, এই খোলা জায়গা দিয়ে পালাতে গেলে আততায়ীর সহজ শিকারে পরিণত হবে। দিনাকে আবার দুই দোকানের মাঝখানে ঢুকতে বলল ও, নিজে দৌড়ে চলে গেল কাছের একটা নিচু ছাতঅলা স্টলে। নানা রকম বাতি আর প্রদীপের দোকান ওটা। দোকানি নেই, পালিয়ে গেছে ভয় পেয়ে। উল্টে পড়ে আছে তার চেয়ার, সামনে স্ট্যাণ্ডে বসানো আছে একটা পিতলের পাত্র, তাতে জ্বলন্ত কয়লা, উপরে কফির পটে পানি গরম হচ্ছে—নামানো হয়নি।

চঞ্চল দৃষ্টি বোলাল রানা দোকানের ভিতর। একপাশের একটা র‍্যাক ভর্তি তেলের প্রদীপ রয়েছে, নীচের তাকে রয়েছে কয়েকটা টিনের ক্যান, গায়ে ইংরেজিতে লেখা: *কেরোসিন।* একটা ক্যান তুলে নিল ও, পাশের ওঅর্কবেঞ্চ থেকে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার নিয়ে দ্রুত কয়েকটা ফুটো করল ক্যানের গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে ফোয়ারার মত কেরোসিন বেরুতে থাকল ওগুলো দিয়ে।

'রানা!!!' বাইরে থেকে চিৎকার করে উঠল দিনা।

ঝট করে পাশ ফিরতেই দোকানের সামনে একজন মানুষকে দেখতে পেল রানা—দিনার চিৎকারে হতচকিত হয়ে গেছে, তাকাচ্ছে এদিক-সেদিক। চেহারা দেখে সুদানিজ মনে হচ্ছে। লোকটার হাতে একটা কোল্ট রিভলবার। দেরি না করে হাতে ধরা ক্যানটা ছুঁড়ে দিল রানা।

আহত হলো না লোকটা, হাতের ঝাপটায় সরিয়ে দিল উড়ে আসা কেরোসিনের ক্যান, তবে ছড়াতে থাকা তেলে তার শরীর ভিজে গেল। ফুটবল খেলার স্ট্রাইকারের মত ছুটে গেল রানা, নিখুঁত একটা কিক দিল জ্বলন্ত

কয়লা-ভর্তি পিতলের পাত্রটার তলায়। উড়ে গেল ওটা অস্ত্রধারী লোকটার দিকে, ফুলকি ছড়িয়ে ভিতরের জ্বলন্ত অঙ্গার ছিটকে পড়ল তার গায়ে। পরমুহূর্তেই মশালের মত দপ করে জ্বলে উঠল সে—কেরোসিন-ভেজা শরীরে আগুন ধরে গেছে।

গুলি করার কথা ভুলে গেল হতভাগ্য লোকটা, আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। হাতের পিস্তল ফেলে ঝাঁপ দিল মাটিতে, গড়াগড়ি করে আগুন নেভাতে চায়। কিন্তু তাতে লাভ হলো না, অতি-দাহ্য কেরোসিন নিভল না কিছুতেই. মাংস-পোড়া গন্ধে ভারী হয়ে উঠল বাতাস।

রানার সেদিকে নজর নেই। র‍্যাক থেকে আরেকটা ক্যান তুলে নিয়ে একটা ফুটো করল ও, তারপর চেঁচাল, 'দিনা, চলে এসো!'

লুকানোর জায়গা থেকে বেরিয়ে এল দিনা, দোকান থেকে বেরুল রানাও। ঠিক তখুনি আবার গুলি হলো, ওদের শরীরের কাছ দিয়ে শব্দ তুলে চলে গেল দুটো বুলেট। পিছনে তাকিয়ে আরও দুজন অস্ত্রধারী শত্রুকে দেখতে পেল রানা—পিস্তল উঁচিয়ে ঢুকেছে গলিতে, ছুটে আসছে ওদেরকে লক্ষ্য করে।

মাটিতে জ্বলতে থাকা আগুনের উপর দিয়ে হাতের ক্যানটা নিয়ে গেল রানা, চোখের পলকে ঝরতে থাকা কেরোসিন জ্বলে উঠল, কমলা শিখাটা দ্রুত উঠে আসছে ক্যানের দিকে। অলিম্পিকের হ্যামার-থ্রোয়ারের ভঙ্গিতে পিছনদিকে ক্যানটা ছুঁড়ে দিল ও, পিছনে আগুনের ধারা রেখে ধূমকেতুর মত উড়ে গেল ওটা—দুই অস্ত্রধারীর সামনে গিয়ে পড়ল... এবং বিস্ফোরিত হলো। আগুনের একটা দেয়াল লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সরু গলির ভিতর—জ্বলন্ত তেলের ফলে সৃষ্টি হয়েছে, আগুন ধরে গেছে দু'পাশের দোকানপাটেও।

দিনার হাত ধরে উল্টোদিকে ছুটতে শুরু করল রানা, হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে এল গলি থেকে—বাজারের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা পশু-খোঁয়াড়ের সামনের রাস্তায়। খোঁয়াড়ের দেয়াল বেশ উঁচু, ইঁটের তৈরি। খোলা একটুখানি জায়গা আছে, ওখান দিয়ে পশুগুলোকে ঢোকানো ও বের করা হয়। সামনের কাঁচা রাস্তাটায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে খড় আর গোবরের স্তূপ, গন্ধে টেকা দায়। বেশ কিছু মানুষ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে, হাঁ হয়ে তাকিয়ে আছে ছড়িয়ে পড়তে থাকা আগুনের দিকে।

আশপাশে তাকাল রানা, পাশের গলিগুলোর মুখ আটকে আছে দাঁড়িয়ে থাকা বেশ কয়েকটা বাস-ট্রাক এবং মানুষের জটলায়। যাবার জায়গা মাত্র একটাই দেখল—খোঁয়াড়ের ভিতরে... দিনাকে টান দিয়ে ওখানেই ঢুকে পড়ল ও। ভিতরে মানুষ আর পশুর অভাব নেই, সবার মাঝ দিয়ে পথ করে চলল বৃত্তাকার খোঁয়াড়টার উল্টোদিকে—বেরুনোর বিকল্প পথের খোঁজে। কিন্তু অর্ধেক পর্যন্ত যেতেই টের পেল, বিরাট ভুল করেছে। থেমে গেল তাই।

দম ফিরে পাওয়ার জন্য জোরে জোরে শ্বাস টানছে দিনা। জিজ্ঞেস করল, 'থামলে কেন?'

'ওদিকে যাবার জায়গা নেই,' তিক্ত গলায় বলল রানা। 'ঢোকা আর বেরুনোর রাস্তা শুধু সামনের ওই একটাই।'

'শিট!' গাল দিয়ে উঠল দিনা।

রানাও নিজেকে গালমন্দ করছে—এখানে ঢুকে ফাঁদে পড়ে গেছে ওরা। বেরুতে চাইলে সোজা খুনিদের মুখে গিয়ে পড়বে। ঝড়ের বেগে চিন্তা চলেছে ওর মাথায়, চারদিকে তাকিয়ে কোর্স অভ অ্যাকশন ঠিক করবার চেষ্টা করছে।

গরুগুলো বাংলাদেশি গরুর মত নয়, প্রকাণ্ড সাইজের একেকটা *বোভাস ইন্ডিকাস*, মানে ব্রাহ্মণ গরু ওগুলো। কোনোটার ওজন এক-দেড় টনের কম হবে না—প্রায় ছ'ফুট উঁচু, বিশাল শরীর; বাঁকা শিংগুলোর এক গুঁতোয় পূর্ণবয়স্ক একজন মানুষকে ফেড়ে ফেলতে পারবে। রানার বামদিকে একটা গাভী এইমাত্র সন্তান প্রসব করেছে। শরীর এখনও ভেজা বাছুরটার, কাঁপা কাঁপা পায়ে দাঁড়িয়ে ওলান থেকে দুধ খাওয়ার চেষ্টা করছে। তবে মা-গাভীটা দুধ খাওয়ানোর চেয়ে বেশি ব্যস্ত সন্তানকে নিরাপদ রাখতে। সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে চারপাশে—মানুষ বা অন্য কোনও পশু কাছে আসলেই হিংস্র ভঙ্গিতে শিঙ দিয়ে গুঁতো দেবার ভঙ্গি করছে।

আচমকা দুষ্টবুদ্ধি খেলল রানার মাথায়। কাছে দাঁড়ানো এক রাখালের হাত থেকে একটা কাঠের ডাণ্ডা কেড়ে নিল, তারপর এগিয়ে গেল গাভীটার দিকে। ক্লান্ত চোখে নয়া-বিপদটার দিকে তাকাল প্রাণীটা, শরীর দিয়ে আড়াল করল সদ্যভূমিষ্ঠ সন্তানকে। রানা কাছে যেতেই একটু এগিয়ে শিং নাড়ল। হুমকিটাকে পাত্তা দিল না রানা, লাঠি দিয়ে একটা গুঁতো মারল গাভীটাকে।

রেগে গিয়ে ফোঁস ফোঁস শ্বাস ছাড়ল প্রাণীটা। পাশ কাটিয়ে এগোবার ভান করল রানা, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে গিয়ে আবার সন্তানকে আড়াল করল ওটা। আবারও গুঁতো দিল রানা। এভাবে চলল আরও বার তিনেক। স্প্যানিশ ম্যাটাডোরদের অনুকরণে গাভীটাকে খেপিয়ে তুলছে রানা।

'কী করছ তুমি?' পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল দিনা।

'ওখানেই থাকো,' গাভীর উপর থেকে চোখ না সরিয়ে বলল রানা। 'নোড়ো না।'

ক্রমাগত অত্যাচারে শেষ পর্যন্ত ধৈর্য হারাল প্রাণীটা, মাথা নিচু করে রানাকে আক্রমণ করল। তৈরি ছিল ও, লাফ দিয়ে একপাশে চলে গেল, গাভীটা টার্গেট মিস করতেই উন্মুক্ত অবস্থায় পেয়ে গেল বাছুরটাকে। লাঠি দিয়ে এবার ওটাকেই আঘাত করল রানা। খারাপ লাগল অবলা জন্তুটাকে মারতে, কিন্তু প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে যা করার করছে ও এখন।

লাঠির বাড়ি পড়তেই আর্তচিৎকার করে উঠল ছোট্ট বাছুরটা, পড়িমরি করে ছুটে পালাল—খোঁয়াড়ের প্রবেশপথ বরাবর পথটা খালি... তাই গেল ওদিকেই। দৃশ্যটা দেখে ডাক দিয়ে উঠল গাভী-মা, সন্তানকে ফেরাতে চাইছে বোধহয়... কিন্তু কে শোনে কার কথা! রানার দিকে আরেকবার ছুটে এল বিশাল প্রাণীটা, আবারও লাফিয়ে সরে গিয়ে ওটাকে ফাঁকি দিল ও।

বাছুরটা ততক্ষণে খোঁয়াড় থেকে বেরিয়ে গেছে, তাই দুষ্ট মানুষটার কথা ভুলে গেল মাতৃ-হৃদয়। ডাক ছেড়ে ছুটতে শুরু করল গাভীটা বাছুরের পিছু পিছু। এই হাঁকডাকে অস্থির হয়ে উঠল বাকি সবক'টা গরু, ডানে-বায়ে তাকিয়ে রানা লক্ষ

করল—স্ট্যামপিড শুরু করে দিয়েছে ওগুলো। রাখাল আর কৃষকরা প্রাণপণে চেষ্টা করল গরুগুলোকে শান্ত করতে, কিন্তু পারল না। উন্মত্তের মত পুরো পালটা ছুটতে শুরু করল খোঁয়াড়ের প্রবেশপথের দিকে, বেরিয়ে যেতে চায়।

রানাদেরকে ধাওয়া করে আসা দুই অস্ত্রধারী তখন কেবল পা রেখেছে খোঁয়াড়ের ভিতর, আঁতকে উঠে দেখতে পেল ছুটে আসা অবাধ্য পশুগুলোকে। শিং নেড়ে, ধুলো তুলে অপ্রতিরোধ্য ঝড়ের মত আসছে ওরা... সামনে একেবারে নাঙ্গা দুই দুর্বৃত্ত, নিজেদের বাঁচাবার উপায় নেই। কোনোমতে সরে গিয়ে গাভীটাকে ফাঁকি দিল দুজনে, কিন্তু বাকিগুলোকে দিতে পারল না। মুহূর্তে তাদের উপর সওয়ার হলো দৈত্যাকৃতি গরুর পাল।

গুলি করল দুই সুদানিজ, দুটো গরু ঘায়েল হলো, কিন্তু তাতে যেন আরও পাগল হয়ে গেল বাকিগুলো। গতি বাড়িয়ে দিয়ে তেড়ে এল ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে। সুদানী লোকদুটো সরবার কোনও সময়ই পেল না, ট্রেনের ইঞ্জিনের মত তাদেরকে আঘাত করল গরুর পাল। কয়েক হাত দূরে উড়ে পড়ল তারা, কিন্তু তাতেও রক্ষা নেই, শরীরদুটোর উপর দিয়ে ছুটে যেতে থাকল আতঙ্কিত প্রাণীগুলো। শক্ত খুর আর টনকে টন ওজনের তলায় পড়ে থেঁতলে গেল দুটো শরীর, অসহায় আর্তচিৎকার হারিয়ে গেল স্ট্যামপিডের আওয়াজের ভিতর। ভয়ঙ্কর মৃত্যুর দৃশ্য দেখে দিনাও চিৎকার করল, মুখ ঢেকে ফেলল দু'হাতে।

রানা অবশ্য নির্বিকার। গোবর আর ময়লা মাখা জ্যাকেট খুলে ফেলে দিল মেঝেতে। শেষ গরুটা বেরিয়ে যেতেই দিনার হাত ধরে বলল, 'চলো যাই। চমক ভাঙলেই গরুর মালিকেরা দাম চাইবে আমাদের কাছে।'

কাঁপছে দিনা। প্রবেশপথের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওরা... ওরা...'

মাটির উপর পড়ে থাকা দুটো লাল-বেগুনি মাংসপিণ্ডের দিকে তাকাল রানা। বলল, 'ওরা এখন ইতিহাস। নরকের দিকে রওনা হয়ে গেছে। এসো।'

খোঁয়াড় থেকে বেরিয়ে এল ওরা। দ্রুতপায়ে হাঁটতে শুরু করল হোটেলের দিকে। সদর রাস্তায় ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পিছনে বিকট হর্ন শুনতে পেল। সাদা রঙের একটা টয়োটা ল্যাণ্ড-ক্রুজার এসে দাঁড়িয়ে পড়ল পাশে। ড্রাইভিং সিটে আবেল আফরাকি, পিছনে তার ভাইপো, পাশা।

'হোটেলে ঝামেলা হয়েছে,' হড়বড় করে বলল আবেল। 'তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠুন।'

প্রশ্ন করে সময় নষ্ট করল না রানা বা দিনা। পাশা ইতোমধ্যে পিছনের দরজাটা খুলে ধরেছে, লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠে গেল দিনা। রানাও প্যাসেঞ্জার সাইডের দরজা খুলে আবেলের পাশে বসে পড়ল। গিয়ার বদলে অ্যাকসেলারেটর চাপল ইরিত্রিয়ান গাইড, পিছনে ধুলো উড়িয়ে ছুটতে শুরু করল গাড়িটা। ভীষণ তাড়া লক্ষ করা যাচ্ছে আবেলের ড্রাইভিঙে, ছাগল আর গাধা নিয়ে রাস্তা পার হতে থাকা কয়েকজন মানুষকে সামনে দেখতে পেয়ে ঘন ঘন হর্ন চাপল, তাতে কাজ না হওয়ায় ফুটপাতের উপর তুলে দিল গাড়িটা। রীতিমত কসরত করে পেরিয়ে এল জটলাটাকে। আরেকটু হলে ফেণ্ডারের ধাক্কায় একটা গাধা মরতে বসেছিল।

'চাচা, তুমি গাধাকে গুঁতো মেরেছ!' পিছন থেকে টিটকিরির সুরে বলল

পাশা।

'বাজে কথা বলবি না একদম! খবরদার!' ধমকে উঠল আবেল। গাধার সঙ্গে অ্যাকসিডেন্ট করাটা ইরিত্রিয়ান চালকদের জন্য মস্ত অপমান। 'কান টেনে ছিঁড়ে ফেলব বলছি!'

'সিটবেল্ট বাঁধো সবাই,' ওর ড্রাইভিং দেখে বলল রানা। 'নইলে মরতে হবে!'

'মারার জন্য নয়, *এফেন্দি,*' বলল আবেল। 'বাঁচাবার চেষ্টা করছি।'

'কেন, কী হয়েছে?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না আবেল, ড্রাইভিঙে ব্যস্ত। কয়েক মিনিট পর একটু ফাঁকা রাস্তা পেয়ে তাকাল রানার দিকে। বলল, 'হোটেলে বন্দুক-লড়াই হয়েছে, *এফেন্দি।* আমি আর পাশা লোডিঙের কাজ করছিলাম, এমন সময় আপনার রুমে দুজন সুদানিজকে দেখে এক মেইড চেঁচিয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে নীচের বার থেকে দুজন ইয়োরোপিয়ান লোক ছুটে গেল ওখানে। ওরা ওপরে যাবার পর গোলাগুলির শব্দ শুনলাম আমরা, খানিক পর ব্যালকনি থেকে ইয়োরোপিয়ানদের একজনের লাশ পড়ল রাস্তায়... ঠিক আমাদের সামনে! এরপর আর অপেক্ষা করিনি আমরা, লোডিং ফেলে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এসেছি। দুঃখিত *এফেন্দি,* আপনার লাগেজ আর বেশিরভাগ ইকুইপমেন্ট ফেলে আসতে হয়েছে।'

'অসুবিধে নেই,' বলল রানা। 'আসল জিনিসটা ওদের হাতে পড়েনি।' শার্টের ভিতরদিকে সেলাই করা পকেট থেকে মেডিউসা-ফটোগ্রাফগুলো বের করল ও।

'ওগুলো তুমি সঙ্গে নিয়ে ঘুরছ?' বিস্মিত কণ্ঠে বলল দিনা।

রানা হাসল। 'এরচেয়ে নিরাপদ জায়গা আর খুঁজে পেলাম না।'

'অনেক বড় ঝুঁকি নিয়েছ!' অভিযোগ ফুটল দিনার গলায়। 'সুদানিজ লোক তিনটে নিশ্চয়ই এগুলোর জন্যই বাজারে আমাদের উপর হামলা চালিয়েছিল?'

'আমারও তা-ই ধারণা,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'হোটেলের টিমটা রুম-তল্লাশি করে পায়নি কিছু। বাজারের টিমটাকে জানিয়েছে সেটা। ওরা আমাদের আক্রমণ করেছে। হোটেলের ওরা নিশ্চয়ই রুম থেকে বেরুবার সময় মেইডের চোখে পড়ে গেছে।'

'কিন্তু ইয়োরোপিয়ান লোকদুটো কারা?' জিজ্ঞেস করল আবেল। 'সুদানিজদের সঙ্গে লড়াই করতে গেল কেন?'

'জানি না,' নিজের সন্দেহের কথা প্রকাশ করল না রানা। তাকাল দিনার দিকে। 'তুমি জানো?'

'না,' মাথা নাড়ল দিনা। তবে ওর চোখ দেখে রানা পরিষ্কার বুঝতে পারল, কিছু একটা লুকিয়ে যাচ্ছে।

শহর থেকে বেরিয়ে আসতে কোনও সমস্যা হলো না—কেউ পিছু নেয়নি ওদের। হাইওয়েতেও তেমন ট্রাফিক নেই। কয়েকটা ট্রাক শুধু চোখে পড়ল—নানা রকম পণ্য বোঝাই করে ছুটে চলেছে বিভিন্ন গন্তব্যের উদ্দেশে। রাস্তার দুপাশে এখানে-ওখানে ইরিত্রিয়ার স্বাধীনতা-যুদ্ধের নিদর্শন পড়ে আছে—মরচে-পড়া, ভাঙাচোরা মিলিটারি ইকুইপমেন্ট... ধীরে ধীরে মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। মাইন

আর মিসাইলের আঘাতে ধ্বংস হওয়া প্রচুরসংখ্যক সোভিয়েত ট্রাক আর টি-৫৫ ট্যাঙ্ক দেখা গেল রাস্তার আশপাশে—ধাতব ডায়নোসরের মত মাটিতে দেবে আটকা পড়ে আছে।

ইরিত্রিয়ান হাইল্যাণ্ডস্ এ-দেশের সবচেয়ে উর্বর এলাকা বলে শুনেছে রানা, কিন্তু বাস্তবে পাথুরে জমি ছাড়া কিছু চোখে পড়ল না। প্রায় জনশূন্যই বলা চলে। ঘাস-টাস সব উড়ে গেছে তীব্র বাতাসে, মুখ-ব্যাদান করা লাল মাটিকে রেখে গেছে প্রখর রোদে ঝলসে যাবার জন্যে। উদ্ভিদ বলতে রয়েছে শুধু কাঁটাঝোপ আর ক্যাকটাসের সারি। হঠাৎ হঠাৎ দু-একটা চাষের জমি দেখা যায়, তাতে কৃষকরা গরু দিয়ে হালচাষ করছে—অনেকটা বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের মত। আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে এখনও পরিচয় হয়নি ওদের। হালের খোঁচায় উঠে আসা মাটিগুলো সারফেসের মত শুকনো, ঝরঝরে। পানির উৎস দেখা যাচ্ছে না, এরা কীভাবে চাষাবাদ করছে, ভেবে অবাক হতে হয়।

কয়েকটা ছোট ছোট গ্রাম পেরিয়ে এল ওরা—কাঁচামাটি আর ভাঙা ইঁটের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে আবাস। বেশিরভাগেরই আকৃতি গোল, উপরে উল্টানো চোঙার মত ছাত—ইরিত্রিয়ার সনাতন গ্রামীণ বাড়ি ওগুলো, ওদের ভাষায় বলে *আগডোস*। রাস্তাঘাটে স্বাস্থ্যবান কোনও মানুষ দেখা গেল না, সবাই রুগ্ন; পরনে স্থানীয় জোব্বা।

আড়াই ঘণ্টার মাথায় *কেরেন*-এ পৌঁছুল ওরা। শহরটা আসমারার চাইতে ছোট, তবে পুরনো ডিজাইনের বাড়ি-ঘর আর পাম গাছে ছাওয়া মূল সড়কটা রাজধানীর মতই উপনিবেশ আমলের গন্ধ ধরে রেখেছে। অধিবাসীদের বেশিরভাগই মুসলিম, মেয়েদের পরনে কালো রঙের বোরখা।

শহরের একমাত্র হোটেলটার পিছনে গাড়ি পার্ক করল আবেল। বলল, 'এখান থেকেই খাবারদাবার আর ফুয়েল কিনে নেয়া দরকার। উত্তরে চলে গেলে আর সুযোগ থাকবে না।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'তবে দেরি করব না এখানে।'

'জানি,' বলল আবেল। 'আমি আর পাশা বাজার থেকে নিয়ে আসছি সব, চেনা-জানা লোক আছে। আপনারা এক কাজ করুন, গাড়ি থেকে নেমে আড়ালে কোথাও লুকিয়ে থাকুন।'

'কেন?'

'বিদেশি লোকজন তেমন আসে না কেরেনে, আর মিস আবানের যা রূপ, তাতে সবার নজরে পড়ে যাবেন। লোকজন মনে রাখবে আপনাদের, পরে কেউ খোঁজখবর নিলে বলে দেবে।'

'হোটেলে অপেক্ষা করব?'

'নাহ্, ওখানেও একই সমস্যা। অন্য কোথাও লুকান।'

'ঠিক আছে।' ওয়ালেট খুলে আবেলকে কিছু ডলার বের করে দিল রানা কেনাকাটার জন্য, তারপর নেমে গেল গাড়ি থেকে। হোটেলের পাশের একটা কানাগলিতে ঢুকল ওরা।

ঘণ্টাখানেক পর ফিরল গাড়িটা বাজারসদাই করে। ইঞ্জিনের আওয়াজ পেয়ে

আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রানা আর দিনা। ড্রাইভিং সিটে পাশাকে দেখল ওরা, ল্যাণ্ড-ক্রুজারের ছাদের উপরের কার্গো ক্যারিয়ারটা ভরে গেছে নানা রকম জিনিসপত্রে; তবে আবেলের দেখা নেই। কোথায় গেছে জানতে চাইলে পাশা কাঁধ ঝাঁকাল। বলল, চলে আসবে।

গাড়িতে উঠে বসে তরুণ ইরিত্রিয়ানকে কিছু টাকা দিল রানা, হোটেলের বার থেকে টুকটাক কিছু জিনিস কিনে আনতে। ও যখন ফিরল, তখন আবেলও এসে পড়েছে।

'আমার পুরনো বন্ধুবান্ধবের অভাব নেই কেরেনে,' রানার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির জবাবে বলল আবেল, ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। 'ওদের সঙ্গে কথা বলে এসেছি। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে যদি কোনও সুদানিজ আমাদের খোঁজ নিতে চায়, তা হলে তাকে খুব হতাশ হতে হবে।' হাসল সে।

'হুম, তা হলে একটা পক্ষকে ধোঁকা দেয়া যাচ্ছে,' গ্লাভ কম্পার্টমেণ্ট থেকে একটা ম্যাপ বের করল রানা। 'অন্যটাকেও বোকা বানানো দরকার।' ম্যাপের উপর আঙুল রাখল ও। 'এই যে... নাক্‌ফা-য় একটা এয়ারপোর্ট দেখা যাচ্ছে। আমি ওই ইয়োরোপিয়ানদের দলের লোক হলে বিমানে করে ওখানে গিয়ে ফাঁদ পেতে বসে থাকতাম, যাতে টার্গেটকে শহরে ঢোকামাত্র আটক করতে পারি।'

'ওরাও তা-ই করবে ভাবছেন?' ভুরু কোঁচকাল আবেল।

'নিঃসন্দেহে। তবে ওদেরকে বুড়ো আঙুল দেখাব আমরা।' ম্যাপটা আবেলের সামনে তুলে ধরল ও। 'এই যে... পশ্চিমদিকে একটা বাইপাস রোড আছে, নাক্‌ফায় ঢুকতে হবে না আমাদেরকে, শহরটাকে পাশ কাটিয়ে *ইটারো*-তে গিয়ে আবার মেইন রোডে উঠে আসতে পারব।'

'হুঁ, বৃষ্টি নামেনি এখনও, খুব সম্ভব রাস্তাটা ব্যবহার করা যাবে,' একমত হলো আবেল। 'কিন্তু নাক্‌ফায় আমাদের জন্য যে-এক্সক্যাভেটরটা অপেক্ষা করছে, সেটার কী হবে?'

'আপাতত ওটা ছাড়াই চলবে,' বলল রানা। 'এক্সক্যাভেটর দরকার খোঁড়াখুঁড়ির জন্য... পাইপের লোকেশনটা জানার পর। ও-কাজের সময় সরকারি প্রোটেকশন নেব আমরা, জিনিসটা নাক্‌ফা থেকে আনতে অসুবিধে হবে না তখন। এখন ফিল্ডে পৌঁছানো জরুরি—ওখানে পৌঁছে গেলে আমাদেরকে আর খুঁজে পাবে না কেউ।'

অভিজ্ঞ যোদ্ধার মতই প্রতিক্রিয়া দেখাল আবেল। বলল, 'ওরা ততদিন নাক্‌ফায় বসে আঙুল চুষবে না, *এফেন্দি*। আমাদেরকে খুঁজতে বের হবে। তারচেয়ে চলুন ওদের খতম করে দিই। শান্তিতে কাজ করতে পারব তা হলে।'

'কীভাবে খতম করবে?' রানা বলল। 'আমার লাগেজ তুমি অ্যাম্বাসয়রা-তে ফেলে এসেছ। অস্ত্র-শস্ত্র সব ওটার ভিতরে ছিল।'

'একটু সময় দিলে আমি কিছু অস্ত্রের বন্দোবস্ত করতে পারি...'

'না, নষ্ট করবার মত সময় নেই আমাদের হাতে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, আসল কাজ শুরু করতে হবে। তা ছাড়া, নিতান্ত বাধ্য না হলে আমি কারও সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে চাই না। দেখিই না, ওদেরকে ধোঁকা দিয়ে পাইপটা খুঁজে বের

করা যায় কি না!'

'খুন না করুন, নিজেদের প্রোটেকশনের জন্যও তো অস্ত্র দরকার আমাদের।' গোঁয়ারের মত বলল আবেল।

'রিল্যাক্স,' ওর কাঁধে হাত রাখল রানা। 'কিছুই দরকার নেই আমাদের। অনেক বড় একটা মরুভূমিতে চলেছি আমরা... ওখানে যুদ্ধের সময় তোমাদের পুরো মুক্তিবাহিনী বছরের পর বছর লুকিয়ে থেকেছে; আর আমরা মাত্র চারটে মানুষ ছ'সপ্তাহ লুকোচুরি খেলতে পারব না?'

যুক্তিতে না পেরে কাঁধ ঝাঁকাল আবেল। গজগজ করতে করতে ব্রেক রিলিজ করল, সামনে বাড়াল ল্যাণ্ড-ক্রুজারটাকে। কেরেন থেকে বেরিয়ে দশ মাইল এগোল গাড়িটা, তারপরই মোড় নিয়ে নেমে পড়ল পশ্চিমমুখী একটা রাস্তায়। শুরু হলো দীর্ঘ, একটানা পথ চলা।

একুশ

নাক্‌ফা, ইরিত্রিয়া।

সুদান সীমান্ত থেকে ষাট মাইল দক্ষিণে, নাক্‌ফা শহরে টানা তিনদিন অপেক্ষা করার পর ইয়াশাদ টের পেল—মাসুদ রানা তার হাত গলে পালিয়ে গেছে। সুদান সরকার তাদের সীমান্ত বন্ধ করে দেয়ায় ইদানীং শরণার্থীবাহী গাড়ির আনাগোনা নেই, পুরো শহরের জীবনযাত্রাই থমকে গেছে। সারাদিন অলসভাবে বসে কাপের পর কাপ কফি গেলা, কিংবা শহরের রাস্তাঘাট মেরামতে ব্যস্ত শ্রমিকদের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া সময় কাটাবার উপায় নেই। বিরক্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে ইজরায়েলি টিমটা।

অলস সময়টাতে আসমারায় ঘটে যাওয়া ঘটনার কথা মনে পড়ে ইয়াশাদের। সেদিন সকালে রানা আর দিনা হোটেল থেকে বেরিয়ে যাবার পর তরুণ সঙ্গীটিকে নিয়ে সে বসে ছিল বারে। রানাকে অনুসরণ করে বাজারে যায়নি ওরা, যাবার প্রয়োজনও' মনে করেনি। কাঁচাবাজার দেখার ইচ্ছে ছিল না ইয়াশাদের, তা ছাড়া কালো লোকজনের মাঝে ওদের চেহারাসুরত অন্যরকম দেখাত, কেউ হিসেবে চিনে ফেলত রানা। তাই বারে বসে ইংরেজি একটা খবরের কাগজ পড়ছিল, অপেক্ষা করছিল রানার ফিরে আসবার। হঠাৎ দোতলা থেকে একজন মেইডের চিৎকার শুনে চমকে ওঠে ওরা। একটা অশুভ অনুভূতি হয় ইয়াশাদের, সঙ্গীকে নিয়ে ওপরে ছুটে যায় সে।

রানার কামরায় ঢুকতেই দুজন সুদানিজকে দেখতে পায় ওরা—ভিতরের জিনিসপত্র তছনছ করে ফেলেছে, ওয়াকিটকিতে কথা বলছে কার সঙ্গে যেন। ওদেরকে দেখতে পেয়েই গুলি ছোঁড়ে সুদানিজরা। নিখুঁত রিফ্লেক্সের বশে দরজার আড়ালে ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে বাঁচাতে সমর্থ হয় ইয়াশাদ, কিন্তু ওর সঙ্গী বেশ কয়েকটা গুলি খায়, ছিটকে ব্যালকনিতে গিয়ে পড়ে, সেখান থেকে রেলিং টপকে

নীচের রাস্তায়। ইয়াশাদও অবশ্য ছেড়ে দেয়নি শত্রুদেরকে। ওর সঙ্গীকে খতম করায় ব্যস্ত দুই সুদানিজকে পিছন থেকে গুলি করে ঝাঁঝরা করে দেয়।

খুনোখুনি শেষ হতেই হোটেল থেকে পালিয়ে যায় ও, পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্য। যোগ দেয় অন্য হোটেলে লুকিয়ে থাকা দলের বাকি সদস্যদের সঙ্গে। রি-এনফোর্সমেন্ট নিয়ে সে যখন অ্যাম্বাসয়রা-তে ফিরে আসে, তখন টয়োটা ল্যাণ্ড-ক্রুজারটা সহ গায়েব হয়ে গেছে রানা।

ওকে ধরার জন্য একটা বিমান চার্টার করে নাক্ফায় চলে এসেছে ইজরায়েলিরা, এমনকী দলের একজন সদস্যকে গাড়ি সহ নাক্ফা থেকে আসমারাগামী রাস্তায় টহলেও রাখা হয়েছে, রানাকে স্পট করবার জন্য। কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই বিফলে গেছে। তিনদিন পেরিয়ে যাবার পরও নাক্ফায় আসেনি রানা। ও যে বিকল্প কোনও পথ ধরেছে, তাতে আর সন্দেহ নেই। উপায়ান্তর না থাকায় আসমারায়তে এখন ফিরে যেতে হবে ইয়াশাদকে। স্থানীয় কন্ট্যাক্টের মাধ্যমে ইনফরমেশন জোগাড়ের চেষ্টা করতে হবে। সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড ইনফরমেশন মোটেই পছন্দ নয় ওর, কিন্তু রানার খোঁজ পেতে হলে এখন সেই ইনফরমেশনের উপরই ভরসা রাখতে হবে তাকে।

ব্যর্থতার উপলব্ধি ইয়াশাদের মনটাকে তিক্ত করে তুলল। কেন যেন মনে হচ্ছে, অপারেশনটার নিয়ন্ত্রণ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে তার। ওর লোকজন এখনও বিশ্বস্ত আছে, আদর্শের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ওরা, ওর নেতৃত্বে আস্থা রেখেছে; তারপরও নিজের আত্মবিশ্বাসেই চিড় ধরেছে ইয়াশাদের। বিড়বিড় করে নিজেকে গালমন্দ করল সে, তাকাল পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক সঙ্গীর দিকে।

'এই গু-য়ের ডোবায় বসে থেকে লাভ নেই কোনও!' বিরক্ত গলায় বলল সে। 'পেরনকে বলো, গাড়িটা হোটেলের সামনে নিয়ে আসতে। দশ মিনিটের ভিতর আমরা আসমারার পথে রওনা হব।'

'জী, সার।' বলে চলে গেল ইয়াশাদের সঙ্গী।

দাঁতে দাঁত পিষল ইহুদি নেতা—মহা ত্যাঁদড় লোক তো! এতদিন আণ্ডারএস্টিমেট করেছে রানাকে, আর না। আগামীতে ওকে হাতে পেলেই টুঁটি চেপে ধরতে হবে, জেনে নিতে হবে—খনিটা কোথায়। তারপর স্রেফ খুন করে ফেলবে ও লোকটাকে। এর বাইরে আরও একটা কাজ আছে বটে। সুদানিজদের সঙ্গে অ্যাম্বাসয়রা-তে ঝামেলার পর ও পরিষ্কার বুঝতে পারছে—হাসাবের মৃত্যুর জন্য ওই লোকগুলোই দায়ী। ওদের সঙ্গেও বোঝাপড়া করবে ইয়াশাদ—তবে সেটা অন্য যুদ্ধ।

উত্তর ইরিত্রিয়া। হাজের মালভূমির দক্ষিণ এলাকা।

টানা দশদিন ধরে মরুভূমির মাঝখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা, খেটে মরছে... কিন্তু ফুয়েল গজের কাঁটা লাল ঘরে নেমে আসা ছাড়া সেই কষ্টের কোনও প্রতিদান পায়নি। ধীরে ধীরে ব্যর্থতার জ্বালা আর হতাশা গ্রাস করতে শুরু করেছে অভিযাত্রীদেরকে। পরিস্থিতি হয়ে উঠেছে অসহনীয়—ল্যাণ্ড-ক্রুজারের অবিরাম ঝাঁকি, ব্লাস্ট-ফার্নেসের উত্তাপ ছড়ানো গরম বাতাস, ঘাম, তৃষ্ণা... সব! বাড়তি

উপদ্রব হিসেবে আছে মরুভূমির পোকামাকড়; চলন্ত অবস্থায় সুবিধে করতে পারে না ওগুলো, কিন্তু গাড়ি থামলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে চারদিক থেকে—ঘামে ভেজা নোনতা শরীরে পোকার কামড় যে কতটা যন্ত্রণাদায়ক, তা কেবল ভুক্তভোগীই জানে। তার ওপর দিনাকে এড়িয়ে চলছে আবেল, কথাই বলে না নিতান্ত প্রয়োজন না হলে; পাশা তার চাচার অন্ধভক্ত—একই আচরণ করছে। ফলে থমথমে একটা নীরবতা বিরাজ করে থাকে গাড়ির ভিতর—সবচেয়ে অসহ্য ব্যাপার সেটাই।

রানার উপর অবশ্য এসব তেমন প্রভাব ফেলছে না। মাথা থেকে সব চিন্তা দূর করে দিয়েছে ও, সমস্ত মনোযোগ পাইপ খোঁজার পিছনে কেন্দ্রীভূত। সঙ্গে আনা রেফারেন্স ম্যাটেরিয়াল ঘেঁটে চলেছে ও, এলাকার জিয়োলজি আর জিয়োগ্রাফি বিশ্লেষণ করছে। চোখ বোলাচ্ছে মেডিউসা-ফটোগ্রাফগুলোয়, আবেলের সঙ্গে আলোচনা করছে, তারপর একেকটা লোকেশন বাছাই করে নিচ্ছে মাটি পরীক্ষা করবার জন্য।

নিষ্ফল দশটা দিন কেটে যাবার পরও হতাশ হয়নি রানা, বরং প্রতিদিন পূর্ণোদ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। তবে খাটুনি হচ্ছে খুব। একেকবার নিজেকে পুরনো আমলের প্রসপেক্টরের মত মনে হয় ওর, যেন গাঁইতি-কোদাল নিয়ে একাকী সোনা খুঁজে বেড়াচ্ছে। বাস্তবেও ব্যাপারটা অনেকটা সে-রকমই। কিম্বারলাইট পাইপ খোঁজার কাজটাতে ওর তিন সঙ্গী স্রেফ দর্শকমাত্র, মূল কাজটা ওকে একাই করতে হচ্ছে। পুরোদস্তুর একটা এক্সপিডিশন হলে নানা রকম সহকারী পাওয়া যেত, কিন্তু এখানে সে-সুযোগ নেই। পুরনো অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে একাই সামাল দিতে হচ্ছে সবদিক।

বার্কা প্রদেশে পৌঁছুনোর পর থেকেই দিনে অন্তত বিশবার আবেলকে গাড়ি থামাতে বলছে রানা, নেমে পড়ছে হাতে *হার্ডপ্যান* নিয়ে—ওটা এক ধরনের হাতুড়ি, জিয়োলজিস্টরা ব্যবহার করে। নাম-না-জানা একেকটা পাহাড়ের শরীরে হাতুড়িটা নিয়ে হামলা চালায় ও—পাথরের পরত ভেঙে ওগুলোর অভ্যন্তর পরীক্ষা করে, পানিতে ভেজায়; বোঝার চেষ্টা করে—ভাঙা টুকরোগুলোর প্রতিফলন-ক্ষমতা আছে কি না। মাঝে মাঝে আবেল আর পাশার সাহায্যও নেয় ও, তিনজনে মিলে শাবল আর কোদাল দিয়ে মাটি খোঁড়ে—গর্তের গভীর থেকে তুলে আনে নমুনা, সেগুলোর উপর পরীক্ষা চালায়। কোনোবারই ফলাফলটা মুখ ফুটে বলে না রানা, ময়লা শরীর নিয়ে ল্যাণ্ড-ক্রুজারে ওঠে, নতুন একটা দিকে যাবার নির্দেশ দেয় আবেলকে।

রাতের বেলা ছোট করে ক্যাম্প বানায় ওরা। আসমারা থেকে পালাবার সময় আবেল মাত্র দুটো তাঁবু আনতে পেরেছে, ফলে বিশ্রামের খুব অসুবিধে। একটা তাঁবু চাচা-ভাতিজাকে দান করেছে রানা, মেয়ে বলে দিনাকেও বরাদ্দ করেছে একটা। ও নিজে ঘুমায় ল্যাণ্ড-ক্রুজারের পিছনের সিটে। দিনা অবশ্য ব্যবস্থাটাতে আপত্তি জানিয়েছিল, অনুরোধ করেছিল ওকেই তাঁবুতে থাকতে। কিন্তু রানা রাজি হয়নি। যুক্তি দেখিয়েছিল, রাতে খুব একটা ঘুমায় না ও, কাজেই খামোকা একটা তাঁবু দখল করে রেখে লাভ নেই। আসলেও তাই। সারাদিনের ক্লান্তিতে রাতের বেলা শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে মড়ার মত ঘুমিয়ে পড়ে ওর তিন সঙ্গী, কিন্তু ও ঘুমাতে

পারে না। রাতে জেগে কাগজপত্র ঘাঁটে, স্যাটেলাইট-ফটোগুলো দেখে, ঠিক করে পরদিনের কর্মপন্থা। জানেও না, ঘুম ভাঙলেই তাঁবুর ফাঁকে চোখ রেখে ওর পাগলামি দেখে আর মাথা নাড়ে দিনা এপাশ-ওপাশ।

শুরুতে মাত্র এক সপ্তাহ ভূমি-জরিপের প্ল্যান করেছিল রানা, ভেবেছিল তারপর আসমারায় ফিরে গিয়ে একটা বিমান চার্টার করবে এরিয়াল রিকনিসান্সের জন্য—আকাশ থেকে স্যাটেলাইট ফটো আর গ্রাউণ্ড-স্টাডির ফলাফল মিলিয়ে দেখবে। কিন্তু সেটা এখন অসম্ভব হয়ে পড়েছে—রাজধানীতে ফিরে যাওয়াটা স্রেফ আত্মহত্যার শামিল হবে। ফলে মাটি থেকে দৃশ্যমান বস্তুগুলোই শুধু রেফারেন্স এখন, ওগুলোর সঙ্গেই মেডিউসার তোলা ফটোগ্রাফগুলোতে ভেসে ওঠা টপোগ্রাফি মেলাতে হচ্ছে—কাজটা হয়ে পড়েছে শতগুণ কঠিন।

একাদশ দিনের সকালে সূর্য ঢাকা পড়ল মেঘে। পূর্বদিক থেকে বৃষ্টি আসতে শুরু করেছে। মেঘের আড়াল থেকে সূর্যের হালকা গোলাপি একটা আভা শুধু রাঙিয়ে রাখল আকাশটাকে, নীচের মরুভূমি আর পশ্চিমের পাহাড়শ্রেণী আটকা পড়ে গেল অদ্ভুত এক আলোআঁধারিতে। বরাবরের মত সবার আগে জেগে উঠল রানা, ল্যাণ্ড-ক্রুজার থেকে নেমে আড়মোড়া ভাঙল। চারপাশে চেয়ে দেখল ভোরের শান্ত পরিবেশ।

শুকনো একটা নালার পাশে ক্যাম্প করেছে ওরা, কুলুকুলু ধ্বনি শুনে ওদিকে তাকাতেই পানির ধারা দেখতে পেল ও—দূর থেকে আসা বৃষ্টির পানি গড়াচ্ছে ওখান দিয়ে। মনটা খুশি হয়ে উঠল অনেকদিন পর পানির দেখা পেয়ে, তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে গোসল সেরে নিল ও, ডলে ডলে পরিষ্কার করল গায়ে জমে থাকা ময়লা। লাগেজ না থাকায় কেরেন থেকে কয়েকটা শার্ট-প্যান্ট ওকে কিনে এনে দিয়েছে আবেল, সেখান থেকে পরিষ্কার এক সেট পোশাক পরল। ভোরের হিম হিম পরিবেশে গোসল করায় শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল নিমেষে, বুক আর বাহুর রোম খাড়া হয়ে গেল। অনুভূতিটা চমৎকার!

খানিক পর জাগল আবেল, ঠোঁটে একটা সিগারেট ঝুলিয়ে বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে। নিভু নিভু অগ্নিকুণ্ডটাতে নতুন লাকড়ি জোগান দিয়ে কফির পানি চড়াল। নালায় বহমান পানি দেখে খুব একটা উল্লসিত হলো না সে, নির্বিকার ভঙ্গিতে প্রাতঃকৃত্য সেরে হাত-মুখ ধুয়ে এল। কফি বানিয়ে একটা মগ রানাকে দিল, তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়ল নাশতা তৈরিতে।

রানা কফিটা শেষ করবার আগে পাশা আর দিনাও জেগে গেল। পানির দেখা পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল দিনা, জামাকাপড় নিয়ে ছুটে গেল গোসল করতে। ওকে প্রাইভেসি দেবার জন্য অগ্নিকুণ্ড ঘিরে বসে রইল তিন পুরুষ। কফিতে চুমুক দিয়ে মেতে গেল গল্পে। আস্তে আস্তে চারপাশ কিছুটা আলোকিত হয়ে উঠতেই ফিরতে দেখা গেল দিনাকে, ভেজা জামাকাপড় আর তোয়ালে রাখার জন্য তাঁবুতে ঢুকল।

ও ফিরে আসায় উঠে পড়ল পাশা, চলে গেল হাত-মুখ ধুতে। রানাকে নাশতা দিতে দিতে আবেল বলল, 'আজ আমাদের *বাদন*-এ যেতেই হবে।'

ওটা একটা গ্রাম। গ্রামটার কাছে ঘাঁটি গাড়া একদল যাযাবরের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে ওদের—নাক্‌ফা থেকে গাড়ির ফুয়েল কিনে এনে দেবে। বেশ কয়েকদিন

আগে গেছে ওরা, এতদিনে ওদের উটের কাফেলা ফিরে আসবার কথা। ল্যাণ্ড-ক্রুজারের জ্বালানি ফুরিয়ে আসছে, দ্রুত ফুয়েল পেতে হবে। আজ না গেলে পরে বাদ্‌ন পর্যন্ত যাবারও তেল থাকবে না।

'জানি,' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল রানা। তাকিয়ে আছে তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসা দিনার দিকে। গোসল করায় এই রুক্ষ পরিবেশেও সদ্য ফোটা একটা ফুলের মত লাগছে ওকে। সুতি একটা স্কার্ট পরেছে, উপরে ঢোলা শার্ট। জিন্সের তুলনায় মরুভূমির জন্য এ-পোশাকটা অনেক বেশি উপযোগী। মাথায় একটা খড়ের টুপি রয়েছে ওর, তলা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে ঢেউ-খেলানো ভেজা কালো চুল। পুরো অবয়বটা আশ্চর্য কমনীয় লাগছে। ছন্দময় ভঙ্গিতে হেঁটে এসে আগুনের পাশে বসল দিনা, রানার মুখোমুখি। ওর গালে গোলাপি আভার ছোপ দেখা গেল—লজ্জা পাচ্ছে, রানার মুগ্ধ দৃষ্টিটা নজর এড়ায়নি।

তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল রানা। অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, 'আজ আমরা বাদ্‌নে ফিরছি।'

স্বস্তি ফুটল দিনার চোখে। গত কয়েকটা দিন অমানুষিক কষ্ট হয়েছে, তার থেকে সামান্য বিরতি পেতে উন্মুখ হয়ে ছিল ও।

'তেল আনা হলে ওই লোকগুলোকে আবার ভাড়া করব ভাবছি,' রানা যোগ করল। 'নাক্‌ফায় গিয়ে এক্সক্যাভেটরটাকে গাইড করে নিয়ে আসতে পারবে ওরা।'

দুই ইরিত্রিয়ানের চোখেই বিস্ময় ফুটল। দিনা জিজ্ঞেস করল, 'তু... তুমি খনিটা খুঁজে পেয়েছ?'

'না,' রানা মাথা নাড়ল। পূর্বদিকের কালো মেঘ দেখিয়ে বলল, 'বর্ষার মরশুম এসে যাচ্ছে, এখুনি যদি এক্সক্যাভেটরটা *আদোবা* নদী পার করে না রাখি, তা হলে পরে আর সম্ভব হবে না। যে-ক'টা ব্রিজ আছে, সেগুলোর একটাও ওটার ট্র্যাক্টর-ট্রেইলার, বা ক্রলারের ওজন সইতে পারবে না। নদী শুকনো থাকতে থাকতেই রিভারবেডের উপর দিয়ে চালিয়ে পার করে আনতে হবে।'

খনি-বিষয়ক কিছু শুনতে না পেয়ে হতাশা ঘনাল দিনার চেহারায়।

একটু হাসল রানা। বলল, 'মন খারাপ কোরো না, ছোট্ট একটা সুখবরও আছে।'

ল্যাণ্ড-ক্রুজারের ভিতর থেকে ম্যাপ আর মেডিউসা- ফটোগ্রাফগুলো নিয়ে এল ও, বিছিয়ে রাখল মাটিতে—ম্যাপের চার কোনা চাপা দিল চারটে ছোট পাথর দিয়ে। আবেল আর দিনা ঝুঁকল ওগুলোর উপর।

রানা বলল, 'আমার জিপিএস রিসিভারটা আসমারায় রয়ে যাওয়ায় ম্যাপের সমস্ত মার্কিং আন্দাজের উপর করতে হয়েছে। দু-এক মাইল এদিক-সেদিক হতে পারে দাগগুলো, তবে তাতে খুব একটা কিছু যায়-আসে না।' বাদ্‌নের বিশ মাইল উত্তরে একটা স্পটে আঙুল রাখল ও। 'আমরা এখন এখানে আছি। আশপাশে যতগুলো স্টার-মার্কিং দেখছ, ওসব জায়গা থেকে স্যাম্পল নিয়েছি আমি, পরীক্ষা করেছি।'

অনেকগুলো তারকা দেখা গেল ম্যাপ জুড়ে—সবগুলো পরস্পরের আধ-মাইল

চাই ঐশ্বর্য-১

দূরে। নিখুঁত একটা জ্যামিতিক ছক মেনে স্যাম্পল নিয়েছে রানা, দেখে চমৎকৃত হলো দিনা আর আবেল।

'লাল রঙের দাগগুলোতে গারনেট আর ইলমেনাইটের ট্রেস পেয়েছি আমি—ওগুলো হীরার ট্রেস-এলিমেন্ট। কিন্তু সমস্যা একটাই—মিনারেলদুটোর পরিমাণ এত কম পেয়েছি যে, মনে হচ্ছে না কখনও কোনও কিম্বারলাইট পাইপ এদিককার সারফেসে বেরিয়ে এসেছিল; বেরুলে এসব প্রাচীন নদীতে পাললিক তলানি পেতাম।' হাতে আঁকা কয়েকটা আঁকাবাঁকা রেখা দেখাল রানা।

'আমরা আবার নদীতে নামলাম কখন?' ভুরু কোঁচকাল দিনা।

'ওগুলো আর নদী নেই এখন,' বলল রানা। 'মরুভূমির অংশ হয়ে গেছে। বেশ কয়েকটা খাদে নেমেছিলাম, মনে নেই? ওগুলোই লাখ লাখ বছর আগে নদী ছিল।'

'পাইপটা বেরিয়ে আসেনি বলছেন,' আবেল বলল। 'তা হলে কি মাটির নীচে আছে?'

'হতে পারে,' রানা বলল। 'কিন্তু অমন পাইপ খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব।'

'তা হলে সুখবরটা কী?' বিরক্ত কণ্ঠে জানতে চাইল দিনা।

নোটবুক খুলে একটা কাগজ বের করল রানা, তাতে একটা পেন্সিল ড্রয়িং। বলল, 'আঁকাআঁকির হাত তেমন ভাল না আমার, তারপরও চেষ্টা করে দেখেছি। এটা হলো আমাদের পাইপের স্পটের সারফেস-ড্রয়িং... কাল রাতে এঁকে শেষ করেছি। মেডিউসা-ফটোগ্রাফগুলো আকাশ থেকে তোলা, ওগুলো দেখে জায়গাটা কেমন হবে আন্দাজ করবার চেষ্টা করেছি আমি। সারফেস থেকে জায়গাটার একটা কাল্পনিক ছবি এঁকেছি। ভুলচুক হতে পারে, স্যাটেলাইটটার ক্যালিব্রেশন ঠিকমত করা ছিল না, তারপরও এটা আমাদের সার্চে সাহায্য করবে নিঃসন্দেহে।' ড্রয়িংটা আবেলের দিকে বাড়িয়ে ধরল ও। 'দেখো তো, এমন কোনও জায়গা চেনো তুমি?'

ছবিটা ভাল করে দেখল ইরিত্রিয়ান গাইড। খাড়া একটা পাহাড়ি দেয়াল দেখা যাচ্ছে ওতে, মাঝখানটায় কুড়ালের কোপের মত একটা খাদ—মনে থাকার মত একটা বৈশিষ্ট্য বটে! কিন্তু এমন পাহাড় কখনও দেখেনি ও। মাথা নেড়ে বলল, 'না, দেখিনি। তবে ওই যাযাবরদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখা যেতে পারে, প্রচুর ঘোরাফেরা করে ওরা। হয়তো আরও উত্তরে আছে এটা, হাজের মালভূমির ওপারে।'

'এলাকাটা চেনো?' জানতে চাইল রানা।

'খারাপ জায়গা,' আবেল বলল। '*শিফটা*-রা বেশিরভাগ অংশে নিয়ন্ত্রণ করে। অত উত্তরে সরকারি টহলও নেই। যুদ্ধের সময় ওখানটায় ইথিওপিয়ান বাহিনী ছিল—আমাদেরকে সুদানে পৌঁছাতে বাধা দিত। প্রচুর ল্যাণ্ড-মাইন পুঁতেছিল ওরা, পরিষ্কার করা হয়নি। *ইটারো* থেকে পুবের রাস্তাটা ছেড়ে অন্য কোথাও নামা অত্যন্ত বিপজ্জনক। যাযাবর আর পশুপালক-রা খুব কম যায় ওদিকে, তারপরও প্রতি বছরই কিছু না কিছু মানুষ মাইনের বিস্ফোরণে মারা যাচ্ছে বা পঙ্গু হচ্ছে।'

বাড়তি বিপদের কথা শুনে মনটা তিক্ততায় ভরে গেল রানার। ল্যাণ্ড-মাইন

অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা অস্ত্র—একবার পাতা হলে বছরের পর বছর সক্রিয় থাকে। সামান্য কয়েক পাউণ্ড ওজনই বিস্ফোরিত করে ওগুলোকে, তাতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিরীহ মানুষজন আহত-নিহত হয়। আফ্রিকার একটা ক্রম-বর্ধমান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই ল্যাণ্ড-মাইন, জাতিতে-জাতিতে যুদ্ধ থামানো সম্ভব হলেও ওগুলোকে পরিষ্কার করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে শান্তির সময়েও অবিরাম প্রাণহানি ঘটে চলেছে।

'আর কিছু আছে উত্তরে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'পুরনো একটা মঠ,' আবেল বলল। 'যুদ্ধের সময় সন্ন্যাসীরা চলে গিয়েছিল, তবে পরে আবার ফিরে এসেছে বলে শুনেছি।'

'হুম,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'মাইনের বিপদটা কাটাবার কোনও উপায় নেই। আমাদেরকে ওর ভিতরেই কাজ করতে হবে। তোমাদের কারও যদি তাতে আপত্তি থাকে, তা হলে এখুনি বলতে পারো। দরকার হলে আমি একাই যাব ওখানে।'

'আমি তোমার সঙ্গে আছি,' দিনা নির্দ্বিধায় জানাল।

'আমরাও,' হাতমুখ ধুয়ে ফিরে আসা ভাইপোর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে বলল আবেল।

'ধন্যবাদ।' ইরিত্রিয়ান চাচা-ভাতিজার প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করল রানা, ওর মত একজন অচেনা মানুষকে সঙ্গ দিতে প্রাণের ঝুঁকি নিতেও রাজি হচ্ছে ওরা। দিনার ব্যাপারটা একটু আলাদা, গোপন একটা মতলব রয়েছে ওর, তারপরও সাহসটা অগ্রাহ্য করার মত নয়—ল্যাণ্ড-মাইনে ভরা একটা এলাকায় যাবার কথা বললে অতি-সাহসী মানুষও দ্বিধায় ভুগবে।

'একটা চান্স নেব আমি,' রানা বলল। 'আমাদের বর্তমান পজিশন থেকে হাজের মালভূমি পর্যন্ত এলাকায় আর জরিপ চালাব না, সরাসরি চলে যাব উত্তরে। যাযাবর-রা এক্সক্যাভেটরটাকে গাইড করে এখান পর্যন্ত এনে দিলেই চলবে।' পেন্সিল দিয়ে ম্যাপে আদোবা নদীর ধারে *ইলা বাবু* নামে একটা গ্রামের উপর বৃত্ত আঁকল ও। তাকাল বাকিদের দিকে। 'তোমরা কী বলো?'

আইডিয়াটা পছন্দ হলো সবার।

'গুড,' বলল রানা। 'তা হলে আর দেরি করে লাভ নেই। চলো, নাশতা সেরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে পড়ি।'

বাইশ

ধুলো উড়িয়ে বাদন গ্রামে প্রবেশ করল ল্যাণ্ড-ক্রুজার, ফুয়েল ট্যাঙ্কের তলানি খতম করে ইঞ্জিনটা তখন খক্ খক্ করে কাশি দিচ্ছে। গাড়ির সারা গায়ে পড়ে গেছে ময়লার একটা আস্তরণ—দেখে মনে হচ্ছে যেন ক্যামোফ্লাজ পেইন্ট করা হয়েছে চেসিসে।

গ্রামে স্থায়ী বাড়িঘরের সংখ্যা কম; বেশিরভাগই কাঠ-বাঁশের কাঠামোর উপর কাপড় জড়িয়ে বানানো কুঁড়ে। গাছপালাও নেই তেমন, সূর্যের তাপে দগ্ধ হচ্ছে গোটা এলাকা, ওই কুঁড়েঘরগুলোতেই শুধু ছায়া পাওয়া যাবে। ছোট একটা জলাশয় আছে গ্রামের ভিতরে, সেজন্যেই আবাস গড়ে উঠেছে এখানে, খার্কা প্রদেশের সমস্ত যাযাবর পানির জন্য বাদনে আসা-যাওয়া করে।

নাক্‌ফা থেকে ফুয়েল আনার জন্য ভাড়া করা পরিবারটার বাড়ি চিনতে অসুবিধে হলো না ওদের, গাড়িটা নিয়ে ওটার আঙিনায় থামাল আবেল। আঙিনার একটা পাশ দখল করে রেখেছে জ্বালানি কাঠের স্তূপ; দূরে মরুভূমি পাড়ি দিয়ে আরও কাঠ নিয়ে আসছে একটা উটের কাফেলা। নেচে ওঠা তাপতরঙ্গের ভিতর কেমন যেন ভৌতিক মনে হচ্ছে প্রাণীগুলোকে—নিরেট আকৃতি নয়, ঢেউ-খেলানো দেহ নিয়ে ভেসে আসছে গ্রামের দিকে। কয়েকটা উট অবশ্য আগেই এসেছে, আঙিনার পাশে বসে আছে ওগুলো, শুকনো খড় চিবুচ্ছে। ওগুলোর পিঠে ঝোলানো আছে বেশ কয়েকটা পেট্রোলের জেরিক্যান।

গাড়ির শব্দ শুনেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল বৃদ্ধ যাযাবর-সর্দার। রানারা নামতেই ছুটে এসে আলিঙ্গন করল সবাইকে। ইংরেজি জানে না, বলতে পারে শুধু একটা শব্দ—গুড... সেটাই বলতে থাকল বারে বারে। মৃদু হেসে পাল্টা আলিঙ্গন করল রানা—এটাই ওদের সম্ভাষণের রীতি।

আবেলের দিকে তাকিয়ে কথার তুবড়ি ছোটাল সর্দার, সেটা অনুবাদ করে শোনাল গাইড। বলল, 'আমাদেরকে ওর ছোট্ট কুঁড়েতে স্বাগত জানাচ্ছে সর্দার। সেই সঙ্গে আশা করছে, বন্ধুত্বটা গাঢ় করবার জন্য আমরা ওর প্রত্যাশিত পারিশ্রমিক সঙ্গে নিয়ে এসেছি।'

'নিশ্চয়ই,' বলে বুক পকেট থেকে দশ-ডলার নোটের একটা বাণ্ডিল বের করল রানা, ওর থেকে কয়েকটা তুলে দিল বৃদ্ধের হাতে।

খুশিতে দাঁত বেরিয়ে গেল সর্দারের। টাকাটা সামান্য, কিন্তু এ-পরিমাণ অর্থ ওরা সারা বছরেও আয় করে না। রানাকে আবার আলিঙ্গন করল সে। বলল, 'গুড! গুড!!'

'গুড!' হেসে পাল্টা জবাব দিল রানা।

আবেলের দিকে ফিরে আবার কিছু বলল সর্দার। সেটার অনুবাদে ও বলল, 'আমাদেরকে আজ রাতে ওর অতিথি হবার অনুরোধ জানাচ্ছে সর্দার। খাতির-যত্ন করতে না পারলে নাকি খুব কষ্ট লাগবে ওর মনে।'

'ওঁকে জানাও, নিমন্ত্রণ পেয়ে আমরা সম্মানিত বোধ করছি,' বলল রানা। 'যদি অনুমতি দেন, তা হলে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে এক বোতল ব্র্যান্ডি উপহার দিতে চাই।'

অনুবাদ শুনে উজ্জ্বল হয়ে উঠল সর্দারের চোখ। 'গুড! গুড!!'

দু'ঘণ্টা পর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে সর্দারের কুঁড়েতে ঢুকল রানা, পিছু পিছু দিনা, আবেল আর পাশা। ভিতরে একটা ছোট আগুন জ্বলছে, তার উপর হাঁড়ি ঝুলিয়ে চলছে রান্নাবান্না। খাবারের গন্ধ ভাসছে বাতাসে। কয়েকটা কুপি জ্বালিয়ে ঘরটা আলোকিত করা হয়েছে, হাতে বোনা মাদুরের উপর আগুন ঘিরে বসে থাকা

বেশ ক'জন মানুষ দেখতে পেল ওরা—সবাই যাযাবর, ভোজে যোগ দিতে এসেছে। সর্দারের পাশে খানিকটা জায়গা ফাঁকা রাখা হয়েছে অতিথিদের জন্য। সেখানে বসে পড়ল ওরা।

থালা দেয়া হলো সবার সামনে, তাতে একটা করে *ইনজেরা*, মানে ইরিত্রিয়ান রুটি। তরকারি রাখা হয়েছে একটা বড় পাত্রে। রানার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল দিনা। বলল, 'যাক, আমাদের ট্র্যাডিশনাল ফুডের স্বাদ পেয়ে যাচ্ছ আজ। তোমাকে আর রেস্টুরেন্টে নিতে হবে না আমার।'

ব্র্যাণ্ডির বোতলটা ইতোমধ্যে সর্দারকে দিয়েছে রানা, কিন্তু সেটা খুলল না বৃদ্ধ। অতিথিদের হাতের পিতলের পেয়ালায় স্থানীয় পানীয় তুলে দিল। নাকের কাছে নিয়ে তেজ-এর গন্ধ পেল রানা—মধু থেকে তৈরি করা ড্রিঙ্ক... শুধু ইথিওপিয়া আর ইরিত্রিয়ায় পাওয়া যায়। এক চুমুকে পেয়ালাটা খালি করে ফেলল ও। গলা বেয়ে নেমে গেল তরল আগুন, পাকস্থলীতে পৌঁছে বিস্ফোরিত হলো। মারাত্মক শক্তিশালী জিনিস, কোনোমতে ধাক্কাটা সহ্য করল ও।

ভদ্রতা রক্ষার জন্য পর পর চার পেয়ালা খেতে হলো ওকে। এরপর দয়া দেখাল সর্দার, ব্র্যাণ্ডির বোতল খুলল। তবে তাতেও স্বস্তি নেই, পেয়ালায় না ঢেলে মুখ লাগিয়ে চুমুক দিল সে বোতলে, তারপর বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। আশপাশের সবার চোখে প্রতীক্ষা দেখতে পেল রানা, বোতলটা হাতে হাতে ঘুরবে। শুকনো ঢোক গিলল ও, সর্দারের ময়লা দাঁতের দিকে চোখ আটকে গেছে, না জানি ওখান থেকে কী পরিমাণ রোগজীবাণু ইতোমধ্যে ঢুকে পড়েছে ব্র্যাণ্ডির বোতলে। কিন্তু না খেলেও অপমান করা হয়, তাই কাঁধ ঝাঁকিয়ে ওপরঅলাকে ডাকল ও, তাড়াতাড়ি একটা ছোট চুমুক দিয়ে বোতলটা তুলে দিল দিনার হাতে—এবার ওটা ওর সমস্যা।

একটা অল্পবয়েসী মেয়ে এসে তরকারি পরিবেশন করতে শুরু করল বড় পাত্রটা থেকে। সবজি আর মাংস মেশানো একটা থিকথিকে মিশ্রণ—দেখলেই গা ঘিন ঘিন করে। মেজবান-রা অবশ্য ওর উপরই হামলে পড়ল, রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে পুরতে শুরু করল মুখে, কষা বেয়ে ঝোল গড়াচ্ছে—সেদিকে খেয়াল নেই। আবেল আর পাশাও মোটামুটি সমান উৎসাহ নিয়ে খাচ্ছে। দিনা একটু ব্যতিক্রম, ভদ্রতা বজায় রেখে ছোট ছোট গ্রাস মুখে দিচ্ছে ও। রানার দিকে তাকিয়ে খেতে ইশারা করল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে *ইনজেরা*-টা তুলে নিল রানা, একটু ছিঁড়ে শুরু করল খাওয়া। চেহারা স্বাভাবিক রাখতে রীতিমত কসরত করতে হলো ওকে—জীবনে হরেক রকমের খাবার খেয়েছে, তার মধ্যে বিস্বাদ অনেক আইটেম ছিল। চট্টগ্রামের পাহাড়িদের তৈরি কেবাং-নাপ্পি-সিডল খেয়েও ও বমি করেনি, প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে সমতলে; কিন্তু ইরিত্রিয়ান যাযাবরদের এই সুস্বাদু তরকারি দেখেই নাড়িভুঁড়ি ঠেলে উঠে আসতে চাইল গলা দিয়ে। রুটিটা তাও খাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু তরকারিটা—ওরেব্বাপ! স্রেফ মরিচ মেশানো গ্রিজ বলে মনে হলো ওর কাছে। জিভে বেশিক্ষণ রাখার সাহস পাচ্ছে না, অল্প-স্বল্প চিবিয়েই পেয়ালায় চুমুক দিয়ে ড্রিঙ্কের সঙ্গে চালান করে দিচ্ছে পেটে। ভাগ্যিস খানিক পর পর তেজ-এর

পেয়ালা ভরে দিয়ে যাচ্ছে অল্পবয়েসী মেয়েটা, পানীয়টার সাহায্য না পেলে এ খাবার গিলতে পারত না ও কিছুতেই।

রাক্ষসের মত খাচ্ছে সবাই, খুব দ্রুত শেষ হয়ে গেল সামনে রাখা খাবার। সর্দারের ডাকে নতুন করে রুটি আর তরকারি পরিবেশন করা হলো। তাড়াতাড়ি দু'হাত তুলে বাধা দিল রানা—প্রথমবারের কোর্সই শেষ করতে পারেনি, আরেক দফা নেবার প্রশ্নই ওঠে না।

দিনাও নিল না। রুমাল বের করে হাত মুছতে মুছতে রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগছে খাবার?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রানা বলল, 'আর একটু তেজ পেটে পড়া দরকার। নইলে ভুলতে পারছি না যে, পাকস্থলীর ভিতরে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়েছে।'

কথাটা শুনে জোরে হেসে উঠল দিনা।

ওর মধ্যে উৎফুল্ল একটা ভাব লক্ষ করল রানা—পরিবেশটা উপভোগ করছে। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়, সারাজীবন দেশের মাটিতে বহিরাগতের মত আচরণ পেয়েছে দিনা; এই প্রথম সাধারণ মানুষের সঙ্গে একত্রে বসে এক বেলার খাবার খেল..., অনেকটা একই পরিবারের সদস্যের মত। ভাল লাগারই কথা।

হঠাৎ রানাকে অবাক করে দিয়ে পাশে ঝুঁকল দিনা, ঝাপটে ধরে ওর ঠোঁটে চুমু খেল—গাঢ়, গভীর চুমু! ঝাল তরকারির গরম ছাপিয়ে রানার শরীরটা অন্যরকম উত্তাপে ভরে গেল। নিজের অজান্তে সাড়া দিল ও-ও।

পাশ থেকে হাততালি দিয়ে উঠল সর্দার, দেখাদেখি বাকিরাও। মুখে চেঁচাল, 'গুড! গুড!!'

সংবিৎ ফিরে পেল দিনা, তাড়াতাড়ি রানাকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হলো। লজ্জায় গাল লাল হয়ে উঠেছে। তেজ-এর পেয়ালার দিকে তাকিয়ে বিব্রত সুরে বলল, 'বেশি খেয়ে ফেলেছি ওটা। সরি!'

মুচকি হাসল রানা। বলল, 'সেজন্যে এমন অমৃত জুটবে, ভাবতেও পারিনি। ধন্যবাদ।'

ওর দিকে বড় একটা মাংসের টুকরো বাড়িয়ে ধরল সর্দার, ঝিকঝিকে ঝোল ঝরছে। সেটার দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। বলল, 'কী আর হবে? দিন।' মাংসটা নিয়ে কামড় বসাল ও।

পর পর চারবার খালি হলো সবার থালা, তাতে আবার দেয়া হলো খাবার। শেষে দুজন খাদক টাইপের লোক ছাড়া সবাই ক্ষান্ত দিল, ততক্ষণে গোঁফ-দাড়ি সব ঝোলে ভরে গেছে ওদের। দুই খাদক অবশ্য গিলেই চলেছে রুটি-তরকারি। ব্র্যান্ডির বোতলে চুমুক দিয়ে ওটা আবার রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল সর্দার। আগের মত অল্প একটু চেখেই ওটা দিনার হাতে দিল রানা। সর্দারের আনন্দিত চেহারা দেখে ভাবল, এবার কাজের কথা পাড়া যায়।

শার্টের পকেট থেকে পেন্সিলে আঁকা ছবিটা বের করল ও। আকেলকে ইশারা করল দোভাষীর কাজ করতে। সর্দারকে ছবিটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এ-জায়গাটা চেনেন?'

'হ্যাঁ, চিনি তো!' জড়ানো গলায় বলল সর্দার। ভরপেট খাওয়া আর মদের কল্যাণে একটু একটু দুলছে সে। 'হাজের মালভূমির পশ্চিম দিকে ওটা। আমার দাদীর জন্ম হয়েছে ও-জায়গাটার কাছে।'

'নাম কী জায়গাটার?' জানতে চাইল রানা।

বিড়বিড় করে কিছু বলল সর্দার। সেটা শুনে একটু দ্বিধা করল আবেল, নামটা কীভাবে অনুবাদ করবে বুঝতে পারছে না। শেষে বলল, 'উনি বলছেন, জায়গাটার নাম *মৃত শিশুদের উপত্যকা*... ভ্যালি অভ ডেড চিলড্রেন।'

একটু অবাক হলো রানা। 'এমন অদ্ভুত নাম কেন?'

'কী জানি!' কাঁধ ঝাঁকাল সর্দার। 'নাম তো নাম-ই। জন্মের পর থেকেই ও-নাম শুনে আসছি।'

'এমন নাম রাখার পিছনে কোনও কারণ নেই?'

'থাকতে পারে, তবে আমার জানা নেই,' বলল সর্দার। 'খুব খারাপ জায়গা ওটা—অশুভ আত্মারা বাস করে। এখন তো দূরের কথা, যুদ্ধের আগেও ওখানে কেউ যেত না। বাবার কাছে শুনেছি—কোনও পশুও নাকি ঢুকতে চাইত না উপত্যকায়; ওরা ভূত-প্রেতের উপস্থিতি টের পায় তো, তাই। তারওপর ওখানে এখন ল্যাণ্ড-মাইনের ছড়াছড়ি। দুই বর্ষা আগে আমার এক ভাইপো হারিয়ে গেছে ওখানে—পালিয়ে যাওয়া একটা ভেড়া খুঁজতে গিয়েছিল... আর ফিরে আসেনি। সেই থেকে ওটা আমাদের জন্য নিষিদ্ধ এলাকা।'

'আপনি কখনও গেছেন ওখানে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না,' মাথা নাড়ল সর্দার। দুলুনি বেড়ে গেছে তার, হঠাৎ করে শুয়ে পড়ল মাটিতে। নাক ডাকাতে শুরু করল একই সঙ্গে। মজা পেয়ে হো হো করে অট্টহাসি দিল তার সঙ্গীরা।

মাতালের হাসি!

পরদিন ভোরে দপদপে মাথা-ব্যথা নিয়ে ঘুম থেকে জাগল রানা—হ্যাঙওভারে আক্রান্ত হয়েছে। বুঝতে পারল, এত তেজ গেলা মোটেই উচিত হয়নি কাল রাতে, ভুগতে হবে অনেকক্ষণ। পেটের মধ্যে যাযাবরদের *ঐতিহ্যবাহী* খাবারও গুড়গুড় ডাক ছাড়ছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও।

মাথাটা পাশে ঘোরাতেই দিনাকে দেখতে পেল—দিব্যি ওর বাহুতে মাথা রেখে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। চার অভিযাত্রীকে রাতে একটা কুঁড়েতে থাকতে দেয়া হয়েছিল—খাট-টাট ছিল না, চারটে মাদুরে শুয়েছিল ওরা। রাতের বেলা নিজের মাদুর ছেড়ে কখন যেন চলে এসেছে দিনা, রানাকে জড়িয়ে ধরে হারিয়ে গেছে ঘুমের অতলে। ঠোঁটদুটো ঈষৎ ফাঁক হয়ে আছে, দেখা যাচ্ছে মুক্তোর মত দাঁতের সারির অগ্রভাগ। লোভ হলো রানার, ইচ্ছে হলো একটা চুমু খায়... কাল রাতের ঘটনার পর চুমুটা খুব একটা অশোভনও হবে না। তারপরও নিজেকে চোখ রাঙাল ও—নেশার ঘোরে দিনা যা করেছে, সেটার সুযোগ নেয়া ঠিক হবে না। তা ছাড়া, প্রবল আকর্ষণ বোধ করলেও মেয়েটাকে বিশ্বাস করে না ও, এই পরিস্থিতিতে ঘনিষ্ঠতা গড়তে গেলে পরে সেটার চড়া মাশুল দিতে হবে।

সাবধানে নিজেকে মুক্ত করে উঠে বসল রানা। হাতঘড়ির লিউমিনাস ডায়াল বলছে—সূর্য উঠতে এখনও আধঘণ্টা বাকি। কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে এল ও, আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল দিগন্তের কাছে চাঁদ মৃদু আলো ছড়াচ্ছে। ল্যাণ্ড-ক্রুজারের দিকে এগিয়ে গেল ও, পিছনের দরজা খুলে একটা থার্মোস ফ্লাস্ক বের করল—রাতে ঘুমোনোর আগে ওতে গরম পানি রেখে দিয়েছিল। ব্যাগ হাতড়ে বের করল ইন্সট্যান্ট কফির একটা বয়াম। গরম, কড়া কফি ক্লান্তি হ্যাণ্ডওভারটা কাটাবে বলে মনে করছে।

কফি বানাতে বানাতে পায়ের শব্দ পেল ও। নিজের কুঁড়ে থেকে যাযাবরদের বৃদ্ধ সর্দার বেরিয়ে এসেছে, আড়মোড়া ভাঙছে। হাঁক দিয়ে একটা কমবয়েসী ছেলেকে ডাকল সে, উঠোনে বসে তাকে দিয়ে কপাল টেপাতে শুরু করল। মুচকি হেসে দু'মগ কফি বানাল রানা, এগিয়ে গেল সর্দারের দিকে। একটা মগ বাড়িয়ে ধরে বলল, 'এই নিন, মালিশের চেয়ে বেশি উপকার পাবেন এতে। মাথা-ধরা চলে যাবে।'

কথাটার অর্থ বুঝতে পারল না সর্দার, তবে বাড়িয়ে ধরা মগ দেখে যা বোঝার বুঝে নিল। 'গুড!' বলে মগটা নিল সে। রানাও পাশে পা মুড়ে বসে পড়ল। দুজনে একসঙ্গে চুমুক দিল কফিতে।

খানিক পরেই কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে এল আবেল। হাতছানি দিয়ে ওকে ডাকল রানা—দোভাষী দরকার, সর্দারের সঙ্গে কথা বলবে।

'আবেল, ওঁকে জিজ্ঞেস করো তো, আমাদেরকে ভ্যালি অভ ডেড চিলড্রেনে নেবার জন্য একজন গাইড দিতে পারবে কি না?'

প্রশ্নটা শুনে মাথা নাড়ল সর্দার। 'আজই আমি দলবল নিয়ে পুবে চলে যাচ্ছি বৃষ্টি ধরবার জন্য। আমার পোষা প্রাণীগুলো অনেকদিন থেকে তাজা ঘাস পাচ্ছে না—ওগুলোকে নেবার জন্য লোক দরকার, কাউকে ছাড়তে পারব না। তা ছাড়া... কাউকে আমি ওখানে পাঠাতে চাইও না। তোমারও যাওয়া উচিত নয়, বিদেশি যুবক! শুধু পুঁতে রাখা মাইনগুলোর কারণে বলছি না, আমার কাছে খবর এসেছে—ওদিককার সীমান্তে... সুদানের অংশে সশস্ত্র একটা বাহিনী এসে ঘাঁটি গেড়েছে। ছ'দিন আগে পৌঁছেছে ওরা।'

'কারা ওরা?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

'আমি ঠিক জানি না। তবে নিয়মিত সৈনিক নয় ওরা, দলে পঞ্চাশজনের মত আছে—সবাই ভারী অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত। *শিফটা* দস্যুদের দল কখনও এত বড় হয় না।' সর্দার কাঁধ ঝাঁকাল। 'ওখানে ওরা কী করছে, সেটা এক মস্ত রহস্য।'

'হুম,' গম্ভীর হয়ে গেল রানা। তারপর পকেট থেকে ইরিত্রিয়ার একটা টপোগ্রাফিক ম্যাপ বের করে বিছাল মাটিতে। বলল, 'উপত্যকাটার লোকেশনটা অন্তত দেখিয়ে দিন আমাকে।'

ফ্যাল ফ্যাল করে ম্যাপটার দিকে তাকিয়ে রইল সর্দার। অশিক্ষিত একজন মানুষ, মানচিত্রের রঙ-বেরঙের রেখার কিছুই বুঝতে পারছে না। আলোবা নদীটা দেখিয়ে দিল রানা, চেষ্টা করল ওটাকে রেফারেন্স ধরে সর্দারের কাছ থেকে তথ্য নিতে... তবে সফল হলো না। ম্যাপের আঁকাবাঁকা রেখাটা যে নদী হতে পারে,

সেটাই মানছে না বৃদ্ধ লোকটা।

'দেখো বাপু, ওসব কাগজপত্তর আমি বুঝি না,' এক পর্যায়ে বিরক্ত সুরে বলল সর্দার। 'উপত্যকায় যেতে চাও? ওটা হাজের মালভূমির পশ্চিম ঢালে: ইলা বাবু গ্রাম থেকে তাগড়া উটে একদিনের পথ। এর বেশি কিছু আমি জানি না। যাইনি কখনও ওখানে, বললাম না?'

'ঠিক আছে, ওতেই চলবে,' মেনে নিল রানা। 'ছোট একটা উপকার করবেন? উপত্যকায় যেতে হবে না, আমার সঙ্গীদেরকে নাক্ফা আর ইলা বাবু পর্যন্ত নিয়ে যেতে লোক দিন। নাক্ফাতে একটা ট্রাক আছে আমার, ইলা বাবু-তে নেব। আমার সঙ্গীরা নিয়ে যেতে পারবে, কিন্তু পথ দেখাবার জন্য কাউকে দরকার।'

'একই বোতল থেকে মদ খেয়েছি আমরা, এটুকু উপকার তো অবশ্যই করব,' দরাজ গলায় জানাল সর্দার। 'তবে ইলা বাবু ছাড়িয়ে আর কিন্তু এগোবে না আমার লোক। তোমাদের অভিযানের জন্য আমি আমার দলের কাউকে হারাতে রাজি নই।'

'বুঝতে পেরেছি,' রানা মাথা ঝাঁকাল।

'আর হ্যাঁ,' মুচকি হেসে বলল সর্দার, 'উপকারটা পেতে তোমাকে দুইশ' ডলার খরচ করতে হবে।'

রানাও হাসল। 'সেটা আমি আগেই আন্দাজ করেছি।'

আবরুটা লাগিয়ে উটের পিঠ থেকে ফুয়েলের জেরিক্যানগুলো ল্যাণ্ড-রোভারে তুলল আবেল আর পাশা। দিনা তখনও ঘুম থেকে জাগেনি। ডাকলও না রানা, ব্যস্ত রইল নিজের কাজে। সর্দারের ছেলে মোটামুটি কাজ চালাবার মত ইংরেজি জানে, তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে একটা মৌখিক চুক্তি করল ও, বিনিময়ে কিছু টাকা দিল। তারপর ফিরে এল আবেল আর পাশার কাছে।

'আপনার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, আমাদেরকে সঙ্গে নিচ্ছেন না,' মন্তব্য করল আবেল।

'ঠিকই ধরেছ,' বলল রানা। 'সীমান্তের কাছাকাছি ঝামেলার আশঙ্কা করছি আমি, দিনা সঙ্গে থাকলে বোঝা বাড়বে। অশিক্ষিত যাযাবরদের সঙ্গে ওকে একাকী পাঠাবার সাহসও পাচ্ছি না। তাই তুমি যাচ্ছ ওর সঙ্গে।'

'আমি! আমার যাবার দরকার কী? পাশাকে পাঠালে হয় না?'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল রানা। 'ওর বয়স কম, মাথা খাটিয়ে কাজ করতে পারবে না। দিনাকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখতে হবে। গতকাল এক্সক্যাভেটরটা আনবার কথা শুনে কী জিজ্ঞেস করেছিল, মনে আছে? জানতে চাইছিল, খনিটা আমি খুঁজে পেয়েছি কি না। কিন্তু ওর হিসেবে তো খনি না, পাইপ খোঁজার কথা আমাদের। ব্যাপারটা গোলমেলে না? আমার বন্ধুর কিডন্যাপাররাও বার বার খনির কথা বলছিল। আমার মনে হচ্ছে দিনার সঙ্গে ওদের কোনও না কোনও কানেকশন আছে।'

'হুঁ, বুঝতে পেরেছি,' মাথা ঝাঁকাল আবেল। 'চিন্তা করবেন না, আমি চোখ-কান খোলা রাখব। দেখব, নাক্ফায় পৌঁছে ও কারও সঙ্গে যোগাযোগ করে কি

না।'

'ধন্যবাদ, আবেল।'

'পাশা তা হলে আপনার সঙ্গে যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ, আমার সঙ্গে কারও থাকা দরকার। খনিটা যদি খুঁজে পাই, তা হলে ওকে ইলা বাবুতে পাঠিয়ে দেব। তোমাদেরকে পথ দেখিয়ে এক্সক্যাভেটর-সহ সাইটে নিয়ে আসতে পারবে।'

আড়চোখে সর্দারের ছেলের দিকে তাকাল আবেল। 'ওর সঙ্গে কী নিয়ে কথা বললেন?'

'বিকল্প প্ল্যানের ব্যাপারে,' সংক্ষেপে বলল রানা, ব্যাখ্যা করল না কথাটা। বাড়তি স্যাটেলাইট ফোনটা বের করে আবেলকে দিল, শিখিয়ে দিল কখন-কীভাবে ব্যবহার করতে হবে। 'চার্জ কিন্তু প্রায় শেষ,' সতর্ক করে দিল ও। 'চার্জার কেনার সুযোগ পাইনি আসমারায়। যেটুকু আছে, তা খুব ভেবেচিন্তে ব্যবহার কোরো। কাজ না থাকলে সেটটা অন করবারই দরকার নেই।'

খানিক পর প্রস্তুতি শেষ হয়ে গেল ওদের। সর্দারের সঙ্গে শেষবারের মত কথা বলে নিল রানা। বৃদ্ধ আশ্বাস দিল, পরদিনই দুই ছেলেকে দিনা আর আবেলের সঙ্গে গাইড হিসেবে নাকফায় পাঠাবে। তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ল্যাণ্ড-ক্রুজারে উঠে পড়ল রানা, বিদায় নিল আবেলের কাছ থেকে। পাশা ইতোমধ্যে উঠে পড়েছে প্যাসেঞ্জার-সিটে। দিনা এখনও ঘুম থেকে জাগেনি। একটু খারাপ লাগল রানার ওকে কিছু না বলে চলে যেতে, কিন্তু উপায়ও নেই। জাগালে নির্ঘাত সঙ্গে যাবার জন্য জেদ ধরবে, অথচ সামনে অপেক্ষমাণ অজানা বিপদের মধ্যে মেয়েটাকে টেনে নিয়ে যাবার কোনও ইচ্ছে নেই ওর। কিছুটা সময় একান্তে নিজের মতও থাকা দরকার।

'আপনার *বান্ধবী* কিন্তু খেপবে ভীষণ!' গাড়ির জানালার পাশে দাঁড়িয়ে টিটকিরির সুরে বলল আবেল। 'ঘুম থেকে উঠে যখন দেখবে, আপনি নেই।'

'খেপুক,' রানা কাঁধ ঝাঁকাল। 'তোমরা সাবধানে থেকো। আমি যোগাযোগ করব সময়মত। খনিটা পাই, বা না-পাই, পরিস্থিতি বুঝে তোমাদের নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করব। একসঙ্গে থাকলে কাজ করতে সুবিধে হবে।'

'আমাদেরকে নিয়ে ভাববেন না,' আবেল বলল। 'সাবধান থাকা দরকার তো আপনাদের!'

মাথা ঝাঁকিয়ে ইঞ্জিন স্টার্ট দিল রানা, গিয়ার দেবার আগে একবার তাকাল কুঁড়েটার দিকে—যেটায় দিনা ঘুমিয়ে আছে। আবার যখন দেখা হবে, তখন ওর সঙ্গে লম্বা একটা বাতচিত করবার ইচ্ছে আছে ওর। কিডন্যাপার আর খনি-সংক্রান্ত সমস্তকিছু ও জেনে নেবে ওই রহস্যময়ীর কাছ থেকে।

সিদ্ধান্তটা নিয়ে গিয়ার দিল রানা, হ্যাণ্ডব্রেক রিলিজ করে সামনে বাড়াল ল্যাণ্ড-ক্রুজারকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গ্রাম থেকে বেরিয়ে এল গাড়ি। ছুটতে শুরু করল ধু-ধু মরুভূমির মাঝ দিয়ে।

তেইশ

ফেয়ারফ্যাক্স, ভার্জিনিয়া।

এডওয়ার্ড ব্যাগলি ও তাঁর স্ত্রীর হত্যাকাণ্ডের কেসে প্রথম সূত্রটি পাওয়া গেল বেশ দেরিতে।

ঘটনার দিন পুরো এলাকা জুড়ে ফেয়ারফ্যাক্স পুলিশ ডিপার্টমেন্ট মাইকিং করেছিল, দ্বারে দ্বারে লোক পাঠিয়ে জানার চেষ্টা করেছিল, আণ্ডার-সেক্রেটারির বাড়ির আশপাশে পড়শিরা কোনও সন্দেহজনক মানুষকে দেখেছে কি না। তবে তাতে কিছু বেরিয়ে আসেনি। আশার আলো ছিল শুধু এক ডাক্তার দম্পতি: মিস্টার ও মিসেস ওয়ার্নার... ব্যাগলির বাড়ির ঠিক পাশের বাড়িটাই ওঁদের। কিছু দেখলে শুধু ওঁরাই দেখে থাকবেন। আগুন লাগার মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে নিজ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন এই দম্পতি। ভয়ঙ্কর ঘটনাটার কাছাকাছি সময়ে একমাত্র তাঁরাই ছিলেন ব্যাগলি-নিবাসের কাছে। কিন্তু জানা গেল, বাড়ি থেকে বেরিয়ে ওয়ার্নার দম্পতি চলে গেছেন পেরুতে: ওখানকার একটা দাতব্য হাসপাতালে বছরে দু'সপ্তাহ বিনা পারিশ্রমিকে সেবা দেন ওঁরা। অনেক চেষ্টা করেও তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা গেল না, ফলে তদন্তকারীদেরকে অপেক্ষায় থাকতে হলো দুই ডাক্তারের দেশে ফেরা পর্যন্ত।

ওয়ার্নার দম্পতি যখন পেরু থেকে ফিরলেন, তখন স্বয়ং রবার্ট সোয়ান অপেক্ষা করছেন ওঁদের জন্য। সাধারণত এফবিআই ডিরেক্টর কোনও কেসের সঙ্গে নিজেকে জড়ান না, তবে এই বিশেষ কেসটিতে দুটি কারণে ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন তিনি। প্রথম কারণটি হলো, একজন কেবিনেট সদস্যের নৃশংস হত্যাকাণ্ড নিয়ে প্রেসিডেন্টের উদ্বেগ। ঘটনার দিন বিকেলেই অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন-সহ হোয়াইট হাউসে গিয়েছিলেন তিনি, দেশের সর্বোচ্চ নির্বাহীকে সবকিছু খুলে বলেছেন। আগুনে বেশিরভাগ আলামত নষ্ট হয়ে গেলেও বাড়ির ভিতর পাওয়া দুটি মৃতদেহের খুলিতে গুলির ফুটো আবিষ্কৃত হয়েছে—সন্দেহের অবকাশ নেই, আণ্ডারসেক্রেটারি ব্যাগলি ও তাঁর স্ত্রীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এই হত্যার সঙ্গে জড়িত রয়েছে হারানো মেডিউসা-ফটোগ্রাফগুলোর রহস্য। স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন প্রেসিডেন্ট, সোয়ানকে ব্যক্তিগতভাবে কেসটা হ্যাণ্ডেল করবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। স্বস্তির ব্যাপার হলো, মেডিউসা ফটোগ্রাফগুলো রানার কাছেই রাখবার ব্যাপারে রাজি করানো গেছে তাঁকে।

কেসটার সঙ্গে জড়াবার দ্বিতীয় কারণ সম্পূর্ণই ব্যক্তিগত: মেজর জেনারেল রাহাত খান ও অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের অনুরোধ। রানাকেও পছন্দ হয়েছে তাঁর, ওকে সাহায্য করতে হলে পুরো ব্যাপারটা নিজের হাতে রাখা ছাড়া উপায় নেই।

আণ্ডারসেক্রেটারির বাড়িতে আগুন, আর গুলি করে হত্যার খবরটা প্রেসের

কাছে পৌঁছুতে দেরি হয়নি। *ওয়াশিংটন পোস্ট*-এ ফলাও করে ছাপা হয়েছে জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক এডওয়ার্ড ব্যাগলির উপর তদন্তের বিষয়টা। ভদ্রলোক সরকারি গোপন তথ্য পাচার করছিলেন বলেও আভাস দিয়েছে পত্রিকাটা, তবে এর পিছনে কোনও বাস্তব প্রমাণ দেখাতে পারেনি। তারপরও বিষয়টা কেলেঙ্কারির পর্যায়ে পৌঁছুনোর মত অবস্থায় আছে।

দ্রুত রহস্যটা সমাধানের জন্য জোর দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট। খুব শীঘ্রি জনগণের সামনে এ-নিয়ে একটা ভাষণ দিতে চান তিনি, তার আগেই দায়ী ব্যক্তিদের নাম চেয়েছেন। সোয়ানকে বলে দিয়েছেন, আফ্রিকান অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টকে যেন খোঁচাখুঁচি করা না হয়, তাতে ব্যাপারটা আরও ঘোঁট পাকিয়ে যেতে পারে। তদন্তটা কেন্দ্রীভূত রাখতে হবে ব্যাগলির হত্যাকাণ্ডের উপরে। ফলে হাত-পা আটকা পড়ে গেছে এফবিআই ডিরেক্টরের, ব্যাগলির অফিসে কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে না পারায় প্রয়াত আণ্ডারসেক্রেটারির দুই পড়শিই তাঁর শেষ ভরসা।

নিজের গাড়িতে বসে চিন্তায় ডুবে ছিলেন সোয়ান, এমন সময় ওয়ার্নারদের ড্রাইভওয়েতে ঢুকতে দেখলেন লাল রঙের মারকারি মাউন্টেনিয়ার গাড়িটাকে—এয়ারপোর্ট থেকে ফিরেছেন ডাক্তার দম্পতি। তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নামলেন এফবিআই ডিরেক্টর, দেহরক্ষীকে নিয়ে এগোলেন বাড়িটার দিকে। ওঁর সামনে মাউন্টেনিয়ার থেকে নামলেন দুই ডাক্তার—দুজনের বয়সই চল্লিশের কোঠায়; অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন তাদের প্রতিবেশীর আবাসস্থলের ধ্বংসস্তূপের দিকে।

'আগুন লাগানো হয়েছিল ওখানে,' কাছে গিয়ে বললেন সোয়ান। দুই ডাক্তার তাঁর দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল। 'দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আগুন দেবার আগে আরসনিস্ট লোকটা মিস্টার ও মিসেস ব্যাগলিকে গুলি করে খুন করেছে।' হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। 'হাই, আমি রবার্ট সোয়ান—ডিরেক্টর অভ এফবিআই। আপনাদের সঙ্গে আমার একটু কথা বলা দরকার।'

পাঁচ মিনিট পর ধাতস্থ হয়ে সোয়ানকে নিয়ে বাড়ির লিভিং রুমে বসল ওয়ার্নার দম্পতি। কামরাটা সুন্দর করে সাজানো। দেয়ালে শোভা পাচ্ছে নানা রকম ছবি আর ফ্রেমে বাঁধানো সার্টিফিকেট। শো-কেসে নানা রকম আর্টিফ্যাক্ট, কয়েকটা ভাস্কর্যও বসানো হয়েছে নিচু স্তম্ভের উপর।

মিসেস ওয়ার্নারের চোখে পানি, ব্যাগলির স্ত্রীর সঙ্গে তিনি খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন—দুজনে একসঙ্গে গলফ খেলতেন। ডা. ওয়ার্নার অবশ্য শক্ত মানুষ, তারপরও কিছুটা মুহ্যমান হয়ে গেছেন।

'বুঝতেই পারছেন,' বললেন সোয়ান, 'কী ঘটেছে জানবার জন্য প্রেসিডেন্ট অত্যন্ত অস্থির হয়ে আছেন। পারিবারিক ঐতিহ্যের কারণে মি. ব্যাগলির উপর তাঁর আলাদা দুর্বলতা ছিল, এটা হয়তো জানেন।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন মিসেস ওয়ার্নার। 'মিসেস ব্যাগলির কাছে শুনেছি।'

'এফবিআই আর ফেয়ারফ্যাক্স পুলিশ এলাকার সবার সঙ্গে কথা বলেছে... আপনারা দুজন বাদে,' সোয়ান বললেন। 'আমরা আশা করছি, আপনারা ঘটনাটার

উপর কিছুটা আলোকপাত করতে পারবেন। আপনাদের পেরু-সফরে যাবার দিন সকালে কি অস্বাভাবিক কোনও কিছু দেখেছেন, বা শুনেছেন?'

সামনে ঝুঁকলেন মিসেস ওয়ার্নার। 'একটা মেয়েকে ওই বাড়িতে যেতে দেখেছি আমি... আমরা রওনা হবার খানিক আগে। ওকে আগে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তবে... ও-বাড়িতে সবসময়ই অনেক মানুষের যাতায়াত ছিল, সবার চেহারা মনে রাখা কঠিন।'

'মেয়েটার বর্ণনা দিতে পারেন?'

'অতটা ভাল করে দেখিনি তো... তবে বয়স বেশি বলে মনে হয়নি, এই ধরুন পঁচিশ-ছাব্বিশের মত হবে। বেশ সুন্দরী, ক্যাজুয়াল পোশাক পরা ছিল। গাড়িটার কথা খেয়াল নেই, তবে দেখলাম সোজা ড্রাইভওয়েতে গিয়ে থামল; দরজায় নক করে দেরি করেনি, বাড়িতে ঢুকে গেছে। বেরিয়েও এসেছে একটু পরই। আপনার কি মনে হচ্ছে, ও-ই খুন করেছে? চেহারাসুরত দেখে কিন্তু খুনি মনে হয়নি আমার কাছে।'

মনে মনে হাসলেন সোয়ান। ভাল করে না দেখায় এই অবস্থা? কৌতূহলী প্রতিবেশী আর কাকে বলে! হাসিটা চাপা দিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ছবি দেখালে চিনতে পারবেন মেয়েটাকে?'

'কী জানি...'

একটু ইতস্তত করলেন মিসেস ওয়ার্নার। কারণটা বুঝতে অসুবিধে হলো না মি. সোয়ানের। পলিটিক্যাল কারেক্টনেসের এই যুগে একটা বিষয় মুখ ফুটে উচ্চারণ করে না সম্ভ্রান্ত মানুষেরা—ভাবে তাতে বর্ণবাদী বলে অভিযুক্ত হবে। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'মেয়েটা কি কৃষ্ণাঙ্গ ছিল?'

'ইয়ে... হ্যাঁ। তবে ওতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। ব্যাগলির বাড়িতে আফ্রিকান-আমেরিকানরা তো সবসময়ই আসা-যাওয়া করত। ভদ্রলোকের কাজই ছিল ওদের নিয়ে!'

'সব কৃষ্ণাঙ্গই আমেরিকান নয়,' বললেন সোয়ান। 'মেয়েটা সত্যিকার আফ্রিকান হতে পারে না?'

শ্রাগ করলেন মিসেস ওয়ার্নার। 'আমার কাছে ওদের সবাইকে একই রকম লাগে।'

'হুম! মেয়েটাকে আবার দেখলে চিনতে পারবেন?'

'ঠিক জানি না... হয়তো!' দ্বিধান্বিত শোনাল মিসেস ওয়ার্নারের কণ্ঠ।

'ডা. ওয়ার্নার?' ওঁর স্বামীর দিকে ফিরলেন সোয়ান। 'মেয়েটাকে আপনি দেখেছেন?'

'না,' মাথা নাড়লেন ডাক্তার। 'আমি সকালেই চলে গিয়েছিলাম এয়ারপোর্টে—বিমানে আমাদের মেডিক্যাল সাপ্লাই তোলার ব্যাপারে কাস্টমসের ফর্মালিটি সারার জন্য। আমার স্ত্রী একাই ছিলেন বাড়িতে। ফ্লাইটের ঠিক আগে যোগ দিয়েছেন আমার সঙ্গে।'

আবার মিসেস ওয়ার্নারের দিকে ফিরলেন সোয়ান। 'তা হলে আপনিই ভরসা। ভাল করে ভেবে বলুন, ছবি দেখলে চিনতে পারবেন কি না।'

'চেষ্টা করতে পারি,' রাজি হলেন মিসেস ওয়ার্নার। 'তবে ছবিটা ভাল হতে হবে। মেয়েটার চুলের কথাই শুধু পরিষ্কার মনে আছে আমার—অন্যান্য আফ্রিকান-আমেরিকানদের মত ছিল না চুলটা। লম্বা, কালো... মোটেই কোঁকড়া নয়। হালকা ডাই-ও করেছিল বোধহয়, একটু লালচে আভা বেরুচ্ছিল।'

মেয়েলি কথাবার্তায় কান না দিয়ে দেহরক্ষীর কাছ থেকে দুটো ম্যানিলা খাম নিলেন সোয়ান। একটা খুলে ছবির বাণ্ডিল তুলে দিলেন মহিলার হাতে। 'দেখুন, এর মধ্যে আছে কি না।'

দেখতে শুরু করলেন মিসেস ওয়ার্নার, একটা একটা করে উল্টে রাখতে থাকলেন কফি-টেবিলের উপর। ওগুলো সব মোসাদের নারী-এজেন্টদের ছবি, যারা যুক্তরাষ্ট্রের ভিতর কাজ করে। এর মধ্যে কালো চামড়ারও কয়েকজন আছে, তাই চান্স নিয়ে দেখছেন সোয়ান।

তবে খানিক পরেই হতাশ ভঙ্গিতে সবগুলো ছবি ফিরিয়ে দিলেন মিসেস ওয়ার্নার। 'দুঃখিত, এদের কারও সঙ্গে মিলছে না চেহারা।'

'কোনও অসুবিধে নেই,' প্রথম বাণ্ডিলটা নিয়ে এবার দ্বিতীয় খাম থেকে আরেকটা বাণ্ডিল বের করলেন এফবিআই ডিরেক্টর। 'এবার এগুলো দেখুন।'

নতুন বাণ্ডিলের দ্বিতীয় ছবিটা হাতে তুলেই চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস ওয়ার্নার। 'এই যে... এই মেয়েটাই তো!'

উঁকি দিয়ে ভুরু কুঁচকে গেল মি. সোয়ানের। 'আপনি শিওর?'

'হ্যাঁ, একশো ভাগ! কোনও সন্দেহ নেই। এই মেয়েটাকেই আমি যেতে দেখেছি ব্যাগলিদের বাড়িতে।'

ছবিটা হাতে নিলেন সোয়ান। তাঁর বুকের ভিতর হাতুড়ির বাড়ি পড়তে শুরু করেছে। জানেন উপায় নেই, তাও রানার সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার এখুনি, ওকে জানানো দরকার ঘটনাটা। কারণ হাতে ধরা ছবিটা স্টেট ডিপার্টমেন্টের সিকিউরিটি ক্যামেরায় তোলা, ওতে যে-মেয়েটিকে দেখা যাচ্ছে, সে আর কেউ নয়... দিনা আবান!

চব্বিশ

ইরিত্রিয়া।

বাদ্‌ন ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর উত্তরদিকে হাজের মালভূমির পাদদেশের উদ্দেশে দ্রুত ছুটে চলল ল্যাণ্ড-ক্রুজার। পাগলের মত গাড়ি চালাল রানা, প্রফেশনাল র‍্যালি-ড্রাইভারের দক্ষতায় মরুভূমির মাঝখান দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে চলল বাহনটাকে। হ্যাঙওভার কেটে যাবার পর এই উদ্দাম গতিতে পাশাও খুব মজা পেল। উঁচু-নিচু জমিনে গাড়িটা লাফিয়ে উঠলেই গলা ছেড়ে চেঁচাচ্ছে সে।

তবে অনেক চেষ্টা করেও ষাট মাইলের বেশি এগোতে পারল না ওরা। এলাকাটায় চড়াই-উৎরাই বড্ড বেশি, আঁকাবাঁকা পথে যেতে হচ্ছে ওদের। ষাট

মাইল এগোতেই পাড়ি দিতে হলো একশো মাইল পথ। বাড়তি সতর্কতা হিসেবে খারাপ পথে ড্রাইভ করছে রানা, ভাল রাস্তায় ল্যাণ্ড-মাইন থাকবার সম্ভাবনা বেশি।

ড্রাইভিঙের পাশাপাশি নানা রকম চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে রানার মন। ড্যাদি অভ ডেড চিলড্রেনের হদিস পাওয়াটা ওদের সার্চে বড় একটা অগ্রগতি বটে, তারপরও কাজ খুব একটা কমেনি। প্রায় একশো বর্গমাইল এলাকা ওখানে, ম্যাপ বলছে—ছোট-বড় পাহাড়, গিরিখাদ আর বক্র ক্যানিয়ন মিলে পুরোটাই এক বিরাট গোলকধাঁধা।

ম্যাপের সঙ্গে আশপাশটা মেলাতে চাইল রানা, কিন্তু লাভ হলো না। মানচিত্রটা যে-ই বানিয়ে থাকুক, খুব দায়সারা ভাবে কাজ সেরেছে—জিয়োগ্রাফিকাল ল্যাণ্ডমার্ক ঠিকমত চিহ্নিত করেনি। মরুর অংশটাতেই এই অবস্থা, না-জানি কী দেখে এঁকেছে গন্তব্যের এলাকাটা। ম্যাপের উপর আর আস্থা রাখা যাচ্ছে না, নিজের আঁকা ড্রয়িংটাই ড্যাশবোর্ডে টেপ দিয়ে সেঁটে রাখল রানা। ওটায় পাহাড়ের মাঝে কুড়ালের কোপের মত যে-প্রবেশপথটা দেখা যাচ্ছে, সেটাই খুঁজে বের করতে হবে ওকে।

লাখ লাখ বছর ধরে বায়ু আর জলপ্রবাহের আঘাতে বর্তমান চেহারায় পৌঁছেছে এলাকাটা। পর্বতমালার শরীরের তুলনামূলক নরম ত্বক ক্ষয়ে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে রুক্ষ পাথুরে অভ্যন্তর। ওর ভিতর ঠিক কোন্ পাহাড়টার গায়ে কাঙ্ক্ষিত প্রবেশপথটা আছে, তা বোঝার উপায় নেই। ফলে প্রতিটা পাহাড়ের কাছে যেতে হচ্ছে রানাকে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হচ্ছে চারপাশ।

টানা তিনটে দিন এভাবে নিষ্ফল ঘোরাঘুরির পর হতাশা অনুভব করতে শুরু করল ও। হাতের ফাঁক গলে বেরিয়ে যাচ্ছে সময়, অথচ উপত্যকাটাই খুঁজে পায়নি এখনও। শেষে বিকল্প একটা পন্থা ঠিক করল ও—ল্যাণ্ড-ক্রুজার নিয়ে উঠে পড়ল একটা উঁচু পাহাড়ের ঢালে।

ঢালু পথ ধরে সাতশো ফুট উঠতে হলো ওদেরকে, ইঞ্জিনের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ল—যান্ত্রিক আর্তনাদ ছাড়তে ছাড়তে চলল ওটা পায়ে চলার গতিতে। চূড়ার কাছে যখন পৌঁছুল, তখন আগুনের মত গরম হয়ে গেছে বনেট, ধোঁয়া বের হচ্ছে চারপাশ দিয়ে... আরেকটু হলেই বারোটা বাজত ইঞ্জিনের। ইগনিশন বন্ধ করতেই ইঞ্জিন-ফ্লুইডের টগবগানি শোনা গেল।

বিনকিউলার নিয়ে ল্যাণ্ড-ক্রুজারের ছাদে উঠে পড়ল রানা, পাহাড়চূড়ায় ওঠায় বেশ সুবিধে হয়েছে—পুরো এলাকার বিশাল একটা অংশ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে এখান থেকে। চোখে বিনকিউলার *ঠেকিয়ে* আস্তে আস্তে চারদিকে নজর বোলাচ্ছে ও—শক্তিশালী *যেইস* লেন্সের কল্যাণে প্রতিটি খুঁটিনাটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

'দু'মাইল দূরে একটা উপত্যকা দেখতে পাচ্ছি,' চোখে দূরবীনটা ধরে রেখে পাশাকে বলল রানা। 'দেখে মনে হচ্ছে, ওটা এককালে এই অঞ্চলের একটা প্রধান জলপথ ছিল। কিম্বারলাইট পাইপটা যদি এদিকে কোথাও সারফেসে বেরিয়ে থাকে, তা হলে ওখানকার মাটিতে কিছু না কিছু পাথর, বা ট্রেস এলিমেন্ট পাব।'

আবেলের মত ইংরেজিতে ভাল দখল নেই পাশার, রানার কথা বুঝতে না

পেরে শব্দ করল, 'অ্যাঁ?'

বিনকিউলার নামিয়ে রানা হাসল। বলল, 'ভাল একটা সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি, আর কিছু না।'

গাড়ি চালিয়ে আবার সারফেসে নেমে এল ওরা, এবার ঢাল ধরে নীচে নামায় কোনও অসুবিধে হলো না। রানার মনটা আশায় নেচে উঠেছে প্রাচীন নদীটা দেখতে পেয়ে। মালভূমির এপাশটায় আর কোনও নদী বা ঝর্ণার দেখা মেলেনি গত তিনদিনে—কাজেই এইমাত্র পাওয়া নদীটাতে পাললিক তলানি, বা ট্রেস এলিমেন্টের সন্ধান পাবার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

কালের প্রবাহে পুরো এলাকার সারফেস টপোগ্রাফি অবশ্য অনেক বদলে গেছে। প্রাচীন নদীটার শুকনো গতিপথ দেখে ভ্রম হতে পারে, ওটা পাহাড়ি ঢাল বেয়ে উর্ধ্বমুখী হয়ে বইত। তবে রানা ভুল করল না, কাছাকাছি পৌঁছে জলপ্রবাহের সঠিক দিকটা চিনে নিল ও, তারপর উত্তরমুখী একটা ট্রেইল ধরে এগোতে থাকল। শুকনো রিভারবেডটার পাশে পাশে থাকছে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে জমির উপর—তীরের কাছাকাছি পুরনো মাইনিঙের চিহ্ন খুঁজছে। একটু পরেই তীক্ষ্ণ একটা বাঁকের কাছে পৌঁছে গেল ল্যাণ্ড-ক্রুজার—মাঝারি আকারের একটা স্যাণ্ডস্টোনের পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে বাঁকটাতে, জায়গাটাকে ছায়ায় ঢেকে রেখেছে।

গাড়ি থামাল রানা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চেঁচিয়ে উঠল, 'পাশা! থামো!!'

দরজা খুলে ফেলেছে ইরিত্রিয়ান তরুণ, আরেকটু হলেই লাফ দিয়ে নামছিল মাটিতে। ডাক শুনে জমে গেল।

নিজের পাশের দরজাটা খুলল রানা, পাশার মারাত্মক ভুলটা দেখে পাল্‌স বিট বেড়ে গেছে ওর। সর্বনাশ ঘটে যেতে পারত এখুনি। গাড়ির পাশের জমিনে চোখ বোলাল ও—মাটির উঁচু-নিচু অবস্থা দেখে ল্যাণ্ড-মাইন আছে কি না বোঝার চেষ্টা করল। চোখের দেখায় আন্দাজ করল না কিছু। পাশাকে জিপের রেডিও অ্যান্টেনাটা ভেঙে ওর হাতে দিতে বলল।

গাড়িতে বসে অ্যান্টেনাটা প্রোবের মত ব্যবহার করল রানা, মাটি খোঁচাতে শুরু করল ধীরে ধীরে। আট ইঞ্চি ঢুকে যাবার পর থামল। কিছু নেই ওখানে।

ল্যাণ্ড-ক্রুজারের ধাতব শরীর তেতে উঠে তীব্র উত্তাপ ছড়াচ্ছে, ঘামছে রানা দর দর করে, চোখ জ্বালা করছে কপাল থেকে নেমে আসা লবণের স্পর্শে। তবু কাজ করে গেল ও। প্রথম স্পটটার পাশাপাশি আরও কয়েকটা স্পটে অ্যান্টেনা ঢোকাল। বিশ মিনিট পর নিশ্চিত হলো, বিপদ নেই। নামা যেতে পারে।

গাড়ি থেকে নেমে আবারও অ্যান্টেনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রানা। এতক্ষণ শুধু গাড়ির পাশটা দেখেছে, এবার চারদিকে পুরো পঞ্চাশ গজ জায়গা দেখতে শুরু করল। কোনও ঝুঁকি নিতে চায় না। দু'ঘণ্টা পর, ঘেমে-নেয়ে উঠে রানা স্বস্তির শ্বাস ফেলল—নিরাপদে কাজ করা যাবে, মাইনফিল্ডে এসে ঢোকেনি ওরা।

অ্যান্টেনাটা ভাঁজ করে পাশার দিকে ছুঁড়ে দিল ও। বলল, 'কোদাল নিয়ে এসো। কাজ শুরু করতে হবে।'

শার্ট খুলে ফেলল রানা। ঘামে ভেজা তামাটে রঙের সুঠাম দেহটা চকচক করছে। পাশা কোদাল নিয়ে আসতেই দুজনে নেমে পড়ল প্রাচীন বাঁকটায়, মাটি

খুঁড়তে শুরু করল। এ-ধরনের বাঁকে নদীর স্রোত এসে আছড়ে পড়ে; মাটিতে আটকে যায় পানির সঙ্গে গড়িয়ে আসা শক্ত জিনিসগুলো; টিকে থাকে অনেক... অনেক বছর। প্রসপেক্টররা তাই খনিজ সম্পদের খোঁজে এসব নদীর বাঁকেই বেশি ঘোরাফেরা করে। রানা আশা করছে, প্রাচীন এই নদীটিতে হীরার পাললিক তলানি থাকলে তা ওই প্রক্রিয়াতেই বাঁকের প্রাকৃতিক ফাঁদে আটকা পড়ে থাকবে।

চুপচাপ মাটি খুঁড়ে চলল ওরা। খানিক পর পর কোদাল-ভর্তি মাটি একটা প্লাস্টিকের তারপুলিনের উপর ফেলছে রানা, ধুয়ে ফেলছে পানি দিয়ে। প্রতিফলন, প্রতিসরণ, এবং কাঠিন্যের ধর্মের পাশাপাশি হীরার আরেকটা ধর্ম হচ্ছে শুষ্কতা। ভেজার ক্ষমতা নেই মিনারেলটার; যতই পানি ঢালা হোক, শুকিয়ে উঠবে মুহূর্তেই। কাদা হয়ে ওঠা মাটির ভিতর আঙুল দিয়ে কঠিন কণাগুলো তুলে আনছে রানা, চোখের কাছে এনে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে, তারপর সরিয়ে রাখছে একপাশে। আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ছে মাটি খোঁড়ায়।

সূর্যের আলো যখন মরে গেল, তখন ওদের খোঁড়া গর্তটা আট ফুট চওড়া, আর ছ'ফুট গভীর হয়ে গেছে। স্যাম্পলগুলো স্বল্প আলোয় আর পরীক্ষা করা যাচ্ছে না দেখে কাজ থামাল রানা। পশ্চিমাকাশের লালচে আভা ছড়িয়ে গেছে মরুভূমিতে, অদ্ভুত একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে মনটা বিষাদে ছেয়ে গেল রানার। এসব দৃশ্য চোখে পড়লে অর্থহীন মনে হয় ওর কাছে সবকিছু। কার জন্য এই সৌন্দর্য মেলে ধরা? ও যখন থাকবে না, পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব যখন আর থাকবে না, তার পরেও কোটি কোটি বছর এমনি লালচে আলোয় মোহনীয় রূপ ধারণ করবে এ মরুভূমি। অর্থহীন নয়?

সারফেসের মাটি খুঁড়ে লাভ হয়নি, আরও খুঁড়লে যে লাভ হবে, সেটারও কোনও নিশ্চয়তা নেই। উত্তর ইরিত্রিয়ার বেডরক দুনিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন বেডরকগুলোর একটা। উপরের সারফেসের প্রলেপ এক মাইলের বেশি পুরু—লাখ লাখ বছরে হরেক রকম মাটি এসে জমাট বেঁধেছে। এখান থেকে স্যাম্পল পেতে হলে *কোর-ড্রিলার* দরকার—ওটা থাকলে সারফেস ভেদ করে একেবারে গভীর থেকে স্যাম্পল তুলে আনা যেত। বলা বাহুল্য, ও-জিনিস ওদের সঙ্গে নেই। উপরের কয়েক ফুট মাটি কুপিয়ে ওরা হয়তো শুধু শুধুই সময় নষ্ট করছে। তিক্ততা অনুভব করল রানা—আশার আলোটা নিভে যেতে বসেছে।

'কী হয়েছে, *এফেন্দি?*' ওর মুখের ভাব লক্ষ করে জানতে চাইল পাশা।

'কিছু না,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল রানা। 'মাটিতে ট্রেস এলিমেন্ট পেলে নদীটার গতিপথ ট্র্যাক করে উপত্যকাটার খোঁজ বের করব ভেবেছিলাম। সেটা বোধহয় সম্ভব হচ্ছে না। পুরো এলাকা চষেই ভ্যালি অভ ডেড চিলড্রেনের সন্ধান পেতে হবে।'

গর্ত থেকে পাশাকে নিয়ে উঠে এল ও, হাত-মুখ ধোয়ার আগে শেষ একবার স্যাম্পল-পরীক্ষা করবে বলে ঠিক করল। গর্তের কিনারের স্তূপ থেকে এক কোদাল মাটি নিয়ে তারপুলিনের উপর ফেলল, পানি ঢেলে কাদা বানিয়ে শুরু করল হাতড়াতে। সারাদিনে অন্তত পঞ্চাশবার করেছে কাজটা, হাত চলতে থাকল যন্ত্রের মত, মন বিক্ষিপ্ত। আজেবাজে দুশ্চিন্তা খেলা করছে মাথায়, সারাদিনের

হাড়ভাঙা পরিশ্রমে টনটন করছে গোটা শরীর।

ছোট একটা পাথরকণা উঠে এল দু'আঙুলে—শুকনো, ঠিকমত ভেজেনি বোধহয়। ক্যান্টিনের তলানি থেকে শেষ কয়েক ফোঁটা পানি ঢেলেই চমকে গেল রানা—পানিটা শুকিয়ে গেছে চোখের পলকে, কণাটা আবার খটখটে। উত্তেজিত গলায় ও বলল, 'পাশা, ফ্ল্যাশলাইট আনো! পানিও দরকার আরও!'

ছুটে গিয়ে ফ্ল্যাশলাইট আর পানির বোতল নিয়ে এল পাশা। আলোটা জ্বালতে বলে বোতলটা বাম হাতে নিল রানা, পানি ঢেলে পরিষ্কার করতে লাগল ডান হাতে ধরা পাথরকণাটাকে। ময়লা পরিষ্কার হলো ঠিকই, কিন্তু আধ বোতল পানি ঢালার পরও ওটা শুকনোই রয়ে গেল। আলোতে ভাল করে ওটাকে দেখল রানা—বেশ ছোট, পিঠটা অমসৃণ; তবে সাধারণ পাথরের মত নয়। ঘোলাটে একটা ভাব আছে দানাটাতে, অনেকটা লবণের মত।

পাশাও উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। চোখদুটো চক চক করছে ওর। 'এফেন্দি, এটা কি...'

জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা, হেঁটে চলে গেল গাড়ির কাছে। দানাটার একটা চোখা কোনা বেছে চেপে ধরল উইণ্ডশিল্ডের উপর, চাপ দিয়ে আঁচড় কাটল। তীক্ষ্ণ শব্দ করে কাচের মধ্যে কামড় বসাল ওটা, সরিয়ে নিতেই দেখা গেল—সেফটি গ্লাসের উপর সাদা একটা দাগ বসে গেছে।

মুখে হাসি নিয়ে উল্টো ঘুরল রানা, পাথরের কণাটা তুলে দিল পাশার হাতে। বলল, 'এনগেজমেণ্ট রিঙে বসাতে হলে কেটে নিতে হবে, তবে তোমার হাতে ওটা বারো ক্যারাটের একটা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডায়মণ্ড, পাশা!'

ফ্যাল ফ্যাল করে ওর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল পাশা, তারপরই ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করল। রানার ইচ্ছে হলো তখুনি প্রাচীন নদীগর্ভ ধরে রওনা দেয়, কিন্তু রাতের বেলা সেটা সম্ভব নয়। উপায়ান্তর না দেখে ইচ্ছেটার গলা টিপে ধরল ও। খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়ল ল্যাণ্ড-ক্রুজারের সিটে, তাঁবু খাটানোর ঝামেলায় গেল না। শুয়ে পড়ল ঠিকই, কিন্তু ঘুম এল না কিছুতেই। নার্ভ উত্তেজিত হয়ে আছে।

পেয়েছে ও... হীরার খোঁজ পেয়েছে! সোহেলের কিডন্যাপাররা আগামীকাল মাঝরাতে ফোন করবে, ওদেরকে কী বলবে, সেটা নিয়ে ভাবতে শুরু করল। হীরা-আবিষ্কারের কথাটা বলা যাবে না, তবে এমন কিছু বলতে হবে, যাতে ওরা আশ্বস্ত হয়; রানা লক্ষ্যের কাছাকাছি আছে বলে বিশ্বাস করে। এত দ্রুত হীরা পেয়ে যাওয়ায় একটা মস্ত সুবিধে হয়েছে। চার সপ্তাহ সময় আছে ওর হাতে—এর মধ্যে ভেবেচিন্তে একটা পরিকল্পনা স্থির করতে পারবে, যাতে সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে। সোহেলকে তো উদ্ধার করবেই, শয়তান টেরোরিস্টরা যাতে হীরা না পায়—সেটাও নিশ্চিত করবে ও। ওদেরকে শায়েস্তা করবে রানা!

এসব নিয়ে ভাবতে ভাবতে একসময় নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে গেল ও। ভোরে যখন জাগল, তখন সারা শরীরে আড়ষ্টতা ভর করেছে। নড়াচড়া করলেই টন টন করে উঠছে পেশি—গতদিনের মাটি খোঁড়াখুঁড়িই এর কারণ।

পাশাকে জাগাল রানা। প্রাতঃকৃত্য আর ব্রেকফাস্ট সেরে আধঘণ্টার মধ্যেই

শুরু হলো পথ চলা। গাড়ি নিয়ে রিভারবেডে নেমে পড়েছে ওরা, ওটা ধরেই এগোচ্ছে। নদীটা এককালে খুব চওড়া ছিল, বাঁক-টাক ছিল না খুব একটা; যেখানে হীরা পেয়েছে, সেটার পরে আর একটা মাত্র বাঁকই শুধু পড়ল সেটা কাটিয়ে সামনে কয়েক মাইল যেতে একটা খাড়া পাহাড় দেখা গেল। অতীতের কোনও একটা সময়ে ওখান দিয়ে জলপ্রপাত হয়ে নেমে এসেছিল নদীটা।

সরাসরি পেরুবার উপায় নেই, ঢালের উপরে উঠে ল্যাণ্ড-ক্রুজারের টো-উইঞ্চের সাহায্যে পার করল গাড়িটাকে। এখানেই কয়েক ঘণ্টা সময় নষ্ট হলো—গাড়ি থেকে নেমে রেডিও-অ্যান্টেনার প্রোব দিয়ে মাটি পরীক্ষা করতে হয়েছে ওকে। যা হোক, পাহাড়টা পেরিয়ে আবার রিভারবেডে নেমে গেল ওরা, আবার এগোচ্ছে। এবার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া গেল প্রাচীন নদীটার গতিপথের। মোটামুটি উত্তর থেকে দক্ষিণমুখী হয়ে প্রবাহিত হতো ওটা। ওরা যেভাবে এগোচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে সোজা হাজের মালভূমির মূল অংশে গিয়ে থামতে হবে। মালভূমিটা বেশ উঁচু, আশপাশের বিশাল একটা এলাকাকে ছায়ায় ঢেকে রেখেছে। নদীটার উৎপত্তিও সম্ভবত ওখানেই হয়েছিল। একবার রিভারবেড থেকে বেরিয়ে যাবার কথা ভাবল রানা, সময় বাঁচানোর জন্য সরাসরি মালভূমির পাহাড়শ্রেণীর দিকে এগিয়ে যেতে চাইল... কিন্তু পরক্ষণেই আবার বাতিল করে দিল চিন্তাটা। ওভাবে গেলে মাইনফিল্ডের মাঝখানে পড়বার সম্ভাবনা থাকে। তারচেয়ে প্রাচীন নদীগর্ভের এবড়ো-খেবড়ো পথটা অনেক বেশি নিরাপদ।

'*এফেন্দি!*' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল পাশা। ড্যাশবোর্ড থেকে পেন্সিল-ড্রয়িংটা খুলে নাড়ছে একহাতে, অন্য হাতের তর্জনী তুলে দেখাচ্ছে বামদিকটা।

তাকাল রানা, পরমুহূর্তে নেচে উঠল মন। ভ্যালি অভ ডেড চিলড্রেনের প্রবেশপথের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ওরা। ওর ড্রয়িংটা মোটামুটি নিখুঁতই হয়েছে—তিনশো ফুট উঁচু পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে কুড়ালের একটা কোপের মত দেখাচ্ছে ওটাকে। আসলে উপত্যকার মুখটাতে দুপাশের পাহাড়ের অংশ খসে পড়েছিল কোনকালে যেন, ইংরেজি *ভি* বর্ণের মত বুজিয়ে ফেলেছে দুটো পাশ... তাই অমন আকৃতি।

নদী থেকে আধমাইল দূরে প্রবেশপথটা। মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটায় অসংখ্য ইম্প্যাক্ট ক্রেটার দেখা গেল—যুদ্ধের সময় ইথিওপিয়ান আর্টিলারির শেলের আঘাতে সৃষ্টি হয়েছে। বেশ কয়েক জায়গার পুড়ে যাওয়া মাটি আজও কালো হয়ে আছে। দৃশ্যটা বিস্ময় জাগাল রানার মনে—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের নো-ম্যানস্ ল্যাণ্ডের ছবি দেখেছে ও, এরকমই ছিল ওগুলো!

বিশাল কামানগুলো যখন এলাকাটার উপর গোলাবর্ষণ করছিল, তখন তার মাঝখানে পড়ে যাওয়া মানুষগুলোর কথা ভাবতেই শিউরে উঠল রানা। আশপাশে কোনও কবর আছে কি না, দেখার চেষ্টা করল; তবে একটু পরেই বুঝতে পারল—পাবে না। এমন ভয়াবহ গোলাবর্ষণের পর কবর দেবার মত দেহাবশেষ থাকার কথা নয়। দৃশ্যটা দেখে পাশাও থম মেরে গেছে। বয়স কম ওর, ইরিত্রিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধ দেখেনি, তারপরও বুঝতে পারছে—ওদের জনগণকে কী পরিমাণ রক্ত দিতে হয়েছে স্বাধীন হবার জন্য।

পাশার দিকে তাকিয়ে আশ্বস্ত করবার ভঙ্গিতে একটু হাসল রানা, তারপর স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে নদীগর্ভ থেকে তুলে আনল গাড়ি।

বধ্যভূমিটার মাঝ দিয়ে যাবার সময় অদ্ভুত একটা অপরাধবোধে আক্রান্ত হয়ে থাকল রানার মন। মনে হলো যেন মৃত বীরদের হাড়-গোড়ের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে... ব্যাপারটা সত্যিও হতে পারে। এই জায়গাটা বাকিদের জন্য একটা ওয়ার্নিং হয়ে দাঁড়িয়েছিল কি না, কে জানে। সেজন্যেই হয়তো এত বছর ধরে কেউ পা রাখতে চায়নি এলাকাটায়।

কাছাকাছি যেতেই গিরিখাদটার আকৃতি বোঝা গেল। সারফেসটা দু'শো ফুট চওড়া, মাথাটা দ্বিগুণ। শুধু মুখ নয়, পুরোটাই আসলে ভি-শেপের। ধুলো উড়িয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল ল্যাণ্ড-ক্রুজার। গতি কমিয়ে দুপাশে নজর বোলাল রানা। পাহাড়ি দেয়ালটা পাথুরে নয়, সেডিমেন্টারি স্যাণ্ডস্টোনে গড়া—স্তরে স্তরে জমা হয়েছে দীর্ঘ সময় ধরে। অত্যন্ত নড়বড়ে। গিরিখাদের মেঝে ভরে আছে শুকনো গুঁড়োয়। গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দে ওদের চোখের সামনেই খসে পড়ল দেয়ালের বেশ কয়েকটা জায়গার মাটি, ল্যাণ্ড-ক্রুজারের ছাদের উপর জমা হলো সাদাটে ধুলোর একটা আস্তর।

'এদিকে হীরা আবিষ্কৃত হয়নি দেখে অবাক হচ্ছি না,' আপনমনে বলল রানা। 'জিয়োগ্রাফিই তো ঠিক নেই। কীসের হীরা? এখানে শুধু *রায়োলাইট* আর *ব্যাসল্ট* পাওয়া যাবার কথা।'

প্রায় মাইলখানেক দীর্ঘ গিরিখাদটা পেরিয়ে খানিক পরেই বেরিয়ে এল গাড়ি। সামনে একটা বৃত্তাকার ধু-ধু প্রান্তর: চারদিক পাহাড়ে ঘেরা; দেখতে অনেকটা খাবারের বাটির মত। তবে আকারে মোটেই ছোট নয়, অন্তত পাঁচ মাইল ব্যাস পুরো জায়গাটার। সূর্যের তীব্র উত্তাপে তেতে আছে সমগ্র প্রান্তর। দূরপ্রান্তের পাহাড়সারি হারিয়ে গেছে তাপতরঙ্গের ভিতর।

স্থানীয় লোকজন কেন জায়গাটাকে অপয়া ভাবে, সেটা বুঝতে পারল রানা মুহূর্তে। ইরিত্রিয়ার মরুভূমিতে এমনিতেই উদ্ভিদের পরিমাণ খুব কম, কিন্তু এই উপত্যকার অবস্থা তার চেয়ে অনেক... অনেক খারাপ। যতদূর চোখ যায়, কোথাও একটা ক্যাকটাসও চোখে পড়ছে না... ছবিতে চাঁদের পিঠ এমনটা দেখায়। এ যেন এক মৃত্যুপুরী, প্রাণের কোনও চিহ্ন নেই কোথাও।

শূন্য প্রান্তরটার যতই গভীরে গেল গাড়ি, ততই নার্ভাস হয়ে পড়ল পাশা। প্রার্থনার ভঙ্গিতে দু'হাত একত্র করে বুকের কাছে ধরে রেখেছে সে। বিড় বিড় করে বলল, 'জায়গাটা আমার ভাল মনে হচ্ছে না।'

'আমারও,' স্বীকার করল রানা। ঘাড়ের কাছটা শির শির করছে ওরও।

প্রান্তরের মাঝামাঝি পৌঁছুতেই কিছু একটা নজর কাড়ল রানার। পাহাড়শ্রেণীর কাছাকাছি মানুষের তৈরি কী যেন একটা দেখা যাচ্ছে।

'কী ওটা?' অবাক কণ্ঠে জানতে চাইল পাশা।

জবাব না দিয়ে গতি বাড়াল রানা। জিনিসটার পাঁচশ' গজের মধ্যে পৌঁছেই হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে গেল ওর। উত্তেজিত গলায় বলল, 'চিনতে পেরেছি। ও... ওটা হেড-গিয়ার... খনির হয়েস্টিং ডেরিক!'

তৈলখনির ড্রিল-টাওয়ারের মত দেখতে কাঠামোটা—মরচে-পড়া স্টিলের বড় বড় কয়েকটা পায়া দিয়ে মাটি থেকে চল্লিশ ফুট উপরে আটকে রাখা হয়েছে একটা বিশাল ফ্লাই-হুইল। টাওয়ারটার পাশেই কয়েকটা ভাঙাচোরা কাঠের ঘর দেখা যাচ্ছে—ওর ভিতর হেড-গিয়ারের মেশিনারি থাকবার কথা। টাওয়ারটা আসলে যে-কোনও খনির এলিভেটর মেকানিজম হিসেবে কাজ করে। বড় বড় কন্টেইনারের মাধ্যমে মাটির গভীরে শ্রমিক নামায়, ওদের খোঁড়া খনিজ-সমৃদ্ধ আকরিক তুলে আনে। কন্টেইনারগুলোকে মাইনিঙের ভাষায় *স্কিপ* বলা হয়।

গতকাল নদীগর্ভে হীরা পাবার পর খনিটার আবিষ্কার অপ্রত্যাশিত ছিল না, তারপরও কিছুক্ষণের জন্য ভাষা হারাল রানা। যে-জিনিসের খোঁজে গত দুটো সপ্তাহ পাগলের মত মরুভূমি চষে বেড়াচ্ছে, সেটা চোখের সামনে দেখার পর সাময়িক বাক্‌রোধ ঘটতেই পারে। তারপর আস্তে আস্তে হাসি ফুটল ওর মুখে।

হঠাৎ আরেকটা চিন্তা খেলল ওর মাথায়। খনিটা পরিত্যক্ত কেন? হীরার জন্য খোঁড়া হয়েছিল ওটা, মেডিউসা স্যাটেলাইটের ছবিও বলছে—এখানে কিম্বারলাইট পাইপ আছে; তারপরও খনিটা বন্ধ করে দেয়া হলো কী কারণে? ভাঙাচোরা ঘরগুলোর দিকে তাকাতেই জবাবটা পেয়ে গেল। অন্তত ষাট-সত্তর বছরের পুরনো ওগুলো, তারমানে খনিটা খোঁড়া হয়েছিল ইটালিয়ান উপনিবেশ আমলে। ১৯৪১ সালে ব্রিটিশরা ইরিত্রিয়ার দখল নিয়ে নেয়ায় খনি বন্ধ করে পাততাড়ি গোটাতে বাধ্য হয়েছিল ইটালিয়ানরা। পরিচিত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন, নির্জন একটা জায়গা এটা; পাহাড়ের গলিঘুপচির মধ্যে লুকানো; ব্রিটিশরা সম্ভবত খুঁজে পায়নি খনিটা, কিংবা খোঁজার চেষ্টাই করেনি। ইরিত্রিয়ার স্বাধীনতা-যুদ্ধের সৈনিকরা খোঁজ পেয়ে থাকতে পারে, কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, উপত্যকার প্রবেশমুখে ইথিওপিয়ানদের লং-রেঞ্জ আর্টিলারি বম্বিঙে মারা পড়েছে তারা। এভাবেই সবার চোখের আড়ালে রয়ে গেছে খনিটা।

তারপরও প্রশ্ন থাকে। ইরিত্রিয়া স্বাধীন হয়েছে দেড় দশকেরও বেশি সময় আগে, এখনও ইটালিয়ানরা খনিটার জন্য ফিরে আসেনি কেন? নাকি এসেছে? সোহেলের কিডন্যাপাররা ইটালিয়ান নয়তো? সেজন্যেই কি পাইপের বদলে খনির কথা বলছে? ভাবতে ভাবতে মাথায় জট পাকিয়ে গেল চিন্তাগুলো।

টাওয়ারের পাশে পৌঁছে গাড়ি থামাল রানা। *হারানো খনি* এটা, ইথিওপিয়ানদের পা পড়েনি, কাজেই ল্যাণ্ড-মাইন থাকবারও সম্ভাবনা নেই। দরজা খুলে নিশ্চিন্তে নেমে পড়ল ও। টাওয়ারের কাছে যেতেই ওটার তলায় বিশ ফুট দৈর্ঘ্য-প্রস্থের একটা কালো গহ্বর চোখে পড়ল—খনির মুখ। দেখে মনে হচ্ছে যেন পাতালে যাবার পথ। একটা ছোট পাথর তুলে নিয়ে গর্তের ভিতর ফেলল রানা, চোখ রিস্টওয়াচে—সময়ের হিসেব রাখছে।

প্রত্যাশিত সময়ের অনেকটা পরে ভেসে এল প্রতিধ্বনি। তলায় পাথরের আছড়ে পড়ার একটা মৃদু শব্দ। সময় আর শব্দের গতি মিলিয়ে ক্যালকুলেশন করল রানা—গর্তটা একশো ষাট ফুট গভীর। বিস্ময়ের একটা ধ্বনি বেরিয়ে এল ওর গলা দিয়ে।

'এফেন্দি!' পাশার ডাক শোনা গেল। বড় একটা ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে

আছে সে।

ভবনটা পুরনো আমলের ওয়েস্টার্ন বাড়ির মত—কাঠের তক্তা দিয়ে গড়া, সামনের ছোট্ট বারান্দা ঢাকা মরচে-ধরা টিনের চাল দিয়ে। বারান্দাটায় পা রাখতেই পুরনো কাঠ মড়মড় করে উঠল। সাবধানে এগিয়ে গিয়ে দরজা পেরুল ও, তাকাল ভিতরে। আলো থেকে ছায়ায় আসাতে প্রথমে কিছু দেখতে পেল না, তবে দৃষ্টিটা সয়ে আসতেই থমকে গেল দৃশ্যটা দেখে।

একটা লাশ পড়ে আছে ঘরটাতে। দেয়ালে ঠেস দেয়া এক সৈনিকের লাশ, আর্টিলারি গানফায়ারের মাঝ দিয়ে উপত্যকা থেকে পালাবার সময় ইরিত্রিয়ান মুক্তিবাহিনী পিছনে ফেলে গেছে। মরুর তীব্র উত্তাপে শুকিয়ে মচমচে হয়ে গেছে লাশটা, আলাদা মুখোশের মত চামড়া সেঁটে বসে গেছে খুলির উপর—ঠোঁট ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে দাঁতের সারি। খামচানোর ভঙ্গিতে কুঁকড়ে আছে হাতের আঙুলগুলো, কালো অক্ষিকোটর থেকে বেরিয়ে আসছে একটা মাকড়সা। বীভৎস দৃশ্য! লাশের পরনে ব্যাটল-জ্যাকেট, তাতে গুলির ফুটো আর শুকানো রক্তের দাগ। সম্ভবত মারাত্মক আহত হয়েছিল সে, গুলি খেয়েছিল, তাই বাকিদের সঙ্গে যেতে পারেনি। গেলেও অবশ্য লাভ হতো না, সঙ্গীদের মত কামানের গোলায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতো।

গাড়ি থেকে তারপুলিন এনে লাশটা ঢেকে দিল রানা। চোখ বোলাল ঘরের বাকি অংশে। আরও যারা আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। এখানে-ওখানে পড়ে আছে খালি বুলেটের খোসা, ভাঙা অ্যামিউনিশন ক্লিপের স্প্রিং। কালো হয়ে যাওয়া একটা পাথরের বৃত্ত—আগুন জ্বালা হয়েছিল। ঘরের কোণে পড়ে আছে জঞ্জাল।

'লাশটা সূর্য ডোবার আগে কবর দেব আমরা,' পাশাকে বলল রানা। 'দেরি হয়ে গেছে বেশ, আজ আর মাইন-শাফটটা পরীক্ষা করবার সময় নেই। এখানেই রাতে ক্যাম্প করব আমরা।'

দাফন সারতে সারতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। কাজ শেষে পুরনো কাঠের বাড়িটায় ঢুকল ওরা, রাতের খাওয়া সারল। একটু পরেই ঘুমিয়ে গেল পাশা। রানা অবশ্য জেগে থাকল, মাঝরাতে কিডন্যাপাররা যোগাযোগ করবে, তাই ঘুমানো চলবে না। স্যাট-ফোনে চার্জ নেই, একেবারে শেষ মুহূর্তে অন্ করতে হবে ওটা। এখনও অনেকটা সময় বাকি, নানা রকম চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল মনটা। ধীরে ধীরে উদ্বেগ অনুভব করল ও—অ্যাম্বাসেরা হোটেলের ইয়োরোপীয় লোকদুটোর পরিচয় আন্দাজ করতে পারছে। নিশ্চয়ই কিডন্যাপারদের দলের সদস্য ছিল ওরা, ওর উপর নজর রাখার জন্য হোটেলে অপেক্ষা করছিল!

একজন মারা গেছে ওদের। সেটা একটা দুঃসংবাদ। সুদানিজরা দায়ী হলেও শাস্তিটা ভোগ করতে হবে সোহেলকেই। ওর উপরেই ঝাল মেটাবে কিডন্যাপাররা। অসহায় বোধ করল রানা, কী করবে বুঝতে পারছে না। কীভাবে বাঁচাবে ও সোহেলকে?

পঁচিশ

ওয়াশিংটন ডিসি। সন্ধ্যা সাতটা।

পেনসিলভ্যানিয়া অ্যাভিনিউ ধরে ছুটে চলেছে এফবিআই ডিরেক্টরের ক্রাউন ভিক্টোরিয়া গাড়িটা, ভিতরে বসে আছেন রবার্ট সোয়ান আর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন, গন্তব্য হোয়াইট হাউস। কথা বলছেন না আমেরিকার দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার দুই কর্ণধার, থমথমে নীরবতা বিরাজ করছে তাঁদের মধ্যে। এডওয়ার্ড ব্যাগলির প্রতিবেশী ওয়ার্নার দম্পতির সঙ্গে মি. সোয়ানের কথা হবার পর চব্বিশ ঘণ্টার বেশি কেটে গেছে। ফেয়ারফ্যাক্স থেকে ফিরেই নুমা চিফের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন তিনি, যা জানতে পেরেছেন, সেটা খুলে বলেছেন। শুনে খুবই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, দুজনে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেন, খবরটা প্রেসিডেন্টকে জানাতে হবে। কিন্তু আমেরিকার প্রধান নির্বাহী তখন অ্যালাবামায়, সম্প্রতি ঘটে যাওয়া একটা টর্নেডোয় ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করতে গেছেন। ফলে অপেক্ষা করতে হয়েছে ওঁদের। আজ বিকেলে হোয়াইট হাউসে ফিরে এসেছেন প্রেসিডেন্ট, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, সন্ধেবেলা ওঁদেরকে যেতে বলেছেন প্রেসিডেন্ট।

মিনিট দশেক পরেই হোয়াইট হাউসের ফটকে পৌঁছে গেল গাড়ি। ওখান থেকে নিরাপত্তামূলক ফর্মালিটি সম্পন্ন করে মূল ভবনে পৌঁছুতে লাগল আরও দশ মিনিট। আরও পাঁচ মিনিট কেটে যাবার পর ওভাল অফিসে ডাক পড়ল অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর মি. সোয়ানের।

ওঁরা ঢুকতেই ডেস্ক থেকে উঠে এসে করমর্দন করলেন আমেরিকার নতুন প্রেসিডেন্ট। হালকা-পাতলা গড়নের অত্যন্ত অমায়িক একজন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ তিনি—ব্যক্তিত্ব আর অধ্যবসায়ের জোরে গায়ের রঙকে পিছনে ফেলে দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে উঠে এসেছেন। কুশল বিনিময় শেষে অতিথিদের সামনের চেয়ারে বসতে দিলেন, তারপর নিজে গিয়ে বসলেন ডেস্কের পিছনে।

'হ্যাঁ... বলুন, কী ব্যাপার।' বললেন প্রেসিডেন্ট।

মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর মি. সোয়ান। তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে নুমা চিফ বললেন, 'ইয়ে... ব্যাপারটা এডওয়ার্ড ব্যাগলিকে নিয়ে, মি. প্রেসিডেন্ট।'

এফবিআই ডিরেক্টরের দিকে তাকালেন প্রেসিডেন্ট। 'খুনির পরিচয় পেয়েছেন?'

'জী স্যর। তবে... ব্যাপারটা একটু জটিল...'

'মানে?'

'আমি বলছি, মি. প্রেসিডেন্ট,' বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'রবার্টের

হাতে নিরেট প্রমাণ নেই, কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, ব্যাগলিকে ইজরায়েলিরা খুন করেছে... মানে, মোসাদ।'

'হোয়াট!' চমকটা এতই অপ্রত্যাশিত, প্রেসিডেন্টের মনে হলো তিনি চেয়ার থেকে পড়ে যাবেন।

'ঠিকই শুনছেন, সার,' বললেন সোয়ান। 'মেডিউসা-ফটোগ্রাফ আর মাসুদ রানার কথা আগে কিছুটা জানিয়েছি আপনাকে; তবে ওটার সঙ্গে ইজরায়েলিদের কানেকশনের ব্যাপারে বলা হয়নি আপনাকে কিছু। তার প্রয়োজন হবে বলে মনে করিনি। তবে এখন সব কথা জানানো দরকার।'

ভাগাভাগি করে এখন পর্যন্ত ঘটে যাওয়া সব ঘটনা খুলে বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর রবার্ট সোয়ান। বিশেষ করে দিনা আবানের ব্যাপারে খোঁজ নিতে গিয়ে কী-ধরনের চাপের মুখে পড়েছিলেন এফবিআই ডিরেক্টর, সেটা বলা হলো তাঁকে। শুনতে শুনতে চোয়াল ঝুলে পড়ল প্রেসিডেন্টের।

'বিশ্বাস না হলে স্টেট ডিপার্টমেন্টের ড্যানিয়েল প্রেসকটকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন আপনি,' কথার শেষে বললেন সোয়ান। 'উনিই বলবেন, ইজরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিমন বারস্টিনের ফোন পেয়েছিলেন কি না।'

'তার কোনও দরকার নেই,' থমথমে গলায় বললেন প্রেসিডেন্ট। শান্তশিষ্ট মানুষটি রেগে গেছেন, হাসিখুশি চেহারাটায় কাঠিন্য ভর করেছে। 'আমি আরও উপরের লেভেলে খোঁজ নিচ্ছি।' টেলিফোনের রিসিভার তুলে ইজরায়েলের কানেকশন চাইলেন তিনি।

তেল আবিবে এখন রাত দুটো বাজে, তারপরও আমেরিকান রাষ্ট্রপতির ফোন আসায় তড়িঘড়ি করে জাগানো হলো ওদের প্রধানমন্ত্রী লিওনিদ হালপেরিনকে।

'মি. প্রেসিডেন্ট!' ফোনে ভেসে এল হালপেরিনের কণ্ঠ। 'হোয়াট আ প্লেজ্যান্ট সারপ্রাইয!'

কুশল বিনিময়ের ফর্মালিটিতে গেলেন না প্রেসিডেন্ট, সরাসরি আক্রমণ করলেন। 'একটা প্রশ্ন করব আপনাকে, লিওনিদ; ঠিক ঠিক জবাব দেবেন। দিনা আবান নামটা কি আপনার পরিচিত?'

কয়েক মুহূর্তের জন্য চুপ হয়ে গেলেন হালপেরিন। তারপর নিচু গলায় বললেন, 'হ্যাঁ, পরিচিত। কী হয়েছে ওর?'

খেপে গেলেন প্রেসিডেন্ট। 'কী হয়েছে মানে? কী হতে চলেছে, সেটা জিজ্ঞেস করুন। ওকে হাতের কাছে পেলে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসাব আমি! জানেন, ও কী করেছে? স্ত্রী-সহ আমার একজন আণ্ডারসেক্রেটারিকে খুন করেছে, ওদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে! সত্যি করে বলুন, আপনি এ ব্যাপারে কী জানেন।'

বিছানা থেকে ঝট করে উঠে দাঁড়ালেন ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী, বিড়বিড় করে ভাগ্যকে দোষারোপ করলেন। তারপর বললেন, 'এক মিনিট, মি. প্রেসিডেন্ট। আমি আমার স্টাডিতে যাচ্ছি। ওখান থেকে ফোন করছি আপনাকে কয়েক মিনিট পর। প্লিজ, উত্তেজিত হবেন না। সবকিছু ব্যাখ্যা করব আমি, তবে তাতে আপনার জন্য নতুন কিছু সমস্যাই শুধু মাথা চাড়া দেবে।'

'সেটা আমাকে বুঝতে দিন।' ফোন নামিয়ে রাখলেন প্রেসিডেন্ট।

'কী বললেন উনি?' সাবধানে জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।

'দিনা আবানকে চেনে বলে স্বীকার করেছে। তবে একটা ব্যাপার... আমার ফোন পেয়ে যতটা অবাক হবার কথা, ততটা হয়নি। মনে হলো যেন জানত, আমি ফোন করব।'

ভুরু কুঁচকে গেল অ্যাডমিরালের। 'তা হলে ফোন রেখে দিলেন যে?'

'আবার কল করবে বলেছে, সব ব্যাখ্যা করবে। তবে তাতে নাকি আমরাই ঝামেলায় পড়ব!'

'মানে?'

'জানি না। দেখা যাক কী বলতে চায় ও।'

তিন মিনিটের মাথায় বেজে উঠল ফোন। রিসিভার তুলে প্রেসিডেন্ট বললেন, 'মিস্টার লিওনিদ, আমার সঙ্গে এখানে আমাদের এফবিআই ডিরেক্টর রবার্ট সোয়ান আর নুমা চিফ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন আছেন। আণ্ডারসেক্রেটারির কেসটাতে কাজ করছেন ওঁরা। আপনার কথা ওদেরও শোনানো দরকার, স্পিকারটা অন করলে অসুবিধে আছে?'

'জী না, মি. প্রেসিডেন্ট,' বললেন হালপেরিন। 'বরং ওঁরা ব্যাপারটা জানলে আরও ভাল হয়।'

'ঠিক আছে।' একটা সুইচ চাপলেন প্রেসিডেন্ট। 'এবার বলুন আপনার ওই মোসাদ এজেন্টের ব্যাপারে।'

'প্রথমেই আপনাদের ভুল ধারণা ভেঙে দিতে চাই,' স্পিকারে ভেসে এল হালপেরিনের কণ্ঠ। 'দিনা আবান মোসাদ এজেন্ট নয়। ও *শিন বেট*-এর সদস্য।' *শিন বেট* হচ্ছে আমেরিকান এফবিআই-এর ইজরায়েলি সংস্করণ, সেটা জানা আছে শ্রোতাদের। 'সেই সঙ্গে এটাও জানিয়ে দিতে চাই, ও এডওয়ার্ড ব্যাগলিকে খুন করেনি।'

'কীভাবে জানলেন আমরা এডওয়ার্ড ব্যাগলির কথা বলছি?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন প্রেসিডেন্ট। 'নামটা আমি একবারও উচ্চারণ করিনি।'

'আপনি অনুমতি দিলে আমি সেটা ব্যাখ্যা করব,' হালপেরিন বললেন। 'একটু ধৈর্য ধরতে অনুরোধ করছি, কারণ সব বলতে কিছুটা সময় লাগবে।

'আপনারা হয়তো জানেন, পার্লামেন্টে আমার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছে। ওটার ফলে সরকার ভেঙে দিয়ে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে নতুন করে সাধারণ নির্বাচন দিতে হবে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, আমাদের প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী ইয়োরাম বাবাক ওই নির্বাচনে জয়ী হবে, আগামী প্রধানমন্ত্রী হবে। ও একটা ফ্যাসিস্ট, শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করে আমাদের আরব প্রতিবেশীদের উপর হামলা চালাবার পক্ষপাতী। আরেকটা পাগলাটে ইচ্ছে আছে ওর মনে—জেরুসালেমে মুসলিমদের *ডোম অভ দ্য রক* ভেঙে দিয়ে সেখানে সলোমনের তৃতীয় মহামন্দির স্থাপন করবে। দু'মাস আগে পশ্চিম প্রাচীরের কাছে আত্মঘাতী বোমা হামলার পর থেকে ওর সমর্থন বেড়েই চলেছে। এমনকী আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মধ্যপন্থীরাও ধীরে ধীরে ওর দিকে ঝুঁকে পড়ছে...'

'রাজনৈতিক লেকচারে আমার আগ্রহ নেই, লিওনিদ,' বললেন প্রেসিডেন্ট।

'ওসবের জন্য আমাদের নিজস্ব সোর্স আছে। হ্যাঁ, আমাদের প্রেডিকশনও বলছে, রাবাক আপনাকে পাঁচ-তৃতীয়াংশ মার্জিনে হারিয়ে দেবে। ব্যাপারটা আমাদেরও কম অপছন্দ নয়। লোকটা একটা উন্মাদ।'

হালপেরিনের কণ্ঠ ভারী হয়ে উঠল। 'এখন যা বলব, তা শুনে আপনি খুশি হবেন না, তারপরও না বলে উপায় নেই।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। 'আপনাদের ন্যাশনাল রিকনিসান্স অফিসে মোসাদ একজন চর বসিয়েছে...'

'কী বললেন?' প্রেসিডেন্ট প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন।

'জী। চর। টপ লেভেলের একজন ফটো-অ্যানালিস্ট। নামটা বলব না, তাতে ওর জীবন বিপন্ন হয়ে পড়বে। তবে গত কয়েক বছর থেকে আপনাদের সমস্ত স্পাই-স্যাটেলাইটগুলোর জোগাড় করা তথ্য আমাদের কাছে পাচার করছে সে, এর মধ্যে নিউ-জেনারেশন মেডিউসা স্যাটেলাইটও আছে...'

মুখের ভাষা হারালেন প্রেসিডেন্ট। শত্রু হলে এক কথা, কিন্তু ইজরায়েলের মত মিত্র যদি আমেরিকায় চর বসায়, এখান থেকে তথ্য পাচার করে... সেটা কীভাবে মেনে নেয়া যায়? হাতের মুঠি শক্ত হয়ে গেল তাঁর, সত্যি বাড় বেড়েছে এদের, প্রশ্রয় পেয়ে মাথায় উঠে এখন কাঁঠাল ভেঙে খেতে শুরু করেছে। ঠিক করলেন, খুব শীঘ্রি একটা ব্যবস্থা নেবেন তিনি। আপাতত ইজরায়েলি প্রাইম মিনিস্টারের বক্তব্য শোনা যাক।

'কয়েক বছর আগে ওই ফটো অ্যানালিস্টকে রিক্রুট করে মোসাদ,' বলে চললেন হালপেরিন। 'অন্যান্য স্পাই স্যাটেলাইটের পাশাপাশি শুরু থেকেই প্রথম মেডিউসা স্যাটেলাইটের ছবিগুলোর উপর আগ্রহ ছিল আমাদের, সেগুলো হাতে পাবার জন্য কাজ করতে শুরু করে ও। কিন্তু সিকিউরিটি রেস্ট্রিকশনের কারণে সফল হয়নি সে—চুরি করা যাচ্ছিল না, যাচ্ছিল না কপি করাও। কী যেন একটা কপি-প্রোটেক্টেড সিস্টেমে যেন ডেভেলপ করা হয়েছিল ছবিগুলো। শেষ পর্যন্ত বিকল্প একটা কৌশল বের করে আমাদের এজেন্ট, নিজে আড়ালে থেকে এয়ারফোর্সের একজন অফিসারের মাধ্যমে ছবিগুলো এনআরও থেকে বের করে আনার চেষ্টা চালায়। প্ল্যানটা ঠিকমতই এগোচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ ওই অফিসার টের পেয়ে যায় ছবিগুলোর গুরুত্ব... আমাদের সঙ্গে বেঈমানী করে সেগুলো বিক্রি করে দেয় এডওয়ার্ড ব্যাগনির কাছে।

'ছবিগুলো হারিয়ে আমাদের এজেন্ট রিপোর্ট করে মোসাদে তার কর্তাদের কাছে। সেখান থেকে খবরটা চলে যায় ইয়েরাম রাবাকের কাছে। ছবিতে কী আছে, তা জানার পর রাবাক অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে ওঠে ব্যাপারটা নিয়ে।'

'জাস্ট আ মিনিট, মি. প্রাইম মিনিস্টার,' বাধা দিলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'হ্যামিলটন বলছি। একটা প্রশ্ন আছে আমার। প্রতিরক্ষা-মন্ত্রীর পক্ষে কীভাবে মোসাদের রিপোর্ট জানা সম্ভব হলো? ওটা তো তাঁর আওতায় নয়।'

'ঠিক বলেছেন, তবে ওখানে ওর অনেক অনুসারী আছে। ওরাই জানিয়েছে তাকে। যা-হোক, মেডিউসা ফটোগ্রাফের কথা বলছিলাম... আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, ওগুলোতে উত্তর ইরিত্রিয়া আর দক্ষিণ-পশ্চিম সুদানের একটা অংশ দেখা যাচ্ছে, যেখানে মাটির তলায় একটা কিম্বারলাইট পাইপ লুকিয়ে আছে। তবে

আমাদের ধারণা, শুধু ওই পাইপটাই নয়, আরও কিছু একটা ধরা পড়েছে স্যাটেলাইটটার চোখে, সেটা সম্পর্কে একটু পরে বলছি আপনাদের। আগে রাবাকের কথা শেষ করি—সবকিছু জানার পর ওই পাইপটার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে ওঠে সে।

'আমাদের মিলিটারি আর ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস-সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক নিয়ে অনেকদিন থেকেই একটা প্রাইভেট আর্মি গড়ছে রাবাক। এরা সব ওর আদর্শের অনুসারী, ইজরায়েলকে রাবাকের দর্শনে গড়বার জন্য জীবন পর্যন্ত দিতে রাজি... সোজা কথায় ফ্যানাটিক। ইরিত্রিয়ায় হীরার খবর জানার পর ওদের থেকে একজনকে পাইপটার খোঁজে পাঠায় সে—অস্ট্রিয়ান আর্কিয়োলজিস্টের ছদ্মবেশে। লোকটার নাম এরিক অ্যাভনার, তেল আবিব ইউনিভার্সিটির ভূ-তত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক ছিল সে। তবে কাজ শেষ করতে পারেনি বেচারা, তার আগেই দস্যুদের হাতে খুন হয়ে যায়।' একটু থামলেন হালপেরিন, কথা গুছিয়ে নিচ্ছেন।

'থামবেন না, লিওনিদ,' তাড়া দিলেন প্রেসিডেন্ট। 'সব খুলে বলুন আমাদেরকে।'

'বলছি,' আবার খেই ধরলেন ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী। 'অ্যাভনার ব্যর্থ হওয়ায় মরিয়া হয়ে ওঠে রাবাক। বুঝতে পারে, মেডিউসা ফটোগ্রাফগুলো ছাড়া সফল হবার উপায় নেই তার; সেই সঙ্গে দক্ষ, যোগ্য একজন লোকও দরকার ইরিত্রিয়ায় পাঠানোর জন্য। ওর প্রাইভেট আর্মিতে সুদানিজ দস্যুদের সঙ্গে লড়াই করে হীরা খোঁজার মত কেউ নেই। কাজেই ছবি, এবং লোক জোগাড়ের দায়িত্ব দিয়ে হাসাব হাইন নামে একজন ফিল্ড অপারেটিভকে ছোট একটা টিম নিয়ে আমেরিকাতে পাঠায় রাবাক। অত্যন্ত বিপজ্জনক লোক এই হাসাব, ফিলিস্তিনী ইহুদি সে; রাবাকের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে চরমপন্থী যায়োনিস্টে পরিণত হয়েছে। ওর উপর নির্দেশ ছিল, যে-কোনও মূল্যে মেডিউসা- পিকচার আর সার্চের জন্য লোক জোগাড় করতে হবে।'

'আর দিনা আবান?'

'ও আমার লোক,' বললেন হালপেরিন। 'আসলে হাসাবকে ঠেকানোর জন্য আমেরিকায় গেছে ও। ইরিত্রিয়ান নাগরিকত্ব আছে ওর, ওখানকার রিলিজিয়াস ফ্যানাটিসিজমের উপর নজর রাখবার জন্য সরকারি একটা পদেও কয়েক বছর আগে থেকেই প্ল্যান্ট করে রাখা হয়েছিল ওকে। এডওয়ার্ড ব্যাগলি ছবিগুলো কিনেছে জানতে পেরে ইরিত্রিয়ান এম্বাসির মাধ্যমে পাঠানো হয় দিনাকে, আণ্ডারসেক্রেটারির সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তোলে ও, তাকে কনভিন্স করে—পাইপ খুঁজে বের করবার কাজে সাহায্য করতে পারবে।'

'এর মধ্যে মাসুদ রানা আসছে কীভাবে?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।

'তাকে তো ভাড়া করা হয়েছে পাইপটা খোঁজার জন্য। আর কিছু না। কেন, আপনারা অন্য কিছু ভাবছিলেন?'

'ও এমনিতে যেতে রাজি হয়নি, মি. প্রাইম মিনিস্টার। খুব ঘনিষ্ঠ একজন মানুষকে জিম্মি করে ওকে ইরিত্রিয়ায় যেতে বাধ্য করা হয়েছে...' বলতে বলতে

থমকে গেলেন অ্যাডমিরাল। তাকালেন সোয়ানের দিকে। 'ওহ্ গড, আরব নয়, তা হলে ইজরায়েলিরাই কিডন্যাপ করেছে সোহেল আহমেদকে!'

'হ্যাঁ,' বুঝতে পেরে মাথা ঝাঁকালেন সোয়ান।

'কীসের কথা বলছেন আপনারা?' বিস্মিত কণ্ঠে জানতে চাইলেন হালপেরিন।

'মাসুদ রানার বন্ধুকে আপনার ওই হাসাব হাইন কিডন্যাপ করেছে, হীরার খোঁজে ইরিত্রিয়ায় যেতে বাধ্য করেছে,' তিক্ত গলায় বললেন প্রেসিডেন্ট, রহস্যটা ধরতে পেরেছেন তিনিও। 'একটা বিমান চার্টার করে বৈরুতে পালিয়ে গেছে ওরা, পালাবার সময় কিডন্যাপারদের একজন আত্মাহুতি দিয়েছে সঙ্গীদেরকে বাঁচাবার জন্য। এসব দেখে এফবিআই ভাবছিল এটা মুসলিম ফ্যানাটিক টেররিস্টদের কাণ্ড।'

'রানা সেটা বিশ্বাস করেনি, করেননি আমার বন্ধু বিসিআই চিফ রাহাত খানও,' হ্যামিলটন বললেন। 'ফ্যানাটিসিজম আর টেরোরিজমের জন্য সবাই খালি মুসলমানদেরকে দোষারোপ করে, কিন্তু ধর্মীয় সহিংসতা কেবল ওরাই করে না। অন্যান্য ধর্মেও প্রচুর ফ্যানাটিক আছে, নিষ্ঠুরতা ওরাও কম করে না, তবে ওদের কীর্তি আড়ালে থেকে যায়। বিশেষ করে ইহুদিদের তো লম্বা ইতিহাস আছে টেরোরিজমের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইজরায়েলেই ঘটেছে বহু ঘটনা।'

'বিশ্বাস করুন, কিডন্যাপিঙের ব্যাপারে দিনা আবান বা আমি... কেউ কিছু জানি না,' বললেন হালপেরিন। 'এ-ধরনের কাজ আমরা সমর্থনও করি না। যাকেই কিডন্যাপ করা হোক, উদ্ধারের জন্য সব ধরনের সহায়তা দিতে রাজি আছি আমি।'

'ব্যাগলিকে কে খুন করেছে?' জিজ্ঞেস করলেন প্রেসিডেন্ট। 'হাসাব?'

'আমার তা-ই ধারণা,' হালপেরিন বললেন। 'মাসুদ রানা ছবিগুলো নিয়ে ইরিত্রিয়ায় রওনা হয়ে যাবার পর ব্যাগলি ওর জন্য একটা ছেঁড়া সুতো হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। পাইপের খবরটা গোপন রাখতেই তাঁকে আর তাঁর স্ত্রীকে খুন করা হয়েছে বলে বিশ্বাস আমার। রানাকে যে ওরা নাচাচ্ছে, সেটা জানা ছিল না আমাদের। আমরা ভেবেছিলাম, ওর কাছ থেকে ছবিগুলো ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করবে হাসাব, সেজন্যে দিনাকে রাখা হয়েছে রানার সঙ্গে; যাতে গোলমাল দেখা দিলে হাসাবের আগে ও-ই ছবিগুলো কবজা করতে পারে।'

'দিনা আবান তা হলে ব্যাগলির বাড়িতে কী করছিল? ও বেরোবার পরেই তো ওখানে আগুন লাগল!'

'আগুনটা ও-ই লাগিয়েছে, মি. প্রেসিডেন্ট,' স্বীকার করলেন হালপেরিন। 'তবে সেটা শুধুই তদন্তটাকে পিছিয়ে দেয়ার জন্য। পুরো ঘটনাতে আমাদের ইনভলভমেন্ট আড়াল করতে চাইছিল ও। ইরিত্রিয়ায় যাবার পথে তেল আবিবে এসে ব্যক্তিগতভাবে সবকিছু আমার কাছে রিপোর্ট করে গেছে দিনা। ব্যাগলির কাছে বিদায় নিতে গিয়েছিল, কিন্তু গিয়ে দেখে লাশ পড়ে আছে ওখানে। বুদ্ধিমতী মেয়ে, প্রমাণ ধ্বংস করবার জন্য একমাত্র পথটাই বেছে নিয়েছে।'

'কাজটা ঠিক করেনি,' গরম গলায় বললেন প্রেসিডেন্ট। 'এনিওয়ে, হাসাব হাইন এখন কোথায়? ওকেই তো হাতে পাওয়া দরকার আমাদের।'

'দুঃসংবাদ, মি. প্রেসিডেন্ট। হাসাব মারা গেছে... আর ওটাই আরও বড় ঝামেলা দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে আমাদের সামনে। নতুন দুটো পক্ষ এসে পড়ছে দৃশ্যপটে, সব গোলমাল করে দিচ্ছে।'

'মানে? নতুন পক্ষ আবার কারা?'

'ইটালিয়ান ও সুদানিজ। এরা সবাই একটা বিশেষ লক্ষ্যের পিছনে ছুটছে...'

'হীরা?'

'না, মি. প্রেসিডেন্ট। ব্যাপারটা আরও অনেক, অনেক বড়। মন দিয়ে শুনুন, এখন আপনাকে ইতিহাসের পাতা থেকে একটা গল্প শোনাব আমি...'

টানা একটা ঘণ্টা ধরে সবকিছু ব্যাখ্যা করলেন লিওনিদ হালপেরিন। শুনতে শুনতে থ হয়ে গেলেন তিন শ্রোতা। অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য একটা কাহিনি শুনিয়েছেন ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু সেটা পুরোপুরি উড়িয়েও দেয়া যায় না। গত কিছুদিনে যা যা ঘটেছে, সেসবের বিচারে ব্যাপারটাকে সত্য বলেই ধরে নিতে হয়।

হালপেরিনের কথা শেষ হবার পর প্রশ্ন করলেন প্রেসিডেন্ট। 'কী মনে হয় আপনার, লিওনিদ? পরিত্যক্ত খনিটায় সত্যিই কি লুকানো আছে জিনিসটা?'

'আমি জানি না, মি. প্রেসিডেন্ট,' হালপেরিন বললেন। 'আমাদের ধর্মীয় ইতিহাসের সবচেয়ে মূল্যবান নিদর্শন ওটা, কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। ওর খোঁজে হাজার হাজার বছর ধরে সারা দুনিয়া চষে বেড়িয়েছি আমরা... পাইনি। এখন ওটা আছে কি নেই—সেটা সম্পূর্ণ ধর্মবিশ্বাসের প্রশ্ন। আমার ব্যক্তিগত মতামতে কিছু যায়-আসে না, গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো—ইয়োরাম রাবাক বিশ্বাস করছে, ওটা আছে। আর এ-জন্য প্রয়োজনে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে ও। শেষ পর্যন্ত যদি জিনিসটা পায়, তা হলে ওটার সাহায্যে দুনিয়ার সমস্ত ইহুদিকে একাট্টা করবে, নিজের আদর্শকে বাস্তবায়ন করবে অনুসারীদের সাহায্যে। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি বলতে আর কিছু থাকবে না তখন।'

'হুম, ঠিক আছে। পরে আপনার সঙ্গে কথা বলব আবার।' থমথমে চেহারা নিয়ে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন তিনি।

অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের চেহারা থেকে রক্ত সরে গেছে ততক্ষণে। সোয়ানের দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে বললেন, 'রানাকে... রানাকে সাবধান করে দিতে হবে! ওর সামনে মস্ত বিপদ! তিন হাজার বছরের পুরনো একটা লড়াইয়ের মাঝখানে বসে আছে ও!'

'শান্ত হোন, অ্যাডমিরাল,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'মাসুদ রানা সম্পর্কে যতটুকু শুনেছি আমি, তাতে তো খুব শক্ত লোক বলে মনে হয়েছে ওকে।'

'ত্রিমুখী লড়াইয়ের মাঝখানে কীভাবে শক্ত থাকবে রানা, একা?' তিক্ত কণ্ঠে বললেন সোয়ান। 'সবদিক থেকে আক্রমণ আসবে ওর উপর, সবাই ওর শত্রু। এর ভিতর কীভাবে নিজেকে বাঁচাবে ও?'

'একমাত্র ঈশ্বরই ওর ভরসা,' উপরদিকে তাকিয়ে বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। উত্তেজনায় নিজের অজান্তেই চেয়ারের হাতল শক্ত করে খামচে ধরেছেন তিনি, আঙুলগুলো সাদা হয়ে গেছে রক্ত সরে গিয়ে।

***


মাসুদ রানা
চাই ঐশ্বর্য
দ্বিতীয় খণ্ড
কাজী আনোয়ার হোসেন

চাই ঐশ্বর্য-২

প্রথম প্রকাশ: ২০১০

এক

ড্যাজি অভ ডেড চিলড্রেন, উত্তর ইরিত্রিয়া।

ফোনের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে কয়েকবার তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল মাসুদ রানা, চেতনা ফিরলেই আবার ধড়মড় করে সোজা হলো। চোখদুটো টকটকে লাল হয়ে গেছে ওর, প্রাচীন বাড়িটার ভিতরে উড়তে থাকা ধুলোর কারণে চোখ কটকট করছে। এগারোটা বাজতেই উঠে পড়ল ও, বুঝতে পারছে—এখন যদি ঘুমিয়ে পড়ে, তা হলে সকালের আগে আর জাগতে পারবে না। স্যাট-ফোনটা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ও। রাত নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে, চিরাচরিত নিয়মে মরুভূমির তাপমাত্রা ঝপ্ করে নেমে গেছে, গা কেঁপে উঠল শীতে। আকাশে কোমল দ্যুতি ছড়াচ্ছে চাঁদ, তার সঙ্গী হয়েছে লক্ষ-কোটি তারা। আজ তেমন মেঘ নেই, তারার দল নির্বিঘ্নে মুখ দেখাতে পারছে। ঝিকমিক করছে সারা আকাশ জুড়ে, যেন এক মস্ত চাঁদোয়ার ওপর লাগানো বাতি—উৎসবে যাদের কাজ হলো ঝলমল করা। চারদিক শুনশান, নিজের পায়ের শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনতে পাচ্ছে না রানা।

নির্দিষ্ট সময়ের দশ মিনিট আগে ফোনটা অন করল ও, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেজে উঠল ওটা। তর সইছে না বোধহয় অপরপক্ষের, আগেই কল করেছে। *রিসিভ* বাটন চেপে সেটটা কানে ঠেকাল রানা। 'ইয়েস?'

'মি. রানা? আবার আপনার কণ্ঠ শুনতে পেয়ে খুব ভাল লাগছে।'

গলাটা চিনতে পারল রানা, আসমারায় এই লোকটাই ফোন করেছিল ওর কাছে। ও বলল, 'আমার মোটেও ভাল লাগছে না।'

হাসল লোকটা। 'অনেকক্ষণ থেকেই চেষ্টা করছি লাইন পাবার, কিন্তু আপনার ফোনটা বোধহয় বন্ধ ছিল। বেশ কয়েকটা ব্যাপার নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা হওয়া দরকার। আমাদের শেষ কথাবার্তার পর অনেককিছু ঘটে গেছে...'

'হ্যাঁ, জানি,' বিরক্ত সুরে বলল রানা, সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে ওর। খোঁচা দেয়ার লোভটা সামলাতে পারল না। 'আমার আন্ডারওয়্যার চুরি করতে আসা কয়েকজন অ্যামেচারের হাতে প্যাঁদানি খেয়েছ তোমরা। এদেরকে সাধারণত হোটেলের মেইডরা ঝাড়ুর বাড়ি দিয়েই তাড়াতে পারে, কিন্তু হিরোগিরি দেখাতে গিয়ে ধরা খেয়েছ তোমরা। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, অসহায় এক-হাতঅলা পঙ্গু মানুষকে কিডন্যাপ করা পর্যন্তই তোমাদের দৌড়। আরও প্র্যাকটিস দরকার তোমাদের। এক কাজ করো, বাচ্চার হাত থেকে ললিপপ ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে দেখতে পারো। তোমাদের জন্য যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং কাজ হবে ওটা।'

'রসিকতা করছেন?' থমথমে গলায় বলল ওপাশের লোকটা। 'দেখা যাক, এটা শোনার পর রস থাকে কি না আপনার।'

পরমুহূর্তেই একটা যন্ত্রণাকাতর চিৎকার ভেসে এল ফোনে, সেইসঙ্গে শাপ-শাপান্ত। *'শালা রানা, জলদি কিছু কর! এরা আমাকে মেরে ফেলছে! বুডলস্ ছাড়া আর কিছু খেতেও দিচ্ছে না হারামজাদারা! আর সহ্য করতে পারছি না!'*

আবছাভাবে শোনা যাচ্ছে কথাটা, সম্ভবত টেপ রেকর্ডারে বাজছে। তারপরও বিসিআই-এর চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেল আহমেদের গলা চিনতে অসুবিধে হলো না রানার। চোয়াল শক্ত হয়ে গেল ওর।

'দু'সপ্তাহের সময় দেয়া হচ্ছে আপনাকে, মি. রানা,' কঠিন গলায় বলল লোকটা। 'এর মধ্যে খনিটা খুঁজে বের করা চাই।'

'দু'সপ্তাহ মানে?' বিস্মিত গলায় বলল রানা। 'আমার হাতে আরও চার সপ্তাহ থাকার কথা।'

'নট এনিমোর। সময়টা কমিয়ে দিচ্ছি আমি। দু'সপ্তাহের ভিতর যদি খনির খোঁজ দিতে না পারেন, সোহেলকে খুন করব আমরা।'

'সেটা অসম্ভব! আমি এখনও কাজে লাগার মত কিছুই বের করতে পারিনি,' মিথ্যে বলল রানা। আড়চোখে তাকাল চাঁদের আলোয় ভৌতিক অবয়ব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা হেড-গিয়ারটার দিকে। দু'সপ্তাহে এদিকটা সামলে সোহেলকে উদ্ধার করা খুবই কঠিন হয়ে পড়বে।

'ওটা আপনার আর সোহেল আহমেদের সমস্যা, আমার নয়,' কঠিন গলায় জানাল লোকটা।

'আমি একটা সূত্র পেয়েছি,' বলল রানা, প্রতিপক্ষকে আগ্রহী করতে চাইছে। 'খুব ভাল একটা সূত্র। তবে সেটা পরখ করবার জন্য সময় দরকার। বুঝতে পারছ না কেন, বিশাল একটা এলাকায় অনুসন্ধান চালাতে হচ্ছে আমাকে। এতদিন তো যুক্তি মেনেছ, আজ মানছ না কেন? অন্তত বাড়তি একটা সপ্তাহ দাও আমাকে। কথা দিচ্ছি, তিন সপ্তাহের ভিতর খনির লোকেশন খুঁজে বের করব আমি।'

'দুঃখিত, আপনি দু'সপ্তাহই পাচ্ছেন,' কাটা কাটা স্বরে জানাল প্রতিপক্ষ। 'এখন আরেকটা ব্যাপার... হোটেলের ঘটনাটা তো শুনেছেন আপনি—বড় একটা সমস্যা ওটা।'

'তোমার লোককে আমি খুন করিনি।'

'সেটা আমি জানি, মি. রানা। হোটেল-রুমে কাফ্রি বদমাশদুটোকে খুন করেছি আমি... আপনি পুরো ঘটনা শোনেননি বোধহয়। সমস্যাটা অন্যখানে। বুঝতেই পারছেন, আপনার অভিযানের ব্যাপারে আরেকটা পক্ষ উৎসাহী হয়ে উঠেছে। আপনাকে প্রোটেকশন দেয়া দরকার আমার। এ-মুহূর্তে কোথায় আছেন আপনি?'

'হঠাৎ আমার ভালমন্দ নিয়ে তুমি উতলা হয়ে পড়লে কেন?' বাঁকা সুরে জানতে চাইল রানা। 'ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না আমার।'

'কথা ঘোরাবেন না,' ধমকে উঠল লোকটা। 'আপনাকে নিয়ে অবশ্যই মাথা ঘামাতে হবে আমাকে। এ-মুহূর্তে আপনি আমাদের হয়ে কাজ করছেন, কাজেই মিশনটা সফল হবার জন্য আপনার জ্যান্ত থাকা দরকার। বলুন আপনার লোকেশন কোথায়?'

'না, বলব না,' কড়া গলায় জানাল রানা। 'তোমরা খনিটা চাও, আর আমি চাই সোহেলকে। আমাদের মধ্যে চুক্তিটা ওই পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাক। কাজের সময় তোমাদের নোংরা চেহারা দেখতে চাই না আমি।'

'সুদানিজদের ব্যাপারে কী করবেন?'

'ওরা আমার মাথাব্যথা, তোমার মায়াকান্না না কাঁদলেও চলবে।'

'তা হলে বলবেন না?' রেগে গেল লোকটা। 'ঠিক আছে, তা হলে আগামীবার যখন ফোন করব, তখন সোহেল আহমেদের একটা পা কেটে নেবার আওয়াজ শুনবেন।' লাইন কেটে দিল সে।

'শিট!' আপনমনে গাল ঝাড়ল রানা, দর কষাকষিটা বেশি হয়ে গেছে। আরও কৌশলে কথা বলা উচিত ছিল, রাগের কারণে পারেনি। তাড়াতাড়ি আবেল আফরাকিকে দেয়া স্যাট-ফোনের নাম্বারে ডায়াল করল ও। ওটাতেও চার্জ নেই, আবেল এখন অফ করে রাখলেই বিপদ! অবশ্য আজ রাতে ওটা অন রাখতে বলে দিয়েছিল রানা, কিডন্যাপারদের সঙ্গে কী কথা হয়েছে, সেটা জানাবার জন্য। আবেল সেটা মনে রেখেছে কি না, কে জানে!

কপাল ভাল, রিং শুনতে পেল ও। পরমুহূর্তেই একটা ঘুমজড়িত গলা। 'হ্যালো?'

'আবেল, রানা বলছি,' হড়বড় করে বলল রানা। 'কিডন্যাপারদের খেপিয়ে দিয়েছি আমি। হুমকি দিচ্ছে ওরা এখন, আমি সেটা বিশ্বাসও করছি। বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে, এক্সকাভেটরটা খুব শীঘ্রি প্রয়োজন হবে আমার। কাল সকালে আলো ফুটলেই রওনা দিতে পারবে?'

'পারব,' এক শব্দে জবাব দিল আবেল। তারপর ব্যাখ্যা করল, 'ওটার মালিক এখানে অবশ্য রাস্তা মেরামতের কাজ নিয়েছে, তবে ওকে আমি বলে দিয়েছি—দরকারের সময় মুহূর্তের নোটিশে রওনা হতে হবে।'

'বাড়তি ইনকামের ধান্দায় লেগেছে, না? কাল রওনা দেবে তো?'

'দেবে, দেবে। ওর আসলে কোনও দোষ নেই। নাক্ফার রাস্তাঘাটের খুব করুণ দশা, এক্সকাভেটরও হাতের কাছে পাওয়া যায় না। টাউন কাউন্সিল মোটা টাকা সাধায় তাই আর মানা করতে পারেনি।'

'তাই বলে যন্ত্রটা যেন ভেঙেচুরে নিয়ে না আসে!'

'ওসব নিয়ে ভাববেন না, আমি আছি তো! আর হ্যাঁ, আপনার পিজ নেয়া অন্যান্য ইকুইপমেন্টও এসে পড়েছে এখানে। এক্সকাভেটরের সঙ্গে কিছু নিয়ে আসব?'

'হ্যাঁ, জেনারেটর আর পোর্টেবল ফ্লাডলাইট।' স্যাট-ফোনের কমিউনিকেশন নিরাপদ নয়, সহজেই আড়ি পাতা যায়। তাই ঝুঁকি এড়িয়ে ড্যাৰ্লি অভ ডেড চিলড্রেনের দশ মাইল দূরের একটা কো-অর্ডিনেট দিল রানা, এক্সকাভেটর

নিয়ে পৌঁছাবার জন্য। ওখান থেকে পাশা ওদেরকে গাইড করে নিয়ে আসতে পারবে। 'কখন পৌঁছুবে তোমরা?' জানতে চাইল ও।

'কমপক্ষে একদিনের রাস্তা,' বলল আবেল। 'রাস্তাঘাট খুব খারাপ, আদোবা নদীতেও ঢল নেমেছে কি না কে জানে। পরশু দুপুরে পাশাকে পাঠালে সবচেয়ে ভাল হয়।'

'ঠিক আছে, তা-ই হবে।' যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল রানা। স্যাট-ফোনটা অফ্ করে ঢুকিয়ে রাখল পকেটে।

সোহেলের কথাটা কানে বাজছে ওর। *বুডলস্* শব্দটা বলেছে চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। ওটা একটা জিন জাতীয় মদ। ওর কিডন্যাপাররা যদি মুসলিম টেরোরিস্ট হয়ে থাকে, তা হলে তার সঙ্গে বুডলস্-এর কী সম্পর্ক? মদ তো চরমপন্থী মুসলমান ফ্যানাটিকদের জন্য অস্পৃশ্য একটা বস্তু! ও কি কিছু বলতে চাইছে ওকে? কোনও সঙ্কেত দিচ্ছে? অনেক ভেবেও কোনও কূল-কিনারা পেল না কথাটার। ক্লান্ত হয়ে ক্যাম্পে ফিরে গেল ও, ঘুমিয়ে গেল মুহূর্তে।

ভোরের আলো ফুটতেই পাশাকে জাগিয়ে তুলল রানা। একটানা একটা ঘুম দিতে পারায় শরীরটা ঝরঝরে লাগছে। তবে সূর্য চড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসছে মরুভূমির তীব্র গরম, দিনটা খুব কষ্টে কাটবে।

নাশতা খেতে খেতে পাশার সঙ্গে আলোচনা করে নিল রানা। ঠিক হলো, কাল সকাল পর্যন্ত উপত্যকাতেই থাকবে পাশা, রানাকে সাহায্য করবে। তারপর চলে যাবে রঁদেভু পয়েন্টে, আবেলের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য।

ব্রেকফাস্ট শেষ করে খনির হেড-গিয়ারটা দেখতে গেল রানা, পাশা ব্যস্ত হয়ে পড়ল সঙ্গে আনা সমস্ত দড়িদড়া গাড়ি থেকে নামাতে। ঘুরে ঘুরে ইস্পাতের ফ্রেমওয়ার্কটা পরীক্ষা করল রানা, উপরিভাগে মরচে পড়ে গেলেও ভিতরটা শক্ত আছে বলে মনে হলো—ওর ভার নিতে পারবে। ল্যাণ্ড-ক্রুজারে মাত্র তিনটে পঞ্চাশ-ফুটি দড়ির রোল আছে, তাতে খনির তলায় পৌঁছানো সম্ভব নয়, তবে গাড়ির টো-কেইবলের সঙ্গে দড়িগুলো বেঁধে নিলে সমস্যাটা কাটিয়ে ওঠা যাবে।

হেড-গিয়ারের সঙ্গে কয়েকটা পুলি লাগিয়ে একটা সিস্টেম খাড়া করল রানা, দড়িগুলো ভিজিয়ে নিল গাড়ির ফুয়েলে—এতে লোহার সঙ্গে ক্রমাগত ঘষা খাবার পরও সহজে ছিঁড়বে না ওগুলো। একটা হারনেসও বানিয়ে নিয়েছে ও; পাশাকে ডেকে ওটা কীভাবে ওঠাতে-নামাতে হবে, সেটা শিখিয়ে দিল। সেইসঙ্গে ঠিক করে নিল যোগাযোগের কোড—দড়িতে ঝাঁকি দিয়ে সঙ্কেত বিনিময় করবে ওরা।

'মনে রেখো, পাশা,' বলল রানা। 'তলায় আছড়ে পড়ার হাত থেকে একমাত্র তুমিই ঠেকিয়ে রাখবে আমাকে। কাজেই সাবধান থেকো।'

'কিচ্ছু ভাববেন না, *এফেন্দি!*' ধবধবে সাদা দাঁত বের করে আশ্বাসের হাসি হাসল পাশা।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে খনির কালচে গহ্বরের দিকে তাকাল রানা—দেখলেই ভয় করে। পাশার মত অল্পবয়েসী একটা ছেলের হাতে জীবন সঁপে দিয়ে ওখানে

নামার কথা কেবল বেপরোয়া মানুষই ভাবতে পারে। কিন্তু এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। স্বস্তির ব্যাপার একটাই—ছেলেটা বুদ্ধিমান, এখন পর্যন্ত যোগ্য সহকারীর মতই আচরণ করে এসেছে। কথা হলো, শেষ পর্যন্ত পারবে কি না।

হারনেসে শরীর আটকে গহ্বরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। লম্বা করে শ্বাস নিল কয়েকবার। সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'রেডি?'

পাশা মাথা ঝাঁকাল। আলতোভাবে ঝুলে পড়ল রানা একশো ষাট ফুট গভীর শাফটটার উপর। শরীরের ভর চলে গেছে দড়িতে, আস্তে আস্তে দুলতে থাকল ও। পাশে তাকাতেই এক মুহূর্তের জন্য পাশাকে যুঝতে দেখল, মুঠিতে দড়িটা আটকে রাখতে পারছে না। সরসর করে কয়েক ইঞ্চি নেমে গেল রানার দেহ। তারপর থামল।

'সব ঠিক তো?' পাশার দিকে তাকিয়ে নার্ভাস গলায় জানতে চাইল রানা। মনে হচ্ছিল নীচে পড়ে যাবে।

'হ্যাঁ, *এফেন্দি!*' হাসল পাশা। 'হঠাৎ করে ওজনটা দড়িতে এসে পড়েছে তো, সামলাতে পারিনি। এখন আর অসুবিধে হবে না।'

পুলি সিস্টেমটা এমনভাবে বসানো হয়েছে যাতে রানার শরীরের মাত্র পঞ্চাশ পাউণ্ড ওজন পাশার হাতে থাকে। অসুবিধে হবার কথা নয় ওর। তারপরও অবশ্য বাড়তি নিরাপত্তা হিসেবে দড়ির শেষ প্রান্তটা বাঁধা আছে ল্যাণ্ড-ক্রুজারের উইঞ্চের সঙ্গে। উঠবার সময় পাশাকে আর কষ্ট করতে হবে না, মোটরের সাহায্যে টেনে তুলে ফেলতে পারবে।

'ঠিক আছে, নামাতে শুরু করো,' বলল রানা।

ঢিল পড়তে শুরু করল দড়িতে, অন্ধকার শাফটে প্রবেশ করল রানা। আলাদা এক জগৎ যেন ওটা। শাফটের মুখ দিয়ে আসা আলো খুব দ্রুত মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে। ছয়-ব্যাটারির একটা ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল রানা, মাথায় পরা মাইনিং হেলমেটটা ঠিকঠাকমত বসিয়ে নিল। শাফটের দেয়াল থেকে গুঁড়ো গুঁড়ো মাটি খসে পড়তে শুরু করেছে, হেলমেটে ঠোকর খেয়ে নেমে যাচ্ছে পাতালের দিকে।

'আস্তে!' চেঁচাল রানা। দড়িতে ঝাঁকি দিয়ে সঙ্কেত পাঠাল।

সঙ্গে সঙ্গে ধীর হয়ে গেল নামার গতি। হারনেসটা মাংস কেটে বসে যেতে চাইছে, দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথাটা সহ্য করল রানা। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় দেয়ালটা দেখল ও, তারপর রশ্মিটা তাক করল নীচের দিকে। তবে বিশেষ লাভ হলো না। কিছুদূর যেতেই আলোটাকে গিলে খাচ্ছে নিকষ অন্ধকার। শাফটের দেয়ালে স্টিলের তৈরি গাইড রেইল খুঁজল রানা—হেড-গিয়ারের সাহায্যে উঠতে-নামতে থাকা স্কিপ আর কেইজকে স্থির রাখে ওগুলো; কিন্তু পেল না। কখনও ছিল বলেও মনে হলো না, বোল্ট বসাবার গর্ত নেই একটাও। একটু অবাক হলো ও, খনিটাতে খুব বেশিদিন কাজ হয়নি বলে মনে হচ্ছে।

সারফেসে পাথর ভাঙার কল, বা সেপারেশন ফ্যাসিলিটি দেখতে পায়নি ওরা। ঠিকমত হয়েস্ট সিস্টেমও বসানো হয়নি শাফটে... শর্ট-টাইম মাইনিঙের লক্ষণ। বিসদৃশ ব্যাপার হলো শাফটের গভীরতা—একশো ষাট ফুট খুঁড়তে

পুরনো আমলে কমপক্ষে এক বছর ব্যয় হতো, সেটা তো কম সময় নয়। তা হলে এখানে কিছু নেই কেন?

আশি ফুট নামার পর প্রথম ড্রিফটটার সন্ধান পেল রানা। ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল একটা ওয়ার্কিং প্যাসেজওয়ে ওটা—মেইন শাফট থেকে মূল আকরিকের কাছে পৌঁছুনোর পথ। ওখান থেকে সারফেসে শাফটের মুখটাকে ছোট্ট একটা ফোকরের মত দেখাচ্ছে। মাইনিঙের সঠিক নিয়ম পালন করা হয়েছে খনিটাতে, সরাসরি পাইপটাকে না খুঁড়ে আলাদা একটা শাফট খোঁড়া হয়েছে পাশে, তারপর শাফট থেকে টানেলের মাধ্যমে পৌঁছুবার ব্যবস্থা করা হয়েছে কিম্বারলাইটের কাছে। একটু দোল খেয়ে টানেলের ভিতর ঢুকে পড়ল রানা, দড়িতে ঝাঁকি দিয়ে থামার সঙ্কেত পাঠাল পাশার কাছে। হারনেসটা খুলে ফেলল ও, আটকে রাখল মাথার উপরের একটা সাপোর্ট বিমের সঙ্গে, যাতে ওটা দোল খেয়ে শাফটের মাঝখানে চলে না যায়।

ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় আঁধার কেটে গেল। বারো ফুট চওড়া, ছ'ফুট উঁচু, দীর্ঘ একটা সুড়ঙ্গ ভেসে উঠল রানার চোখের সামনে। ছাদের উপর আলো ফেলল রানা, কিন্তু কোনও বাদুড় দেখতে পেল না। পরিত্যক্ত খনিতে বাদুড়ের বিষ্ঠার গন্ধ পাওয়া যায়, এখানে তা নেই। খুব একটা অবাক হলো না ও, বুঝতে পারছে—পুরো উপত্যকার মত খনিটাও মৃত, জীবনের কোনও স্থান নেই এখানে। উপলব্ধিটা আসতেই শিরদাঁড়া বেয়ে উঠে এল একটা শীতল স্রোত, নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল ও।

টানেল ধরে এগোতে শুরু করল রানা। পঞ্চাশ গজ যাবার পর প্রথম শাখাটা পাওয়া গেল—ডানদিকে গেছে ওটা, উচ্চতায় মূল টানেলেরই সমান, তবে চওড়ায় অর্ধেক। ওখানে ঢুকবে কি না, তা নিয়ে একটু দ্বিধায় ভুগল ও, পরে সিদ্ধান্ত নিল—মূল সুড়ঙ্গে থাকাই ভাল হবে। দ্বিতীয় আর তৃতীয় শাখা-সুড়ঙ্গ পাওয়া গেল আর কিছুদূর যেতেই—বাম আর ডানদিকে গেছে ক্রমান্বয়ে। হাঁটতে হাঁটতে টানেলের ছাদ, মেঝে আর দেয়ালে আলো ফেলে চলেছে রানা, একটা ব্যাপার অবাক করছে ওকে—টানেলের স্ট্যাবিলিটি বাড়াবার জন্য তেমন কোনও ব্যবস্থাই নেয়া হয়নি ভিতরে। অবশ্য টানেলটা রায়োলাইটের মাঝখানে গড়া হয়েছে—সাধারণ মাটি-পাথরের চাইতে এর ধসে পড়বার সম্ভাবনা কম, তারপরও এমন অসতর্কতার মানে হয় না। মনটা খুঁতখুঁত করছে ওর। খনিটাতে কী যেন একটা গড়বড় আছে, কিন্তু ধরতে পারছে না।

দুইশ' গজ যাবার পর একটা উইনয্ আবিষ্কার করল রানা—বড় একটা ফোকর ওটা, উপরের লেভেল থেকে নীচের লেভেলে সরাসরি সংযোগ ঘটিয়েছে। এক লেভেল থেকে আরেক লেভেলে মাইনিং করা মিনারেল সহজে ওঠানো-নামানোর জন্য এ-ধরনের সংকীর্ণ, খাড়া টানেল তৈরি করা হয়। উইনয্-টার পাশে কাঠের তৈরি নিরাপত্তামূলক রেলিং আছে—ঘুণে ধরা এবং ভাঙা। টানেলের গা বেয়ে নেমে যাওয়া মইটা দেখে মনে হচ্ছে না সেটা মানুষের ওজন সইতে পারবে।

আরও এগোল রানা, মোট আটটা সাইড টানেল আর তিনটে উইনয্

পেরিয়ে, দেড় হাজার গজ ভিতরে ওয়ার্কিং ফেসের দেখা পেল। বিস্মিত হয়ে গেল ও—প্রচুর কাজ করা হয়েছে এই খনিতে। এই একটা টানেলের গভীরতাই যদি এত হয়, তা হলে উইনযের মাধ্যমে সংযুক্ত অন্যান্য লেভেলগুলোর টানেল আর সাইড-টানেলের না জানি কী অবস্থা! অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, আট-দশ মাইলের কম খোঁড়াখুঁড়ি করা হয়নি এখানে—অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার!

পনেরো মিনিট ধরে ওয়ার্কিং ফেসের পাথর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল রানা। শেষবারের বিস্ফোরণে আলগা হওয়া মাটি-পাথর স্তূপ হয়ে আছে মেঝেতে, দেখে মনে হচ্ছে, তাড়াহুড়ো করে চলে গিয়েছিল শ্রমিকরা; নইলে অপরিশোধিত আকরিক ফেলে যেত না। সময় নিয়ে মেঝের স্তূপও পরীক্ষা করল ও, কিন্তু নীলচে কিম্বারলাইটের কোনও চিহ্ন দেখতে পেল না। রানা অনুমান করল, অন্তত একটা বছর অপচয় করা হয়েছে এই খনিতে—কোনও ফলাফল ছাড়া!

মেইন শাফটে ফিরে গেল ও, হারনেসে শরীর আটকে ঝুলে পড়ল শূন্যে। দড়িতে ঝাঁকি দিয়ে পাশাকে ইশারা করল ওকে আরও নীচে নামাতে। নামার পথে আরও তিনটে ড্রিফট পেল, তবে থামল না; দরকার হলে উঠে আসার সময় ওগুলো দেখা যাবে। আগে শাফটের তলাটা পরীক্ষা করা দরকার। ধীরে ধীরে অন্ধকার পাতালে নেমে চলল ও, নৈঃশব্দ্য আর অন্ধকারের মাঝে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ছোট্ট একটা বুদবুদের মত ঘিরে রেখেছে ওকে। পরিবেশটা ভয়-জাগানো।

শাফটের তলার কাছাকাছি পৌঁছুতেই ধাতব মেশিনারির স্তূপ আর জট-পাকানো কয়েকশো ফুট দীর্ঘ স্টিলের কেইবল দেখতে পেল রানা। খনি ছেড়ে চলে যাবার সময় ইটালিয়ান মালিকরা সবকিছু শাফটের ভিতর ফেলে দিয়ে গেছে, আগ্রাসী ব্রিটিশ বাহিনীর হাতে পড়তে দিতে চায়নি। হয়েস্ট কেইবলের একটা স্তূপের উপর পা রেখে নামল রানা—ইরিত্রিয়ার মৌসুমি বৃষ্টির পানিতে জং-ধরে জট পাকিয়ে গেছে ওগুলো, দেখাচ্ছে ইস্পাতের তৈরি বিমূর্ত ভাস্কর্যের মত। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় ওটার তলায় একটা মানুষ বহনের খাঁচা চোখে পড়ল, আরও তলায় রয়েছে আকরিক বহনের স্কিপ। আলোটা নেড়ে-চেড়ে বুঝল রানা, ইকুইপমেন্টগুলো শাফটের একেবারে তলায় পৌঁছেনি, উল্টেপাল্টে পড়তে গিয়ে মেঝে থেকে দশ-পনেরো ফুট উপরে আটকে গেছে। শাফটের দেয়াল আর আটকে থাকা যন্ত্রপাতির মাঝখান দিয়ে আলো ফেলে মেঝেটা দেখবার চেষ্টা করল ও, হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠল হৃৎপিণ্ডটা—লোহা-লক্কড়ের মাঝে তালগোল পাকিয়ে থাকা একটা লাশ চোখে পড়েছে!

দৃশ্যটা চমকে দিয়েছে ওকে। হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিক হতেই আবার ঝুঁকল নীচের দিকে, আলো ফেলল; পায়ের নীচে কাঁচকোঁচ করে উঠল লোহার তার। গতকাল আবিষ্কার করা লাশটার মতই অবস্থা এই লাশটার—মমির মত শুকিয়ে গেছে, পরনেও একই রকম ইউনিফর্ম। রানা আন্দাজ করল, অতি-উৎসাহী হয়ে খনিটা দেখতে এসেছিল সৈনিক, শাফটের মুখ থেকে পা হড়কে পড়ে গেছে

নীচে, লোহা-লক্কড়ের মাঝে আছড়ে পড়ে মারা গেছে।

দড়িতে ঝাঁকি দিয়ে পাশাকে স্থির থাকবার সঙ্কেত দিল ও, তারপর খুলে ফেলল হারনেসটা। উবু হয়ে আলো ফেলল জঞ্জালের উপর—দেয়াল থেকে একটা ফোকরের মত চোখে পড়ছে, চেষ্টা করলে ওটা গলে নেমে যেতে পারবে শাফটের তলায়, একদম নীচের ড্রিফটটার মুখে। ওটা দেখা দরকার। তবে কাজটা বিপজ্জনক, আটকে থাকা লোহা-লক্কড় খসে পড়ে বন্দি করে ফেলতে পারে ওকে। পাশাকে সঙ্কেত দেয়া যাবে না সেক্ষেত্রে; দেয়া গেলেও লাভ নেই, একার পক্ষে রানাকে উদ্ধার করা ওর জন্য অসম্ভব।

কিন্তু ঝুঁকিটা না নিয়েও উপায় নেই। মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করল ও। ফোকরটা ভাল করে দেখে ফ্ল্যাশলাইটটা কামড়ে ধরল, তারপর ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে নামতে শুরু করল। সতর্ক ভঙ্গিতে লোহার জঞ্জালের মাঝ দিয়ে এগোল ও, বুঝে-শুনে হাত-পা রাখছে বেরিয়ে থাকা টুকরোগুলোর উপর। এতকিছুর পরও হাতের তালু আর পিঠ কেটে গেল ধারালো কোনাগুলোয় লেগে, জামা-কাপড় ছিঁড়ে গেল কয়েক জায়গায়।

শারীরিক যন্ত্রণা মুখ বুজে সহ্য করল রানা। যন্ত্রের মত নেমে চলল। জঞ্জালের ভিতর দিয়ে আট ফুট যেতেই স্টিলের খাঁচাটার তলায় পৌঁছে গেল ও। নীচে তাকাতে চোখে পড়ল, শেষ ড্রিফটটার মুখ ওর থেকে কয়েক ফুট দূরে। পিঠে একটা লোহার রড চাপ দিয়ে রেখেছে, ঝটকা দিয়ে সেটার বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করল ও, দপদপে একটা ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল শরীরের পিছনদিকে, চামড়া ছিলে গেছে। পরমুহূর্তেই ঝপাস করে জঞ্জালের ফাঁক গলে শাফটের তলায় আছড়ে পড়ল ও, পতনের ধাক্কায় বুক থেকে বেরিয়ে গেল সমস্ত বাতাস।

আঘাতটা সামলে ওঠার আগেই উপর থেকে ইস্পাতের ঘর্ষণের তীক্ষ্ণ আওয়াজ ভেসে এল—সমস্ত লোহা-লক্কড় নেমে আসতে শুরু করেছে ওর গায়ের উপর। হামা দেয়ার ভঙ্গিতে কোনোমতে উঁচু হলো রানা, তারপরই লাফ দিয়ে ঢুকে পড়ল ড্রিফটের খোলা মুখের ভিতর। পিছনে সশব্দে আছড়ে পড়ল গোটা স্তূপ, এক মুহূর্ত দেরি হলে ওকে চিড়ে-চ্যাপ্টা করে ফেলত।

সোজা হয়ে ড্রিফটের মুখে আলো ফেলল রানা, একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বুক চিরে। যা ভয় করেছিল, তা-ই ঘটেছে। মুখটা আটকে গেছে পুরোপুরি। এমন কোনও ফাঁক নেই, যা গলে একজন মানুষ কোনোমতে বেরুতে পারে। সারফেস থেকে একশো ষাট ফুট তলায়, ভূ-গর্ভে আটকা পড়ে গেছে ও!

মাথা ঠাণ্ডা রাখল রানা, এ-ধরনের পরিস্থিতি নতুন নয় ওর জীবনে। মুক্তির উপায় নিয়ে ব্যস্ত হলো না, শান্ত ভঙ্গিতে উল্টো ঘুরল, হাঁটতে শুরু করল অন্ধকার টানেল ধরে। কিন্তু কিছুদূর যেতেই মুখ থেকে রক্ত সরে গেল ওর, চেপে রাখা আতঙ্কটা শতগুণ বেড়ে গিয়ে আচ্ছন্ন করে ফেলতে চাইল সমস্ত অস্তিত্বকে। চিৎকার বেরিয়ে যাচ্ছিল গলা দিয়ে, কোনোমতে নিজেকে সামলাল রানা। কাঁপছে বুক—চোখের সামনে ভেসে ওঠা দৃশ্যটা ভয়াবহ।

টানেলটা যেন একটা লাশ রাখার গুদামঘর। সারি বেঁধে দু'পাশের

দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে কয়েকশো মানবদেহ। ফ্ল্যাশলাইটের আলো যতদূর যায়, শুধু লাশ আর লাশ। প্রথমে মনে হলো, রানার মত আটকা পড়েছিল এরা; কিন্তু পরমুহূর্তেই বোঝা গেল, ঘটনা তা নয়। ফাঁদে পড়লে মানুষগুলো শাফটের তলায় জমায়েত হতো উদ্ধারের আশায়, ধুঁকে ধুঁকে ওখানেই মারা যেত। দেহগুলো পড়ে থাকত এলোমেলোভাবে, এভাবে সাজানো অবস্থায় নয়।

কাছে গিয়ে একটা লাশ পরীক্ষা করল রানা, ওটার কপালে তৃতীয় নয়নের মত ফুটে আছে একটা নিখুঁত ছিদ্র—গুলির, নিঃসন্দেহে। পোশাক দেখে বোঝা যাচ্ছে, এরা সবাই মাইনার; খনিটা এরাই খুঁড়েছে। পালিয়ে যাবার আগে ইটালিয়ানরা খুন করে রেখে গেছে এদেরকে, খনির অস্তিত্ব গোপন রাখবার জন্য। শিউরে উঠল রানা কঠিন সত্যটা অনুভব করতে পেরে।

লাশের মাঝখান দিয়ে নিঃশব্দে হাঁটতে শুরু করল ও, মনে মনে হিসেব করল—অন্তত চারশো দেহ রয়েছে টানেলে। গভীর একটা বিষাদ আচ্ছন্ন করল ওর সমগ্র অস্তিত্বকে। মানুষ কোথায় নামতে পারে!

ড্রিফট থেকে বেরুবার পথ খুঁজল না রানা, আগে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গেল। এক মাইলের চেয়েও বেশি দীর্ঘ ওটা, ডানে-বাঁয়ে অসংখ্য সাইড-টানেল আছে। ছাদটা বেশি উঁচু নয়, ওর হেলমেটের মাত্র দু'ইঞ্চি উপরে ঝুলে রয়েছে। ওয়ার্কিং ফেসটা দেখে বুঝতে পারল, ওখানে বেশি সময় নষ্ট করা হয়নি। ব্যর্থ প্রচেষ্টার কথা বুঝতে পেরে হাল ছেড়ে দেয়া হয়েছে সামান্য খোঁড়াখুঁড়ির পরই। মেকানিকাল একটা স্ক্র্যাপার পড়ে আছে ওখানে, সেই সঙ্গে একটা পুরনো আমলের ইঞ্জিন—যান্ত্রিক কোদালটাকে অপারেট করা হতো ওটার সাহায্যে। মাইনারদের শাবল-গাঁইতিও পড়ে আছে অবহেলায়—শুষ্ক বাতাসে তেমন একটা মরচে ধরেনি।

ওয়ার্কিং ফেস আর মেঝেতে পড়ে থাকা আকরিকের টুকরো পরীক্ষা করতেই অনেকগুলো প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেল রানা। বিষণ্ণ ভঙ্গিতে পিছন ফিরল ও।

নতুন একগাদা প্রশ্নের উদয় হয়েছে মনে, সেগুলো নিয়ে মাথা ঘামানো দরকার, তবে তার আগে দরকার সারফেসে পৌঁছুনো। জীবনে বহুবার আণ্ডারগ্রাউণ্ড টানেলে ঘোরাফেরা করতে হয়েছে রানাকে, ট্রেইনিং-ও রয়েছে ওর এ-ধরনের অবস্থা মোকাবেলার জন্য, সেইসঙ্গে রয়েছে সহজাত একটা ক্ষমতা—সুড়ঙ্গপথের গোলকধাঁধা থেকে সঠিক পথ বের করবার। ধীরে ধীরে উল্টোপথে হাঁটতে শুরু করল ও, সাইড-টানেলগুলোর দিকে নজর রেখে মনে মনে পুরো জায়গাটার একটা ম্যাপ তৈরি করছে। যেতে যেতে একটা উইনযের তলায় এসে থামল ও, সরু খাড়া শাফটটা উপরের দিকে চলে গেছে। তবে পুরনো অভিজ্ঞতা বলছে, সরাসরি উপরের লেভেলে পৌঁছুনো যাবে না ওটা দিয়ে, সম্ভবত উপরদিকের আরেকটা সাব-টানেলে উঠেছে শাফটটা। তবে সেটাও মন্দ নয়, ওখান থেকে আসল ড্রিফটটা খুঁজে নিতে পারবে ও।

দেয়ালের সঙ্গে শাফটে উঠবার কাঠের মই আছে, সেটা জরাজীর্ণ। নীচের

ধাপটায় পা রেখে সামান্য চাপ দিতেই মট্ করে ভেঙে গেল। দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা—কাজটা সহজ হবে না। আস্তে আস্তে মেঝে থেকে পাথর কুড়োতে শুরু করল ও, শাফটের তলায় জড়ো করছে—মেক-শিফট একটা মঞ্চ বানানোর আশায়। ব্যাটারি বাঁচাবার জন্য কয়েকবার ফ্ল্যাশলাইট নিভিয়ে দিল, কাজ করল নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের ভিতর। বিশ মিনিটের মাথায় পাথরের স্তূপটা তিন ফুট উঁচু হয়ে গেল। আলো ফেলে উচ্চতাটা দেখল রানা, সন্তুষ্ট হয়ে উঠে পড়ল তাতে। পায়ের নীচে আলগা পাথর নড়বড় করছে, সাবধানে ব্যালান্স রেখে শাফটের ভিতর শরীর ঢুকিয়ে দিল ও—আলো ফেলল উপরদিকে। কিন্তু দেখা গেল না কিছু। শাফটটা বেশ লম্বা, শেষপ্রান্ত পর্যন্ত আলো পৌঁছুচ্ছে না, তার আগেই রশ্মিটাকে গিলে খাচ্ছে আঁধার। পাশ দিয়ে উঠে যাওয়া মইটার ধাপ আরেকবার পরীক্ষা করল রানা—কিন্তু নীচের মতই অবস্থা এখানেও—ভেঙে গেল চাপ দিতেই। কী আর করা, সময় নষ্ট না করে আসল কাজে লেগে গেল রানা। জ্বলতে থাকা ফ্ল্যাশলাইটটা কোমরে গুঁজে পকেট থেকে বের করে আনল ছুরি, প্লায়ার্স আর জিওলজিস্ট-এর পিক হ্যামার। ছুরি দিয়ে জিন্সের প্যান্টের তলা থেকে একটা অংশ কাটল ফালি ফালি করে, সেগুলো দিয়ে সেফটি লাইন বানাল। একটা প্রান্ত বাঁধল পিক হ্যামারের সরু অংশে, মাথার কাছে। তারপর অপর প্রান্ত দিয়ে তৈরি করল একটা লুপ। এরপর বেল্ট বাকল দিয়ে একটা হুক বানাল, সেটা দেখতে হলো ইংরেজি সি হরফের মত। দ্বিতীয় প্রস্থ লাইনটা এই হুকের সঙ্গে আটকাল, অপর প্রান্ত দিয়ে তৈরি করল আরেকটা লুপ।

এবার শাফট বেয়ে ওঠার পালা। রায়োলাইট দেয়ালের একটা জায়গা সামান্য ফুলে আছে, হাত উঁচু করে বেল্ট হুকটা সেখানে আটকাল রানা। এরপর পা দিল লুপে, লাইনের উপরের প্রান্ত মুঠোর ভিতর ধরল, নিজেকে তুলে নিল শাফটের ভিতর। এবার হ্যামারটা যতটা সম্ভব উঁচু করল, সরাসরি উপরে নয়, সামান্য এক পাশে, তারপর হ্যামারের পিক প্রান্তটা ঢুকিয়ে দিল রায়োলাইটের একটা পকেটে। মুক্ত পা দ্বিতীয় লুপে আটকে টানেলের আরও খানিক উপরে উঠে এল।

সরঞ্জাম বা আয়োজন, কোনোটাই মানসম্মত নয়, তবে কাজ হচ্ছে। পদ্ধতিটা পুনরাবৃত্তি করল রানা, বার বার—প্রথমে সি হুক আটকাল পাঁচিলে, তারপর পিক হ্যামার; মাকড়সার মত টানেলের পাঁচিল বেয়ে উঠে যাচ্ছে উপরে।

অমানুষিক পরিশ্রম হচ্ছে, সময় লাগছে প্রচুর, অথচ ওঠার গতি খুবই মন্থর। পা আর হাতের পেশি টন টন করছে ব্যথায়। কাটা ক্ষতগুলো থেকে রক্তক্ষরণ হয়ে চলেছে; কিছুক্ষণ পর পর বিশ্রাম নিতে বাধ্য হচ্ছে রানা। কতটা সময় পেরুচ্ছে, কিছু বলতে পারবে না।

অর্ধেক দূরত্ব পেরুতেই ফুরিয়ে এল শক্তি। তবে হার মানল না রানা। সিদ্ধান্ত নিল, এখন থেকে আর কোনও বিশ্রাম নেবে না। শাফটের মুখ আর যখন মাত্র তিন ফুট দূরে, মনে হলো জ্ঞান হারাবে। বিশ্রাম নিতে বাধ্য হলো ও, পেশিগুলো সাড়া দিচ্ছে না। কিছুক্ষণ পর লাইনটা দু'হাতে ধরে একটু একটু করে উঠে এল। গড়ান দিয়ে শাফটের মুখের পাশে চিত হয়ে পড়ল ও।

চোখে-মুখে অন্ধকার দেখছে, হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক।

ধাতস্থ হতে পুরো দশ মিনিট লাগল রানার। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হতেই উঠে দাঁড়াল, তাকাল এদিক-ওদিক। যা ভেবেছিল, সংকীর্ণ একটা সাইড-টানেলে উঠে এসেছে। ডান-বাম দু'দিকেই গেছে ওটা। চোখ বন্ধ করে মনে মনে তৈরি করা ম্যাপটা স্মরণ করল ও—বুঝতে পারল, উপরের লেভেলের মেইন ড্রিফটটা ডানদিকে হবে। হাঁটতে শুরু করল ওপথে। বেশ কিছুক্ষণ এগোনোর পর পৌঁছে গেল বড় টানেলটাতে। ওখান থেকে মোড় নিয়ে এগোল মেইন শাফটের দিকে। ড্রিফটের মুখে পৌঁছে তাকাল নীচে। হ্যাঁ, পেরেছে ও, লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালটার উপরে উঠে আসতে পেরেছে। ওগুলো এখন ওর থেকে বিশ ফুট নীচে। ঘড়ি দেখল, বেলা বারোটা পেরোয়নি এখনও, তারপরও মনে হচ্ছে যেন কয়েক যুগ কেটে গেছে খনির মধ্যে।

সামনেই ঝুলছে দড়িটা, কোমরের বেল্ট ব্যবহার করে ওটাকে কাছে টেনে আনল রানা। হারনেসটা তুলে এনে শরীরে আটকাল, তারপর ঝাঁকি দিয়ে সঙ্কেত পাঠাল পাশার কাছে—ওকে তুলে নেবার জন্য। দড়ি ধরে শাফটের মাঝখানে ঝুলে পড়ল ও, একটু পরেই মসৃণ গতিতে উঠতে শুরু করল উপরে—ল্যাণ্ড-ক্রুজারের ইঞ্জিন চালু করেছে পাশা, দড়ি টানছে উইঞ্চের সাহায্যে।

সূর্যের আলো গায়ে পড়তেই অদ্ভুত একটা স্বস্তি অনুভব করল রানা, অনেকটা সময় অন্ধকারের রাজ্যে কাটানোর পর ওটা শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিচ্ছে শরীরে। অবশ্য কিছুক্ষণের জন্য চোখ ধাঁধিয়ে গেল তীব্র আলোয়, তবে তাতে মোটেই খারাপ লাগল না। চোখদুটো আধবোজা করে হারনেস থেকে নিজেকে মুক্ত করল, তারপর হাঁপাতে লাগল হেড-ফ্রেমের গোড়ায় বসে।

বিয়ারের একটা ক্যান নিয়ে ছুটে এল পাশা। তুলে দিল রানার হাতে। বিস্মিত কণ্ঠে বলল, 'এ কী অবস্থা আপনার, এফেন্দি! সারা শরীর এভাবে কেটে-ছিঁড়ে গেছে কীভাবে?' রানার রক্তমাখা গায়ের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে।

'ও কিছু না,' বিয়ারে চুমুক দিয়ে বলল রানা। 'ফার্স্ট এইড কিটটা নিয়ে এসো। পরিষ্কার করে মলম লাগালেই সব সেরে যাবে।'

ঘুরতে গিয়ে থেমে গেল পাশা। ইতস্তত করে বলল, 'যা খুঁজছিলেন, তা পেয়েছেন? মানে... দামি পাথরগুলোর কথা বলছি... যেগুলো এদেশের কপাল ফিরিয়ে দেবে!'

'না,' তিক্ত গলায় বলল রানা। 'পেয়েছি গুলির খোসা... আর শ'চারেক লাশ—নীচে পড়ে পচছে! হীরা-টীরার চিহ্ন নেই কোনও।'

'কী বলছেন, এফেন্দি!' চমকে উঠল পাশা।

'পরে তোমাকে বলব সব। আগে ফার্স্ট এইড কিটটা আনো, কাটগুলো খুব জ্বালা করছে।'

'জী, এফেন্দি।' ল্যাণ্ড-ক্রুজারের দিকে চলে গেল পাশা।

হতাশ দৃষ্টিতে খনির মুখের দিকে তাকাল রানা। নীচে যা আবিষ্কার করেছে,

সেটার একটাই অর্থ হতে পারে—হীরা পায়নি এখানে ইটালিয়ানরা। খনির অস্তিত্ব, সেই সঙ্গে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে খুন করে রেখে গেছে অসহায় মাইনারদেরকে। দিনের পর দিন অমানুষিক কষ্ট করেছে হতভাগা মানুষগুলো, খুঁড়েছে মাইলের পর মাইল মাটি-পাথর, কিন্তু কিম্বারলাইটের সন্ধান পায়নি। শেষ পর্যন্ত ঘাম-রক্ত ঝরানোর প্রতিদান দেয়া হয়েছে বুলেটের মাধ্যমে। এমন নৃশংসতার কোনও তুলনা হয় না।

তবে আশপাশে যে কিম্বারলাইট পাইপ আছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই রানার মনে। কয়েক হাজার লোক, বছরদুয়েক সময় আর কয়েকশো মিলিয়ন ডলার খরচ করতে পারলে সেটা খুঁজেও বের করা যাবে। কিন্তু ওসবের কিছুই নেই ওর কাছে, নেই সোহেলকে বাঁচাবার মত কোনও উপায়ও। ওর অপহরণকারীরা রানাকে একটা খনি খুঁজে বের করতে বলেছে, তা ও করেছে; সমস্যা হলো খনিটাতে হীরা নেই, ওটা মাটির তলায় স্রেফ একটা গোলকধাঁধা ছাড়া আর কিছু নয়। কিডন্যাপাররা কিছুতেই তা মেনে নেবে না। ওদেরকে সন্তুষ্ট করাও সম্ভব নয় রানার পক্ষে।

ভাগ্যকে গালাগাল দেয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই এখন।

দুই

ইরিত্রিয়া-সুদান সীমান্ত।

নির্জন সীমান্ত ঘেঁষে চলে গেছে দুটো নুড়ি-বিছানো কাঁচা রাস্তা, একসঙ্গে মিলেছে গভীর এক খাদের উপর ঝুলে থাকা একটা কাঠের সেতুর গোড়ায় গিয়ে। যুগ-যুগান্ত ধরে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে সেতুটা—বয়সের ভারে জীর্ণ ও বিবর্ণ। এই সেতু থেকে দু'দিকে, চল্লিশ মাইলের ব্যবধানে রয়েছে দুটো রিফিউজি ক্যাম্প—হাজার হাজার মানুষ মানবেতর জীবনযাপন করছে ক্যানভাস বা প্লাস্টিকের তৈরি সামান্য আচ্ছাদনের তলায়; মরু এলাকার প্রখর সূর্যকিরণ এবং তীব্র বায়ুপ্রবাহের বিরুদ্ধে এই ঠুনকো আবাস খুব সামান্যই প্রতিরোধ গড়তে পারে। তাঁবুর মত অসংখ্য ঘরের সমষ্টি এই ক্যাম্পগুলো, তাতে বাস করছে শরণার্থী ইরিত্রিয়ানরা, দেশে ফেরার উপায় নেই যাদের। গৃহযুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করবার পর থেকে প্রচুর সুদানিজও আশ্রয় নিয়েছে ওখানে, মনে আশা—শরণার্থীদের সঙ্গী হয়ে তারাও একদিন প্রবেশাধিকার পাবে ইরিত্রিয়ায়, সেখানে স্বপ্নের নীড় গড়তে পারবে।

সীমান্তের কাছাকাছি হওয়ায় সুদানের অভ্যন্তরের ক্যাম্পগুলোর চেয়ে তুলনামূলকভাবে ভাল পরিবেশ বিরাজ করছে এখানকার ক্যাম্পগুলোতে। জাতিসংঘের কর্মীরা নিয়মিত আসা-যাওয়া করে, রিলিফ এজেন্সির ট্রাকগুলোও খাবার, ওষুধ আর জামাকাপড় নিয়ে আসতে পারে ইরিত্রিয়ার দিক থেকে।

গিরিখাদের ভিতর দিয়ে প্রবল না হলেও মোটামুটি ভাল একটা জলপ্রবাহ

আছে, রিফিউজি ক্যাম্পগুলো গড়া হয়েছে তাই খাদেরই পারে। অল্পবয়েসী মেয়েরা নিয়মিত পানির পাত্র নিয়ে ওঠানামা করে খাদের মধ্যে—খাওয়ার পানি আনে নীচের জলপ্রবাহ থেকে। তবে মানুষগুলোর মধ্যে স্বাস্থ্য-সচেতনতা কম, ওই পানিতে গোসল আর ধোয়াধুয়ির কাজটাও সারে, এমনকী পায়খানাও দাঁড় করিয়েছে খাদের ধারে। স্বেচ্ছাসেবীরা অনেক চেষ্টাতেও অভ্যাসটা ছাড়াতে পারেনি তাদের। ফলে ডায়রিয়া আর পেটের পীড়া ক্যাম্পগুলোর নিত্যদিনের সমস্যা।

দ্বিতীয় ক্যাম্পটার দশ মাইল দক্ষিণে রয়েছে তৃতীয় আরেকটা ক্যাম্প, তবে এটায় শরণার্থী নয়, সৈনিকেরা থাকে। শরণার্থী-শিবিরদুটোর চেয়ে একেবারে আলাদা ওটার চেহারা। বড় বড় পাতাঅলা বেশ কিছু গাছ আছে, সেগুলোয় ছায়ায় খাটানো হয়েছে উন্নতমানের তাঁবু। গুমগুম করে একটা জেনারেটর চলছে চব্বিশ ঘণ্টা, গিরিখাদ থেকে পানি তুলে আনা হচ্ছে পাম্প আর হোসের সাহায্যে। তিনজন লোক সেই পানি সারাক্ষণ সেদ্ধ করছে, দূর করে নিচ্ছে সমস্ত রোগজীবাণু, তারপর আবার কেমিক্যাল ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে পুরোপুরি বিশুদ্ধ হবার পর তা যাচ্ছে ব্যবহারের জন্য।

ক্যাম্পে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার প্রাণান্ত প্রচেষ্টার পরও দুটো জিনিস দূর করা যায়নি—এক, দশ মাইল দূরের শরণার্থী-শিবির থেকে বাতাসে ভর করে ভেসে আসা বাজে গন্ধ; দুই, মরু এলাকার বিশাল বিশাল মাছি—একেকটার আকার প্রায় বুড়ো আঙুলের অর্ধেকের সমান। মার্সেলো মানসিনির চোখে, এই দু'টোই শুধু এ-ক্যাম্পের দুর্বলতা, নয়তো বাকি সব তার পছন্দ হয়েছে। বড়-সড় একটা এয়ার-কণ্ডিশনড্ তাঁবুতে উঠেছে সে, খাবারটাও পাচ্ছে বেশ ভাল—হিলালের দলের এক সদস্য যুদ্ধে যোগ দেবার আগে খার্তুমের এক বড় রেস্টুরেন্টের বাবুর্চি ছিল, ইটালিয়ান টাইকুনের আনা অত্যাধুনিক কুকিং ইকুইপমেন্ট পেয়ে নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে লোকটা, যুদ্ধ-টুদ্ধের কথা ভুলে গিয়ে মন ঢেলে দিয়েছে সরঞ্জামগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহারে। সবমিলিয়ে সময়টা খারাপ কাটছে না মানসিনির। গুলিবর্ষণের গগনবিদারী আওয়াজটা অবশ্য একটা উৎপাত—ক্যাম্পে চলতে থাকা সার্বক্ষণিক প্রশিক্ষণের সাইড-এফেক্ট বলা যেতে পারে। ওটা না থাকলে এ-জায়গাটাকে কেনিয়া বা দক্ষিণ আফ্রিকার যে-কোনও কৃত্রিম সাফারি-ক্যাম্পের চেয়ে অনেক বেশি পছন্দ হতো ওর।

এ-মুহূর্তে নিজের তাঁবুর ছায়ায়, যেব্রা-র চামড়ায় মোড়া একটা চেয়ারে বসে আছে মানসিনি, সামনে একটা অত্যাধুনিক ডেস্ক—ভাঁজ করে যেখানে খুশি নেওয়া যায়; ওটার উপর রয়েছে তার ল্যাপটপ। ওটার মাধ্যমে মানসিনি কর্পোরেশনের বিশাল সাম্রাজ্যের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে ইটালিয়ান টাইকুন।

অবশ্য শিকার-টিকারের সুযোগ পেলে ব্যবসা নিয়ে মাথা ঘামাত না মানসিনি, হাতে বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ত রোমাঞ্চের নেশায়। কিন্তু কপাল খারাপ, এমন এক জায়গায় এসেছে, যেখানে শিকার বলতে কিছু নেই। পুরো

মরুভূমি শুষ্ক ও বৈচিত্র্যহীন, জীবন্ত প্রাণী বলতে রয়েছে দশ মাইল দূরের ক্যাম্পে ওই মানব-আবর্জনাগুলো... যদি ওদেরকে আদৌ জীবন্ত বলা যায় আর কী! সময় কাটানোর জন্য এখন ব্যবসার খবরদারি ছাড়া করবার আর কিছু পাচ্ছে না সে।

প্রতিশ্রুতি অনুসারে যথেষ্ট পরিমাণ লোক জোগাড় করেছে হিলাল। সুদানিজ লিবারেশন আর্মির রেভোলুশনারি কাউন্সিল তাদের সবচেয়ে বড় ইয়োরোপিয়ান পৃষ্ঠপোষকের অনুরোধ এবং তার কাছ থেকে বিরাট অঙ্কের টাকা পেয়ে আর দেরি করেনি, পঞ্চাশজন সৈনিক পাঠিয়ে দিয়েছে ইরিত্রিয়ার সীমান্তে—হিলাল ওদের নেতৃত্ব দেবে, তবে নিয়ন্ত্রণ থাকবে মানসিনির-ই হাতে। লোকগুলো লিবারেশন আর্মির সেরা যোদ্ধা, অন্তত দশ বছরের কমব্যাট-এক্সপিরিয়েন্স আছে প্রত্যেকের। লেটেস্ট ন্যাটো গিয়ারে সজ্জিত করা হয়েছে এই খুনে-বাহিনীকে, দেয়া যায়নি শুধু অত্যাধুনিক অ্যাসল্ট রাইফেল—নিজস্ব একে-৪৭ ছাড়া অন্য কোনও অস্ত্রে নাকি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না তারা।

'এক্সকিউজ মি, সার?' একটা কণ্ঠ ভেসে এল তাঁবুর প্রবেশদ্বার থেকে।

চোখ তুলতেই দলের একজন শ্বেতাঙ্গ মাইনারকে দেখতে পেল মানসিনি। ল্যাপটপের ডালা নামিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ভিতরে এসো, ওয়ালেস।'

অস্ট্রেলিয়া থেকে বেশ ক'জন অভিজ্ঞ দক্ষিণ আফ্রিকান শ্বেতাঙ্গ মাইনার জোগাড় করে এনেছে মানসিনি, চুরানব্বুইয়ে *এএনসি* ক্ষমতা দখলের পর এরা পালিয়ে গিয়েছিল দেশ ছেড়ে। ওয়ালেস মায়ার তাদের একজন। অনুমতি পেয়ে তাঁবুতে ঢুকল বিশালদেহী মানুষটা, একটা ক্যাম্প-চেয়ার টেনে নিয়োগকর্তার মুখোমুখি বসল। বলল, 'আপনার আনা মাইনিং গিয়ারগুলো চেক করে দেখেছি আমরা। চমৎকার জিনিস!'

পাঁচজন শ্বেতাঙ্গ মাইনিং সুপারভাইজর ভাড়া করেছে মানসিনি—প্রত্যেকে বিস্ফোরক-বিশেষজ্ঞ; শিফট্-বস হিসেবে কাজ করবারও অভিজ্ঞতা আছে ওদের। একশোজন শ্রমিক আনবে হিলাল, তাদেরকে পরিচালনা করবে এরা। এ ছাড়াও আনা হয়েছে পাঁচ-ট্রাক ভর্তি মাইনিং ইকুইপমেন্ট, বিশালাকার নিউম্যাটিক ড্রিল, বা ড্রিফটার, নানা রকম এক্সপ্লোসিভ; সেই সঙ্গে রয়েছে আণ্ডারগ্রাউণ্ড কণ্ডিশনে কাজ করবার মত কয়েকটা ছোট ইউটিলিটি ট্রাক। বেশ অনেকদিন ধরেই এসব মালামাল ধীরে ধীরে আনা হয়েছে আফ্রিকায়, খার্তুমের একটা গুদামঘরে রেখে দেয়া হয়েছিল অভিযান শুরু হবার অপেক্ষায়।

একটা সিগারেট ধরিয়ে ঠোঁটে ঝোলাল ওয়ালেস। 'কাফ্রি কুত্তাগুলো কয়েকবারই আমাদের এক্সপ্লোসিভ চুরি করবার চেষ্টা করেছে। দু'জনের মাথা কাটিয়েছি আমি বাকিদের শিক্ষা দেবার জন্য।'

ভুরু কোঁচকাল মানসিনি। 'বেশি জখম করোনি তো? ওই সৈন্যরাই কিন্তু আমাদের রক্ষাকবচ। ওদের কিছু হয়ে গেলে সমস্যায় পড়তে হবে।'

'কাফ্রিদের ব্যাপারে বোধহয় কিছুই জানেন না আপনি,' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে

বলল দক্ষিণ আফ্রিকান। 'কৈ মাছের প্রাণ ওদের, মাথার খুলিও পাথরের মত শক্ত। দু'চারটা বাড়ি খেলে কিস্যু হয় না।' ঠোঁট উল্টাল সে। 'আপনাকে বুঝতে হবে, আদর-সোহাগ বা বাড়তি রেশনের চাইতে পাছায় লাথি খেলে ওরা অনেক বেশি অনুগত থাকে।'

'দেখো, গার্ডরা আমার লোক,' বিরক্ত কণ্ঠে বলল মানসিনি। 'ওদের পাছায় লাথি দেয়া তোমার কাজ নয়। লাথি দিতে হলে তোমার শ্রমিকদের পাছায় দিয়ো।'

'হাহ্, শ্রমিক!' কাঁধ ঝাঁকাল ওয়ালেস। 'আপনার ওই হিলাল নামের কুত্তাটা রিফিউজি ধরে আনছে কোত্থেকে যেন। হাড়-জিরজিরে, তালপাতার সেপাই একেকটা। জনাপঞ্চাশেক থেকে বেছে এক কি দু'জন নেয়া যায়। মাইনিং যথেষ্ট খাটুনির কাজ, অথচ কাফ্রিগুলোর দাঁড়িয়ে থাকারই মুরোদ নেই। ওদের মাঝ থেকে যথেষ্ট পরিমাণ শ্রমিক বাছতে সময় লাগবে আমাদের। তা ছাড়া যা-ও বা পাচ্ছি, সব বেকুবের হদ্দ। ওদের দিয়ে কীভাবে কাজ করাব, সেই চিন্তায় অস্থির হয়ে আছি আমরা।'

আলোচনায় মনোনিবেশ করার জন্য কম্পিউটারটা অফ করে দিল মানসিনি। খবরটা উদ্বিগ্ন করে তুলেছে তাকে। বুদ্ধিটা হিলালের—বলেছিল, আশপাশের ক্যাম্পগুলো থেকে জোয়ান-তাগড়া রিফিউজি জোগাড় করাটাই শ্রমিক পাবার সবচেয়ে ভাল উপায়। জীবিকার জন্য মরিয়া ওরা, পারিশ্রমিকের লোভ দেখালে চোখ-কান বন্ধ করে যে-কোনও কাজ করবে। ওদের বেশিরভাগই দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্মের শরণার্থী। জন্ম হয়েছে রিফিউজি ক্যাম্পে, জীবনও কাটছে ওখানে... নরকতুল্য পরিবেশে। লোভ দেখিয়ে ওদেরকে নিয়ে আসা খুব সহজ হবে। বাস্তবেও কথাটার সত্যতা পাওয়া গেছে। প্রচুর লোক আনতে পারছে হিলাল। কিন্তু শরীর-স্বাস্থ্যই যদি ঠিক না থাকে, তা হলে লোক এনে লাভ কী?

'কতজন পেয়েছ তুমি এ-পর্যন্ত?' জানতে চাইল মানসিনি।

'চল্লিশজনের মত,' বলল ওয়ালেস। 'একশো-র কম হলে কাজ শুরুই করতে পারব না। তারপরও সমস্যা আছে। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, কাজের ধকল টের পাবার সঙ্গে সঙ্গে অন্তত অর্ধেক শ্রমিক পালিয়ে যাবে, কিংবা মারা পড়বে খনির ভিতর। উত্তরাঞ্চলের এই কাফ্রি কুত্তাগুলো একটুতেই টপ করে মরে যায়—বড়ই নাজুক জানোয়ার।'

'তুমি তো শুনেছি আগেও সুদানিজ আর ইরিত্রিয়ানদের নিয়ে কাজ করেছ!'

'হ্যাঁ, জাম্বিয়ার তামার খনিতে। কয়েকশো লোক নামিয়েছিলাম খনিতে, পাঁচ মাসের মধ্যে আবার লোক আনতে হয়েছিল। প্রথম গ্রুপের অর্ধেক মারা পড়েছিল কাজ করতে গিয়ে, বাকিরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকত ক্যাম্পে—অনাহারে মরতে রাজি ছিল ওরা, কিন্তু কিছুতেই আর খনিতে নামতে রাজি ছিল না।'

'ব্যাপারটা জানা ছিল না আমার,' বলল মানসিনি। কপালের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে তার, বুঝতে পারছে—বড় একটা সমস্যা এটা।

'চিন্তা করবেন না,' বলল ওয়ালেস্। 'বাড়তি লোক নেবার প্ল্যান করেছি আমরা, যাতে কিছু লোক মরে-টরে গেলেও কাজ চালিয়ে যাবার মত একটা লোকবল থাকে আমাদের হাতে। কথা হলো, কবে নাগাদ মুভ করব আমরা?'

'এখনও বলতে পারছি না,' বলল মানসিনি।

ঠিক তখুনি তাঁবুর ফ্ল্যাপ সরিয়ে উঁকি দিল হিলাল। মুখ বেয়ে দর দর করে ঘাম ঝরছে তার, হাঁপাচ্ছে উত্তেজনায়। অনুমতির অপেক্ষা না করে ভিতরে ঢুকে পড়ল সে।

'কী ব্যাপার?' মানসিনি জানতে চাইল।

'রিফিউজিদের ক্যাম্পে গিয়েছিলাম, এফেন্দি,' হড়বড় করে বলল হিলাল। 'কাল রাতে একজন যাযাবর এসে ওদের পঞ্চাশজনকে ভাড়া করেছে। রাতেই পরিবার-পরিজন নিয়ে লোকটার সঙ্গে বর্ডার-ক্রস করে চলে গেছে ওরা। ক্যাম্পে গুজব—বিশাল একটা খনি নাকি পাওয়া গেছে ইরিত্রিয়ায়, ওটা খোঁড়ার জন্য লোক দরকার। আরও অনেকেই যাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ-ও শুনলাম, যাযাবরটাকে পাঠিয়েছিল বাদামি চামড়ার এক বিদেশি লোক!'

'নিশ্চয়ই মাসুদ রানা!' তড়াক করে উঠে দাঁড়াল মানসিনি। 'খনিটা খুঁজে পেয়েছে ও!'

'আমারও তা-ই ধারণা,' মাথা দোলাল হিলাল।

আবেগ উথলে উঠল মানসিনির বুকের ভিতর। মেডিউসা-পিকচারগুলোই প্রমাণ—অ্যাঞ্জেলো মানসিনি উন্মাদ ছিলেন না, সত্যিই একটা কিম্বারলাইট পাইপ রয়েছে ইরিত্রিয়ার উষর মরুতে। মাসুদ রানা ওই স্যাটেলাইট-ফটোগুলোর মাধ্যমে সন্ধান বের করেছে ওটার, অথচ অ্যাঞ্জেলো ওটা খুঁজে বের করেছিলেন কোনোরকম আধুনিক যন্ত্রপাতি বা টেকনোলজি ছাড়া! কতই না কষ্ট করেছেন তিনি! আজ... এত বছর পর তাঁর স্বপ্নকে সফল করবে তাঁরই রক্ত, তাঁর ভাইয়ের নাতি: মার্সেলো।

এটা ঠিক, অ্যাঞ্জেলোকে কোনোদিন চোখে দেখেনি মার্সেলো। তবে তার দুঃসাহস আর একরোখামিকে সবসময়ই শ্রদ্ধা করেছে সে। করবে না-ই বা কেন, মার্সেলোর নিজের ভিতরও আছে ও-দুটো গুণ। অ্যাঞ্জেলোর মত সে-ও অসম্ভবের পিছনে তাড়া করতে ভালবাসে, নিজের স্বপ্ন আর বিশ্বাসকে বাস্তবায়নের জন্য যে-কোনও ধরনের ঝুঁকি নেয়। হীরা-আবিষ্কার ও তার পরবর্তী প্ল্যানটা নিয়ে ভাবল ইটালিয়ান টাইকুন, মৃদু হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটের কোণে। অ্যাঞ্জেলোর হারানো সম্মান ফেরানো একটা মহৎ উদ্দেশ্য বটে, তবে তার সঙ্গে এই অভিযান থেকে নিজের প্রাপ্তিও কম হবে না। একবার ভাবল এখুনি লণ্ডনে ফোন করে, পরে আবার নিরস্ত করল নিজেকে। দেখাই যাক না, ডায়মণ্ড সিণ্ডিকেটের মিটিঙের আগে কী পরিমাণ হীরা সংগ্রহ করা যায়। পাঁচ হাজার ক্যারাট দরকার তার; ওয়ালেস মায়ারের নিষ্ঠুরতার আঁচ পেয়ে মনে হচ্ছে, লক্ষ্যটা অর্জন করা কঠিন হবে না।

'হিলাল, তোমার লোকজনকে রেডি হতে বলো, আমরা খুব শীঘ্রি রওনা দেব।' নির্দেশ দিল মানসিনি। 'রিফিউজিরা আগে রওনা হয়েছে বটে, কিন্তু ট্রাক

নিয়ে ওদের ধরতে অসুবিধে হবে না। ওয়ালেস, আমাদের বন্ধু মাসুদ রানা তোমার বাকি শ্রমিকের ব্যবস্থা করে ফেলেছে। যে-চল্লিশজন পেয়েছ ইতোমধ্যে, তার সঙ্গে ওদেরকে যোগ করে নিলেই কাজ শুরু করতে আর অসুবিধে হবে না; কী বলো? ট্রাকগুলোতে কি মালামাল সব তোলা হয়েছে?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল দক্ষিণ আফ্রিকান। 'চেকিঙের পর সবকিছু আবার রি-লোড করে রেখেছি আমরা।'

'গুড।' হিলালের দিকে ফিরল মানসিনি। 'রিফিউজিদের কাফেলা মরুভূমির ভিতর দিয়ে দিনে কতটুকু এগোতে পারবে বলে তোমার মনে হয়?'

'মহিলা আর বাচ্চাদের রেখে গেলে তো বিশ মাইলের মত যেতে পারত,' হিলাল বলল। 'তবে পরিবার নিয়ে গেছে যখন, ওদের স্পিড অর্ধেকে নেমে আসবে।'

'তা হলে তো ভালই,' স্বস্তি অনুভব করল মানসিনি। 'এক কাজ করো, কিছু স্কাউট পাঠিয়ে দাও, ওদেরকে ট্র্যাক করতে থাকুক। আমরা তা হলে ধীরে-সুস্থে রওনা হতে পারব। খার্তুম থেকে আরেকটা ফুয়েল-ট্রাকও এসে যাবে তার মধ্যে।'

'মি. মানসিনি,' ওয়ালেস মনে করিয়ে দিল, 'খনিতে অত লোক গেলে বাড়তি পানিও দরকার হবে আমাদের।'

ল্যাপটপটা অন্ করল ইটালিয়ান টাইকুন, লিস্ট করতে থাকল প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের। 'ফুয়েল... পানি... আর কী?'

এক ঘণ্টা ধরে কাজ করল তিনজনে। কয়েক সপ্তাহ রি-সাপ্লাই ছাড়া চলবার মত জিনিসপত্রের তালিকা বানাল। এরপর সুদান থেকে আবার আনা হবে ওসব। তাতে অবশ্য খুব একটা কষ্ট হবে না, বিদ্রোহীদের পাশাপাশি সরকারি মহলেও বড় অঙ্কের টাকা ঘুষ দেয় মানসিনি—দু'পক্ষই তার পকেটে।

আলোচনার সমাপ্তি টানল ইটালিয়ান টাইকুন। 'হিলাল, স্কাউটদেরকে পাঠিয়ে দাও এখুনি। সঙ্গে হ্যাণ্ড-রেডিও দিয়ো, যাতে আমাদেরকে নিয়মিত রিপোর্ট দিতে পারে। আমি খার্তুমে বাকি সব ইকুইপমেন্ট আর সাপ্লাইয়ের জন্য অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি। আর, ওয়ালেস, তোমার লোকজনকে রেডি করে ফেলো, বলার সঙ্গে সঙ্গে যেন পথে নামতে পারে।'

'জী, সার,' প্রায় সমস্বরে সায় জানাল দুই অনুগত কর্মচারী। উল্টো ঘুরে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল তারা।

তিন

ভ্যালি অভ ডেড চিলড্রেন, ইরিত্রিয়া।

হাফ-লোডেড ট্র্যাক্টর-ট্রেইলারে চড়ে গোধূলির আলোছায়ায় উপত্যকায় পৌঁছুল আবেদ আফরাকি, দিনা আবাদ আর পাশা। ওদের পিছু পিছু গিরিখাদ

[illegible]
ভাঁজ করে রাখা হয়েছে ওটার বড়সড় ক্যাবের উপরে। গিরিখাদের মুখ একটু সরু হয়ে গিয়েছিল বিশাল যানটার জন্য, মাটি-পাথর সরিয়ে জায়গা করে নিতে হয়েছে। ট্রেইলার থেকে সেজন্যেই নামানো হয়েছে ওটাকে, কাজশেষে আর ওঠানো হয়নি, সামান্য রাস্তা... ড্রাইভ করেই ওটাকে মাইন-সাইটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে অপারেটর।

বাতাসের ধাক্কায় এগোতে থাকা যানগুলোর পিছনে ধুলো উড়ছে, ভারি ইঞ্জিনের আওয়াজে গুম গুম করছে গোটা প্রান্তর। হেড-গিয়ারের সামনে এসে থামল যানদুটো, ইঞ্জিন বন্ধ হতেই অদ্ভুত এক নীরবতা নেমে এল প্রাচীন উপত্যকার বুকে।

ট্রেইলার থেকে দিনাকে নামতে সাহায্য করল আবেল। দুজনের সম্পর্ক কিছুটা সহজ হয়ে এসেছে। ওকে নামিয়েই বাঙ্কহাউসের ভিতর চলে গেল সে, বেরিয়ে এল কয়েক মিনিট পর। চোখের সামনে হাত তুলে ডুবন্ত সূর্যের আলোয় মলিন হয়ে থাকা প্রান্তরের উপর দৃষ্টি বোলাল। কিন্তু ল্যাণ্ড-ক্রুজার বা রানার চিহ্ন দেখতে পেল না।

'পাশা,' ভাইপো নেমে এসেছে ট্রেইলার থেকে, ওকে ডাকল আবেল, 'মি. রানা কোথায়?'

'কী জানি!' কাঁধ ঝাঁকাল পাশা। 'এখানেই তো অপেক্ষা করবার কথা। খনিটা খালি পেয়ে খুব হতাশ দেখাচ্ছিল তাঁকে, তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল। কোথাও যাবার তো কথা নয়।'

একটু শঙ্কা অনুভব করল আবেল। ভাড়া করা দুই ড্রাইভারকে নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে এল দিনা। জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

'মি. রানার এখানে অপেক্ষা করবার কথা, কিন্তু দেখছি না কোথাও।' হেঁটে হেড-গিয়ারের গোড়ায় চলে গেল আবেল, উঁকি দিল কালো গহ্বরটার ভিতর।

'বলো কী, রানা অতটা হতাশ হয়েছে?' চোখ বড় বড় করে বলল দিনা।

'আরে নাহ্,' মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়ল আবেল। 'এখানে ঝাঁপ দিয়েছে ভাবছেন নাকি? আমি তো এমনিই উঁকি দিচ্ছি, খনিটা দেখতে চাইছিলাম।' ঘুরে শাফটের কাছ থেকে ফিরে এল সে। 'মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। আসুন, ক্যাম্প করে ফেলি। অন্ধকার নামতে দেরি নেই।'

'ল্যাণ্ড-ক্রুজারটা কোথায়?' আশপাশে ইতিউতি তাকাল দিনা।

'নিশ্চয়ই মি. রানা নিয়ে গেছেন,' আন্দাজ করল আবেল। 'বাঙ্কহাউসে ক্যাম্পিং গিয়ারও নেই। মনে হচ্ছে রাতটা বাইরেই কাটাবার প্ল্যান করেছেন ভদ্রলোক।'

'বিপদে পড়বে না তো?' উদ্বিগ্ন সুরে জিজ্ঞেস করল দিনা।

আবেল খেয়াল করল, কণ্ঠের এই ব্যাকুলতা স্রেফ একজন সহ-অভিযাত্রীর জন্য নয়, তাতে আরও কিছু যেন মিশে আছে—মেয়েটা স্বীকার করুক, বা না-ই করুক। ও বলল, 'কিচ্ছু ভাববেন না, মি. রানা কঠিন মানুষ। আফ্রিকার কোনও কিছুই তাঁর জন্য নতুন নয়।'

ট্রেইলার থেকে ক্যাম্পিঙের জিনিসপত্র নামানোয় ব্যস্ত হয়ে পড়ল সবাই। দিনা সামান্য সাহায্য করল বটে, কিন্তু ওর মন পড়ে রইল প্রান্তরের দিকে। গাড়ির হেডলাইটের আলো খুঁজছে চারপাশে তাকিয়ে, কান পেতে রয়েছে ইঞ্জিনের আওয়াজ শোনার আশায়। তবে ওর এই প্রতীক্ষা নিষ্ফল হলো।

পুরনো বাঙ্কহাউসে বসে হারিকেন-ল্যাম্পের আলোয় রাতের খাওয়া সারল ওরা, কথাবার্তা একদমই হলো না। ক্লান্ত সবাই, সারাদিনের জার্নিতে পরিশ্রান্ত, খাওয়া শেষ করেই ঘুমিয়ে গেল। দিনা অবশ্য রানার জন্য বেশ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল, কিন্তু একটা সময়ে হেরে গেল ক্লান্ত নার্ভের কাছে, আপনাতেই বুজে গেল দু'চোখ।

মাঝরাতের খানিক পরে ফিরল রানা, পায়ের শব্দে ঘুম থেকে জেগে উঠল সবাই। দেখার মত চেহারা হয়েছে বটে ওর—জামাকাপড় ময়লায় মাখামাখি, মাথার চুল খয়েরি হয়ে গেছে ধুলোর আস্তর পড়ে। ভয়ানক ক্লান্ত, চোখদুটো মুদে এসেছে প্রায়। ধপ্ করে বসে পড়ল ক্যাম্পিং স্টোভের পাশে। তাড়াতাড়ি ল্যাম্প জ্বালল আবেল। পাশা একটা প্লেটে করে খাবার বেড়ে দিল ওর সামনে।

'কোথায় ছিলে তুমি?' আপ্লুত কণ্ঠে জানতে চাইল দিনা।

হালকা একটু হাসি উপহার দিল রানা। মেয়েটা এখনও একটা বিরাট রহস্য ওর সামনে, তবে গলায় উদ্বেগের যে-ছোঁয়া দেখা যাচ্ছে, তাতে খাদ নেই।

'বাংলায় একটা প্রবাদ আছে: *একবার না পারিলে দেখো শতবার।*' রানা বলল। 'সেটা মনে পড়ে যাওয়ায় একটু ঘুরতে বেরিয়েছিলাম।' আবেলের দিকে ফিরল ও। 'গিয়ার আনতে অসুবিধে হয়নি তো?'

'হয়েছে,' গোমড়ামুখে বলল আবেল। 'আদোবা নদীতে ঢল নেমেছে। এক্সক্যাভেটর দিয়ে একটা অস্থায়ী বাঁধ বানিয়ে তার উপর দিয়ে এসেছি আমরা। তবে ফেরার পথে ওভাবে যাওয়া সম্ভব হবে না। স্রোতের গতি ক্রমশ বাড়ছে, বাঁধ-টাঁধ সব ভেঙে নিয়ে যাবে কয়েকদিনের মধ্যেই।'

'পরেরটা পরে ভাবা যাবে,' রানা বলল। 'নাকফায় কী অবস্থা?'

'ভাল। ওখানে সন্দেহজনক কাউকে চোখে পড়েনি। ইয়োরোপিয়ানরা সম্ভবত হাল ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।'

'উঁহুঁ, এত সহজে হাল ছাড়ার লোক নয় ওরা। আমাদের খোঁজ জানে না বলে ওদের দেখতে পাওনি।' প্লেট থেকে রুটি ছিঁড়ে মুখে দিল ও। 'আহ্‌হ্, খাবার রেখে বড় ভাল করেছ, পাশা। ব্রেকফাস্টের পর থেকে কিছুই পেটে পড়েনি।'

'শুনলাম, খনিতে নেমেছিলে?' বলল দিনা।

'হ্যাঁ,' রুটি চিবুতে চিবুতে বলল রানা। 'কিচ্ছু নেই ওখানে। প্রচুর টানেল খুঁড়েছে ওরা, চেষ্টায় কমতি ছিল না, তবে কিম্বারলাইট পায়নি।' দিনার বাড়িয়ে ধরা থার্মোস ফ্লাস্কটা নিয়ে মগে কফি ঢালল ও।

'আর এই খনি নিয়েই পাগল হয়ে উঠেছে সবাই?' ভুরু কোঁচকাল আবেল।

রানা কাঁধ ঝাঁকাল। 'সবাই কি না, জানি না। তবে একটা পক্ষ তো বটেই। তবে সেটা কারা, বুঝতে পারছি না।'

'একটা পক্ষ মানে?' দিনার কপালে ভাঁজ পড়ল।

'আমাদের পিছনে দুটো গ্রুপ লেগেছে,' বলল রানা। 'আসমারার হোটেলে য়া ঘটেছে, তাতে মনে হয় না ওরা কেউ কাউকে খুব একটা পছন্দ করে। আমি শিয়োর, ওদের একদল এই খনিটা খুঁজছে। আর অন্যেরা চাইছে সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু।'

'ভিন্ন কিছুটা কী?'

'আরেকটা খনি,' অর্থপূর্ণ স্বরে বলল রানা। 'এখন আর কিছু ব্যাখ্যা করতে পারব না, সকালে বলব। বড্ড টায়ার্ড লাগছে, ঘুমাতে দাও আমাকে।'

খাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়ল ও—অন্যদের মনে একগাদা প্রশ্নের জন্ম দিয়ে।

ভোরের আলো ফোটার আগেই হৈচৈ করে সবার ঘুম ভাঙাল রানা। বলল, 'অনেক কাজ পড়ে আছে সামনে। সময় নষ্ট করা যাবে না। কুইক, তৈরি হয়ে নাও সবাই।' সবার আগে নাশতা সেরে বাঙ্কহাউস থেকে বেরিয়ে গেল ও।

একটু পর বেরুল এক্সক্যাভেটরের মালিক। রানাকে বিশাল যন্ত্রটার ড্রাইভিং ক্যাবে দেখে মাতৃভাষায় চেঁচামেচি জুড়ে দিল সে। হাত নেড়ে নেমে যেতে ইশারা করছে।

আবেল বেরিয়ে এসেছে চেঁচামেচি শুনে। ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'সমস্যাটা কী ওর?'

'বলছে, ওর এক্সক্যাভেটর চালাবার জন্য কোয়ালিফায়েড নন আপনি,' উত্তর দিল আবেল। 'ও ছাড়া আর কেউ এতে হাত দিলে মেশিন নষ্ট হয়ে যেতে পারে।'

'জিজ্ঞেস করো, একটা ডেমোনস্ট্রেশন দিতে পারি কি না আমি।' রানা জানে, এদেরকে তাক লাগাতে পারলে আনুগত্য পাওয়া যাবে সহজেই।

রাজি হলো লোকটা। কাজেই ক্যাবের ভিতরের কন্ট্রোল প্যানেলে চোখ বোলাল রানা। ইঞ্জিন গজ বলছে, জীবদ্দশায় কয়েক হাজার ঘণ্টা চলেছে যন্ত্রটা, তবে এর ভিতর একবারও মেইনটেন্যান্স হয়েছে কি না সন্দেহ। ইগনিশনের চাবি ঘোরাল ও; কপাল ভাল, সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল ইঞ্জিন। ক্যাব থেকে নেমে এসে আবেলের কাছ থেকে একটা দেশলাইয়ের কাঠি নিল রানা, ও তখন দিনের প্রথম সিগারেটটা ধরাতে যাচ্ছে।

'ধরিয়ো না সিগারেট,' বলল রানা।

এগিয়ে গিয়ে এক্সক্যাভেটরের বাকেটের সবচেয়ে লম্বা দাঁতটার সঙ্গে টেপ দিয়ে দেশলাইয়ের কাঠিটা আটকাল ও। আবেলকে বলল একটু সরে এসে বিশাল যানটার মুখোমুখি দাঁড়াতে।

ক্যাবে উঠে হাইড্রলিকস্ পরীক্ষা করল রানা—পুরো বডি রোটেট করল, আর্মটাকে প্রসারিত আর সংকুচিত করল, বাকেটটাকেও পুরো দশ-ডিগ্রির সীমা পর্যন্ত ডানে-বাঁয়ে কাত করে দেখল। সন্তুষ্ট হলো ও—লিভারগুলোর সাহায্যে ইচ্ছেমত নড়াতে পারছে সব।

ইতোমধ্যে বাঙ্কহাউস থেকে বেরিয়ে এসেছে সবাই, লাইন ধরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে রানার খেলা দেখবার জন্য। কী করতে চাইছে ও, তা বুঝতে পারছে ওরা; কিন্তু সত্যি সত্যি পারবে কি না, তা নিয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। এক্সক্যাভেটরের মালিকের ঠোঁট বেঁকে গেল হঠাৎ একবার রানা ভুল করে ইঞ্জিনের রেভল্যুশন বাড়িয়ে ফেলায়।

'আমার উপর আস্থা রাখো, আবেল,' চেঁচাল রানা। 'নোড়ো না।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ইরিত্রিয়ান বীর, ঠোঁটে একটা সিগারেট ঝুলছে।

লিভার চেপে বাকেটটাকে নীচে নামিয়ে আনল রানা, দেশলাইয়ের ডগাটা আলতো করে ঠেকাল মাটিতে। তারপর... হঠাৎই বাকেটটাকে মোচড় দিল ও, রুক্ষ সারফেসে ঘষা খেয়ে জ্বলে উঠল বারুদ। সঙ্গে সঙ্গে আর্মটাকে উঁচু করল রানা, প্রসারিত করল লক্ষ্যের দিকে। বিশাল বাকেটটাকে ভয়ানক গতিতে ছুটে আসতে দেখে ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল আবেল।

তবে ওকে আঘাত করল না রানা, কন্ট্রোলের উপর হাত-পা নেচে বেড়াচ্ছে ওর, ঠিক আবেলের মুখের কাছে নিয়ে থামাল বাকেটটাকে। বাতাসে নিভে যাবার আগেই জ্বলন্ত কাঠিটা ঠেকাল আবেলের ঠোঁটে ধরা সিগারেটে। নার্ভাস ভঙ্গিতে টান দিল সে—লাল হয়ে জ্বলে উঠল তামাক। নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল আবেল। হাসল, তবে তাতে প্রাণ নেই। ভয় পেয়ে গেছে ভীষণ।

দর্শকরা অবশ্য মুগ্ধ। হাততালি দিয়ে উঠল সবাই। হর্ষধ্বনির মাঝে ক্যাব থেকে নেমে এল রানা। দর্শকদের উদ্দেশে একটা বাউ করল পেশাদার শো-ম্যানের মত।

'কীভাবে করলে ওটা?' বিস্মিত ভঙ্গিতে জানতে চাইল দিনা।

'প্র্যাকটিস,' মুচকি হেসে বলল রানা, তাকাল আবেলের দিকে। 'এক্সক্যাভেটরের মালিককে জিজ্ঞেস করো, এখন আমাকে কোয়ালিফায়েড ভাবছে কি না।'

'জিজ্ঞেস করার কোনও দরকার আছে বলে মনে করছি না,' ভকভক করে ধোঁয়া ছাড়ল আবেল। 'ওর মুখটা দেখুন—যেভাবে হাঁ করে আছে, গোটা একটা অ্যারোপ্লেন ঢুকে যেতে পারবে।'

'তা হলে সময় নষ্ট কোরো না,' রানা বলল। 'ওকে বলো এক্সক্যাভেটরটা ট্রেইলারে তুলে ফেলতে। আমরা একটা লং-ড্রাইভে যাব।'

উপত্যকার এক প্রান্তে, উত্তরদিকের পাহাড়সারির গোড়ায় পৌঁছে ল্যাণ্ড-ক্রুজারের গতি কমাল রানা। স্টিয়ারিঙের উপর ঝুঁকে বেশ কিছুক্ষণ থেকে ড্রাইভ করছে ও, উইণ্ডশিল্ডের ভিতর দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে পাহাড়ের চূড়াগুলো, ওগুলোকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করছে। একটু পর থামল ও, ট্রেইলারটাকে পৌঁছুবার সময় দিল, তারপর নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। পাহাড়ি একটা ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করে বাকিদের বলল, 'আমাকে ফলো করো।'

পঞ্চাশ ফুট চড়ার পর একটা স্যাণ্ডস্টোনের চাতাল পাওয়া গেল। সেখানে

দাঁড়িয়ে সঙ্গীদেরকে নীচের বিস্তৃত প্রান্তরটা দেখাল রানা। জিজ্ঞেস করল, 'কী দেখতে পাচ্ছ?'

'কিছুই না,' সোজাসাপ্টা গলায় বলল দিনা।

'গতকাল এখানে উঠে প্রথমে আমারও তা-ই মনে হয়েছিল,' হাসল রানা। পরমুহূর্তে লক্ষ করল, সঙ্গীরা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। 'শুরুতে, তোমাদেরকে তো ব্যাখ্যা করা হয়নি সবকিছু। গতকাল খনিটার ভিতর থেকে ঘুরে আসার পর আমার মনে হলো, অমন একটা মূল্যহীন জিনিসের ব্যাপারে সম্পূর্ণ ভিন্ন দু'দল মানুষ কখনোই আগ্রহী হয়ে উঠতে পারে না। অবস্থা দেখে মনেও হচ্ছে না, তারা একে-অন্যকে আগে থেকে চেনে। তাই একই জিনিসের পিছনে ছোটার সম্ভাবনাও কম বলে মনে হলো। একটা থিয়োরি খাড়া করেছি আমি অনেক ভেবে-চিন্তে—দুটো পক্ষই হীরার খনি খুঁজছে বটে, কিন্তু সম্ভবত একই খনি নয়।'

'কী বলছেন এসব, এফেন্দি?' বিরক্ত গলায় বলল আবেল। 'আমাদের দেশে দু-দুটো হীরার খনি আছে?'

'তা বলছি না,' রানা মাথা নাড়ল। 'তবে হীরার খোঁজে দু'বার... দু'জায়গায় খোঁড়া হয়েছে বলে সন্দেহ আমার।'

'ব্যাপারটা খুলে বলো তো!' দিনার কণ্ঠে কৌতূহলের পাশাপাশি আরেকটা কিছুর আভাস পেল রানা।

'আমার ধারণা, এখানে দুটো খনি আছে,' রানা বলল। 'একটা তো দেখতেই পেয়েছ—ইটালিয়ান উপনিবেশ আমলের। অন্যটা সম্ভবত আরও আগে খোঁড়া হয়েছিল। আমার মনে হচ্ছে, *অ্যাম্বাসয়রা* হোটেলের ইয়োরোপিয়ান লোকগুলো ইটালিয়ানদের প্রতিনিধিত্ব করছে... মানে, যারা আমাদের পাওয়া খনিটা খুঁজছে। আর সুদানিজরা আসছে সম্পূর্ণ ভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে—ওরা চাইছে আরও পুরনো খনিটা। সমস্যা হলো, কেউই জানে না—খনিদুটোর লোকেশন কোথায়।'

দিনার মাথা ঝাঁকানো দেখে মনে হলো ব্যাখ্যাটা মেনে নিয়েছে ও, কিন্তু মেয়েটির ভিতর এক ধরনের অস্বস্তি চোখে পড়ল—কয়েক মুহূর্ত আগে এই অস্বস্তি ছিল না। অবশ্য রানার ব্যাখ্যায় কিছুটা খুঁত তো আছেই। এই সিনারিও-তে সোহেলের কিডন্যাপিং-টা কীভাবে ফিট করছে, তা জানা নেই ওর। অপহরণকারীদেরকে ইটালিয়ান ভাবতে পারলে সমস্যাটা মিটে যেত, সোহেল যে মদ দেবার কথা বলেছে... তারও একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ইটালিয়ানরা বন্দিকে মদ খাওয়ালে খাওয়াতে পারে, কিন্তু মুসলিম ফ্যানাটিকরা খাওয়াবে না। এখন কথা হলো, এর ভিতর মুসলিম চরমপন্থীরা জড়িত না থাকলে ইজরায়েল, বা মোসাদের স্বার্থ কোথায়?

'যা-হোক,' কথার খেই ধরল রানা। 'পুরনো খনিটা নিশ্চয়ই ইটালিয়ানরা এখানে আসবার আগেই হারিয়ে গেছে, নইলে উপত্যকা সার্ভে করবার সময় ওরা ওটার খোঁজ পেয়ে যেত; ভুল জায়গায় মাটি খুঁড়ত না।'

'ভুল জায়গা?' ভুরু কোঁচকাল দিনা।

'হ্যাঁ, কিম্বারলাইটের ভেন্টের আনুমানিক লোকেশন থেকে তিন মাইল দূরে খুঁড়তে শুরু করেছিল ওরা। তার পিছনে অবশ্য যুক্তিও আছে। ওদের জিয়োলজিস্ট নিশ্চয়ই ভেবেছিল, ভেন্টটা বৃত্তাকার উপত্যকার ঠিক মাঝখানে ডুবে আছে; সেই মোতাবেক ওটার পাশে নিজেদের শাফট খুঁড়েছে। কিন্তু লোকটা বুঝতে পারেনি, লাখ লাখ বছরে প্রকৃতির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে; ঝড়-বৃষ্টি আর বাতাসের আঘাতে বদলে গেছে সারফেসের চেহারা। পাহাড়গুলো এখন আর পাইপটাকে ঘিরে নেই, বরং ওটার মাথার উপরেই বসে আছে। এখন... যদি ধরে নিই, ইটালিয়ানরা আসার বহু আগেই কেউ ওটা খুঁড়েছিল, তা হলে তার চিহ্ন থাকতে বাধ্য।'

'পেয়েছ চিহ্ন?'

'এখুনি জানতে পারবে,' বলল রানা। 'যে-কোনও মাইনিং অপারেশনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ভেন্টিলেশন। মাটির নীচে কাজ করতে থাকা শ্রমিকদের শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার জন্য, সেই সঙ্গে উড়তে থাকা ধুলো সরিয়ে নেবার জন্য সারফেসের কোথাও ফাঁক থাকা দরকার। দক্ষিণ আফ্রিকার বড় বড় খনিগুলোতে প্রতি এক টন আকরিকের জন্য ষোলো টন বাতাস পাম্প করে ঢোকানো হয় খনির ভিতরে। কিন্তু পুরনো আমলের খনিতে... মানে আধুনিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের আগে যেগুলো খোঁড়া হতো... সেগুলোতে বাতাস ঢোকানো সহজ ছিল না, নানা রকম কৌশল অবলম্বন করতে হতো। গতকাল পাশা তোমাদেরকে আনতে যাবার পর একটা মেটাল ক্যান আর শাবলের হাতল জোড়া দিয়ে একটা হ্যাণ্ড-মেইড অ্যানোমিটার তৈরি করেছিলাম আমি। ওটা নিয়ে গোটা উপত্যকায় ঘুরে বেড়িয়েছি, বাতাসের গতি পরীক্ষা করেছি। এই স্পটটাতে আসার পর দেখলাম, এখানে উত্তরের পাঁচিলে বাড়ি খেয়ে প্রচণ্ড গতিতে নীচে নেমে আসছে বাতাস... স্পিড ঘণ্টায় বিশ মাইলের মত।' মাটিতে আঙুল দিয়ে একটা ছবি আঁকল ও—তাতে পাহাড়ের ঢালে বাড়ি খেয়ে নামা বায়ুপ্রবাহের পথটা দেখা যাচ্ছে; পাহাড়ের মুখোমুখি রয়েছে *ভি* শেপের মত দুটো দাগ। 'কঠিন কাজ হচ্ছে, এই বাতাসটাকে প্রয়োজনমাফিক শাফটের ভিতর দিয়ে খনির মধ্যে ঢোকানো।' উপত্যকার মেঝের দিকে ইশারা করল রানা। 'এবার নীচের দিকে তাকাও তোমরা। দেখো, ওখানে কিছু বোঝা যায় কি না।'

তাকাল সবাই। বয়স সবচেয়ে কম বলে পাশার দৃষ্টি সবচেয়ে প্রখর; ও-ই দেখল আগে। আঙুল তুলে বলল, 'ওই তো... আপনার আঁকা ছবির মত দুটো দাগ আছে ওখানে।'

এবার বাকিরাও দেখল। ধুলোর মধ্যে দুটো সরলরেখার মত দাগ—উপত্যকার মেঝের চেয়ে একটু গাঢ় রঙের। প্রায় দুইশ' ফুট দীর্ঘ, কৌণিকভাবে চলে গেছে পরস্পরের দিকে; ইংরেজি *ভি* অক্ষরের মত হতে গিয়ে হয়নি। প্রায় লেগে থাকা প্রান্তদুটো রয়েছে দর্শকদের দাঁড়িয়ে থাকা চাতালের ঠিক তলায়। একেবারে নিখুঁত রেখাদুটো, প্রাকৃতিক হলে এমনটা হতো না; দেখেই বোঝা যায়—মানুষের তৈরি।

'কী ওগুলো?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল দিনা।

'প্রাচীন দুটো প্রাচীরের ফাউণ্ডেশন,' বলল রানা। 'সাইজ দেখে মনে হচ্ছে অন্তত সত্তর ফুট উঁচু ছিল একেকটা। বাতাসের প্রবাহ ধরে খনির এন্ট্রান্সের দিকে বইয়ে নিত। পাহাড়ের গায়ে ঠিকমত খুঁজলে আউটলেটগুলোও পাওয়া যাবে বলে আমার ধারণা। তবে ওসব নিয়ে আপাতত মাথা না ঘামালেও চলে।'

'তুমি কি বলতে চাইছ, আমরা আরেকটা খনির মাথায় দাঁড়িয়ে আছি?'

'হ্যাঁ,' উত্তেজনা চেপে বলল রানা। 'হরাইজন্টাল একটা ড্রিফট... পাহাড়ের ভিতরে ঢুকে গেছে!'

'কবে খোঁড়া হয়েছে ওটা?' হতভম্ব গলায় প্রশ্ন ছুঁড়ল আবেল।

'ঠিক বলতে পারব না। দেয়ালদুটোর ফাউণ্ডেশন নিয়ে রিসার্চ করলে হয়তো জানা যেতে পারে।'

'কবে খোঁড়া হয়েছে, সেটা বাদ দাও,' বলল দিনা। 'কারা খুঁড়েছে ওটা—তা জানো?'

ওর দিকে তাকিয়ে একটু চুপ করে রইল রানা। কেন যেন মনে হচ্ছে, প্রশ্নটার জবাব দিনার জানা আছে। জোরে শ্বাস ফেলে ও বলল, 'ভিতরে ঢুকলেই সেটা জানতে পারব আমরা।'

ঘণ্টাখানেক পর এক্সক্যাভেটরের সাহায্যে দুই প্রাচীরের রেখার মুখোমুখি পাহাড়ের গোড়ায় গর্ত খুঁড়তে শুরু করল ওরা। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ইশারা দিতে থাকল রানা যন্ত্রটার অপারেটরকে—বাকেটটা কোথায় বসাতে হবে, সেটা দেখিয়ে দিচ্ছে। হাতে একটা কোদাল রেখেছে ও, দশ মিনিট পর পর নামছে গর্তটাতে, তলা থেকে উঠিয়ে আনছে মাটি-পাথরের স্যাম্পল, উপরে এনে গভীর মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করছে। তারপর আবার ইশারা করছে এক্সক্যাভেটরটাকে কাজ করবার জন্য। প্রতিবারই আগের চেয়ে বিপজ্জনক হয়ে পড়ছে গর্তে ওঠানামা—শেষবার যখন নামল, তখন ওটা পনেরো ফুট গভীর, কিনারের দেয়াল থেকে ঝুরঝুর করে ঝরছে মাটি... যে-কোনও মুহূর্তে ধসে পড়তে পারে। তাপমাত্রা একশো ডিগ্রি ছাড়িয়ে গেছে ইতোমধ্যে, গরমে দরদর করে ঘামছে ও। কাজ করছে খালি গায়ে।

ষষ্ঠবার গর্ত থেকে উঠে আসতেই দিনা এগিয়ে গেল রানার দিকে। জিজ্ঞেস করল, 'কী খুঁজছ তুমি?'

'ওভার-বারডেন,' বলল রানা, 'মানে... খনির অকেজো পাথর।' একটা রুমাল নিয়ে মুখ-হাত মুছল ও। আবেল আর পাশা ব্যস্ত ট্রেইলার থেকে ছোট ইকুইপমেন্ট নামাতে; সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'প্রথম যখন খোঁড়া হয় গর্তটা, তখন অদরকারি মাটি-পাথর এন্ট্রান্সের কাছে স্তূপ করে রাখার কথা পুরনো মাইনারদের। সারফেস ম্যাটেরিয়ালের চাইতে ওগুলো আলাদা হবে।'

'অকেজো পাথর নিয়ে সময় নষ্ট করছ কেন? দেয়ালদুটোর মাঝ বরাবর থাকার কথা এন্ট্রান্সটার, সরাসরি ওখানেই খুঁড়লে পারো!'

'শাফটটা রি-ওপেন করবার আগে ভিতরে কী পাওয়া যেতে পারে, তার একটা আইডিয়া থাকা দরকার আমাদের... নিরাপত্তার খাতিরে,' রানা ব্যাখ্যা

করল। 'ভাঙা কিম্বারলাইটের টুকরো আছে কি না, সেটাই দেখছি আমি।'

'দরকার কী? ভিতরে যে হীরা আছে, তা তো আমরা জানিই!'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা, দিনার কথাটাকে গুরুত্ব না দিয়ে আবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে উল্টো ঘুরল মেয়েটা, গটমট করে হেঁটে চলে গেল। খেপেছে। আড়চোখে ওর গমনপথের দিকে তাকাল রানা; ভিতরে কিছু একটা যে আছে, সে-ব্যাপারে দিনা নিশ্চিত... কিন্তু ওর আগ্রহটা কেবল হীরা নিয়ে, সেটা বিশ্বাস হতে চাইছে না। খনির এন্ট্রান্সটা খোলার পর ওর মুখোমুখি হবে বলে ঠিক করল রানা, চাপ দিয়ে আসল কথা বলতে বাধ্য করবে।

দুপুর নাগাদ পাহাড়ের পাদদেশে পঞ্চাশ-ফুট দীর্ঘ একটা ক্ষতের সৃষ্টি হলো। পাহাড়ের কিনারার মাটি ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ল তলার অবলম্বন হারিয়ে, সেগুলোকে সরিয়ে আবার গর্ত খুঁড়ে চলল ওরা। এক্সক্যাভেটরের নিয়ন্ত্রণ এখন রানার হাতে, ইরিত্রিয়ান অপারেটর নীচে নেমে গাইড করছে ওকে—লোকটার নাম আবুদা, ইতোমধ্যে জানা হয়ে গেছে রানার। কিম্বারলাইটের সন্ধান যখন পাওয়া গেল, তখন প্রায় একটা বাজে।

আবুদার ইশারা পেয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করল রানা, নেমে এল ক্যাব থেকে। এক্সক্যাভেটরের বাকেট থেকে নীলচে গুঁড়োয় ভরা একমুঠো মাটি ওর হাতে তুলে দিল অপারেটর, ওটা ভাল করে পরীক্ষা করল ও। কিম্বারলাইটকে একেবারে গুঁড়ো করে ফেলা হয়েছে, সবচেয়ে বড় টুকরোগুলো রানার বুড়ো আঙুলের ডগার চাইতে বড় হবে না। আকরিক পরিশোধনে প্রাচীন খনির শ্রমিকেরা ভালই খাটুনি দিয়েছে—হীরার খুদে কণাও যেন হাতছাড়া না হয়, সেটা নিশ্চিত করতে কিম্বারলাইটকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গুঁড়োয় পরিণত করা হয়েছে। এই পরিমাণ কাজ শুধুমাত্র বড় মাইনিং অপারেশন ছাড়া করা যায় না, বাড়তি লোক রাখতে হয়। কিম্বারলাইট অত্যন্ত শক্ত একটা বস্তু, ওটাকে গুঁড়ো করতে চাইলে প্রচুর শ্রম ও সময় দিতে হয়।

আবুদার কাছ থেকে কোদাল নিয়ে গর্তে নেমে পড়ল রানা, বাতিল কিম্বারলাইটের স্তূপে কোপাতে শুরু করল। কাজটা সহজ হলো না। সময়ের আবর্তন... সেইসঙ্গে পাহাড়ের ওজন আর চাপে প্রায় নিরেট হয়ে গেছে কিম্বারলাইটের গুঁড়ো। কোদালের কোপে খুব সামান্যই ভাঙছে। অনেকক্ষণ খাটুনি করার পর ঠং করে কীসে যেন বাড়ি খেল কোদালের চপা। ওটা সরিয়ে রেখে সদ্য-খোঁড়া গর্তটাতে হাত ঢুকিয়ে দিল রানা, বের করে আনল অন্য রকম একটা পাথর। আকারে বেশি বড় নয়—হাতের মুঠির সমান হবে; সাদা, কিনারগুলো মানুষের হাতে কুঁদে ফেলা হয়েছে... এবড়োখেবড়ো। আলোর মধ্যে পাথরটাকে ধরে ভাল করে দেখল রানা।

কয়েক সেকেণ্ড পরই বিস্ময় ভর করল ওর ভিতর। পাথরটা দেখে বুঝতে পারছে, খনির বয়সের ব্যাপারে ওর পুরনো ধারণাটা কতখানি ভুল ছিল। অন্তত কয়েক হাজার বছরের পুরনো ওটা! একটা লেদার-ব্যাগ আছে রানার কাছে, গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে পাথরটা ওটায় ভরে রাখল ও।

একটু পরেই লাঞ্চের ডাক পড়ল—শুকনো খাবার আর ইন্দা বাবু গ্রাম থেকে আনা বিয়ার পরিবেশন করেছে পাশা। পাহাড়ের ছায়ায় বসে নিঃশব্দে খাওয়া সারল সবাই। রানার কাছ ঘেঁষে বসেছে দিনা, হাঁটুর সঙ্গে প্রায় হাঁটু লাগিয়ে।

ট্রাক-ড্রাইভারের একটা প্রশ্ন অনুবাদ করে শোনাল আবেল। 'মি. রানা, জিপ্পি জানতে চাইছে... আপনি কি আজ সারাদিন খোঁড়াখুঁড়ি চালাতে চান?'

'কেন, অসুবিধে আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না, মানে... খুব গরম পড়েছে তো! ওরা বিশ্রাম চাইছিল।'

'দুঃখিত, আবেল। কাজ থামানো সম্ভব না। আমাদের উপস্থিতি কতক্ষণ গোপন থাকবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। পাহাড়ের কারণে এক্সকাভেটরের আওয়াজ কিছুটা আটকা পড়ছে বটে, কিন্তু কাছাকাছি এলে পাহাড়ের ওপাশ থেকে ঠিকই শোনা যাবে শব্দটা।'

কথাটা বুঝিয়ে দেয়ার পর অসন্তোষ ফুটল ট্রাক-ড্রাইভার জিপ্পির চেহারায়।

'খনির-এন্ট্রান্স খোলার সময় হয়ে গেছে,' পরিবেশটা হালকা করবার জন্য বলল রানা। 'কিম্বারলাইটের ওভার-বারডেন পেয়ে গেছি আমরা। ভিতরে ঢোকা নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

'ভিতরে কী পাবেন বলে আশা করছেন আপনি?' জানতে চাইল আবেল।

'আমার একটা থিয়োরি আছে,' বলল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল দলের কনিষ্ঠতম সদস্যের দিকে। 'পাশা, আবেলের কাছে শুনেছি, এদিকে একটা মঠ আছে। ওটা চেনো তুমি?'

'ওকে কী দরকার?' বলে উঠল আবেল। 'আমিই চিনিয়ে দিতে পারি। এখান থেকে কমবেশি ষাট মাইল দূরে ওটা।'

'না, তোমাকে আমার এখানে দরকার—খনির মুখ খোলার কাজটা তদারক করতে হবে,' রানা বলল। 'তবে আমি ওখানে গিয়ে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। পাশা, তুমি আমাকে নিয়ে যেতে পারবে?'

'ইয়ে... পারব বোধহয়,' দ্বিধান্বিত গলায় জবাব দিল পাশা। 'তবে জায়গাটা অনেক দূর!'

'দরকার হলে আবেলের কাছ থেকে বুঝে নাও,' রানা বলল। 'হাতে সময় আছে, আগামী দু'একদিনের মধ্যে রওনা হচ্ছি না আমরা।'

'সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কথা বলতে চান কেন?'

'মঠটা অনেক বছর ধরে আছে ওখানে,' বলল রানা। 'আমার মনে হচ্ছে, ওখানকার সন্ন্যাসীরা এই খনি... আর এটা কারা খুঁড়েছিল, সে-সম্পর্কে সবকিছু জানে।'

'সে-সব জেনে তোমার কী লাভ হবে?' জিজ্ঞেস করল দিনা।

'লাভ হবে, নাকি ক্ষতি—সেটা জানবার জন্যই তো যেতে চাইছি!' একটু রুক্ষ গলায় বলল রানা। উঠে পড়ে প্যান্টের ধুলো ঝাড়ল ও। ওর আচরণের পরিবর্তন দিনা ধরতে পেরেছে নিঃসন্দেহে, তাতে কিছু যায়-আসে না। ওকে বোকা ভাবছে মেয়েটা, আর সেটাই মাথায় আগুন জ্বেলে দিচ্ছে রানার। পুরো ব্যাপারটা কী নিয়ে, তা খুব ভাল করেই জানা আছে দিনার, অথচ এমন ভান

করছে যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। এমন সব প্রশ্ন করছে, যার উত্তর পেটের ভিতর নিয়ে বসে আছে ও। প্রশ্ন তো করবে রানা, আর সেটার সময়ও ঘনিয়ে আসছে।

রুটিন ধরে টানা তিনদিন কঠোর পরিশ্রম করল ওরা। অবসাদে ভেঙে পড়বার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত খাটতে বাধ্য হলো রানার তাগাদায়। আবেল আর জিল্লি মিলে পুরনো টিন দিয়ে একটা প্লাউ বানিয়ে নিয়েছে, সেটা ট্রাকের সামনে আটকে যানটাকে বুলডোজারে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এক্সক্যাভেটরের খুঁড়ে আনা মাটি সেই বুলডোজার দিয়ে সরিয়ে নিচ্ছে দূরে। খোঁড়াখুঁড়িটা পালা করে করছে রানা আর আবুদা, পাশার কাজ সামনে দাঁড়িয়ে এক্সক্যাভেটরটাকে গাইড করা। এসবের পাশাপাশি আর কোনও কাজ না থাকায় দিনার হাত খালি, তাই সেধে ঘাড়ে তুলে নিয়েছে রান্নাবান্নার দায়িত্ব।

তৃতীয় দিন বিকেলেও খনির এন্ট্রান্সের হদিস না পাওয়ায় কাজ বন্ধ করে দিল রানা, সবাইকে নিয়ে মিটিঙে বসল। ইতোমধ্যে বাট ফুট চওড়া আর দ্বিগুণ গভীরতার একটা গর্ত খুঁড়ে ফেলেছে ওরা পাহাড়ের গোড়ায়। পরিশ্রমটা বৃথা গেছে, ফল পাওয়া যায়নি।

আবেলের বাড়িয়ে ধরা বিয়ারের ক্যানে চুমুক দিয়ে রানা বলল, 'পাহাড়টা উড়িয়ে দেব বলে ভাবছি আমি। গর্তটা খুঁড়ে আর বড় করা ঠিক হবে না, এমনিতেই পাহাড়ের ঢালটার ভিত নরম হয়ে গেছে, যে-কোনও মুহূর্তে ধস নামতে পারে। তারচেয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে উড়িয়ে দেয়াই ভাল। পরে নাহয় আবার খোঁড়াখুঁড়ি করা যাবে। কারও কোনও আপত্তি আছে?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল আবেল। 'ওটাই একমাত্র উপায়। আগেও খনিতে কাজ করেছি আমি, এ-ধরনের পরিস্থিতিতে ব্লাস্ট ঘটানোই উত্তম।'

'নাক্‌ফা থেকে ফার্টিলাইজার আনতে বলেছিলাম তোমাকে... এনেছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ! অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট—দুইশ' পাউণ্ড। সঙ্গে পাঁচ হাজার গজ ডিটোনেটর কর্ড।'

আমেরিকা থেকে রওনা হবার আগে অর্ডার দেয়া এক্সপ্লোসিভ আসমারায় পড়ে আছে, আনতে পারেনি রানা। তাই ইম্প্রোভাইজেশনের সাহায্য নিতে হচ্ছে।

'গুড,' বলল ও। 'ট্রাকের অক্সিলারি ট্যাঙ্ক থেকে ডিজেল নেব আমরা। বড় বিস্ফোরণের দরকার নেই, ছোট একটা ধাক্কা দিলেই ঢালটা ধসে পড়বে।' পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বিস্ফোরণ কোথায় ঘটাবে, সেটা ঠিক করবার চেষ্টা করল রানা। 'আর হ্যাঁ... ধসটা নামিয়েই আমি, পাশা আর দিনা চলে যাবো ওই মঠটাতে। সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কথা বলে আসব।'

'আমাকে কী দরকার?' জানতে চাইল দিনা। প্রশ্নটা ব্রেক করার জন্য করা, চেহারা দেখে মনে হচ্ছে না, যেতে ওর খুব একটা আপত্তি আছে।

'পাশার ইংরেজি তেমন সুবিধের নয়। কাজেই বাবুর্চির পদ থেকে দোভাষী হিসেবে তোমাকে প্রোমোশন দিতেই হচ্ছে আমার।'

'এভাবে প্রমোশন দিতে থাকলে সপ্তাহখানেকের মধ্যে তোমার পোস্টটাও নিয়ে নেবে,' মুচকি হেসে বলল দিনা।

'তা হলে তো ভালই হয়,' হাসি ফুটল রানার মুখেও—গত কয়েকদিনের মধ্যে এই প্রথম। তবে হাসিটা কৌতুকের জন্য নয়, মঠে যাবার পথে দিনার কাছ থেকে সমস্ত কিছু জেনে নিতে পারবে বলে।

চার

আসমারা, ইরিত্রিয়া।

ইরাশাদ নিশাচর। ছায়ার সঙ্গে মিশে যাবার সমস্ত কলাকৌশল জানা আছে তার। সেই কৌশল খাটিয়ে ভূতের মত হাঁটছে সে—অদৃশ্য হয়ে, এবং নিঃশব্দে। কোনও তাড়াহুড়ো করছে না, সযত্নে এড়িয়ে যাচ্ছে রাস্তার দু'পাশে জ্বলতে থাকা নিয়ন স্ট্রিটল্যাম্পগুলোকে।

এগারোটা বাজতে না বাজতে নিথর হয়ে গেছে গোটা রাজধানী। দিনের বেলার ব্যস্ত সড়কগুলোতে এখন আর একটা গাড়িও চলছে না, দেখা মিলছে না কোনও পথচারীর। গত কয়েকদিনে আরও কয়েকবার বেরিয়েছিল ইরাশাদ, কিন্তু কোনও পুলিশ টহল দেখতে পায়নি।

নাকফা থেকে ফেরার পর গোটা দলকে নিয়ে পুরনো সোভিয়েত প্যারেড-গ্রাউন্ডের কাছে একটা জরাজীর্ণ হোটেলে উঠেছে সে। হোটেলের মালিক ওদের ব্যাপারে কিছুটা সন্দিহান হলেও যথেষ্ট টাকা পেয়ে মুখ বন্ধ রেখেছে। অ্যাকসামের হোটেলে গোলাগুলির ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ততার সন্দেহে আসমারার পুলিশ ইথিওপীয় আগন্তুকদের ব্যাপারে খুঁতখুঁতে হয়ে উঠেছে। ইরাশাদের বর্ণনা অবশ্য নেই ওদের কাছে, তারপরও সতর্কতায় কোনও রকম ঢিল দিচ্ছে না পোড়-খাওয়া টেররিস্ট। পত্রিকার খবর পড়ে জানা গেছে, ইথিওপিয়ানদের চেয়ে সুদানিজ বহিরাগত নিয়ে কর্তৃপক্ষ বেশি উদ্বিগ্ন। অ্যাকসামে দু'জন মারা গেছে, বাজার-এলাকায় মারা পড়েছে আরও তিনজন। পত্রিকার সম্পাদকীয়তে এসব অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা

দিকটা দেখার জন্য রয়েছে শুধু একজন র‍্যাবাই—নিজের বাড়িতেই প্রার্থনা ও মাহফিলের আয়োজন করে সে। মানুষটার নাম আন্তরাম বার্দা, চল্লিশের কাছাকাছি বয়স, ঘরে সুন্দরী স্ত্রী আর দুটো বাচ্চা রয়েছে। বার্দার বাবা পঞ্চাশের দশকে যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন, ইহুদিদের অধিকার-আদায়ের সংগ্রামে সক্রিয় কর্মী ছিলেন তিনি; ছেলেকেও একই মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছেন, যাতে প্রয়োজনের সময় সে ইরিত্রিয়ার ইহুদিদেরকে একাট্টা করে তুলতে পারে ধর্মীয় নেতা হিসেবে। বিবাহিত জীবন শুরু করার পর ওসব দর্শন-টর্শন নিয়ে আর মাথা ঘামায় না বার্দা, তার একটাই ইচ্ছে—দুই সন্তানকে ইজরায়েলের বড় ইউনিভার্সিটিতে পড়িয়ে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করবে। সেই স্বপ্নটাকে সফল করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে দলে ভিড়িয়েছে ইয়াশাদ।

বিশ মিনিট পর গন্তব্যে পৌঁছে গেল সে। পুরনো ছোট্ট একটা একতলা বাড়ি, দেয়ালের রঙ ধূসর হয়ে গেছে। দরজার কাছে পৌঁছুনোর সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল পাল্লা, বেল বাজাতে হলো না—বাড়ির মালিক সম্ভবত জানালা দিয়ে রাস্তায় চোখ রাখছিল, অতিথিকে আসতে দেখেছে।

'*সালোম! সালোম!*' হিব্রুভাষার জানা একমাত্র শব্দটা বলে ইয়াশাদকে অভ্যর্থনা জানাল বার্দা।

'হ্যালো, র‍্যাবাই! ভাল আছেন আপনি? চমৎকার রাত, তাই না?' পাল্টা অভিবাদন জানাল ইয়াশাদ। ইংরেজিতে কথা বলছে।

'জী, চমৎকার!' বলল বার্দা। 'ভিতরে আসুন। বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়েছে, আমার স্ত্রী-ও তার এক বান্ধবীর বাড়িতে গেছে... ফিরতে দেরি হবে। একান্তে কথা বলতে পারব আমরা।'

'খুব ভাল।' বাড়ির ভিতরে ঢুকল ইয়াশাদ।

বাতি জ্বালল বার্দা। সামনের ঘরটা চমৎকারভাবে সাজানো। দামি জিনিসপত্র নেই তেমন একটা, তবে সবকিছুতে যত্নের ছাপ রয়েছে... দেখলেই মনে প্রফুল্ল একটা ভাব সৃষ্টি হয়। চা দেবে কি না, জানতে চাইল বার্দা, তবে ইয়াশাদ মাথা নেড়ে মানা করল।

'আগেও বলেছি, তবে আবারও না বলে পারছি না,' অতিথির মুখোমুখি বসতে বসতে বলল বার্দা, 'আপনাকে... এবং প্রিয় ইজরায়েলকে সাহায্য করতে

[illegible]

'তো... প্রিয় বন্ধু আমার, কী খবর পেয়েছেন আপনি?'

'আমার সাহায্য চেয়ে খুব ভাল কাজ করেছেন। উত্তরাঞ্চলে মাত্র একটা ইহুদি পরিবার বাস করে, ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কিছুই জানতে পারিনি। ওরা অস্বাভাবিক কোনও ঘটনার বিষয়ে জানে না। তবে আমার বউয়ের এক ভাইয়ের ছেলেবেলার বন্ধু নাক্‌ফায় একটা মুদি দোকান চালায়, ও নাকি ওখানে বেশ কিছুদিন ধরে একটা বড় ট্রাক্টরের মত যন্ত্রকে কাজ করতে দেখেছে...'

'সে তো আমিও দেখেছি,' বাধা দিয়ে বলল ইয়াশাদ। 'একটা এক্সক্যাভেটর... আমি ভেবেছিলাম ওটা সরকারি।'

'জী না, সরকারি না। আমার শ্যালকের বন্ধু ওই যন্ত্রটার মালিকের সঙ্গে বেশ কয়েকবার কথা বলেছে... লোকটা বলেছে, নাক্‌ফার কাজটা সাময়িক, ও আসলে হাজের মালভূমির কাছে অন্য একটা কাজে যাবার জন্য অপেক্ষা করছে... গোপন কাজ!'

'তাই নাকি?' ইয়াশাদের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল।

'হ্যাঁ,' বলল বার্দা। 'আমি এ-ও খবর পেয়েছি, আজ সকালেই এক্সক্যাভেটরটা নাক্‌ফা ছেড়ে হাজের মালভূমির দিকে রওনা হয়ে গেছে। আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে... ভ্যালি অভ ডেড চিলড্রেন নামে একটা জায়গার উদ্দেশে... যাযাবরেরা ওই নামেই ডাকে ওটাকে!'

'কী জানেন ওখানকার ব্যাপারে?'

'শুনেছি খুব খারাপ জায়গা। যুদ্ধের সময় একটা ম্যাসাকার হয়েছিল... কয়েক হাজার ইরিত্রিয়ান সৈন্য মারা পড়েছিল অতর্কিত বোমা-হামলায়। তবে ওর আগেও লোকজন জায়গাটাকে এড়িয়ে চলত। আমাদের গোটা দেশটাই কুসংস্কারে আচ্ছন্ন... ওই উপত্যকাটার বদনামের শেষ নেই। সবাই ওটাকে অশুভ এলাকা বলে মনে করে।'

'কেন?'

'তা জানি না। কুসংস্কারে আমার বিশ্বাস নেই, ওসব অশিক্ষিত লোকজনের ধ্যান-ধারণা। যাযাবরদের বেশিরভাগই মূর্তি-পূজারী, পুরনো বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছে... অদ্ভুত-অদ্ভুত সব আচার পালন করে। ওদের ওসব অন্ধবিশ্বাস আমার মত আধুনিক, শিক্ষিত মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়।'

বিদ্রূপের হাসিটা কষ্ট করে লুকাতে হলো ইয়াশাদকে। আর সবার মত এ-ও চোখ থাকিতে অন্ধ। নিজেকে আধুনিক, শিক্ষিত ভাবছে; অথচ নিজের ধর্ম ছাড়া আর কারও ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইছে না। স্রেফ আরেকজন আত্মকেন্দ্রিক মানুষ এই বার্দা। চেহারা স্বাভাবিক রেখে ও বলল, 'উপত্যকাটা কীভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, বলতে পারেন?'

ভাঁজ করা একটা কাগজ বাড়িয়ে ধরল বার্দা। 'পুরনো একটা মিলিটারি ম্যাপ এটা, উপত্যকার লোকেশন দেয়া আছে। লাল কালিতে ইরিত্রিয়ানদের বধ্যভূমিটাও দাগানো আছে ওতে। আমি বন্দুর দেখেছি, তাতে কোনও রাস্তা

[illegible]

ভাঁজ খুলে ম্যাপটা একনজর দেখল ইয়াশাদ। খুব একটা চিন্তিত হলো না সে, বিমান ভাড়া করে নাকফায় গিয়েছিল, এখন চাইলে ভ্যালি অভ ডেড চিলড্রেনেও যেতে পারবে। ম্যাপ দেখে বোঝা যাচ্ছে, বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে ল্যাণ্ড করবার মত জায়গার অভাব হবে না। মুচকি হাসল ইয়াশাদ। বলল, 'চমৎকার কাজ দেখিয়েছেন আপনি। আমি কথা দিচ্ছি, ইজরায়েলে ফিরে গিয়ে ওখানে আপনার বাচ্চাদের স্কলারশিপের ব্যবস্থা করে দেব।'

বার্দা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আগেই তার স্ত্রী ঢুকল সামনের দরজা দিয়ে। ইয়াশাদের প্রতিশ্রুতির কথা শুনেই আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ল মহিলা, ছুটে এসে আলিঙ্গন করল সোফায় বসা অতিথিকে। মুখ দিয়ে অনর্গল বেরিয়ে আসছে কৃতজ্ঞতার বাণী—মাতৃভাষা *টিগ্রিনিয়ান*-এ; চোখ দিয়ে গড়াচ্ছে আনন্দের অশ্রু।

এই আবেগ অবশ্য স্পর্শ করল না ইয়াশাদকে। পরবর্তী কর্মপন্থা নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে সে, অপারেশনের অন্তিম পর্যায় হতে যাচ্ছে ওটা। মাসুদ রানার লোকেশন সম্পর্কে জানতে পেরে মনে হচ্ছে, খনিটা ইতোমধ্যে খুঁজে পেয়েছে সে। তার মানে ইয়াশাদের সঙ্গে যখন কথা বলছিল স্যাট-ফোনে, তখন নির্জলা মিথ্যে বলে গেছে বাঙালি লোকটা। ভিতরে ভিতরে তীব্র ক্রোধ অনুভব করল ইয়াশাদ, সোহেল আহমেদের পা কেটে নেবার হুমকি দেবার পরও ভাবান্তর হয়নি রানার মধ্যে। এখন পর্যন্ত হুমকিটা বাস্তবায়ন করা হয়নি, তবে আর দেরি করা চলে না। আজ রাতেই ফোন করে কাজটা করিয়ে নিতে হবে, সেই সঙ্গে রেকর্ড করতে হবে সোহেলের আর্তচিৎকার, সেটা শুনিয়ে রানাকে বুঝিয়ে দিতে হবে—কত বড় ভুল করেছে সে ইয়াশাদকে ধাপ্পা দিতে গিয়ে।

তবে একটা ব্যাপার পরিষ্কার—খনিটা রানা খুঁজে পেয়েছে, এবং সেটা খোলার জন্য কাজও শুরু করে দিয়েছে। নাকফা থেকে সেজন্যেই নিয়ে গেছে এক্সক্যাভেটরটা। যত দ্রুত সম্ভব, ওখানে পৌঁছুতে হবে তাকে। আজ রাতের পর অবশ্য এমনিতেও আসমারা ছাড়তে হবে তাকে, রানা খনিটা খুঁজে পাওয়ায় ভালই হলো।

'ইয়াশাদ?' বার্দার ডাকে ধ্যান ভাঙল ইয়াশাদের।

'কী?'

'আমার স্ত্রী আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কিছু করতে চায়। একটা বেলা আমাদের এখানে খাওয়াদাওয়া করবেন?'

'তার কোনও প্রয়োজন নেই,' হাসল ইয়াশাদ। 'ওঁকে বলুন, আরেকবার জড়িয়ে ধরলে আমিই বরং কৃতজ্ঞ হয়ে যাব।' উঠে দাঁড়াল সে, একটা হাত শরীরের পিছনে লুকিয়ে রেখেছে।

আবার ইয়াশাদকে জড়িয়ে ধরল মহিলা। বুকে গাল ঠেকিয়ে বলল, '*ইয়াকান ইয়েলেই!*' ধন্যবাদ!

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত,' বিড়বিড় করল ইয়াশাদ। পরমুহূর্তেই ঘ্যাচ করে হাতে লুকানো ছুরিটা বিঁধিয়ে দিল মহিলার হৃৎপিণ্ডে।

[illegible] করে চিৎকার করতে চাইল,
চোখদুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল বার্দার স্ত্রীর [illegible] মেঝেতে

ফেলে দিল ইয়াশাদ, তারপর পা বাড়াল তার স্বামীর দিকে। ঘটনার আকস্মিকতায় বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে বার্দা, নড়তে ভুলে গেছে, ইয়াশাদ সামনে দাঁড়াতেই শূন্য দৃষ্টিতে চোখে চোখ রাখল। বুকে যখন ছোরাটা ঢুকে গেল, তখন শুধু মৃদু গোঙানি বেরুল তার মুখ দিয়ে। কয়েক সেকেণ্ড পর স্ত্রী-র লাশের পাশে আছড়ে পড়ল বার্দার প্রাণহীন দেহ।

একটা রুমাল বের করে ছুরির ফলা থেকে রক্ত মুছে ফেলল ইয়াশাদ, ওটা আবার ঢুকিয়ে রাখল পোশাকের আড়ালে। চারপাশে তাকাল সতর্ক ভঙ্গিতে, পরমুহূর্তে সন্তুষ্ট হলো। নিঃশব্দে কাজ সারা গেছে। বার্দার বাচ্চারা টের পায়নি কিছু, ভিতরের কামরায় ঘুমোচ্ছে তারা। তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল সে।

খুনদুটো প্রয়োজনের তাগিদে করতে হয়েছে ইয়াশাদকে। বার্দা হয়তো গল্পচ্ছলে কোনও এক দিন তার বন্ধুদেরকে বলে বসত আজ রাতের কথা, ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বলত, কীভাবে সে একজন ইজরায়েলি এজেন্টকে সাহায্য করেছিল। সেটা হতে দেয়া যায় না। ইয়াশাদের কাজে গোপনীয়তাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

মনে বিন্দুমাত্র গ্লানিবোধ নেই টেরোরিস্ট লোকটার। অনেক কাজ সামনে। টিম নিয়ে ভ্যালি অভ ডেড চিলড্রেনে রওনা হবার আগে জেরুসালেমে অপেক্ষারত সদস্যদের সঙ্গে কথা বলতে হবে তাকে, সোহেল আহমেদের পা-কাটার ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর যোগাযোগ করতে হবে প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী ইয়োরাম রাবাকের সঙ্গে, মিশন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে এক্সট্র্যাকশনের জন্য হেলিকপ্টার রেডি রাখতে বলতে হবে। ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সের হাতে অত্যাধুনিক *সিএইচ-ফিফটি থ্রি* সুপার স্ট্যালিয়ন হেলিকপ্টার আছে—ইনফ্লাইট রি-ফুয়েলিং কেপাবিলিটির কারণে সহজে ইরিত্রিয়ায় আসতে পারবে, ওদের মহামূল্যবান কার্গোটা নিয়ে নিরাপদে ফিরেও যেতে পারবে।

এসবের পাশাপাশি খনিটা নিয়েও ভাবল সে। ওখানে যে-জিনিস লুকিয়ে আছে, তা শুধু রাবাকের নির্বাচন-জয়ের চাবিকাঠি নয়, আরও অনেক... অনেক বড় একটা লক্ষ্য অর্জনের মূল সোপান। ইহুদি ধর্মের সূতিকাগারের নিদর্শন... এমন একটা ধর্মীয়-আর্টিফ্যাক্ট, যা উদ্ধার করা গেলে ডেড-সি স্ক্রোলও খুবই সাদামাঠা একটা আবিষ্কার বলে মনে হবে। ইতিহাসের মহামূল্যবান ওই বস্তু এখন নাগালের ভিতর, ইজরায়েল থেকে ওটা কয়েক হাজার বছর আগে চুরি হয়ে গিয়েছিল, এবার ইয়াশাদের মাধ্যমে ওটা আবার মূল ঠিকানায় ফিরে যাবে।

মাথা ঝাঁকিয়ে ঘোরটা দূর করল ইয়াশাদ, মন দিল কাজের ভাবনায়। সবকিছু ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে আসছে। খনির লোকেশন... সেই সঙ্গে রোম আর আসমারায় আঘাত হানা সুদানিজদের ব্যাপারটাও। ইতোমধ্যে ইয়াশাদের মোসাদ-কন্ট্যাক্ট জানিয়েছে, আমেরিকা থেকে গায়েব হওয়া কিছু গোপন ডকুমেন্টের সঙ্গে সম্পৃক্ততার সন্দেহে এফবিআই আর ইন্টারপোল যৌথভাবে একজন ইটালিয়ান টাইকুনের বিষয়ে খোঁজখবর নিতে শুরু করেছে, লোকটার নাম মার্সেলো মানসিনি। ইয়াশাদের ধারণা, ওরা মেডিউসা-পিকচারগুলোর

ব্যাপারেই তদন্ত করছে। উপনিবেশ আমলে ইরিত্রিয়ায় ইটালিয়ানদের উপস্থিতি ছিল, মানসিনিরা তখন ইরিত্রিয়ায় নিজস্ব সাম্রাজ্য গড়েছিল। কাজেই ধরে নেয়া যায়—ওই মানসিনি কোনোভাবে জানতে পেরেছে বর্নিটার কথা, ওটাই খুঁজে বেড়াচ্ছে সে-ও। সুদানিজদের পিছনে সম্ভবত তারই হাত রয়েছে, ওদেরকে মার্সেনারি হিসেবে ব্যবহার করছে রানা আর ইয়াশাদের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য।

কথা হলো, লোকটা কতদূর এগিয়েছে? সে কি জানে, প্রাচীন ওই বর্নিটার ভিতরে আসলে কী লুকানো আছে?

পাঁচ

জেরুসালেম।

পশ্চিম-প্রাচীরে বোমা-হামলার পর ঘটনাবিহীন দুটো মাস কেটে গেলেও গোটা ইজরায়েলকে এখনও রাখা হয়েছে সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায়। পাঁচিল-ঘেরা পুরনো নগরীতে গেলেই এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাবে। ওখানকার সংকীর্ণ, আঁকাবাঁকা রাস্তাতে সারাক্ষণই টহল দিচ্ছে সশস্ত্র সেনারা। সমস্ত পুরুষ নাগরিককেই ইজরায়েলি সশস্ত্র বাহিনীতে দু'বছরের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে যোগদান করতে হয়, তবে পবিত্র শহরটাতে কোনও নবীন, অনিচ্ছুক সৈন্য রাখা হয়নি; যারা টহল দিচ্ছে, তাদের সবাই মোটামুটি বয়স্ক... অভিজ্ঞ যোদ্ধা। ইউনিফর্ম আর মেশিন-পিস্তল ইদানীং নিত্যনৈমিত্তিক দৃশ্যে পরিণত হয়েছে, কঠোর চেহারার সৈন্যদের হাবভাব যে-কোনও সাধারণ মানুষের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিতে যথেষ্ট।

আজ রাতে অদ্ভুত নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে নগরীর রাস্তাঘাট আর অলিগলিতে। টহলকারী সেনাদের বুটের আওয়াজ, বা নেড়ি কুকুরের কদাচিৎ ঘেউ-ঘেউ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই কোথাও। দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগেই, বাড়িঘরের পর্দায় ঢাকা জানালা গলে খুব সামান্য আলো দৃশ্যমান হয়। প্রকৃতি অবশ্য ভেসে যাচ্ছে চাঁদের আলোয়, তবে সাদাটে সেই আভায় ভৌতিক পরিবেশটা বরং আরও জেঁকে বসেছে।

ক্রুসেডার-ওয়ালের ওপারে নয়া-জেরুসালেম শহরও নীরব। সন্ত্রাসবাদীদের খোঁজে সৈন্যদের হাতে হেনস্থা হতে হতে তিতিবিরক্তির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে ওখানকার ইহুদি আর আরব সমাজ, নিতান্ত প্রয়োজন না হলে অসময়ে ঘর ছেড়ে বেরুচ্ছে না কেউই।

পরিস্থিতির চাপ ভালই অনুভব করছে ইয়াশাদের দলের অবশিষ্ট সদস্যরা। পুরনো নগরীর ভিতরে একটা সেফ-হাউসে রয়েছে তারা, বন্দি সোহেল আহমেদকে পাহারা দিচ্ছে। এরা সবাই দলের জুনিয়র সদস্য, লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা যৎসামান্য। ভাল ভাল এজেন্টরা সবাই গেছে ইয়াশাদের

সঙ্গে—ইরিত্রিয়াতে। বন্দি-পাহারার দায়িত্বটা তাই বর্তেছে অনভিজ্ঞ, প্রায় ট্রেইনিং-বিহীন অল্প ক'জন মানুষের উপর। ইয়াশাদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ না থাকায় ইতোমধ্যে শৃঙ্খলায় চিড় ধরতে শুরু করেছে এদের। আদর্শ, এবং প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী ইয়োরাম রাবাকের প্রতি আনুগত্য এখনও অটুট আছে বটে; কিন্তু অসহায়, পঙ্গু একজন মানুষকে দেখাশোনা করতে করতে বিরক্ত হয়ে উঠেছে ওরা।

অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা—এই কথাটা বাস্তবে পরিণত হয়ে উঠেছে গত কয়েকদিনে। কাজ না পেয়ে নিজেদের মধ্যে বিবাদে মেতে উঠছে তরুণ টেরোরিস্টরা, তর্কাতর্কি প্রায়ই হাতাহাতিতে গড়াচ্ছে। দলের একমাত্র নারী-সদস্য র‍্যাশেল ফেদোরা এদের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র, পেশায় নার্স, ইয়াশাদের অনুপস্থিতিতে নেতৃত্বের ভার নিয়েছে। তবে নেতৃত্ব দেখাবার কোনও সময় পাচ্ছে না বেচারি, বেশিরভাগ সময় কাটছে মারামারিতে আহত সদস্যদের কাটাছেঁড়ার শুশ্রূষায়। ক্ষমতা-টমতা সব গোল্লায় গেছে, র‍্যাশেল বুঝতে পারছে—খুব শীঘ্রি নতুন নির্দেশ না পেলে ওর লোকজন বাঙালি বন্দিটাকে খুন করে যার যার বাড়িতে ফিরে যাবে।

ধর্মের জন্য উন্মাদ এরা, তবে সেই উন্মত্ততাকে ঠিকমত জিইয়ে রাখতে হলে সঠিক জ্বালানির প্রয়োজন—সেই জ্বালানিরই অভাব দেখা দিয়েছে।

তবে সুখবর, দীর্ঘদিন পর আজ সন্ধ্যায় এসেছে নতুন নির্দেশ। প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী ইয়োরাম রাবাক ফোন করেছিলেন, ওদেরকে জেরুসালেম ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বলেছেন। নেগেভ মরুভূমিতে নতুন একটা সেফ-হাউসের ব্যবস্থা করেছেন তিনি, ডেমোনা নিউক্লিয়ার রিসার্চ ফ্যাসিলিটির সংলগ্ন মিলিটারি বেসে। সমস্যা একটাই, কীভাবে রাস্তার সশস্ত্র টহলকে পেরুতে হবে, সেটা বলেননি তিনি। র‍্যাশেল জানতে চেয়েছিল, জবাবে রাবাক ঝামেলাটা ওদের ঘাড়েই চাপিয়ে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, দলটাকে কোনও ধরনের পাস দিতে পারবেন না তিনি, তাতে লোকের মনে সন্দেহ জাগবে। কারফিউ-র অর্ডার জারি হয়েছে প্রধানমন্ত্রী লিওনিদ হালপেরিনের দপ্তর থেকে, পাস-টাস শুধুমাত্র ওরাই ইস্যু করতে পারে। রাবাক বরং চাপাচাপি করলে ওদের উপর সবার মনোযোগ টেনে আনা হবে। র‍্যাশেল পাল্টা কিছু যুক্তি দিয়েছিল, সেগুলো কানে তোলেননি প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী। বলে দিয়েছেন, নিজ ব্যবস্থায় জেরুসালেম ত্যাগ করতে হবে।

ভালই একটা ঝামেলা বটে! পুরনো নগরীতে যান চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, তাই র‍্যাশেল বুঝতে পারছে—বন্দিকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে হবে শহরের বাইরে, নতুন শহরে ওদের ভ্যান থাকবে, ওটায় নিয়ে ওঠাতে হবে। কাজটা সহজ নয়।

ইতোমধ্যে ভ্যান আনার জন্য একজনকে পাঠিয়ে দিয়েছে র‍্যাশেল, যায়ন গেটের বাইরে এথিয়োপি স্ট্রিটে এসে অপেক্ষা করবে সে। লোকটার কাছে সেল-ফোন আছে, জায়গায় পৌঁছে রিং দিয়ে জানাবে খবর। কিচেনে বসে দলের বাকিদের সঙ্গে এ-মুহূর্তে আলোচনা করছে র‍্যাশেল, সবার মতামতের ভিত্তিতে ঠিক করে নিচ্ছে নিরাপদ ইভাকুয়েশনের পন্থা। এখন পর্যন্ত আশাপ্রদ কিছু বের

করতে পারেনি ওরা। অভিজ্ঞতা ও ট্রেইনিঙের অভাব ভালমতই অনুভব করছে সবাই।

'যা বুঝতে পারছি,' নিষ্ফল আধঘণ্টার আলোচনা শেষে বলল র‍্যাশেল, 'ডাইভারশনের মাধ্যমেই সারতে হবে কাজটা। ডেভিড ফোন করলেই জ্যাকব আর লেভ বেরিয়ে পড়বে। সেফ-হাউস থেকে মোটামুটি আধ-মাইল দূরে গিয়ে ডাইভারশন তৈরি করবে। কী করতে চাও, সেটা তোমাদের নিজস্ব ব্যাপার... তবে অটোমেটিক ওয়েপনের এক পশলা ফাঁকা গুলিতেই কাজ হবে বলে আমার ধারণা। আর হ্যাঁ... ধরা পড়া যে চলবে না, সেটা আশা করি মনে করিয়ে দিতে হবে না তোমাদের?'

তরুণ দুই টেরোরিস্টের চেহারায় উত্তেজনা ফুটল। 'হ্যাঁ, জানি আমরা।'

ভুরু কোঁচকাল র‍্যাশেল। ওদের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে না, কথাটা ঠিকমত বুঝতে পেরেছে। তাই ভেঙে বলল, 'শোনো, যদি দেখো ধরা পড়ার মত অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তা হলে আত্মহত্যা করতে হবে তোমাদেরকে, বুঝতে পেরেছ? কিছুতেই জ্যান্ত ধরা দেয়া চলবে না। যে-অবস্থা তোমাদের, কিছুতেই ইন্টারোগেশন সহ্য করতে পারবে না। ফাঁস করে দেবে সব। তা যেন না ঘটে, সেটা নিশ্চিত করবার জন্য ধরা না দিয়ে মরতে হবে তোমাদেরকে।'

'ইয়েস, ম্যা'ম!' বাধ্য সৈনিকের মত বলল দুই টেরোরিস্ট।

'মোশে,' দলের কনিষ্ঠতম সদস্যের দিকে ফিরল র‍্যাশেল। 'বন্দিকে রেডি করো। খুব শীঘ্রি রওনা হব আমরা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কিচেন থেকে বেরিয়ে গেল মোশে।

ওকে কুঠুরির মধ্যে ঢুকতে দেখেই সোহেল বুঝতে পারল, কিছু একটা ঘটতে চলেছে। বন্দিদশা যতই দীর্ঘ হয়েছে, ওর ব্যাপারে কিডন্যাপারদের আগ্রহ ততই কমে এসেছে। ইদানীং খাওয়াদাওয়ার সময়টা ছাড়া ওর সামনে দেখা দেয় না কেউ, খোঁজখবরও নেয় না। তাতে অবশ্য ক্ষতি হয়নি। শত্রুপক্ষ ওকে বিরক্ত না করায় বরং শান্তিতে থাকতে পেরেছে... মানে, এ-অবস্থায় যতটা শান্তিতে থাকা যায় আর কী! তবে এখন পর্যন্ত মুক্তির কোনও উপায় বের করতে পারেনি ও। আজ অসময়ে মোশেকে ঢুকতে দেখে বুঝতে পারছে, নতুন কিছু ঘটবে। দেখা যাক, কী সেটা।

শরীরটা খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে সোহেলের, চোখদুটো কোটরে বসে গেছে। মোশেকে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার? কী চাও?'

'তৈরি হও, আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি।'

'চলে যাচ্ছি মানে? কোথায় যাচ্ছি?'

'তা তো তোমাকে বলা যাবে না! শুধু এটুকু জানো, এই বাড়ি ছেড়ে নতুন কোনও জায়গায় যাচ্ছি আমরা। দেরি কোরো না, কাপড়চোপড় পরে নাও। হাতে বেশি সময় নেই।'

মনটা উত্তেজনায় নেচে উঠল সোহেলের। এর আগে যতবার ওরা জায়গা পাল্টেছে, ওকে অজ্ঞান করে নিয়ে গেছে। কিন্তু আজ করছে না। তার মানে এই বাড়ি থেকে জাগ্রত অবস্থায় বেরুবে ও, পালাবার একটা সুযোগ পাওয়া যেতে

পারে।

বালিশের তলা থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল সোহেল। দয়াপরবশ হয়ে দু'একদিন পর পর ওকে সিগারেট দেয় এরা। খুব হিসেব করে খরচ করতে হয় প্রতিটা স্টিক। 'এটা নিতে পারি? কোনও অসুবিধে নেই তো?'

'নিতে পারো, যদি কথা দাও কোনও গোলমাল করবে না। হাঁটিয়ে তোমাকে গাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাব আমরা, তখন শান্ত থাকতে হবে তোমাকে।'

'শান্ত না থেকে উপায় আছে?' নিজের কৃত্রিম হাতটা দেখাল সোহেল। 'এক হাতে তোমাদের সঙ্গে পেরে উঠব নাকি?'

'তা অবশ্য ঠিকই বলেছ,' হাসি ফুটল মোশের ঠোঁটে। এক হাত-অলা এই বন্দিকে নখদন্তহীন একটা জীব বলে মনে হচ্ছে তার কাছে। একেবারে অসহায়, দুর্বল, নিরস্ত্র... গোলমাল পাকিয়ে পেরে উঠবে না ওদের কারও সঙ্গে।

পনেরো মিনিট পর ফোন এল ড্রাইভার ডেভিডের। সঙ্গে সঙ্গে কোটের আড়ালে উজি সাবমেশিনগান লুকিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল জ্যাকব আর লেভ। র‍্যাশেল বাকিদের বলল, 'সেট রেডি, পজিশনে পৌঁছুতে বেশি সময় লাগবে না ওদের। গুলির শব্দ শোনামাত্র রওনা হব আমরা।'

প্রতীক্ষাটা ঠিক সাত মিনিট দীর্ঘ হলো।

নীরবতা খান খান করে দিয়ে দূর থেকে ভেসে এল গুলি বর্ষণের চাপা শব্দ। প্রাচীন নগরীর অলিগলিতে প্রতিধ্বনি তুলে বাতাসে ভাসল অনেকক্ষণ। দরজায় দাঁড়ানো র‍্যাশেলের চেহারা অবশ্য নির্বিকার রইল, কান পেতে শুনছে ও টহলদার সৈন্যদের হাঁকডাক, রাস্তায় ছুটন্ত বুটের শব্দ। কোথায় যেন পুলিশের বাঁশিও বেজে উঠল। দিব্যচোখে নগরীর বাসিন্দাদের দেখতে পেল ও—ভয়ে-আতঙ্কে সেঁধিয়ে যাচ্ছে বিছানায়, লুকাচ্ছে লেপের নীচে।

'ঠিক আছে, চলো।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ছোট্ট দলটা—সোহেল-সহ মাত্র চারজন ওরা। মোশে ওর ডান হাতটা শক্ত করে ধরে রেখেছে, অটোমেটিক পিস্তল উরুর কাছে ধরে সামনে রয়েছে র‍্যাশেল। জিউয়িশ কোয়ার্টারের ভিতর দিয়ে পৌনে এক মাইল দূরত্ব পেরুতে হবে ওদেরকে। লুকিয়ে-চুরিয়ে এগোবার উপায় নেই, বাধ্য হয়ে রাস্তার পাশ দিয়েই হাঁটতে হচ্ছে ওদেরকে।

চারপাশে তাকিয়ে-বড়ের বেগে মগজ খাটাচ্ছে সোহেল, পরিচিত কোনও ল্যান্ডমার্ক আছে কি না দেখার চেষ্টা করছে, কিন্তু চোখে পড়ল না কিছু। জায়গাটা যে মধ্যপ্রাচ্য, তাতে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের ঠিক কোথায়—তা বুঝতে পারছে না। ভাল করে চিন্তা করল ও—এরা যে মুসলিম নয়, তা টের পেয়েছে আগেই; একটা মেয়েকে নেতৃত্ব দিতে দেখে সন্দেহটা গাঢ় হচ্ছে আরও। মুসলিম চরমপন্থীরা নারী-নেতৃত্বের ঘোর বিরোধী। তা হলে কোন্ ধর্মের চরমপন্থী এরা? চারপাশে আবার তাকাল ও, প্রাচীন স্থাপনাগুলো কিছুটা পরিচিত মনে হচ্ছে... কোথায় যেন দেখেছে আগে। কয়েক সেকেন্ডেই আচমকা পরিষ্কার হয়ে গেল সব—জেরুসালেমের প্রাচীন নগরী এটা! ছবিতে দেখেছে ও এই এলাকার পুরনো বাড়িঘরের ছবি... পরিচিত লাগছে সেজন্যই।

জায়গাটা যদি জেরুসালেম, আর অপহরণকারীরা অমুসলিম হয়, তার মানে দাঁড়ায় একটাই—ও ইহুদি চরমপন্থীদের হাতে পড়েছে!

বিড়বিড় করে নিজেকে গাল দিল সোহেল। ব্যাপারটা আরও আগেই টের পাওয়া উচিত ছিল। মোশে নামটা ইহুদি, প্রাক্তন এক ইজরায়েলি নেতাও ছিলেন এ-নামে।

যাক, অন্তত অপহরণকারীদের পরিচয় জানা গেল। কিন্তু সেটা নিজের কাজে লাগানো যায় কীভাবে? গত কিছুদিনে এই প্রথম পালানোর মত একটা পরিস্থিতি পেয়েছে ও, অথচ মাথায় কোনও বুদ্ধি খেলছে না। মুসলমান হোক, বা ইহুদি—তাতে কিছু যায়-আসে না—সমস্ত এই মানুষগুলো ওর শত্রু; এটাই বড় কথা। দলটার মধ্যে চাপা উত্তেজনা টের পাচ্ছে ও, দ্রুত পায়ে এগোনো দেখে বোঝা যাচ্ছে, বিপদের আশঙ্কা করছে চরমপন্থীরা। অসুস্থতার ভান করে এদের দেরি করাবে কি না, ভাবল একবার। পরমুহূর্তে বাতিল করে দিল চিন্তাটা। ওভাবে নিজের ঘাড়েই বরং নিশ্চিত বিপদ টেনে আনা হবে।

কয়েক মিনিট নির্বিঘ্নে এগোনোর পর হঠাৎ থেমে গেল র‍্যাশেল, শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেছে তার। সামনের মোড় ঘুরে ছোট্ট একটা টহল দল এগিয়ে আসছে ওদের দিকে, অস্ত্র উঁচিয়ে। পিস্তল ধরা হাতটা সাবধানে শরীরের পিছনে নিয়ে গেল টেররিস্ট-নেত্রী। টহল-দলটা ওদের দশ হাত তফাতে এসে থামল। রাইফেল তাক করে রেখেছে চার কারফিউ-ভঙ্গকারীর দিকে, ট্রিগারে চেপে বসেছে আঙুল।

'প্লিজ! গুলি করবেন না!' হিব্রুতে চেঁচিয়ে উঠল র‍্যাশেল। 'আমরা ইজরায়েলি নাগরিক!'

টহল-দলের নেতা গোছের একজন সৈনিক দু'পা এগিয়ে এল, অস্ত্র ধরে রেখেছে র‍্যাশেলের মাথার দিকে। জানতে চাইল, 'এত রাতে রাস্তায় কী করছ তোমরা?'

'আমার বড় ভাই অসুস্থ, হার্টে সমস্যা আছে। বাড়ির কাছে গোলাগুলির শব্দ শুনে বুকে ব্যথা শুরু হয়েছে, তাই হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি।'

'বাড়ি ফিরে যাও!' কড়া গলায় বলল সৈনিক। 'কারফিউ-র মধ্যে বাইরে বেরুনোর নিয়ম নেই।'

'দয়া করুন! ও মরে যাবে! আমাদের বাবা-মা নেই, কিছুদিন আগে হামাসের আত্মঘাতী বোমা-হামলায় মারা গেছে। এখন যদি বড় ভাইও...' কথা শেষ করল না র‍্যাশেল, নিখুঁত অভিনয়ের মাধ্যমে চোখের পানি ঝরাতে শুরু করল।

মনটা নরম হয়ে এল টহল-দলের লিডারের। তীক্ষ্ণ চোখে সামনে দাঁড়ানো চারজনকে দেখল সে—একটা মেয়ে, দুজন অল্পবয়েসী তরুণ, আর অসুস্থ একজন যুবককে দেখে কোনও হুমকি বলে মনে হলো না তার কাছে। রাইফেল নামিয়ে নিল লিডার, দেখাদেখি বাকিরাও। কিছু বলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনি তার কোমরে ঝোলানো ওয়াকি-টকি খড় খড় করে উঠল। কমিউনিকেশনটা শুনে দলের দিকে ফিরল সে। বলল, 'ওরা গোলমালের উৎস লোকেট করতে

পেরেছে। দুজন সশস্ত্র মানুষ, অটোমেটিক ওয়েপন আছে। দু'দিকে দৌড়ে পালিয়েছে ওরা, এক হারামজাদা আমাদের এদিকেই আসছে।'

'এদের নিয়ে কী করবেন?' জানতে চাইল একজন সৈনিক।

'চলে যাক,' র‍্যাশেলের দিকে ফিরল লিডার। 'তাড়াতাড়ি এখান থেকে কেটে পড়ো, মেয়ে। হামাসের দুটো বদমাশ আজ ঢুকে পড়েছে শহরে।'

'জী, আপনার অনেক দয়া!' বলল র‍্যাশেল।

সোহেলের মাথায় ঝড় বইছে। টহল-দলটা ঘুরে গেছে, চলে যাচ্ছে ওরা... যা করার এখুনি করতে হবে। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের জন্য দ্বিধা করল ও, তারপরই সজোরে হাঁক ছাড়ল।

'আল্লাহ আকবার!'

ফলাফলটা হলো দেখবার মত। পাঁই করে ওদের দিকে ঘুরল টহল-সৈনিকদের গোটা দল, সবার অস্ত্র উঠে এসেছে কাঁধের কাছে। ঝটকা দিয়ে মোশের মুঠি থেকে নিজেকে মুক্ত করল সোহেল, ঝাঁপ দিল মাটিতে। আর তখুনি র‍্যাশেলের দলের তৃতীয় সদস্য দিশেহারা হয়ে পোশাকের আড়াল থেকে পিস্তল বের করে গুলি ছুঁড়ল। মাজল-ফ্ল্যাশ দেখেই পাল্টা গুলি করল সৈনিকেরা, চারদিক প্রকম্পিত হয়ে উঠল প্রচণ্ড আওয়াজে।

বুকে এক ডজন গুলি খেয়ে ঝাঁঝরা হয়ে গেল মোশে। ওর অপর সঙ্গীও খেল কমপক্ষে ছ'টা গুলি। র‍্যাশেল অবশ্য ভাগ্যবতী, সেই সঙ্গে ওর রিফ্লেক্সও ভাল। ঝাঁপ দিয়ে লাইন অভ ফায়ার থেকে সরে গেল, নিখুঁত নিশানায় গুলি করে ঘায়েল করল দুজন সৈনিককে। ছুটোছুটি শুরু হলো রাস্তায়, সৈনিকরা কাভার খুঁজছে। র‍্যাশেলও পিছাচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে।

গোলমালের ভিতর গড়ান দিয়ে পাশের একটা গলির ভিতর ঢুকে পড়ল সোহেল। ছায়ার মধ্যে উঠে দাঁড়াতেই নতুন পদশব্দ শুনল গলির উল্টোদিক থেকে। সেদিকে তাকাতেই উজি সাবমেশিনগান হাতে ছুটে আসতে দেখল একটা ছায়ামূর্তিকে। র‍্যাশেলের দুই ড্রাইভারশনিস্টের একজন। ঝপ্ করে মাটিতে বসে পড়ল চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। যাক ব্যাটা, গিয়ে গোলমালটা আরও ভাল করে বাধাক।

ওকে খেয়াল করল না লেভ, ছুটে গলি থেকে বেরিয়ে গিয়ে রণক্ষেত্রে যোগ দিল। ওর উজির গর্জনে কান ঝালাপালা হবার জোগাড়। নিষ্ঠুর একটা হাসি ফুটল সোহেলের ঠোঁটে, উল্টো ঘুরে ছুটতে শুরু করল ও গলিপথ ধরে।

জায়গামত অপেক্ষা করছিল ডেভিড ভ্যান নিয়ে। পনেরো মিনিট পর সেখানে পৌঁছুল র‍্যাশেল—একা, রক্তাক্ত অবস্থায়। কাঁধে আর পায়ে গুলি লেগেছে ওর। ব্যথাটা দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করল ও, ঝট করে খুলে ফেলল দরজা। ড্রাইভারের পাশের সিটে উঠে বসে নির্দেশ দিল, 'চালাও!'

হকচকিয়ে গেছে ডেভিড তার নেত্রীর অবস্থা দেখে। বলল, 'বাকিরা?'

'আর কেউ নেই,' চোয়াল শক্ত হয়ে গেল র‍্যাশেলের। 'একটা সিকিউরিটি প্যাট্রোলের মুখে পড়েছিলাম আমরা। সবাই মারা পড়েছে ওদের হাতে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ইঞ্জিন চালু করল ডেভিড। গাড়ি চলতে শুরু করতেই র‍্যাশেলের সেল-ফোন বেজে উঠল।

'হ্যালো?'

'র‍্যাশেল, ইয়াশাদ বলছি।' ওপাশ থেকে ভেসে এল ওদের নেতার ভারী কণ্ঠ।

'খারাপ খবর, বস,' দুর্বল গলায় জানাল র‍্যাশেল। 'আমাদের পুরো টিম খতম। সোহেল আহমেদও পালিয়েছে।'

'হোয়াট!' গর্জে উঠল ইয়াশাদ। 'আমি তো ফোন করলাম ওর পা কেটে নেবার জন্য। আর তুমি বলছ ও পালিয়েছে? কীভাবে?'

'ইয়োরাম রাবাক এর জন্য দায়ী। আমাদেরকে নতুন একটা সেফ-সাইটে যেতে বলেছে, কিন্তু শহর ছেড়ে নিরাপদে বেরুবার ব্যবস্থা করতে রাজি হয়নি। একটা টহল-দলের সামনে পড়ে গিয়েছিলাম আমরা, সোহেল আহমেদ সেখানে গোলমাল পাকিয়ে আমাদেরকে বিপদে ফেলেছে, লড়াইয়ের ফাঁকে চুপিসারে কেটেও পড়েছে। রাবাক যদি পিঠ না দেখাত, তা হলে এ-ঘটনা ঘটত না।'

'হারামজাদা শুয়োর কোথাকার!' গাল দিয়ে উঠল ইয়াশাদ। 'প্রধানমন্ত্রীর গদি হাতের কাছে এসে গেছে তো, তাই আর আমাদের দাম দিচ্ছে না। একটু আগে আমিও ফোন করেছিলাম ওকে এক্সট্র্যাকশনের জন্য হেলিকপ্টার চেয়ে, ব্যাটার হাজারটা প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে—কোথাও গোলমাল হবে না তো! কেউ কিছু সন্দেহ করবে না তো! হাবভাবে মনে হলো, আমি ঘাড়ে করে জিনিসটা নিয়ে এলে বেশি খুশি হয়।'

'পত্রিকায় পড়েছি আমি,' বলল র‍্যাশেল, 'এখন যে-পরিস্থিতি, তাতে এমনিতেই বিশাল ব্যবধানে নির্বাচনে জিতবে শয়তানটা। আমরা মরে গেলেও কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না ওর।' উদ্বেগ ফুটল ওর কণ্ঠে। 'কী মনে হয় তোমার, ইয়াশাদ? রাবাক কি আমাদেরকে খুন করবে?'

'এখনও না,' বলল ইয়াশাদ। 'খনির ভিতরের জিনিসটার জন্য এখনও আমাদেরকে প্রয়োজন ওর। তবে ওটা হাতে পেয়ে গেলে কী করবে, তা বলতে পারছি না।' একটু ভাবল সে। 'রাবাক একটা উচ্চাভিলাষী বেজন্মা, তবে ওকে টাইট দেয়ার মত পজিশনে আছি আমরা। আমাদেরকে খুন করতে চাইলে সব ফাঁস করে দেবার হুমকি দিতে পারব। নিজের স্বার্থেই পিছিয়ে যেতে হবে তাকে।'

'কিন্তু সোহেল আহমেদ যে পালিয়ে গেল?'

'তাতে বিশেষ যায়-আসে না। কিছুই জানে না ও। মুখ বন্ধ করতে হবে মাসুদ রানার। ওকে খুব শীঘ্রি খতম করব আমি। ইরিত্রিয়ার মরুভূমি থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না ও।'

'আর দিনা আবান?'

'ওকেও মরতে হবে। কাজটা এড়ানো গেলে ভাল হতো, কিন্তু উপায় নেই। শিম বেট ওর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে খেপে উঠবে। তবে রাবাককে ওই ঝড় সামলাতে হবে।'

'এতসব খুনোখুনি কি উচিত হবে, ইয়াশাদ?' দ্বিধা ভর করল র‍্যাশেলের কণ্ঠে।

'উচিত-অনুচিত নির্ধারিত হয় শুধু উদ্দেশ্যটা দিয়ে, র‍্যাশেল।' দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল ইয়াশাদ। 'রাবাকের উচ্চাভিলাষ নিয়ে মোটেই ভাবছি না আমি, কাজ করছি আরও মহৎ একটা লক্ষ্য নিয়ে। ইজরায়েলের... গোটা ইহুদি জাতির ভবিষ্যৎ পাল্টে দেবার জন্য দরকার হলে রক্তের সাগর বইয়ে দেব আমি।'

নিজের অনুমানের কথা র‍্যাশেলকে বলল ইয়াশাদ—রানা সম্ভবত খনিটা খুঁজে বের করে ফেলেছে। ওখানে কীভাবে যাবে, আর কী করবে—জানাল সেটাও। মার্সেলো মানসিনির কথাও বলল ইয়াশাদ, ওর আশঙ্কা—ইটালিয়ান ধনকুবের ওদের আগেই রানার কাছে পৌঁছে যাবে। সে-পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্ল্যানে কিছুটা রদবদল এনেছে ইয়াশাদ—সন্তর্পণে ভ্যালি অভ ডেড চিলড্রেনে যাবে সে, কয়েকদিন দূর থেকে সার্ভেইলান্স চালাবে, তারপর নেবে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা!

'আপাতত তুমি গা-ঢাকা দাও,' নিজের কথা শেষে র‍্যাশেলকে বলল ইয়াশাদ। 'নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পরও কিছুদিন লুকিয়ে থাকতে হবে তোমাকে। রাবাকের সঙ্গে যোগাযোগ কোরো না, ওকে আমি সামলাব। আর মাত্র অল্প ক'টা দিন, র‍্যাশেল... তারপরই সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। এই লুকোচুরি, পালিয়ে বেড়ানো, আতঙ্কে থাকা... স-অ-ব! বুক ফুলিয়ে ইজরায়েলের মাটিতে হেঁটে বেড়াব আমরা—গোটা ইহুদি জাতির বীর হয়ে!'

'সে-দিনটার অপেক্ষাতেই রয়েছি আমি, ইয়াশাদ!' ঘোর লাগা গলায় বলল র‍্যাশেল।

'অপেক্ষার ইতি ঘটতে চলেছে... খুব শীঘ্রি!'

লাইন কেটে দিল ইয়াশাদ।

ছয়

উত্তর ইরিত্রিয়া।

বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তরের মাঝে ল্যাণ্ড-ক্রুজারটাকে দেখাচ্ছে ছোট্ট একটা বিন্দুর মত—পিছনে ধুলো উড়িয়ে অজানার পানে ছুটে চলেছে; সমান্তরালভাবে পিছনে রেখে যাচ্ছে একজোড়া টায়ার-ট্র্যাক... দিগন্তের ওপার পর্যন্ত চলে গেছে দাগদুটো। ছোট গাড়িটা ছাড়া গোটা মরুভূমিতে আর কিছু নড়ছে না—তীব্র উত্তাপের ভিতর কোনও ধরনের প্রাণী, পাখি... এমনকী পোকা-মাকড়-সরীসৃপও চোখে পড়ছে না। দেশের পূর্বাঞ্চলে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, তাই আকাশে ছিটেফোঁটা মেঘ উঁকি দিচ্ছে মাঝে-সাঝে, কিন্তু হাজের মালভূমির এলাকা এখনও বর্ষণের দেখা পায়নি। মরুভূমির মেঝে ফেটে চৌচির হয়ে গেছে, বৃষ্টির জন্য এই বন্ধ্যা জমিও যেন হাহাকার করছে।

ঝড়ের বেগে ড্রাইভ করছে রানা, মাথা ঘামাচ্ছে না মাটিতে পোঁতা অ্যান্টি-পার্সোনেল মাইন নিয়ে। ওগুলোর উপর দিয়ে চাকা গড়িয়ে গেলেও বিস্ফোরণের ধাক্কায় বড় কোনও ক্ষতি হবার কথা নয় গাড়ির। সমস্যা শুধু অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মাইন নিয়ে, ওগুলোর কোনোটার কবলে পড়লে বাঁচার উপায় নেই। কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে সতর্কতা অবলম্বনের সুযোগ পাচ্ছে না ও, তাই নিজেদেরকে সঁপে দিয়েছে ভাগ্যের হাতে। ওর পাশেই বসে আছে পাশা, চেহারা রক্তশূন্য, খামচে ধরে রেখেছে ড্যাশবোর্ড। পিছনের সিটে দিনারও কমবেশি একই অবস্থা, চেহারায় আতঙ্ক। একটা সিলিং-স্ট্র্যাপ আঁকড়ে ধরে আছে ও, গাড়িটা ঝাঁকুনি খেলেই চোখ বন্ধ করে ফেলছে।

ইঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে চেঁচাল রানা, 'ওদেরকে দেখতে পাচ্ছ?'

পিছনদিকে ঘাড় ফেরাল দিনা। 'এখনও না...' বলতে বলতে থমকে গেল ও। 'এহ্-হে! দেখতে পাচ্ছি এবার।'

রিয়ারভিউ মিররে নজর বোলাল রানা—দিগন্তের কাছে আরেকটা ফোর-হুইল ড্রাইভ উদয় হয়েছে। এতদূর থেকে আকার-আকৃতি ঠিকমত বোঝা যাচ্ছে না, মাঝে মাঝে শুধু রোদের প্রতিফলন ঘটছে ওটার ধাতব শরীরে... পিছনে উড়ছে ধুলো। খুব দ্রুত এগোচ্ছে।

'খারাপ খবর,' সহযাত্রীদের উদ্দেশে বলল রানা। 'মনে হচ্ছে, ওদেরকে রেসে হারানো যাবে না।'

ভোরের আলো ফোটার দু'ঘণ্টা পর রওনা হয়েছে ওরা। রাত জেগে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট আর ফুয়েল-অয়েল মিশিয়ে বিস্ফোরক তৈরি করেছিল রানা, রওনা হবার আগে ওগুলোর সাহায্যে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ধসিয়ে দিয়ে এসেছে পাহাড়ের ঢাল। আবেলকে বলে এসেছে ধ্বংসস্তূপের মাটি-পাথর সরিয়ে খনির প্রবেশপথের খোঁজ চালিয়ে যেতে। অবশ্য কমপক্ষে দু'দিনের আগে খোঁড়াখুঁড়ি আবার শুরু করতে পারবে না ওরা, রানা আশা করছে, তার আগেই ফিরতে পারবে মঠের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কথা বলে।

দিনতিনেক চলবার মত রেশন আর জিনিসপত্র নিয়ে এরপর উপত্যকা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে রানা, সঙ্গে দিনা আর পাশা। রওনা হবার আধঘণ্টা পর অন্য গাড়িটাকে প্রথম দেখতে পায় দিনা। খবরটা জানাতেই কপালে ভাঁজ পড়েছে রানার। বিড়বিড় করে বলেছে, 'লক্ষণটা ভাল নয়।'

'কেন, কারা ওরা?'

'জানি না। তবে মনে হচ্ছে না, ওরা আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে আসছে।'

সন্দেহটা কতখানি সত্যি, দেখার জন্য ল্যাণ্ড-ক্রুজারের গতি বাড়িয়ে দিয়েছিল রানা। সঙ্গে সঙ্গে অন্য গাড়িটাও গতি বাড়িয়েছে, ধাওয়া করতে শুরু করেছে ওদেরকে। মাঝে একবার একটা ঢাল বেয়ে উঠবার সময় দূরত্ব বেশ কমে গিয়েছিল দুই গাড়ির, তখন ওটাকে ফিয়াট ফোর-হুইল ড্রাইভ পিকআপ বলে চিনতে পেরেছে রানা। ওটার প্যাসেঞ্জার-সাইড জানালায় একটা ঝলকানি দেখতে পেয়েছে ও, পরমুহূর্তে কানে ভেসে এসেছে গুলিবর্ষণের আওয়াজ। ল্যাণ্ড-ক্রুজারের পিছনের মাটিতে নিষ্ফল কামড় বসিয়েছে মিড-ক্যালিবার

মেশিনগানের বুলেট-বৃষ্টি, রানারা রেঞ্জের বাইরে ছিল বলে ক্ষতি করতে পারেনি। সেই থেকে পাগলের মত ড্রাইভ করছে রানা, কিন্তু কিছুতেই খসাতে পারছে না অনুসরণকারীদের। শুধুমাত্র ড্রাইভিঙের দক্ষতার জোরে এতক্ষণ ধরে মেশিনগানের রেঞ্জের বাইরে রেখেছে ল্যাণ্ড-ক্রুজারকে, তবে আর পারা যাবে বলে মনে হচ্ছে না। উঁচু-নিচু এলাকা ছেড়ে সমতলে নেমে এসেছে ওরা, ফাঁকা প্রান্তর পেয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে ফিয়াট পিকআপ, ওদেরকে ধরে ফেলা স্রেফ সময়ের ব্যাপার এখন।

'কী বলছ!' রানার কথা শুনে পিছনের সিট থেকে চেঁচাল দিনা। 'হারাতে পারবে না কেন? এখনও অনেকটা এগিয়ে আছি আমরা।'

'ওদের গাড়িটা নতুন,' রানা ব্যাখ্যা করল। 'আমাদের চেয়ে জোরে ছোটে; সামনে কোনও জায়গা নেই যে, গতি কমাতে বাধ্য হবে। লুকোচুরিও খেলতে পারছি না, আমাদের টায়ার ট্র্যাক থেকে যাচ্ছে বালির উপর, ওটা দেখে সহজেই খুঁজে বের করে ফেলতে পারবে।'

দিনা আর পাশার মুখ কালো হয়ে গেল সত্যটা উপলব্ধি করতে পেরে।

'আরও বড় সমস্যা হচ্ছে ল্যাণ্ড-মাইন নিয়ে,' খানিক চুপ থেকে বলল রানা। 'এদিকে যে-পরিমাণ মাইন পাতা হয়েছে বলে শুনেছি, তাতে আগে হোক, বা পরে... একটাতে ঠিকই হিট করব আমরা।'

'সেটা তো পিছনের গাড়িটার বেলায়ও ঘটতে পারে,' আশান্বিত গলায় বলল পাশা। 'ওরা হয়তো আমাদের আগেই হিট করবে।'

'আমাদের ট্র্যাক ধরে এলে তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই,' গম্ভীর গলায় জানাল রানা।

হঠাৎ তীব্র একটা বাতাসের ঝাপটা আঘাত করল ল্যাণ্ড-ক্রুজারকে, বালি পাক খাচ্ছে সামনে। আকাশের দিকে তাকাতেই ঝোড়ো মেঘ দেখতে পেল রানা, দিগন্তের কাছটা ঢেকে ফেলেছে। দৃশ্যটা ভয়-জাগানো। ঝড় আসবে খুব শীঘ্রি।

'কতক্ষণ লাগবে, বলতে পারো?' মেঘের দিকে ইশারা করে পাশাকে জিজ্ঞেস করল দিনা।

'বলা মুশকিল,' পাশা কাঁধ ঝাঁকাল। 'এক্ষুণি চলে আসতে পারে, আবার আগামী দু'তিনদিন ওখানে স্থির হয়ে থাকলেও অবাক হবার কিছু নেই।'

'কী বলছ!' দিনার কণ্ঠে অবিশ্বাস।

'ভুল বলেনি ও,' সামনে থেকে বলল রানা। 'বায়ুচাপের একটা ব্যাপার আছে, বাতাস বেশি ভারী হয়ে গেলে পাহাড় পেরুতে পারে না, একই জায়গায় আটকা পড়ে থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বৃষ্টিও হয় না।'

ওর কথা শেষ হতে না হতেই প্রথম সম্ভাবনাটা বাস্তবে পরিণত হলো। প্রচণ্ড এক বালুঝড় এসে হামলা চালাল প্রান্তরে। জানালার কাঁচ তোলার আগেই অনেকটা বালি ঢুকে গেল ল্যাণ্ড-ক্রুজারের ভিতর, খক্ খক্ করে সবাই কাশতে শুরু করল ওরা। বিস্ময়কর এক দৃশ্য! চোখের পলকে রোদ ঝলমলে উজ্জ্বল দিন উধাও হয়ে গেল, সূর্য হারিয়ে গেল ধুলোর ঘূর্ণির আড়ালে, আবছা অন্ধকার এসে

করল যেন বিশ্বচরাচরকে। চারদিকে ভয়ানক শোঁ শোঁ আওয়াজ, ক্রুদ্ধ বাতাস মরুভূমির মেঝে থেকে খাবলা দিয়ে তুলে নিচ্ছে বালি, উন্মত্তের মত ঘোরাচ্ছে আকাশে নিয়ে গিয়ে। গাড়ির গতি কমিয়ে ফেলতে বাধ্য হলো রানা, ভিজিবিলিটি শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে।

'হায় খোদা!' ঝড়ের তীব্রতা বাড়তে দেখে বিড়বিড় করল ও। উইণ্ডশিল্ডের ওপারে স্রেফ বালির তাণ্ডব ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। পিছন থেকে দিনা চেঁচিয়ে উঠল, পাশাও ফ্যাল ফ্যাল করে দেখছে প্রকৃতির আক্রোশ। বাতাসের প্রবল ধাক্কায় ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছে ছোট্ট গাড়িটার পুরো চেসিস।

'দিনা, পিছনের গাড়িটা কত দূরে?' জানতে চাইল রানা।

'আ... আমি জানি না।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে মেয়েটা—এই প্রথম এমন ভয়ানক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে। আশ্বাস দেয়ার ভঙ্গিতে হাসল ও। বলল, 'শান্ত হও, সব ঠিক হয়ে যাবে। ঝড় ওঠার আগে পিছনে নজর রাখছিলে না? আন্দাজ করো, কত দূরে ছিল ওরা।'

'কী জানি!' ঢোক গিলল দিনা। 'বোধহয় আধ-মাইল। আমি শিয়োর না।'

'হুম,' সোজা হলো রানা। 'বাতাসে আমাদের টায়ার ট্র্যাক মুছে যাবে, কিন্তু ওরা তো আমাদের ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস ফেলছে। ঝড় থামলেই দেখে ফেলবে আবার। যা করার, এখুনি করতে হবে।'

'কী করবেন?' জিজ্ঞেস করল পাশা।

'দেখি, ওদের খসানো যায় কি না। ডিসট্যান্স বাড়াতে হবে।'

'কীভাবে এগোবে?' প্রতিবাদ করল দিনা। 'কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না।'

'কে বলেছে দেখতে পাচ্ছি না?' সকৌতুকে বলল রানা। 'দেখছি সবই, খালি গাড়ির বাইরেটা ছাড়া!'

ঝড় ওঠার আগে সামনে দেখা মরুভূমির দৃশ্যটা স্মরণ করল ও। মোটামুটি সমতল প্রান্তরই চোখে পড়েছিল, খানাখন্দ দেখতে পায়নি। সোজাসুজি এগোলে ভয়ের কিছু নেই। গিয়ার দিল রানা, চেপে ধরল অ্যাকসেলারেটর। বালিতে কামড় বসাল খাঁজকাটা টায়ার, এগোতে শুরু করল ল্যাণ্ড-ক্রুজার। গতি খুব কম, আর বিপদে ফেলল পাগলা বাতাস—এমনভাবে গাড়িটাকে পাশ থেকে ধাক্কা দিচ্ছে যে, সরলরেখায় এগোনো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দশ মিনিট কাটল, বালি আর বাতাসের ঘূর্ণি ভেদ করে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে ল্যাণ্ড-ক্রুজার। স্টিয়ারিঙে রানার হাত, দেহটা একটু কুঁজো হয়ে ঝুঁকে রয়েছে সামনে, উইণ্ডশিল্ডের ওপাশে ঝড়ের গতিপ্রকৃতি দেখে বোঝার চেষ্টা করছে—পাহাড়ি ঢাল বা উপত্যকার কাছে পৌঁছে গেছে কি না। তারপর... যেমন করে আচমকা শুরু হয়েছিল প্রকৃতির তাণ্ডব, ঠিক তেমনিভাবে বিনা নোটিশে থেমে গেল তা। চোখের পলকে। হিংস্র বাতাস গায়েব হয়ে গেল, পরিষ্কার হয়ে আসছে চতুর্দিক। গিয়ার বাড়িয়ে মেঝেতে অ্যাকসেলারেটর চেপে ধরল রানা, উড়তে থাকা বালি ঠিকমত নেমে আসার আগেই ধাওয়াকারীদের সঙ্গে যতটা সম্ভব দূরত্ব বাড়িয়ে নিতে হবে। এক পলকের জন্য রিয়ারভিউ

ঘিরে চোখ বোলাল—দেখতে পেল না কিছু।

'দিনা, পিছনে চোখ রাখো,' নির্দেশ দিল রানা। 'পিকআপটাকে দেখতে পেলেই জানিয়ো আমাকে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উল্টো ঘুরে বসল দিনা। আধ-মাইল সামনে নিচু পাহাড়ের সারি দেখা যাচ্ছে, ওগুলোর আড়ালে চলে যেতে পারলে শত্রুদেরকে ফাঁকি দেয়া সহজ হবে। শর্টকাট বেছে নিয়ে সজোরে গাড়ি ছোটাল রানা।

'দেখতে পাচ্ছ কিছু?' কয়েক মিনিট পর প্রশ্ন করল ও।

'না,' দিনা মাথা নাড়ল। 'পিছনে ঝড়টা এখনও বইছে। ধুলোর ভিতরে ঢাকা পড়ে আছে ওরা। আমার মনে হয়...'

কথা শেষ করতে পারল না ও, তার আগেই প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনিতে শূন্যে উঠে গেল ল্যাণ্ড-ক্রুজারের গোটা কাঠামো। বাতাসে ছিটকে গেল চেসিস আর আণ্ডারক্যারিজের খণ্ড-বিখণ্ড অংশ। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে তালা লেগে গেছে কানে।

যেন অনন্তকাল হাওয়ায় ভেসে থাকল গাড়িটা... আসলে সময় পেরিয়েছে মাত্র দু'সেকেণ্ড... তারপরই ধড়াম করে আছড়ে পড়ল নীচে। একটা চাকা উড়ে গেছে বিস্ফোরণে, অন্য তিনটে তাই ব্যালান্স ধরে রাখতে পারল না, ভাঙা অংশটা বালিতে লাঙলের মত আটকে যেতেই একপাশে কাত হয়ে গড়ান দিল ল্যাণ্ড-ক্রুজার।

মাটির তলায় পেতে রাখা *নিঃশব্দ ঘাতক* বলে পরিচিত বস্তুটি তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছে, বিস্ফোরিত হয়ে অচল করে দিয়েছে গাড়িটাকে। সোভিয়েত ইউনিয়নে তৈরি অ্যান্টি-পার্সোনেল মাইন ছিল ওটা, মানুষ-হত্যার জন্য তৈরি, যানবাহন নয়; বিস্ফোরণের শকওয়েভের বেশিরভাগটাই হজম করে নিয়েছে ল্যাণ্ড-ক্রুজারের ইঞ্জিন ব্লক, ক্যাবে পৌঁছেছে মাত্র এক-দশমাংশ। তবে সেটার ফলাফলও কম ভয়াবহ হয়নি।

কয়েক মুহূর্ত নিস্তেজ হয়ে পড়ে রইল রানা, মাথা বোঁ বোঁ করছে। স্বপ্নের মত লাগছে সবকিছু—বিস্ফোরণের আওয়াজ, উইণ্ডশিল্ডের ওপারে মাতাল হয়ে ওঠা পৃথিবী, ছুটে আসা ভাঙাচোরা কাঁচ, তারপর ক্যাবের বাল্কহেডে নির্মমভাবে বাড়ি খাওয়া। স্রেফ মনের জোরে একটু উঁচু হলো ও, হাত দিয়ে মুছল মুখ, পরমুহূর্তে দেখতে পেল—তালুতে তাজা রক্ত! বিস্ময় বোধ করল ও, এত রক্ত ঝরার মত কোনও ক্ষতের স্পর্শ তো পায়নি হাতে! তা হলে এল কোত্থেকে রক্তটা? শরীরের উপর চেপে থাকা দেহটার দিকে তাকাতেই স্থবির হয়ে গেল রানা।

নিথর হয়ে ওর উপর পড়ে আছে পাশা, হাসিখুশি চঞ্চল ছেলেটা আর কোনোদিন নড়বে না। ল্যাণ্ড-মাইনটা ওর দিকটাতে বিস্ফোরিত হয়েছিল, আণ্ডারক্যারিজের ফাঁকফোকর গলে প্যাসেঞ্জার-সাইডের ফুট-ওয়েল ভেদ করে শ্র্যাপনেল ঢুকেছে ক্যাবে, পাশার পা দুটো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। প্রচণ্ড ট্রমায় মারা পড়েছে ছেলেটা তৎক্ষণাৎ। গাড়িটা কাত হয়ে থাকায় লাশটা এখন রানার উপরে, ক্ষত দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্তের অঝোর ধারায় ভিজে যাচ্ছে ও।

চাই ঐশ্বর্য-২

বুকটা দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে রানার—হাসিখুশি ছেলেটা কখন যেন মন জয় করে নিয়েছিল ওর, বুঝতে পারেনি। রক্তাক্ত দেহটার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পর সচেতন হয়ে উঠল, এখন ভাবাবেগের সময় নয়, আগে উদ্ধার পেতে হবে, ধেয়ে আসছে বিপদ। শরীর নড়াতে পারছে না, তাই গলা উঁচিয়ে ডাকল, 'দিনা!'

গোঙানি ভেসে এল পিছন থেকে। ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাল রানা—যাক, অন্তত আর একজন বেঁচে আছে। সাবধানে পাশার লাশটা গায়ের উপর থেকে সরাল ও, স্টিয়ারিং হুইলের তলা থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল ড্রাইভারস্ সাইডের দরজার উপর। মাথা ঘুরছে, কোনোমতে সিট ধরে তাল সামলাল; তারপর তাকাল ব্যাকসিটের দিকে।

কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে দিনা, দু'হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছে মুখ, কাঁধদুটো কাঁপছে—কাঁদছে ও, পাশার পরিণতি দেখতে পেয়েছে। নাম ধরে আবার ডাকতেই মুখ তুলে তাকাল। চোখদুটো ভিজে রয়েছে, মুখটা ময়লা, সুন্দর চুল এখন অবিন্যস্ত। আঘাতের কোনও চিহ্ন দেখতে না পেয়ে স্বস্তিবোধ করল রানা।

কিন্তু ধাওয়া করতে থাকা পিকআপটা আর কতদূরে? তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে দিল। বলল, 'হাত ধরো, আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে এখুনি।'

পরম বিশ্বাসে হাতটা আঁকড়ে ধরল দিনা, টান দিয়ে ওকে দাঁড় করাল রানা। ডান পায়ে ব্যথা পেয়েছে বোধহয়, ভর দিতেই গুঙিয়ে উঠে পড়ে যেতে গেল। কোমর জড়িয়ে ধরে পতনটা ঠেকিয়ে দিল রানা। জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় লেগেছে?'

'জানি না, পা ব্যথা করছে খুব।' দুর্বল গলায় জবাব দিল দিনা।

'ব্যথাটা সহ্য করে নেবার চেষ্টা করো, এখানে বসে থাকা চলবে না। পিকআপটা চলে আসবে যে-কোনও মুহূর্তে।' ভাঙা রিয়ার উইণ্ডো দিয়ে বাইরে তাকাল রানা, বালুঝড়টা দ্রুত সরে যাচ্ছে পিছনে। ওটার আড়াল থেকে ধাওয়াকারীদের বেরিয়ে আসতে বেশি দেরি নেই।

দিনার দিকে ফিরল ও। 'তোমার পিস্তলটা দাও।'

'কী!'

'পিস্তল, দিনা!' কড়া গলায় বলল রানা। 'দাও ওটা আমাকে!'

মিনমিন করে দিনা বলল, 'কী বলছ তুমি? আমার কাছে পিস্তল আসবে কোত্থেকে?' অভিনয়টা তেমন ভাল হলো না।

বিরক্ত গলায় রানা বলল, 'দেখো, ভান করে লাভ নেই। আমাদের আয়ু ফুরিয়ে আসছে। বাঁচতে চাইলে এখুনি পিস্তলটা বের করে দাও আমাকে।'

কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল মেয়েটা। তারপর নিচু হয়ে নিজের ন্যাপস্যাক থেকে একটা *হেকলার অ্যাণ্ড কচ* অটোমেটিক পিস্তল বের করে আনল। ওটা রানার হাতে দিয়ে নিচু গলায় প্রশ্ন করল, 'কীভাবে জানলে তুমি?'

বিরূপ এই পরিস্থিতিতেও স্বস্তি অনুভব করল রানা, দুজনের মাঝখানের

লুকোচুরির পর্দাটা সরে যেতে শুরু করেছে। পিস্তলটা চেক করতে করতে ও বলল, 'পরে বলব। তবে এটা থাকার পরও আসমারায় আমাকে অতখানি ঝুঁকি নিতে দিয়ে তুমি ঠিক করোনি।'

চোখ নামিয়ে নিল দিনা, রানার দিকে তাকাবার সাহস পাচ্ছে না আর। ওর বিব্রতভাবটাকে গ্রাহ্য না করে পিস্তলটা কোমরে গুঁজল রানা, সিটের গায়ে পা রেখে উঠে দাঁড়াচ্ছে—বেরোতে হবে। কোনমতে প্যাসেঞ্জার সাইডের দরজাটা খুলে আছড়ে পাছড়ে উঠে পড়ল চেসিসের উপর। পিছনের দরজা খুলে দিনাকেও টেনে বের করে আনল ও। দুজনে একসঙ্গে লাফিয়ে নামল বালিতে।

ফেলে আসা ট্রেইলের দিকে তাকাতেই ধড়াস করে উঠল হৃৎপিণ্ড। ফিয়াট পিকআপটা বেরিয়ে এসেছে ঝড়ের মাঝ থেকে। আকৃতিটা ঠিকমত বোঝা না গেলেও ধুলোর মেঘ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বালুঝড়ের থেকে ওটা আলাদা।

'এখানেই থাকো,' দিনাকে বলল রানা। তারপর চলে গেল ল্যাণ্ড-ক্রুজারের পিছনে। ব্র্যাকেটে আটকানো ফুয়েলের পাঁচ-গ্যালন জেরিক্যানটা আছে এখনও, ক্লিপ খুলে ওটা হাতে নিল। ছাদের স্টোরেজ র‍্যাক থেকে ছিটকে পড়া দুটো ন্যাপস্যাকও কুড়িয়ে নিল ও। মাইন-বিস্ফোরণে মাটিতে সৃষ্টি হওয়া গর্তটার দিকে তাকাল—ওটাকে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের মত দেখাচ্ছে। মনে মনে একটা হিসেব কষে বুঝল, বিস্ফোরণটা ওদেরকে পনেরো ফুট দূরে ছিটকে ফেলেছে।

রানা পাশে ফিরতেই দিনা জিজ্ঞেস করল, 'কী করতে চাইছ? আমরা একটা মাইনফিল্ডের মাঝখানে আছি!'

জবাব দিল না রানা। তাকাল চারপাশে। নরম বালি সবখানে, তলায় কী পরিমাণ মাইন লুকানো আছে—বোঝা মুশকিল। আশার বাণী একটাই—পঞ্চাশ গজ দূরে এক টুকরো পাথুরে জমি আছে, ওখানে মাইন পোঁতা সম্ভব নয়। ওটায় উঠে পড়তে পারলে ওরা নিরাপদ। কিন্তু যাবার পথে নিজেরা যাতে বিস্ফোরণে মারা না পড়ে, সেটা নিশ্চিত করতে হবে আগে। সেই সঙ্গে এটাও নিশ্চিত করতে হবে—ফিয়াটের আরোহীরা যাতে ওদের পালানোর ব্যাপারটা টের না পায়। ল্যাণ্ড-ক্রুজারের গায়ে ডিজেল ঢালতে শুরু করল ও।

'রানা!' আতঙ্কিত গলায় বলল দিনা। 'পাশা...'

'জানি,' বাধা দিয়ে বলল রানা। কাজটা করতে ওর নিজেরও কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু উপায় নেই। লাশটা বের করে আনার মত বাড়তি সময় নেই ওদের হাতে। 'আমি নিরুপায়।'

আধ-মাইল দূরত্বে পৌঁছে গেছে ফিয়াট, ওটার চেসিসের রঙ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এখন। ল্যাণ্ড-ক্রুজারটাকে ভালমত ভিজিয়ে পিছিয়ে এল রানা, দিনার হাত ধরে চলে গেল উল্টোপাশে, পিকআপের দৃষ্টিসীমার আড়ালে। পকেট থেকে একটা *যিপো* লাইটার বের করে আগুন জ্বালল ও, লাইটারটা ছুঁড়ে দিল জিপের গায়ে। চোখের পলকে দাউ দাউ করে লাফিয়ে উঠল কমলা রঙের শিখা, গাড়িটা পুড়তে শুরু করল বিকট শব্দ করে। তীব্র উত্তাপের আঁচ পিঠে অনুভব করল ওরা, কিন্তু নড়ল না রানা; নড়তে দিল না দিনাকেও। পিস্তলটা

বের করে মাটির দিকে তাক্ করল ও, গুলি করতে শুরু করল। কাজটা নিরাপদ, আগুনের চড় চড় শব্দে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে গুলির আওয়াজ, শত্রুরা টের পাবে না কিছু।

হিসেব করে গুলি করল রানা, কাল্পনিক একটা সরলরেখায় প্রতিটা বুলেট বালিতে ঢোকাল মোটামুটি পাঁচ-ফুট দূরত্বে... রেখাটা চলে গেছে পাথুরে জমিটা পর্যন্ত। মাইন-ক্লিয়ারেন্স টেকনিক ওটা, চলার পথে কোনও বিস্ফোরক পোঁতা আছে কি না, নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে। থাকলে গুলির ইম্প্যাক্টে বিস্ফোরিত হবে। তবে গুলি খরচ করাই সার হলো, ক্লিপ খালি হওয়া পর্যন্ত আর কোনও মাইন ফাটল না ওদের সামনে।

প্রতিটা গুলি একটা করে ছোট গর্ত বানিয়ে বালিতে ঢুকেছে। লাফ দিয়ে প্রথমটায় পা রাখল রানা। দিনাকে বলল, 'আমি যেখানে যেখানে পা রাখি, সেখানে পা দিয়ে এগোও।'

নির্দেশটা বুঝতে পেরে মাথা ঝাঁকাল দিনা।

লাফিয়ে লাফিয়ে এগোতে শুরু করল রানা। কষ্টকর কাজ, এক পায়ের উপর থাকতে হচ্ছে যতক্ষণ আরেকটা লাফ না দেওয়া হচ্ছে, ছোট ছোট গর্তগুলোর ঠিক মাঝখানে ঠিকমত ল্যাণ্ড করাও সহজ নয়। ন্যাপস্যাকদুটো বাড়তি বোঝা, ব্যালান্স নষ্ট করে দিচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। সমস্যা সামাল দিচ্ছে অনেক কষ্টে, এগিয়ে চলেছে দ্রুত। ঠিক পিছনেই আছে দিনা। ঝাড়া হাত-পা ওর, এগোতে পারছে সহজে। ডান পায়ে ব্যথা থাকলেও সেটার তেমন কোনও আলামত দেখা যাচ্ছে না। জিমন্যাস্টের দক্ষতায় লাফ দিয়ে দিয়ে এগিয়ে আসছে মেয়েটা।

শেষ গর্তটায় পৌঁছে থামল রানা। পিছনে হাত বাড়িয়ে বলল, 'আরেকটা ক্লিপ দাও।'

'সরি, রানা,' মুখ কালো করে বলল দিনা। 'বাড়তি অ্যামিউনিশন তো গাড়িতে রয়ে গেছে। বের করবার সময় দাওনি তুমি।'

চোয়াল ঝুলে পড়ল রানার। পাথুরে জমিটা এখনও পঁচাত্তর ফুট দূরে, মাঝখানটায় বালিতে ঢাকা ফাঁকা জায়গা। ওখানে আরও কী পরিমাণ মাইন আছে, তা একমাত্র আল্লাহই জানেন! ফিয়াটের ইঞ্জিনের গর্জন কানে আসতেই দিশেহারা বোধ করল ও, শত্রুরা খুব কাছে এসে গেছে, খুব শীঘ্রি দৃষ্টিসীমায় পেয়ে যাবে ওদেরকে। ঠোঁট কামড়ে ধরল ও, নিয়েই ফেলল চরম সিদ্ধান্তটা। কাজটা আত্মহত্যার শামিল, কিন্তু আর কোনও উপায়ও নেই।

পিস্তলটা কোমরে গুঁজে লম্বা করে শ্বাস নিল রানা, তারপর ছুটতে শুরু করল পাথুরে জমিটার দিকে। বুক ধড়ফড় করছে, সমগ্র অস্তিত্ব চেঁচাচ্ছে জান-প্রাণ দিয়ে দৌড়ানোর জন্য, কিন্তু ছোট ছোট পদক্ষেপ ফেলল ও। দিনার কথা মাথায় রাখতে হচ্ছে ওকে, লম্বা কদম ফেললে ওর পায়ের ছাপে নিজের পা ফেলতে অসুবিধে হবে মেয়েটার।

প্রতিবার পা ফেলার সময় রানার মনে হচ্ছে, এই বুঝি বিস্ফোরণ ঘটল... এই বুঝি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল পা... কিন্তু অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে আসার পরও

তেমন কিছু ঘটল না। তারপরও স্বস্তি পেল না ও। সম্ভাবনার যে পরিসংখ্যান আছে, তাতে হিসেবটা ওর প্রতিকূলে। নিরাপদ প্রতিটা পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকির পরিমাণ বেড়ে চলেছে। গন্তব্যের দশ ফুটের মধ্যে পৌঁছুতেই ইচ্ছে হলো একটা ডাইভ দেয়, তা হলে পাথুরে জমিটায় গিয়ে পড়তে পারবে পা না ফেলে। কিন্তু দিনার কথা ভেবে দমে যেতে হলো। ওর সুবিধের জন্য শেষ একটা পদক্ষেপ ফেলল, আর তখুনি শিকার হলো নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসের।

ক্লিক!

মৃদু একটা শব্দ, কিন্তু ওটাই অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দিল রানার। লুকানো একটা মাইনের উপর পা পড়ে গেছে ওর, প্রাইমারটা জ্বলে উঠেছে ওজনের চাপে। এখুনি বিস্ফোরিত হবে মাইনটা। তীব্র হতাশা গ্রাস করল ওকে, আনমনে শুধু ভাবল—দিনা যেন আহত না হয়।

থামল না রানা, ইন্সটিঙ্কটের বশে ঝাঁপ দিল সামনে, পা সরে গেল মাইনের উপর থেকে। সঙ্গে সঙ্গে টের পেল, নিয়তি আসলে পরিহাসটা ঠিক কোথায় করেছে। পাথুরে জমির উপর কাঁধ দিয়ে পড়ল ও, গুঙিয়ে উঠল ব্যথায়, কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করল—পিছনে বিস্ফোরণটা ঘটেনি। দুই দশকের বেশি সময় ধরে পড়ে থাকতে থাকতে অচল হয়ে গেছে মাইনটা, মূল বিস্ফোরককে ডিটোনেট করতে ব্যর্থ হয়েছে ওটার প্রাইমার। এমন ঘটনা কদাচিৎ ঘটে... বেঁচে গেছে রানা দৈবাৎ।

মাথা ঝাড়া দিয়ে একটু উঁচু হলো রানা, চোখ ফেরাল দিনার দিকে। বুলেটের শেষ গর্তটায় পা রেখে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও—অবাক হয়ে দেখছে রানার পাগলামি।

'চলে এসো!' চেঁচাল রানা। 'ভয়ের কিছু নেই, আমার পায়ের ছাপে পা রেখো... শেষেরটা ছাড়া!'

মাথা ঝাঁকিয়ে ছুট লাগাল দিনা, নিখুঁত ছন্দে পা ফেলে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এসে পৌঁছুল রানার পাশে। হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল, 'ওভাবে লাফ দিলে... ল্যাগেনি তো?'

শক্ত জমিতে আছড়ে পড়ায় কাঁধটা ব্যথায় টনটন করছে রানার। এক হাতে জায়গাটা মালিশ করতে করতে উঠে দাঁড়াল ও। বলল, 'ওসব নিয়ে পরে মাথা ঘামানো যাবে। চলো, আগে গা-ঢাকা দিই।'

পাথুরে জমিটা একসারি টিলার গোড়া পর্যন্ত চলে গেছে। ওদিকে ছুটতে শুরু করল দুজনে। ঢালের কাছে পৌঁছুতেই পিছনে একটা ভয়াবহ বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনল। থামল না রানা, শব্দের উৎসের দিকেও তাকাল না। ঢালের আড়ালে চলে গেল। থামল ওখানে পৌঁছে। ধাতস্থ হতে একটু সময় নিল দুজনে, তারপর উঁকি দিল ঢালে শরীর মিশিয়ে।

জ্বলন্ত ল্যাণ্ড-ক্রুজারের ঠিক পিছনে এসে থেমেছে শত্রুপক্ষের পিকআপ। দুজন আফ্রিকান, সুদানিজ নিঃসন্দেহে, অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে গাড়িটার পাশে, ক্যাবের ভিতরে আছে আরও দুজন। বেকুবের মত সবাই তাকিয়ে আছে কয়েক গজ দূরে মাটিতে পড়ে থাকা একটা দলা পাকানো রক্তাক্ত দেহের দিকে। নতুন

একটা গর্ত সৃষ্টি হয়েছে মরুভূমির বুকে, ওটা থেকে সরু একফালি ধোঁয়া উঠছে, ছড়িয়ে পড়ছে হালকা বাতাসে। রানা বুঝতে পারল, বোকার মত ওদেরকে ধাওয়া করতে গিয়েছিল নিহত সুদানিজ, সতর্ক থাকেনি এগোনোর ব্যাপারে। ফলে যা ঘটার, তা-ই ঘটেছে। নিজের ক্ষমতা দেখিয়ে দিয়েছে পুরনো ল্যাণ্ড-মাইন প্রাণ কেড়ে নিয়ে! নেহায়েত কপাল গুণে বেঁচে গেছে ওরা... কৃতজ্ঞতা অনুভব করল রানা বুকের ভিতর।

কয়েক মিনিট দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে থেকে ওরা বুঝল, ভয়ের কিছু নেই, আর ধাওয়া করবে না সুদানিজরা। এক সঙ্গীকে মাইনের আঘাতে পটল তুলতে দেখে উৎসাহ-উদ্দীপনা হারিয়ে গেছে তাদের। মাথা ঘামাচ্ছে নিজেদের প্রাণ বাঁচানো নিয়ে। দিনাকে ইশারা করে ঢাল থেকে সরে এল রানা, হাঁটতে শুরু করল পাহাড়ি পথ ধরে। এবার আর তাড়াহুড়ো করছে না।

তীব্র গরমে শরীর সেদ্ধ হয়ে যাবার অবস্থা। ঘণ্টাখানেক চলার পর থেমে দাঁড়াল দিনা। সারা মুখ ঘামে ভেজা ওর, ভিজে গেছে পরনের পোশাকও। ক্লান্তিতে চলতে পারছে না আর। বড় একটা পাথরের ছায়ায় শুয়ে পড়ল ও, মাথা রাখল ভাঁজ করা হাতের উপর। ওকে কিছু বলল না রানা, নিজেও ক্লান্ত। দিনার পাশে বসে পড়ল ও-ও।

কাঁধে ঝোলানো ন্যাপস্যাকদুটো ভীষণ ভারী ঠেকছে, মাটিতে নামিয়ে চেইন খুলে ফেলল রানা—অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ফেলে হালকা করে নেবে। প্রথম ন্যাপস্যাকটা দিনার, ওটা থেকে কসমেটিকস আর বাড়তি কাপড়-চোপড় বের করে ছুঁড়ে ফেলতে শুরু করল। শখের জিনিসপত্রের করুণ পরিণতি দেখে মেয়েটার চোখে একটু বিষাদ ঘনাল, তবে প্রতিবাদ করল না। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে ফেলল।

'দিনা?' হঠাৎ ডেকে উঠল রানা।

ওর দিকে তাকিয়েই জিভ কামড়ে ধরল দিনা। রানার হাতে হেকলার অ্যাণ্ড কচের একটা স্পেয়ার ক্লিপ দেখা যাচ্ছে—লোডেড, ন্যাপস্যাকের ভিতরে পেয়েছে। 'উপস্! ওটার কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম!'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রানা—কী ভোগান্তিটাই না হয়েছে মেয়েটার ভুলোমনের কারণে! নিজের অজান্তেই আহত কাঁধে হাত বোলাল, কেঁপে উঠল মাইনের *ক্লিক* শব্দটা মনে পড়ে যেতে। দরকারি জিনিসপত্র একটা ন্যাপস্যাকে ভরে ফেলল ও, ফেলে দিল অন্যটা। শার্টের ভিতর থেকে মেডিউসা স্যাটেলাইটের তোলা ছবিগুলো বের করে ওগুলোও রাখল ব্যাগের ভিতর।

'পাশার কথা মনে হলেই খারাপ লাগছে,' হঠাৎ বলল দিনা। 'অন্তত ঠিকমত কবর হওয়া উচিত ছিল ওর।'

মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল রানার। পাশার মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী ভাবছে... ও-ই তো ওকে টেনে এনেছে এখানে। বিবেকের দংশন অনুভব করছে। এই দংশন আরও বাড়বে। যাযাবর সর্দারের ছেলেকে রিফিউজি ক্যাম্প থেকে শ্রমিক ভাড়া করে আনতে বলেছে ও, ড্যাশি অভ ডেড চিলড্রেনের পথে রওনা হয়ে গেছে ওরা, এদিকে পৌঁছুলেই বিপদে পড়বে। ধাওয়া করে আসা

সুদানিজদের দেখে বুঝতে পারছে, শত্রুপক্ষ উপত্যকাটার ব্যাপারে জেনে ফেলেছে। ওখানে ওঁৎ পেতে থাকবে তারা। আবেলও বিপদে পড়েছে... বা পড়তে যাচ্ছে খুব শীঘ্রি। দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল রানা।

'প্লিজ, দিনা,' বলল ও। 'ওসব কথা মনে করিয়ে দিয়ো না।'

ওর দিকে তাকিয়ে মায়াভরা চোখদুটোয় উদ্বেগ দেখতে পেল দিনা। কিছু বলতে চাইল, পারল না। সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। ওর গলার দিকে চোখ পড়ল রানার—কলারের ফাঁক দিয়ে ভিতরে একটা চেইন দেখা যাচ্ছে, লকেটটা চলে গেছে বুশ শার্টের তলায়... দুই স্তনের মাঝখানে। একটু ঝুঁকে চেইনটা ধরে টান দিল ও, শার্টের তলা থেকে বেরিয়ে এল একটা *স্টার অভ ডেভিড*—ইহুদিদের পবিত্র ধর্মীয় প্রতীক।

'মোসাদ?' সংক্ষেপে জানতে চাইল রানা।

'না, শিন বেট,' উত্তর দিল দিনা। কণ্ঠে আর জড়তা নেই।

স্বস্তি অনুভব করল রানা। লুকোচুরির পালা শেষ হয়েছে, এবার খোলাখুলিভাবে কথা বলতে পারে ওরা। তাই প্রশ্ন করল, 'কী ঘটছে আসলে, খুলে বলবে আমাকে?'

'নিশ্চয়ই, একটা ব্যাখ্যা পাওনা হয়েছে তোমার।'

'শুধু ব্যাখ্যা না, আরও অনেক কিছু পাওনা হয়েছে,' তিক্ত গলায় বলল রানা। 'তবে ধৈর্য ধরতে রাজি আছি আমি। আপাতত ব্যাখ্যাটাই শুনি! খুলে বলো সব।'

মাথা ঝাঁকাল দিনা। 'শুরুটা হয়েছে তোমার ওই মেডিউসা-ফটোগ্রাফ দিয়ে। কয়েক মাস আগে ওগুলোর ওপর নজর পড়ে একদল ইজরায়েলি ফ্যানাটিকের...'

'ইজরায়েলি?' ভুরু কোঁচকাল রানা। 'মুসলিম নয়?'

'না,' বলল দিনা। 'আসমারায় আবেল যে-ইয়োরোপিয়ান দুটো লোককে দেখেছে, ওরা আসলে ইহুদি চরমপন্থী; গ্রুপটার নেতা হলো ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী ইয়োরাম রাবাক। ওদের ব্যাপারে অনেক আগে থেকেই জানতাম আমরা; তবে ওরা কতটা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, সেটা টের পেয়েছি মাত্র ক'দিন আগে...'

মাথায় ঝড় বইছে রানার, ভালই ধোঁকা দেয়া হয়েছে ওদেরকে। সোহেলের কিডন্যাপাররা এমনভাবে মিথ্যে সূত্র ছড়িয়ে রেখে গেছে, যা দেখে মুসলিম চরমপন্থীদের পিছনে ছুটতে শুরু করে সবাই। লোকগুলোর প্ল্যানিঙের তারিফ না করে পারা যায় না। ওর মন অবশ্য অন্যরকম আভাস দিচ্ছিল, কিন্তু নিরেট কোনও প্রমাণ ছিল না হাতে। আচমকা সোহেলের বলা বুডলস্ জিনের রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল ওর কাছে। কৌশলে চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরও অপহরণকারীদের পরিচয় জানাতে চাইছিল... বলতে চাইছিল, ওরা মুসলিম নয়!

দিনা বলে চলল, 'রাবাক আর তার অনুসারীরা ইজরায়েলকে একটা ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়। মেডিউসার ছবিতে কী দেখা যাচ্ছে, তা বুঝতে পেরেছে সে; সেই সঙ্গে এটাও বুঝেছে—ওটা আবিষ্কারের কৃতিত্ব নিজের

ঝুলিতে ভরতে পারলে প্রধানমন্ত্রীত্ব নিশ্চিত। ছবিগুলো ইউএস ন্যাশনাল রিকনিসান্স অফিস থেকে হাত করবার চেষ্টা করে লোকটা, কিন্তু তার আগেই ওগুলো আণ্ডারসেক্রেটারি এডওয়ার্ড ব্যাগলির কাছে বিক্রি করে দেয় মেজর জেফরি ভারগাস নামে *এনআরও*-র একজন স্টাফ। ব্যাগলি অবশ্য আসল ঘটনা জানত না, ও চাইছিল ছবিগুলোর সাহায্যে স্টেট ডিপার্টমেন্টে নিজের নড়বড়ে পজিশনকে শক্ত করে তুলতে। যা হোক, ছবিগুলো বিক্রি হয়ে যাবার কয়েকদিন পর ব্যাপারটা জানতে পারি আমরা। আমেরিকায় আমাকে পাঠানো হয় ব্যাগলির সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্য। ওয়াশিংটনের ইরিত্রিয়ান এম্বাসিতে বেশ কিছু টাকা ঢালি আমরা, যাতে আমাকে ইরিত্রিয়ান কর্মচারী বলে স্বীকার করা হয়, ব্যাগলি যেন আমার সঙ্গে ইজরায়েলের কানেকশন খুঁজে না পায়। আমার মিশন ছিল—ব্যাগলির উপর নজর রাখা; ওর সঙ্গে রাবাক বা তার লোকেরা যোগাযোগ করে কি না, সেটা দেখা। সম্ভব হলে রাবাকের আগেই খনিটা খুঁজে বের করবার ব্যবস্থা করা।

'এরপর অবশ্য বলার কিছু নেই, বাকিটা তোমার জানা আছে। তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি আমরা, খনি খোঁজার ব্যাপারে সাহায্য চেয়েছি, তুমিও রাজি হয়ে ইরিত্রিয়ায় চলে এসেছ... এতে রাবাকের জন্য বড় একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। ছবিগুলো নেই ওর কাছে, খনিটা খুঁজে বের করতে পারছে না, তাই খেপে গেছে। ওর লোকজন আমাদের পিছনে লেগে আছে, আসমারায় ওদের উপস্থিতি সেটাই প্রমাণ করে। ইতোমধ্যে ওরা আণ্ডারসেক্রেটারি ব্যাগলিকেও খুন করেছে।'

'কী!' চমকে উঠল রানা।

'হ্যাঁ, যেদিন আমরা ওয়াশিংটন থেকে রওনা হলাম, সেদিন সকালে। আমি নিজে ওর লাশ দেখে এসেছি।'

'আমাকে আগে বলোনি কেন?'

'দুঃখিত, তোমাকে ঘাবড়ে দিতে চাইনি।'

কটমট করে দিনার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল রানা। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'একটা ব্যাপার আমিও চেপে গেছি। এখানে আমি নিজের ইচ্ছাতে আসিনি। আমার বন্ধুকে তো তুমি চেনো... সেদিন রেস্টুরেন্টে দেখেছ, আমার সঙ্গে ছিল, হাসিখুশি মস্ত বড় মনের মানুষ। ওকে কিডন্যাপ করেছে রাবাকের চরমপন্থীরা, ওরাই সব কাজ ফেলে এখানে আসতে বাধ্য করেছে আমাকে। আসমারায় ওরা আমাদেরকে ঠেকাবার জন্য অপেক্ষা করছিল না, নজর রাখছিল আমার উপর।'

এবার দিনার অবাক হবার পালা। 'তোমার বন্ধু সোহেল... মানে, সেদিন রাতে বার্নির রেস্টুরেন্টে যে-ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হলো, তিনি?'

'হ্যাঁ, সে-রাতেই ওকে ধরে নিয়ে গেছে ওরা।' ঘটনাটা খুলে বলল রানা। কিডন্যাপারদের সঙ্গে কী কী কথা হয়েছে, রোম এয়ারপোর্টে যা ঘটেছে... সব।

'এসব তুমি আগে আমাকে বলোনি কেন?'

'দুঃখিত,' দিনার সুর নকল করল রানা। 'তোমাকে বিশ্বাস করতে পারিনি।'

শ্বাগ করল দিনা। 'জানি, এ-আচরণ আমার প্রাপ্য। তবে আর তোমাকে ধোঁকা দেবার ইচ্ছে নেই আমার। হ্যাঁ, আমি ইজরায়েলি চর, রানা। তবে মনে-প্রাণে আমি একজন ইরিত্রিয়ানও। ইজরায়েলের হয়ে কাজ করলেও এই দেশটার কোনও ক্ষতি চাই না। আমি চাই না, রাবাকের মত একটা নোংরা মানুষের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার হোক ইরিত্রিয়া।' একটু থামল ও। 'আচ্ছা, আমার সত্যিকার পরিচয়টা কি রোমেই আঁচ করেছ? মানে... আমাকে তেল আবিবের ফ্লাইট ধরতে দেখে?'

'না, আমেরিকাতে থাকতেই তোমার ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছি। সন্দেহটা রোমে যাবার পর সত্যি প্রমাণ হয়েছে শুধু। ইজরায়েলে কেন গিয়েছিলে তুমি?'

'প্রধানমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট করতে। ব্যাগলি খুন হয়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি জটিল হয়ে পড়েছিল। আমার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চেয়েছিলেন তিনি।'

'এয়ারপোর্টে যে-লোকটা খুন হলো, তার ব্যাপারে কিছু জানো?'

'তোমার বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে ওটা হাসাব হাইন—রাবাকের বাহিনীর টপ এজেন্টদের একজন,' দিনা বলল। 'আমাদের প্রতিরক্ষামন্ত্রী একটা ফ্যাসিস্ট, রানা। ইহুদি হয়ে আরেক ইহুদিকে গালি-টা দিচ্ছি, নিশ্চয়ই খুব অদ্ভুত শোনাচ্ছে? কিন্তু কথাটা সত্যি। হিটলারের মত ও-ও ধর্মীয় শুদ্ধতায় বিশ্বাস করে, ইজরায়েলের মাটিতে ইহুদি ছাড়া আর কোনও ধর্মাবলম্বীকে দেখতে চায় না। নাৎসিদের মত কনসেনট্রেশন ক্যাম্প বানিয়ে তাতে সমস্ত ফিলিস্তিনীকে বন্দি করে রাখতে চায়। এরপরও ওকে ফ্যাসিস্ট না বলে উপায় আছে?

'এই স্বপ্ন ওর আজকের নয়। আশির দশকে ইথিওপিয়ান ইহুদিদেরকে এয়ারলিফট করে ইজরায়েলে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা হয়তো শুনেছ। রাবাক ওটার মদদদাতা ছিল। বাইরের দুনিয়াকে বলা হয়েছিল, মানবিক কারণে উদ্ধার করা হয়েছে ওদেরকে, কিন্তু আসল কারণ ভিন্ন। ইজরায়েলে নিচু স্তরের কাজ করতে থাকা ফিলিস্তিনীদেরকে রিপ্লেস করবার একটা পদক্ষেপ ছিল ওটা—আফ্রিকান শরণার্থী ইহুদি দিয়ে!'

দিনার কথা শুনতে শুনতে মন থেকে সন্দেহ দূর হয়ে যেতে শুরু করেছে রানার। বুঝতে পারছে, স্রেফ দেশ আর মাতৃভূমির স্বার্থেই কাজ করছে মেয়েটা, ওর সঙ্গে মিথ্যে বলেছে একই কারণে। এই প্রথম মনে হলো, ওর উপর আস্থা রাখা যায়।

কণ্ঠ থেকে রুক্ষতা দূর হয়ে গেল রানার। প্রশ্ন করল, 'এই সুদানিরা কারা? আমাদের শত্রু... অথচ রোমে রাবাকের এজেন্টকে খুন করেছে, আসমারার হোটেলেও লড়াই হয়েছে দু'পক্ষের মধ্যে। ব্যাপারটা ঠিক মিলছে না।'

'এটা আরেকটা গ্রুপ,' বলল দিনা। 'ওদের পিছনে ইটালিয়ান মদদ আছে। তুমি প্রথম যে খনিটা খুঁজে পেয়েছ, ওটার পিছনে লেগেছে ওরা। কাকতালীয়ভাবে আমাদের খনিটাও একই জায়গায় হওয়াতে ওদের সঙ্গে গোলমাল বেধে গেছে।'

তারপরও খটকা দূর হচ্ছে না রানার। 'মানছি, রাবাক একজন ম্যানিয়াক।

কিন্তু আমি তো পেপারে পড়েছি, নির্বাচনে ওর জয় মোটামুটি নিশ্চিত। খামোকা হীরার পিছনে ছুটে সময় নষ্ট করছে কেন সে?'

'ও হীরার পিছনে ছুটছে না, রানা,' দিনা মাথা নাড়ল। 'নির্বাচনটা ওকে ক্ষমতায় হয়তো বসাতে পারবে, কিন্তু সারা দুনিয়ার ইহুদিদেরকে এক পতাকার তলায় এনে দিতে পারবে না। তার জন্য আরও বড় একটা অর্জন দরকার ওর—পুরনো ওই খনিটার আবিষ্কার সেই মহা-অর্জন হতে পারে।'

'কেন? ওটার বিশেষত্ব কী?' জানতে চাইল রানা।

রহস্যময় একটা হাসি ফুটল দিনার ঠোঁটে। 'আন্দাজ করতে পারছ না? গত কয়েকদিনে তোমার আচরণ দেখে কিন্তু অন্যরকম ভেবেছিলাম আমি। বিশেষ করে মঠের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে যখন কথা বলতে চাইলে... মনে তো হলো সব বুঝে ফেলেছ!'

ভুরু কোঁচকাল রানা, কী বোঝাতে চাইছে মেয়েটা? একটু গভীরভাবে চিন্তা করল ও, কিছু কি মিস করে গেছে? তা হলে বুঝতে পারছে না কেন ব্যাপারটা? হঠাৎ পুরনো খনির এন্ট্রান্স খুঁজতে গিয়ে পাওয়া সাদা পাথরটার কথা মনে পড়ে গেল। সাধারণ কোনও পাথর নয়, প্রস্তর যুগের হাতিয়ার ছিল ওটা—একটা হাতুড়ি! কয়েক হাজার বছর আগে অমন হাতুড়ি দিয়ে ভাঙা হতো আকরিক। ওটা দেখেই খনিটার প্রকৃত বয়স আন্দাজ করতে পেরেছে ও।

আচমকা খাপে খাপে বসে গেল সব। ইহুদি সম্প্রদায়, কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন খনি, আর ধর্মীয় চরমপন্থী। এর অর্থ একটাই হতে পারে, আর সেটা উপলব্ধি করতেই দম আটকে এল রানার। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য, অসম্ভব... কিন্তু পুরো রহস্যের আর কোনও ব্যাখ্যা থাকতে পারে না। ঠিকই বলেছে দিনা, হীরার পিছনে ছুটছে না ইয়োরাম রাবাক, তার চেয়ে অনেক... অনেক বড় একটা জিনিস তার লক্ষ্য।

মুখের ভাব বদলে গেছে রানার। কোনোমতে বলল, 'তুমি কি বলতে চাইছ, খনিটা...' কথা শেষ করতে পারল না ও।

দিনার হাসিটা আরেকটু বিস্তৃত হলো। 'মঠের ওই সন্ন্যাসীরা কনফার্ম করতে পারবে, তবে হ্যাঁ... তোমার অনুমান একেবারে ঠিক। পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে আলোচিত এক কিংবদন্তিকে সত্যি বলে প্রমাণ করতে চলেছি আমরা। খনিটা আসলে...'

মুখ খুলল রানা, ফিসফিস করে বেরুল শব্দটা। 'কিং সলোমন'স্ মাইন... সলোমনের খনি!'

সাত

ইরিত্রিয়া-সুদান সীমান্ত।

ধীরে ধীরে বর্ডার পেরিয়ে ইরিত্রিয়ায় ঢুকল ট্রাকের বহর। সামনের

বাহনটার প্যাসেঞ্জার সিটে বসে আছে মার্সেলো মানসিনি, জানালার কাঁচ নামিয়ে রেখেছে, যাতে মরুর শুষ্ক বাতাসের গন্ধ শুঁকতে পারে, শুনতে পায় টার্বো-ডিজেল ইঞ্জিনের গুরুগম্ভীর আওয়াজ। অদ্ভুত এক পুলক অনুভব করছে সে, নিজেকে মনে হচ্ছে দিগ্বিজয়ী সমরনায়কের মত। আবিসিনিয়ায় আগ্রাসন চালাবার সময় বেনিটো মুসোলিনি যে-ট্যাঙ্কগুলো ব্যবহার করেছিল, তার চেয়ে দ্বিগুণ ওজন বহন করছে মাইনিং গিয়ার আর প্রভিশনে বোঝাই ট্রাকগুলো; সশস্ত্র সৈন্য-সামন্তও আছে—কাজেই ভাবনাটাকে একেবারে অবাস্তর বলা চলে না।

খাকি রঙের সাফারি সুট পরেছে মানসিনি, চোখ-ধাঁধানো রোদ থেকে বাঁচার জন্য নাকের উপর রয়েছে গাঢ় রঙের সানগ্লাস। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে উদাস হয়ে গেল ইটালিয়ান টাইকুন। কম পায়নি ও জীবনে—টাকা-পয়সা, ক্ষমতা-প্রতিপত্তি... কোনও কিছুরই তো অভাব নেই। তারপরও মনের ভিতর একটা শূন্যতা কাজ করে সবসময়। কারণ ওসব অর্জনে সত্যিকার অর্থে তার ব্যক্তিগত কৃতিত্ব খুব কম, সবই এসেছে পারিবারিক উত্তরাধিকার-সূত্রে। কিন্তু হারানো খনিটা ওই অপূর্ণতা দূর করে দিতে পারে। অ্যাঞ্জেলো মানসিনি ওটা থেকে হীরা তুলতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, কিন্তু মার্সেলো হবে না। একার চেষ্টায় মানসিনি-সাম্রাজ্যের এই নতুন শাখাটাকে প্রস্ফুটিত করবে সে... সারা পৃথিবীর হীরার ব্যবসাতে হবে হর্তা-কর্তা-বিধাতা; কেবলমাত্র তখুনি পরিবারের ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে সে। নিজের একটা আলাদা স্বকীয়তা... আলাদা ছাপ রেখে যেতে পারবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনে। ওই খনিটা তাই ওর জীবনের সেরা অর্জন হবে। খুব শীঘ্রিই সফল হতে চলেছে ওর অন্তিম লক্ষ্য। হালকা একটা হাসি ফুটে উঠল মানসিনির ঠোঁটে। রাস্তার দিকে চোখ ফেরাল সে।

ইরিত্রিয়ান রিফিউজিদেরকে এখন আর অনুসরণ করছে না মানসিনির বহর। বড্ড ধীরগতিতে এগোচ্ছিল ওরা—দিনে মাত্র দু'মাইল। তাই হিলারি প্রস্তাব দেয়—বাড়তি কয়েকজন স্কাউটকে একটা পিকআপ নিয়ে রিফিউজি কাফেলার সামনে পাঠিয়ে দেয়া হোক; ওদের যাত্রাপথের কোথায় কী অবস্থা জানা যাবে তা হলে, সময় বাঁচবে। রাজি হয়েছে মানসিনি, এবং তাতে ফল পাওয়া গেছে। রওনা হবার তিনদিন পর দ্বিতীয় স্কাউট দলটা জানায়—বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছে ওরা... চারদিকে পাহাড়-ঘেরা একটা উপত্যকার ভিতর থেকে। জায়গাটার লোকেশনও জানায় তারা।

খবরটা পেয়ে আর দেরি করেনি মানসিনি, রিফিউজিদের কাফেলাকে এড়িয়ে সোজা ভ্যালি অভ ডেড চিলড্রেনের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে পুরো বহর নিয়ে। পথে নামার একটু পরই আবার যোগাযোগ করেছিল স্কাউটরা—উপত্যকা থেকে একটা টয়োটা ল্যান্ড-ক্রুজারকে বেরোতে দেখেছে, ড্রাইভার লোকটার চেহারার বর্ণনা শুনে মনে হলো—ওটা মাসুদ রানা। তৎক্ষণাৎ গাড়িটাকে থামাতে নির্দেশ দেয় মানসিনি, বলে দেয়—রানাকে জ্যান্ত ধরে আনা চাই, মেডিউসা-ফটোগ্রাফগুলো পাওয়া যাবে ওর কাছে। কিন্তু হিলারির অযোগ্য সহকারীরা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে মিশনটাতে। কয়েক ঘণ্টা পর নির্লজ্জভাবে

রিপোর্ট দিয়েছে—রানা একটা মাইনফিল্ডের ভিতর দিয়ে অদ্ভুত কৌশলে পালিয়ে গেছে, ধাওয়া করতে গিয়ে সুদানিজ গার্ডেরা নিজেদের একজন লোককে হারিয়েছে।

মানসিনির ট্রাকের ড্রাইভিং ক্যাবের পিছনের সিটে বসে আছে হিলাল, মুখ কালো। ইতোমধ্যে দলের লোকের ব্যর্থতার কারণে বাক্যবাণে তাকে একচোট তুলোধুনো করেছে ইটালিয়ান টাইকুন। ব্যাপারটাকে ব্যক্তিগত অপমান হিসেবে নিয়েছে সে। ড্যাশবোর্ডে বসানো রেডিও খড়খড় করে উঠতেই সিধে হয়ে বসল হিলাল, না জানি এখন আবার কোন্ দুঃসংবাদ শুনতে হয়! স্কাউট টিমকে বলা হয়েছে উপত্যকায় গিয়ে ওদের অপেক্ষায় থাকতে... ব্যাটারা আবার কোনও উল্টোপাল্টা কাণ্ড ঘটায়নি তো!

'স্কাউট টু কলিং কনভয় ওয়ান। কাম ইন, কনভয় ওয়ান।'

হ্যাণ্ডসেট তুলে নিল মানসিনি। 'দিস ইজ কনভয় ওয়ান। বলো, কী খবর?'

'উপত্যকায় ঢুকেছি আমরা, এখানে তিনজন ইরিত্রিয়ানকে পেয়েছি—ডিগিং-ইকুইপমেন্ট সহ। বাঙালি লোকটা এদেরকে রেখে গেছে এখানে। ওদেরকে আটক করেছি।'

'কী করছিল ওরা?' জানতে চাইল মানসিনি। 'খনিতে খোঁড়াখুঁড়ি করছিল?'

'জী না, সার। খোঁড়াখুঁড়ি করছে একটা পাহাড়ের গোড়ায়।'

'মানে! খনিটা নেই ওখানে?'

'আছে, সার। জায়গামতই আছে। কিন্তু ইরিত্রিয়ানদের লিডার লোকটা বলছে—ওতে কোনও মিনারেল নেই। বাঙালি লোকটা নাকি ভিতরে গিয়ে সব দেখে এসেছে। তাই ওরা পাহাড়ের দিকটাতে খোঁজাখুঁজি করছে।'

'হোয়াট!' গর্জে উঠল মানসিনি। দুশ্চিন্তা ভর করেছে মাথায়, ফুরফুরে ভাবটা উধাও হয়ে যেতে শুরু করেছে। 'নিশ্চয়ই ভুল করছে ওরা। হীরা আছে ওখানে, আমি জানি!'

'কী জানি, সার। ওর কথা শুনে তো মনে হলো না মিথ্যে বলছে।'

'কারও বোলচাল বিশ্লেষণের জন্য পাঠানো হয়নি তোমাদেরকে,' গরম গলায় বলল মানসিনি। 'উপত্যকাটা পাহারায় রাখো। আমরা খুব শীঘ্রি পৌঁছুচ্ছি ওখানে।'

স্পিড বাড়ানো হলো কনভয়ের, তারপরও আট ঘণ্টা লেগে গেল ভ্যালি অভ ডেড চিলড্রেনের প্রবেশমুখের গিরিখাদে পৌঁছুতে। ট্রাকের পিছনের সিটে হিলালের পাশে আরেকজন সৈনিক বসেছে, দুজনে নিচু গলায় কথা বলল। কান পেতে মানসিনি জানতে পারল, জায়গাটা সম্পর্কে জানে ওরা, ভয় পায় কুসংস্কারের বশে। উল্টো ঘুরে হিলালকে ব্যাপারটা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করল, কিন্তু সে সঠিক জবাব দিতে পারল না একটা প্রশ্নেরও। নিয়োগকর্তাকে শুধু জানাল, উপত্যকা-সম্পর্কিত আতঙ্কটা বহু বছর ধরে বিরাজ করছে। কেউ তার সঠিক উৎস জানে না। সুদান থেকে শুরু করে ইরিত্রিয়া আর ইথিওপিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে কিংবদন্তিটা।

'রাবিশ!' ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল মানসিনি কথাটা শুনে।

একটু পরেই অবশ্য অন্যসব চিন্তা হারিয়ে গেল, গিরিখাদ পেরিয়ে উপত্যকায় ঢুকে পড়ল ট্রাকের বহর। দু'চোখ ভরে চারপাশের দৃশ্য দেখছে ইটালিয়ান টাইকুন। কল্পনার সঙ্গে মিলছে না, তবে তাতে কিছু যায়-আসে না। গন্তব্যে পৌঁছে গেছে, এটাই বড় কথা।

বিশাল প্রান্তরের মাঝখানে তাপতরঙ্গ ভেদ করে মাথা উঁচু করে থাকা হেড-গিয়ারটা দৃষ্টি আকর্ষণ করল তার। কিছুক্ষণ পর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সাপোর্ট বিল্ডিংগুলোও দৃষ্টিগোচর হলো। ওগুলোর সামনে পার্ক করে রাখা হয়েছে অ্যাডভান্স স্কাউটদের ফিয়াট পিকআপ। মনটা অজানা উত্তেজনায় নেচে উঠল মানসিনির।

ধুলো উড়িয়ে পুরনো মাইনিং-ফ্যাসিলিটির চত্বরে ঢুকল ট্রাকের বহর, এয়ার-ব্রেকের হিসহিস শব্দ তুলে থামল। লাফ দিয়ে ক্যাব থেকে নেমে পড়ল ইটালিয়ান টাইকুন, উত্তেজিত ভঙ্গিতে ছুটে গেল খোলা শাফটের মুখের দিকে। ওয়ালেস মায়ার যোগ দিল তার সঙ্গে।

'এটাই সেই খনি!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মানসিনি। 'আমার সারাজীবনের স্বপ্ন... অ্যাঞ্জেলো মানসিনির খনি!' ভিতরে দামি কিছু নেই বলে যে-খবর শুনেছে, তা যেন ভুলেই গেছে।

এই খনি মূল্যহীন হতে পারে না। অ্যাঞ্জেলোর স্থির বিশ্বাস ছিল, এই এলাকায় হীরা আছে; সেই বিশ্বাস বুকে ধারণ করেই মারা গেছেন তিনি। তাঁর বিমানটা ক্র্যাশ না করলে মানসিনি পরিবার ঠিকই পেয়ে যেত অকাট্য প্রমাণ। ভুল করেছে মাসুদ রানা... নিশ্চয়ই ভুল করেছে। একাকী খনির সবগুলো শাখা-প্রশাখা সার্ভে করতে পারেনি নিশ্চয়ই, উপযুক্ত ইকুইপমেন্টও হয়তো ছিল না ওর কাছে। এখানে হীরা আছে... আর মানসিনি সেটা খুঁজে বের করবেই।

'চমৎকার, সার,' নিয়োগকর্তার উচ্ছ্বাস দেখে তাল মেলাল ওয়ালেস। 'ইয়ে... কাজটা আপনি কীভাবে করতে চান?'

মাথা ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকাল মানসিনি। 'কী বলতে চাও?'

'না, মানে... জায়গামত তো পৌঁছে গেছি। এখনও কি আপনিই অর্ডার ইস্যু করবেন, নাকি আমি নিজের মত কাজ করতে পারব?'

মানসিনির হাসিটা শোনাল কুকুরের কাশির মত। দক্ষিণ আফ্রিকান সুপারভাইজরের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'ওয়ালেস, বন্ধু আমার, আমি এমন একজন লোক, যে কিনা গুণের কদর করতে জানে। এখান থেকে হীরা বের করবার জন্য ভাড়া করেছি তোমাকে, নিজের মাতব্বরি দেখাতে নয়। মাইনিং হলো তোমার বিদ্যা, আমি তার কিছুই জানি না; খামোকা হম্বিতম্বি করে কাজে ব্যাঘাত ঘটাব না। এখন থেকে এখানকার নিয়ন্ত্রণ তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি, আমি স্রেফ একজন দর্শকের ভূমিকায় থাকব। ফলাফল চাই আমি, তার জন্য যে-কোনও পন্থায় এগোতে পারো, যে-কোনও পদক্ষেপ নিতে পারো; আমি আপত্তি করব না।'

'শুনে খুশি হলাম, সার,' মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানাল ওয়ালেস, উল্টো ঘুরে চলে গেল ট্রাকের কাছে। সঙ্গে আনা শ্রমিকদেরকে জড়ো করেছে ওখানে

সুদানিজ সৈন্যরা।

'কাফ্রির বাচ্চারা, শোন্!' চেঁচাল ওয়ালেস। 'এখন থেকে তোরা সবাই আমার গোলাম!' সৈন্যদের দিকে তাকাল। 'যতক্ষণ না বাকি রিফিউজিরা আসছে, ততক্ষণ তোরাও কাজ করবি। বুঝেছিস? হিলাল তোদের নেতা, আর আমি হিলালের বাপ! কথা না শুনলে চাবকে পাছার চামড়া তুলে নেব। যা এখন, চেকলিস্ট মিলিয়ে সমস্ত মালামাল নামাতে শুরু কর্। আনলোডিং শেষ হলে তাঁবু খাটাবার জন্য দশজনকে চাই। বাকিরা মালপত্র গোছগাছ করবে। গ্রুপিং অনুসারে সমস্ত মাইনিং গিয়ার স্টোরে ঢোকানো চাই—সারফেস, সাব-সারফেস... এভাবে। কাজ বুঝতে না পারলে আমাকে বা অন্য কোনও সুপারভাইজারকে জিজ্ঞেস করে নিবি। সাবধান, উল্টোপাল্টা কিছু দেখলে কিন্তু পিটিয়ে লাশ বানাব তোদেরকে!' হাততালি দিল সে। 'কুইক! কাজে নেমে পড়।'

ইতোমধ্যে সবার ভিতর ভালই প্রভাব ফেলেছে ওয়ালেস, হুড়োহুড়ি পড়ে গেল জটলার মধ্যে। কাজের জন্য ছুটল সবাই। ঘুরে নিজের সঙ্গী অপর চার শ্বেতাঙ্গ সুপারভাইজারের দিকে এগোল ওয়ালেস। ওদেরকে দায়িত্ব দিল সঙ্গে আনা এক্সপ্লোসিভের—নিরাপত্তার জন্য ক্যাম্প আর খনি থেকে অন্তত পাঁচশো গজ দূরে স্টোর করতে হবে ওগুলো, সতর্কতামূলক বিভিন্ন ব্যবস্থাও নেয়া দরকার। অশিক্ষিত শ্রমিক বা সৈনিকরা ওসবের কিছুই বুঝবে না।

কিছুক্ষণ পর মানসিনির সঙ্গে কথা বলে তিন ইরিত্রিয়ান বন্দিকে হাজির করবার নির্দেশ দিল ওয়ালেস। হাতবাঁধা অবস্থায় স্কাউটদের পিকআপের পাশে ফেলে রাখা হয়েছে ওদের। দুশ্চিন্তা আর আতঙ্কে দুই ইকুইপমেন্ট-অপারেটরের মুখ শুকিয়ে গেছে। আবেল এ-ধরনের পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিত, তারপরও উদ্বিগ্ন না হয়ে পারছে না। সুদানিজদের দলবল আর অস্ত্রশস্ত্র দেখেই বোঝা যাচ্ছে—শক্ত প্রতিপক্ষ। এরাই সম্ভবত হামলা চালিয়েছিল আসমারার এয়ারপোর্ট আর বাজারে। ইয়োরোপিয়ান পক্ষটা কোথায়? অবশ্য ওরা এলেও যে উদ্ধার পাওয়া যাবে, এমন কোনও সম্ভাবনা নেই। অন্তত এই বিশেষ পরিস্থিতিতে শত্রুর শত্রু ওদের বন্ধু—এমনটি ধরে নেওয়া যাবে না।

সুদানিজ স্কাউটরা এসে টান দিয়ে দাঁড় করাল তিন বন্দিকে, গরু খেদানোর ভঙ্গিতে নিয়ে গেল খনির খোলা মুখের সামনে। গম্ভীর হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে মানসিনি আর ওয়ালেস। ভয় পেয়ে গেল এক্সক্যাভেটরের অপারেটর আবুদা, বিড়বিড় করে ডাকতে শুরু করল ঈশ্বরকে।

কয়েক কদম এগিয়ে বন্দিদের সামনে এসে দাঁড়াল ওয়ালেস, একে একে তাকাল তিনজনের চেহারার দিকে। অভিজ্ঞ মানুষ, সহজেই বুঝে নিল তিন ইরিত্রিয়ানের মধ্যে নেতা কে। হালকা হাসি ফুটল তার মুখে, একটা হাত তুলে দিল আবুদার কাঁধে। পরমুহূর্তেই হ্যাঁচকা এক টান দিয়ে বেচারাকে খনির ভিতর ফেলে দিল সে।

সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের জন্য হতভাগ্য এক্সক্যাভেটর-অপারেটরের আর্তচিৎকার প্রতিধ্বনি তুলল শাফটের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে। তারপর থ্যাচ্

জাতীয় একটা শব্দের সঙ্গে থেমে গেল সব—নীচের লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের উপর আছড়ে পড়েছে দেহটা, প্রাণ বেরিয়ে গেছে। ভয়াবহ দৃশ্যটা কল্পনায় ভেসে উঠতেই আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে ফেলল ট্রেইলার ট্রাকের ড্রাইভার জিঞ্জি। কিন্তু আবেল শান্ত রইল। ভিতরে ভিতরে প্রচণ্ড ক্রোধ দানা বেঁধে উঠছে ওর, কিন্তু চেহারায় তার প্রকাশ ঘটতে দিল না।

'বাহ্, বাহ্! তুই দেখছি একটা কঠিন মাল!' বিদ্রূপের সুরে বলল ওয়ালেস। 'ভালমত ভেবে দ্যাখ্, প্রশ্নের জবাব দিতে শুরু করবি... নাকি তোর আরেক দোস্তকেও ফেলে দেব গর্তে?'

দক্ষিণ আফ্রিকান পাষণ্ডটাকে গাল দিতে ইচ্ছে হলো আবেলের, বলতে ইচ্ছে হলো—*শুয়োরের বাচ্চা, তুই তো এখনও কোনও প্রশ্নই করিসনি! আবুদাকে খুন করলি কেন?* তবে ঝোঁকটার রাশ টেনে ধরল সে শক্ত হাতে। খামোকা মরণ ডেকে এনে লাভ নেই কোনও। তারচেয়ে বেঁচে থাকলে প্রতিশোধ নিতে পারবে। মাথা নিচু করে ফেলল আবেল—পরাজিত ভঙ্গি।

ব্যাপারটা লক্ষ করে সন্তোষ ফুটল ওয়ালেসের চেহারায়। 'গুড,' বলল সে। 'এবার বল্, এখানে খনি রেখে তোরা পাহাড়ের গোড়ায় খোঁড়াখুঁড়ি করছিলি কেন?'

বলল আবেল, গোপন করল না কিছুই—বাঁচার তাগিদে, প্রতিশোধ নেবার তাগিদে।

সবকিছু শুনে ভাঁজ পড়ল মানশিনি আর ওয়ালেসের কপালে। একঘণ্টা পর আনলোড করা মালামাল আবার ট্রাকে তুলে রওনা হয়ে গেল পুরো বহরটা, প্রাচীন খনির পাশে নতুন ক্যাম্প স্থাপন করবার জন্য।

আট

মরুভূমি। বহুদূর বিস্তৃত। অতি কদাচিৎ উষর ভূমির আগ্রাসী থাবার গতিরোধ করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে পাহাড়ি খাঁজ আর রোদজ্বলা পাথুরে টিলা। সবুজের চিহ্ন বর্জিত, ন্যাড়া—মাটি ফুঁড়ে উঠে গেছে আকাশের দিকে। গাছপালা বলতে পাতাহীন কিছু ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মেসকিট, সেজঝোপ আর ন্যুব্জদেহ ক্যাকটাস। অকালে বুড়িয়ে যাওয়া, বহুকালের তেল-পানি না পড়া খড়ি-ওঠা শরীরের মত। এ ছাড়া যতদূর চোখ চলে, শুধু বালি আর বালি। উঁচু-নিচু। ছাই-সাদা। পুরো প্রান্তরে তাপতরঙ্গ নাচছে। তামাটে আকাশ থেকে গনগনে আগুন নীচের বালুতে প্রতিফলিত হয়ে সৃষ্টি করছে ওই তরঙ্গ। তাকালে চোখে লাগে। মাথা ঝিমঝিম করে।

বড্ড ভুল হয়ে গেছে, হাঁটতে হাঁটতে ভাবছে রানা। সুদানিজরা চলে যাবার পর মাইনফিল্ডে আবার ফিরে যাওয়া উচিত ছিল ওর। ল্যাণ্ড-ক্রুজারটা পুড়িয়ে ফেললেও দরকারি দু'চারটে জিনিস হয়তো উদ্ধার করা যেত। পানির ক্যান্টিন,

কিংবা ওর স্যাট-ফোন... সবই ফেলে এসেছে তাড়াহুড়োয়। কাঁধে একটা ন্যাপস্যাক রয়েছে বটে, তবে যে-কঠিন সময় অপেক্ষা করছে সামনে, তা মোকাবেলা করবার জন্য ওটায় রাখা জিনিসপত্র কোনও কাজে আসবে না। রাত নামতে এক্ঘণ্টা বাকি, কিন্তু এরই মধ্যে তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। মাইনফিল্ড পেরুনোর ঝুঁকিটুকু নিলে হয়তো বা রক্ষা পেত মরুভূমিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া থেকে। উপলব্ধিটা বড্ড দেরিতে এসেছে; কঠোর বাস্তবতা হলো, এখন আর চাইলেও ফেরার উপায় নেই। অনেকদূর এসে পড়েছে ওরা, ব্যাকট্র্যাক করে ওদিকে ফিরে গেলে এখন স্রেফ শক্তি খরচ করা হবে—যেহেতু পানি পাবার নিশ্চয়তা নেই পোড়া ল্যাণ্ড-ক্রুজারের ভিতর। তার চেয়ে এগিয়ে যাওয়াই ভাল, হয়তো বা বাঁচার মত একটা উপায় বেরিয়ে যেতে পারে।

খাবার নিয়ে চিন্তা করছে না রানা, অনাহারেও বেশ কিছুদিন টিকে থাকে মানুষ। একমাত্র সমস্যা—পানি। মুখের ভিতরটা খটখটে শুকনো হয়ে গেছে। জিভটা এতই খসখসে, যেন মরুর কোনও সরীসৃপের চামড়া ওটা। ঢোক গিলতে পারছে না অনেকক্ষণ থেকে, শেষবার যখন গিলেছিল, তখনও গলায় তীব্র ব্যথা অনুভব করেছিল, তারস্বরে চেঁচাচ্ছিল সমস্ত নার্ভ। তারপর থেকে ঢোক গেলার চেষ্টায় ক্ষান্ত দিয়েছে ও।

ক্লান্ত চোখে দিনার দিকে তাকাল রানা। ওর অবস্থাও বিশেষ সুবিধের নয়। তীব্র রোদে কালো চামড়া আরও কালো হয়ে গেছে, খাঁটি নিগ্রোদের মত দেখাচ্ছে এখন ওকে। পা ফেলছে এলোমেলোভাবে। রানা বুঝতে পারছে—আগামী চব্বিশ থেকে ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে পানি পাওয়া না গেলে নিশ্চিতভাবে মারা যাবে ওরা দুজন। দিনার সত্যিকার পরিচয়, মিশন, আর সলোমনের খনি হারিয়ে গেছে মনের ভিতর থেকে। সমস্ত চিন্তাচেতনা এখন শুধু এগিয়ে যাবার দিকে... পানির উৎস পাবার দিকে।

অস্তায়মান সূর্যের আলো পড়ছে ওদের পিঠে, সামনে গোটা মরুভূমি ছেয়ে গেছে লালচে আভায়। আলো-ছায়ায় মিশে অদ্ভুত একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। দৃষ্টিবিভ্রমের কারণে উঁচু উঁচু বালিয়াড়িগুলোকে দেখাচ্ছে রূপকথার রাজপ্রাসাদের মত, ছায়ার মাঝে মাথা তুলে রেখেছে—চূড়ায় ডুবন্ত সূর্যের ম্লান আলোর মুকুট। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে থেমে গিয়ে দু'চোখ ভরে দেখার মত দৃশ্য... তবে মুগ্ধতায় মগ্ন হবার মত অবস্থায় নেই রানা বা দিনা। দুর্বল পা ফেলে এগিয়ে চলেছে ওরা, প্রতি পদক্ষেপে কমছে এগোনোর গতি।

কাপড় ছিঁড়ে মাথায় বেঁধেছে ওরা, রোদ থেকে বাঁচবার জন্য। ফ্লুইড-লস ঠেকাতে শ্বাস নিচ্ছে শুধু নাকের সাহায্যে। সারাজীবনে শেখা সব-ধরনের সার্ভাইভাল টেকনিক ব্যবহার করছে দু'জনে, তারপরও ভয়াল মরুভূমিতে ওদের প্রচেষ্টা নিতান্তই অপ্রতুল হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাইট-নেভিগেশনের ইকুইপমেন্ট নেই সঙ্গে, থাকলে রাতে চলা যেত, এড়ানো যেত সূর্যের অত্যাচার; এখন সেই অত্যাচারই সয়ে হাঁটতে হচ্ছে ওদেরকে, নইলে রাতে নির্ঘাত পথ হারাবে। চরম মূল্য দিতে হচ্ছে এর ফলে, প্রথম দিনটা ফুরোনোর আগেই পরিষ্কার হয়ে গেছে—মারা যাচ্ছে ওরা।

'সূর্য ডুবে যাচ্ছে,' মুখ খুলল রানা, গত ছ'ঘণ্টায় এই প্রথম। সঙ্গিনীকে আশ্বাস দিল। 'ঠাণ্ডা নেমে আসবে একটু পরেই।'

'একটু পরে মরেও যাব,' কাষ্ঠ হাসি দিয়ে বলল দিনা। গলার স্বর খসখসে হয়ে গেছে।

'দ্যাটস্ দা স্পিরিট!' কৌতুক করল রানা। 'অমন অ্যাটিচিউড-ই ধরে রাখো।' হাসার চেষ্টা করল ও, সঙ্গে সঙ্গে ফেটে গেল ঠোঁটের চামড়া, রক্ত গড়াতে শুরু করল। ব্যথায় মুখ কোঁচকাতে গিয়ে থমকে গেল ও, তাতে আরও কষ্ট বাড়বে।

চারপাশটা দেখল রানা—একেবারেই রুক্ষ ও বন্ধুর একটা জায়গায় এসে পড়েছে ওরা। মরুভূমির মেঝে ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে ছোটবড় নানা রকম পাথুরে টিলা... পূর্বে আদোবা নদীর দিকে ওদের এগোনোর পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাঁটতে থাকল ও, দিনাকেও বাধ্য করছে। হাঁটছে অনিশ্চিত পদক্ষেপে, শরীর আক্রান্ত হয়েছে ক্লান্তি ও পানিশূন্যতায়। অমানুষিক পরিশ্রম করতে হচ্ছে টিলাগুলোর ঢাল বেয়ে ওঠানামা করতে।

রাতের অন্ধকার নামার কিছুক্ষণ আগে বড় একটা টিলার গোড়ায় গুহা দেখতে পেয়ে থামল ওরা। ঢুকে পড়ল ওখানে। কথা বলবার শক্তি নেই, ঠাণ্ডা মেঝেতে পিঠ দিয়ে শুয়ে পড়ল। আধঘণ্টা বিশ্রাম নেবার পর শরীরে একটু শক্তি পেল রানা, উঠে বসে হেলান দিল গুহার পাহাড়ি দেয়ালে। আরাম পেল না, ন্যাপস্যাকটা বালিশের মত ব্যবহার করতে চাইল, কিন্তু ওটা পাথরের চেয়েও শক্ত।

পা টনটন করছে, কিন্তু বুট খোলার সাহস পাচ্ছে না। খোলার সঙ্গে সঙ্গে পা ফুলে ঢোল হয়ে যাবে, পরে আর পরা যাবে না জুতোজোড়া। ফিতে শুধু একটু ঢিল করে নিল রানা, চামড়ার উপর থেকে চাপ কমাবার জন্য।

'তুমিও করো,' দিনাকে বলল ও। 'খুব আরাম। বেটার দ্যান সেক্স!'

'বুঝতে পারছি, বিছানায় তোমার পারফর্মেন্স সুবিধের নয়,' ঠাট্টা করল দিনা। উঠে বসল। 'কতদূর এগিয়েছি আমরা?'

'মনে হচ্ছে পঁচিশ থেকে ত্রিশ মাইল।'

'বাহ্! তা হলে তো নদীর দিকে অর্ধেক পথ পেরিয়ে এসেছি!'

'সরি, তোমাকে নিরাশ করতে হচ্ছে,' তিক্ত গলায় বলল রানা। 'উঁচু-নিচু জমি আর হতচ্ছাড়া পাহাড়গুলোর কারণে আঁকাবাঁকা পথে এসেছি আমরা। পঁচিশ মাইল হাঁটলেও আসলে পনেরো মাইলের বেশি এগিয়েছি বলে মনে হয় না।'

মুখ কালো হয়ে গেল দিনার। 'তারমানে নদীটা এখনও...'

'পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে,' বলল রানা। 'সমতল জমি না পেলে ওটুকু কাভার করতে আরও কমপক্ষে সত্তর মাইল হাঁটতে হবে আমাদেরকে।' দুঃসংবাদ শুনিয়ে চলল ও। 'আজ রাতে আরও দুর্বল হয়ে পড়ব আমরা, কাল চলার গতি আরও কমে যাবে। সূর্যের মধ্যে যতক্ষণ থাকব, পানিশূন্যতা বাড়তে থাকবে। বলতে খারাপ লাগছে, কিন্তু এটাই বাস্তবতা।'

'খনির উপত্যকায় ফিরে গেলে কেমন হয়?'

'ওটাও কম দূরে নয়। অতদূর যেতেই পারব না। তা ছাড়া সুদানিজরা ওখানকার খোঁজ পেয়ে গেছে। দৈববলে যদি কোনোভাবে যেতেও পারি, উপত্যকায় ঢোকামাত্র ওদের হাতে খুন হয়ে যাব।'

'তারমানে বাঁচার কোনও উপায় নেই?' করুণ গলায় বলল দিনা। 'আমরা মারা যাব?'

'মারা তো যাবই,' কষ্ট করে হালকা একটা হাসি ফোটাল রানা, 'তবে সেটা আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে... বুড়ো হয়ে! বোকা দুশ্চিন্তা কোরো না, এর থেকে অনেকগুণ কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছি আমি আগে।'

সান্ত্বনাটাতে কাজ হলো, পুরোপুরি নিশ্চিন্ত না হলেও দিনা কিছুটা সাহস ফিরে পেল। হামাগুড়ি দিয়ে কাছে এল ও, রানার কোলে মাথা রেখে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল। ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিল রানা, খানিক পরেই শুনতে পেল ভারী শ্বাস ফেলার আওয়াজ—ঘুমিয়ে পড়েছে মেয়েটা।

রানা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে ঘুমোতে পারল না। মনটা খুঁতখুঁত করছে ওর দিনার সঙ্গে আলাপচারিতার কথা ভেবে। সলোমনের খনি... নিঃসন্দেহে ওটা একটা আর্কিয়োলজিক্যাল ওয়াণ্ডার, স্মরণকালের ইতিহাসে সবচেয়ে বিখ্যাত আবিষ্কার হতে চলেছে... কিন্তু তাতে ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা-মন্ত্রীর কী? কীভাবে সে এই আবিষ্কারটাকে পুরো দুনিয়ার ইহুদিদেরকে একত্র করবার কাজে ব্যবহার করবে? খনিটা ইজরায়েলের ভিতরে হলেও নাহয় একটা কথা ছিল! ধাঁধার এই অংশটা এখনও অস্পষ্ট। ব্যাপারটার ব্যাখ্যা এড়িয়ে গেছে দিনা, বা হয়তো জানেই না।

ওটা নিয়ে মাথা ঘামাবার সুযোগ পায়নি আসলে। পানি আর খাবার ছাড়া মরুভূমি পাড়ি দিতে হচ্ছে ওদেরকে, এর মাঝে অনর্থক কথা বলে শক্তি খরচ করতে চায়নি—আপাতত খনিটা যেহেতু ওদের নাগালের বাইরে। ঘুমে চোখ মুদে আসার আগে আরেকটা বিষয় মনে পড়ে গেল রানার—সুদানের রিফিউজি ক্যাম্প থেকে আসা শ্রমিকদলটার কথা। একটা নরক ত্যাগ করে আরেকটা নরকে পা দিতে চলেছে ওরা। জানা কথা, সুদানিজ দস্যু ও তাদের ইটালিয়ান নিয়োগকর্তা ওদেরকে এখন খনিতে ক্রীতদাসের মত খাটাবে, কারও প্রাণের পরোয়া করবে না। প্রতিটা মৃত্যুর জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী হতে হবে ওকে, কারণ ও-ই তো যাযাবর সর্দারের ছেলেকে পাঠিয়েছিল ওদেরকে জোগাড় করে আনার জন্য। আনমনে মাথা নাড়ল রানা, আগামীকাল থেকে লড়াইটা শুধু নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য নয়, নিরীহ একদল মানুষের জন্যও করতে হবে ওকে।

পরদিন সকালে রানার আগেই জাগল দিনা। আস্তে করে ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙাল ওর। রাতভর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়েছে ওরা—হাতে হাত, বুকে মাথা, পায়ে পা। ঘনিষ্ঠতা এবং বিশ্বাসের চরম বহিঃপ্রকাশ ওটা, প্রেমিক-প্রেমিকার ঘুমানোর চিরায়ত ভঙ্গি। ঘুম ভাঙার পরও চুপচাপ কিছুক্ষণ পরস্পরের স্পর্শ উপভোগ করল দুজনে। খানিক পর উঠে বসার চেষ্টা করতেই টের পেল

ওরা—মাংসপেশি কতটা আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল দিনা, রানাকেও ঠোঁট কামড়ে ধরতে হলো শারীরিক যাতনা সহ্য করবার জন্য। আর্থ্রাইটিসের রোগীর মত কাটাতে হলো কিছুটা সময়—খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, হাত-পায়ের সীমিত নড়াচড়ার মাধ্যমে। দিনাকে দিয়ে হালকা ব্যায়াম করাতে শুরু করল রানা—পেশির জড়তা কাটাতে চাইছে। কিন্তু তাতে কষ্ট বেড়ে গেল আরও। সামান্যতম নড়াচড়ায় আর্তনাদ করে উঠল শরীরের প্রতিটা অস্থিসংযোগ। হার মানল না রানা, মিনিট বিশেকের মধ্যে আবার পথে নামার জন্য তৈরি করে নিল নিজেদেরকে। সূর্য চড়ে যাবার আগে দু'ঘণ্টার মত সময় আছে, পরিবেশটা ঠাণ্ডা থাকতেই যতটা পারে এগিয়ে যেতে হবে। পরে আর সেভাবে এগোতে পারবে না।

বেরিয়ে পড়ল দুজনে। বিশাল মরুভূমির মাঝখানে ওদেরকে দেখাচ্ছে ছোট্ট দুটো পোকার মত, গুটি গুটি পায়ে চেষ্টা করছে মস্ত খালি টেবিলের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যেতে। প্রতিটা পদক্ষেপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে যেন একটা করে ব্যক্তিগত বিজয়—তৃষ্ণা আর ক্লান্তির বিরুদ্ধে। দু'ঘণ্টা পর একটু বিশ্রাম চাইল দিনা, কিন্তু রানা রাজি হলো না। যন্ত্রের মত এগোল ওরা, পা ফেলছে প্রায় অবচেতনভাবে, হাত নড়াচ্ছেই না প্রায়—কাজটা বড্ড কষ্টের।

দু'ঘণ্টা পর আর পারল না দিনা, ধপ্ করে একটা গ্র্যানিটের চাতালের নীচে বসে পড়ল। ওকে আর জোর করল না রানা, নিজেও বসল পাশে, চোখ রাখল কব্জিতে বাঁধা ট্যাগ-হিউয়ার ঘড়িতে। ঠিক পনেরো মিনিট পেরুতেই আবার উঠে দাঁড়াল ও, হাত বাড়িয়ে দিল সঙ্গিনীর দিকে। করুণ চোখে ওর দিকে তাকাল দিনা, তারপর হাতটা ধরে উঠে পড়ল। আশ্চর্য ওই মহৎ ও ভদ্র মানুষটা পারলে পারবে সে-ও। আবার শুরু হলো পথ চলা। কোথায় যাচ্ছে কে জানে!

মনকে বিক্ষিপ্ত রাখবার জন্য কদম গুনতে শুরু করল রানা, ঠিক করল—দু'হাজার পা এগিয়ে যাবার বিশ্রাম নেবে। ততক্ষণে অন্তত আরও এক মাইল এগোতে পারবে বলে আশা করছে। কিন্তু গোনা শেষ হতেই বুঝল, আসলে মাত্র অর্ধেক দূরত্ব পাড়ি দিয়েছে। থামার চিন্তা ত্যাগ করল ও, বাদ দিল গোনাগুনিও, মন দিল শুধু পা ফেলাতে। বিশ্রাম এমনিতেও নিতে হবে একটু পরে—দিনার যখন শক্তি ফুরিয়ে যাবে। ততক্ষণ পর্যন্ত এগোতে থাকাই ভাল। মেয়েটার অবস্থা আন্দাজ করতে অসুবিধে হচ্ছে না, ওর নিজেরই শরীর আর চলতে চাইছে না। এগোচ্ছে স্রেফ মনের জোরে।

বেলা বারোটা বাজার খানিক পর, নাম-না-জানা এক পাহাড়ের গোড়ায় একটা গুহা নজরে পড়ল রানার—আগের রাতটা যেমন গুহাতে কাটিয়েছে, অনেকটা তেমনই। দিনাকে নিয়ে ওটায় ঢুকে পড়ল, দিনের সবচেয়ে উত্তপ্ত সময়টা কাটিয়ে দেবার ইচ্ছে। নির্দয় সূর্য ওর মাথার ভিতর সহস্র মাইগ্রেনের সমান ব্যথা জাগিয়ে দিয়েছে, যন্ত্রণায় চোখে অন্ধকার দেখছে। এর ভিতর আর হাঁটা সম্ভব নয়।

'বিকেলটায় সময় আবার রওনা হব,' কোনোমতে বলল ও। তারপর চলে গেল একটা ঘোরের মধ্যে। না ঘুম, না জাগরণ—মাঝামাঝি একটা অবস্থা।

ঠিক সময়ে রওনা হতে পারল না ওরা, শরীরে শক্তি ফিরে আসেনি। তাই সূর্য পশ্চিমে আলমত ঢলে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল। রোদের তেজ মরে গেলেই গুহা ছেড়ে বেরিয়ে এল দুজনে। হাঁটার গতি এত কমে গেছে যে, রাত নামার আগে সামনের পর্বতসারি পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবে কি না—সে-ব্যাপারে ঘোর সন্দেহ জাগল রানার মনে। পানিশূন্যতায় মৃত্যু ঘটতে এখনও একটা দিন বাকি আছে, তবে ও নিশ্চিত—রাতে যদি থামে, তা হলে পরদিন সকালে আর উঠতে পারবে না।

'সূর্য ডোবার পরও যদি এগোতে থাকি, তোমার আপত্তি আছে?' জানতে চাইল রানা।

দুর্বলভাবে মাথা নাড়ল দিনা। 'পথ হারাব না?'

'পথ অনেক আগেই হারিয়েছি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'হাঁটছি শুধু আন্দাজের বশে।'

চুপচাপ এগিয়ে চলল দুজনে। রাতের বেলা তাপমাত্রার অত্যাচার না থাকায় অনেকদূর যেতে পারবে ওরা, তাই থামতে চাইছে না রানা। দিক হারানোর ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছে না। অসহায়ভাবে মৃত্যুকে বরণ করতে আপত্তি আছে ওর। কোনদিকে যাচ্ছে, তাতে কিছু যায়-আসে না, মরতে হয় সংগ্রাম করে মরবে।

এক ঘণ্টা পর আবার মুখ খুলল রানা, কতটা সময় পেরিয়েছে, জানে না। 'কাল সকালে আবার বিশ্রাম নেব আমরা। বিকেলের দিকে আবার একটু হাঁটব। ঠিক আছে?'

আধঘণ্টা পর কথা বলল দিনা, তবে কষ্টের মাঝখানে সময়টার বিরতি খেয়াল করল না কেউ। 'আচ্ছা, পুরনো মঠটা নদীর এপারে না?'

দশ মিনিট পর জবাব দিল রানা। 'আবেল আর পাশার কাছে তো তা-ই শুনেছি। তবে ওটার কতটা কাছে এসেছি, তা বলতে পারব না।'

বিশ মিনিট বিরতি। দিনা বলল, 'প্রার্থনা করি, ওটা যেন খুব কাছে হয়!'

ঝপ করে আঁধার নেমে এল, মরুর বুক থেকে শুষে নিতে শুরু করল উত্তাপ। ধীরে ধীরে আকাশে ফুটে উঠল তারা, বরফের মত ঠাণ্ডা আলো নিয়ে। তাপমাত্রা বিশ ডিগ্রিতে নেমে যাবার পর দুজনে খেয়াল করল, আগের চেয়ে দ্রুত এগোতে পারছে, বিশ্রামও নিতে হচ্ছে খুব কম। রাতের প্রথম অংশটা আশা জোগাল ওদের মনে।

তবে মাঝরাত নাগাদ শরীরের শেষ শক্তিটুকু খরচ হয়ে গেল ওদের, সঙ্গে সঙ্গে ফাটল ধরল মনোবলে। শুরুতে ঘণ্টায় দু'মাইল এগোলেও গতিটা কমে গিয়ে আধ-মাইলে পরিণত হলো... সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেটা কমছে আরও। তৃষ্ণাটা এখন আর শুধু শারীরিক চাহিদাতে সীমাবদ্ধ নেই, ওটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। আর বারো ঘণ্টা পর বড় ধরনের ক্ষতি করতে শুরু করবে দেহের, কিডনিকে ধ্বংস করে দেবে। এরপর মৃত্যু আসবে খুব দ্রুত।

ভোর পাঁচটায় পুবাকাশে উদয় হলো সূর্য। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, এর

মধ্যে প্রায় বিশ মাইল পাড়ি দিয়েছে ওরা। পাহাড়ি এলাকার শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে, পর্বতমালার সারির মাঝখানে ফাঁকা জায়গার পরিমাণ বেড়েছে, ফলে পূর্বদিকে মোটামুটি সরল একটা পথেই এগোতে পারছে ওরা। তবে গন্তব্য এখনও অনেক দূরে, তাই পাহাড়ের গায়ে গুহার খোঁজে চোখ বোলাতে শুরু করল রানা, দিনের বেলাটা বিশ্রাম নেবার জন্য। পরিস্থিতির বাস্তবতা খুব ভাল করেই অনুধাবন করতে পারছে ও, পদযাত্রার শেষটা দেখা হবে না ওদের কারও। দিনটুকু বিশ্রাম নিয়ে সন্ধ্যায় হয়তো আবার বেরুতে পারবে, তবে তখন সামান্য কয়েক মাইলের বেশি যেতে পারবে না, যেখানে থামবে—সেটাই হবে ওদের অন্তিম শয্যা। তীব্র হতাশায় ঠোঁট কামড়ে ধরল ও, চামড়া ফাটার কষ্ট অনুভব করল না, তবে ওখান দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্তের তারল্য টের পেয়ে নিজের অজান্তেই চুষতে শুরু করল।

ক্লান্তি আর সূর্যের প্রখরতায় চোখদুটো প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে রানার, কমে গেছে দৃষ্টিসীমা। অল্প কয়েক ফুট দূরত্বের পর থেকে সব ঢেকে আছে চোখ-ধাঁধানো সাদায়। বুক জ্বালানো তৃষ্ণায় জিভের পিছন দিকটাতে ফোস্কা পড়ে গেছে, সেটার তুলনায় চোখের পাতার কষ্ট কিছুই না। লালা বের করবার জন্য মুখের ভিতর একটা নুড়িপাথর রেখেছিল, তবে সেই কৌশল ফেল মেরেছে অনেক আগেই। পাথরটা এখন স্রেফ একটা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে, শক্তি এত কমে গেছে যে, ওটা থুঃ করে ফেলেও দিতে পারছে না।

মরীচিকা দেখতে শুরু করেছে দুজনেই। স্বপ্নের মত চোখের সামনে ভেসে উঠছে ঝর্ণাধারা, কুলকুল ধ্বনি শুনতে পাচ্ছে কানে, নাকে ভেসে আসছে ভেজা গন্ধ। যতই এগোচ্ছে, ততই দূরে সরে যাচ্ছে এই কল্পনা, পাগল হবার দশা করছে ওদের।

দিনার কথা ভুলেই গিয়েছিল রানা, সচেতন হয়ে উঠল পিছনে ধপাস্ করে একটা আওয়াজ হতে। মাথা ঘোরাতেই মাটিতে নিথর পড়ে থাকতে দেখল মেয়েটাকে, জ্ঞান হারিয়েছে। সুন্দর মুখ থেকে সমস্ত কমনীয়তা অদৃশ্য, খসখসে চামড়া টানটান হয়ে আছে খুলির উপর। সামনে দৃষ্টিনিক্ষেপ করল রানা, পাহাড়ি একটা পাঁচিল দেখতে পেল—নিরেট। ফাঁকফোকর চোখে পড়ছে না। দৃষ্টিসীমার স্বল্পতার কারণে পাঁচিলটাকে ঘুরে যাবার মত পথও দেখতে পাচ্ছে না।

ওটা নিয়ে পরে ভাবা যাবে, আগে দিনাকে সাহায্য করা দরকার। কাঁধ ঝাঁকিয়ে সাপের মত লকলকে করতে থাকা ন্যাপস্যাকটা খুলে ফেলল রানা। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল অজ্ঞান সঙ্গিনীর পাশে। যা করতে চলেছে, তা ঠিক সচেতনভাবে নয়; চিন্তাশক্তি ঠিক থাকলে নিঃসন্দেহে দ্বিধা করত। কিন্তু ওসব পর্যায় বহু আগেই পেরিয়ে এসেছে, এখন জীবনমরণের প্রশ্ন, আর কিছু নিয়ে ভাববার অবকাশ নেই। পকেট থেকে একটা ছোট ছুরি বের করল ও, ভাঁজ করা ফলা খুলে ঠেকাল রোদে পুড়ে যাওয়া হাতের চামড়ায়—কবজির উল্টোপাশে। কিছু ভাবল না ও, নির্বিকার ভঙ্গিতে পোঁচ দিল ওখানে।

ধারালো ছুরির টানের মুহূর্তেই দু'ফাঁক হয়ে গেল চামড়া, ইঞ্চি-দুয়েক আকারের একটা ক্ষত সৃষ্টি হলো, সেখান দিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত। তাড়াতাড়ি

ক্ষতটা দিনার মুখে চেপে ধরল ও। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া দিল অজ্ঞান মেয়েটি—চেতনা নেই, তারপরও ঠোঁটদুটো সজাগ হয়ে উঠল তরল পদার্থের স্পর্শ পেয়ে। এমনিতে কোনোদিন যা করতে পারত না, ঠিক তা-ই করল ও, চুষতে শুরু করল রক্ত... ঠিক একটা ভ্যাম্পায়ারের মত।

ধীরে ধীরে প্রাণের সাড়া ফিরতে শুরু করল ফ্যাকাসে মুখটাতে। দিনা পুরোপুরি সজাগ হয়ে ওঠার আগেই হাতটা সরিয়ে নিল রানা, এক টুকরো কাপড় দিয়ে ক্ষতটা বাঁধল, রুমাল দিয়ে মুছে দিল মেয়েটির মুখে লেগে থাকা রক্তও। কয়েক সেকেণ্ড পর চোখ মেলল দিনা।

'কী হয়েছিল?' দুর্বল গলায় জানতে চাইল ও।

'কিছু না, জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গিয়েছিলে,' বলল রানা। 'বেশ জোরে মুখ থুবড়ে পড়েছ, ঠোঁট ফেটে গেছে। এখন কেমন লাগছে?'

'কী জানি!'

মুখের ভিতর জিভটার নড়াচড়ার আভাস দেখতে পেল রানা, অদ্ভুত স্বাদটা কীসের, তা বুঝতে চাইছে দিনা। ওর মনোযোগ ফেরানোর জন্য তাড়াতাড়ি বলল, 'রোদ চড়ে যাবে একটু পরেই। একটা আশ্রয় খুঁজে বের করা দরকার। তুমি হাঁটতে পারবে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠতে চেষ্টা করল দিনা, কিন্তু পারল না। হুড়মুড় করে লুটিয়ে পড়ল আবার। দৃষ্টিতে ফুটে উঠল হতাশা।

'কিচ্ছু ভেবো না, আমি তোমাকে বয়ে নিয়ে যাব,' বলল রানা।

'পাগল হয়েছ?' দিনার চোখে অবিশ্বাস। 'আমার ওজন...'

'ওই ন্যাপস্যাকটার চাইতে বেশি হবে না এখন,' বলল রানা। পিঠ ফিরিয়ে বসল ওর দিকে। কৌতুক করে বলল, 'মাসুদ রানা এক্সপ্রেসে চড়ার জন্য শেষ বোর্ডিং-কল দিচ্ছি। ট্রেন মিস করলে কিন্তু প্ল্যাটফর্মে পড়ে থাকতে হবে!'

কয়েক মুহূর্ত স্থির রইল দিনা, তারপর বুঝতে পারল—রানা সিরিয়াস। সত্যিই ওকে বয়ে নিয়ে যাবে—ও চাক, বা না-ই চাক। আশ্চর্য একটা অনুভূতি হলো ওর হৃদয়ে... এমন মানুষ সত্যিই তা হলে আছে এই পৃথিবীতে! অগত্যা কাঁধ ঝাঁকাল, উঠে পড়ল রানার পিঠে। ন্যাপস্যাকটা আর নিল না রানা, উঠে দাঁড়াল ওকে নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে টের পেল, কতটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। দিনার ছিপছিপে দেহটার ওজন এমনিতেই অনেক কম, গত দু'দিনের ধকলে আরও হালকা হয়ে গেছে। তারপরও রানার মনে হলো জগদ্দল একটা পাথর চেপে বসেছে পিঠে, কষ্টটা সইবার জন্য শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর হয়ে গেল।

ব্যথার দিক থেকে মনকে ফিরিয়ে এগোনোর দিকে মন দিল ও। ধীর গতিতে শুরু করল হাঁটতে। দিনা ওর কাঁধে থুতনি ঠেকিয়ে রেখেছে, কানে ভেসে আসছে দুর্বল শ্বাস ফেলার আওয়াজ। কয়েক পা এগোতেই হাঁটু কাঁপতে শুরু করেছে; রানা বুঝতে পারল, আদোবা নদী পর্যন্ত দিনাকে এভাবে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় ওর পক্ষে; খুব শীঘ্রি ওরা খুঁজে না পেলে হুড়মুড় করে পড়ে যাবে ওকে নিয়ে। তারপরও মেয়েটা একটু আরাম পাচ্ছে... এটাই যা সান্ত্বনা!

'দিনা, আমি আসলে কিছু দেখতে পাচ্ছি না,' বলল ও। 'চোখদুটো একটু

খোলা রেখে গাইড করো। একটা গুহা দরকার আমাদের।'

কষ্টকর একটা ঘণ্টা পেরুল। পাহাড়ি পাঁচিল ঘেঁষে উত্তরদিকে এগোচ্ছে রানা। ব্যথা-ট্যথা অনুভব করছে না আর, পিঠটা আড়ষ্ট হয়ে গেছে। শরীরের শেষ শক্তিটুকু ব্যবহার করে হেঁটে চলেছে শুধু—ওটা ফুরোতেও বেশি দেরি নেই। নিভে যাবার আগে আগুন যেভাবে দপ্ করে জ্বলে ওঠে, সেই অবস্থা চলছে এখন। সূর্য উঠে এসেছে অনেকটা। তীব্র উত্তাপ আর পিঠে চেপে থাকা দিনার ওজন মাটিতে মিশিয়ে ফেলতে চাইছে ওকে। অনেকক্ষণ থেকেই দিনার সাড়াশব্দ নেই, রানা ভেবেছিল ফের অজ্ঞান হয়ে গেছে, তবে হঠাৎ উত্তেজিত চিৎকার শুনে বুঝল—ধারণাটা ভুল।

'ওই যে... রানা! ওখানে!!'

কী দেখেছে দিনা, বুঝতে পারল না রানা। চোখে সাদাটে মেঘ ছাড়া আর কিছু ভাসছে না, সারা দুনিয়া হারিয়ে গেছে দৃষ্টি থেকে। সঙ্গিনীর নির্দেশনা শুনে টলমল পায়ে এগোল শুধু, একেবারে প্রবেশমুখে পৌঁছানোর পর দেখতে পেল গুহাটা। চোখ-ধাঁধানো আলোর মাঝখানে ছায়ায় ঢাকা একটা কালো গহ্বর।

পিছলে রানার পিঠ থেকে নেমে পড়ল দিনা। ব্যাপারটা টের পেল না ও। বোধবুদ্ধি সব ভোঁতা হয়ে গেছে। মৃত্যুপথযাত্রী পশুর মত একটা চিন্তাই শুধু খেলছে মাথায়—একটা নিরাপদ আশ্রয় চাই, যেখানে শান্তিতে মরা যায়! হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রানা, উবু হয়ে হামাগুড়ি দিতে শুরু করল। গুহার ভিতরের ঠাণ্ডা পরিবেশটা টের পেল কি পেল না, থামল একপাশের দেয়ালে মাথা লেগে যাওয়ায়। আর এগোনোর মানে হয় না, হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। দিনাও এসেছে ওর পিছু পিছু, রানার দেখাদেখি ও-ও বসে পড়ল মাটিতে।

রানা জানে, আর উঠতে পারবে না ও। মাথাটা দপ দপ করছে ব্যথায়, সামান্য টোকা লাগলেই যেন দুই টুকরো হয়ে যাবে। পাশে বসা দিনার হাতে হাত রাখল ও, মনে হলো যেন শুকনো কাগজ স্পর্শ করেছে। পানির জন্য শরীরের প্রতিটা অণু-পরমাণু চিৎকার করছে... কিন্তু হা-হতোস্মি!

'এখানেই আমরা মরব, দিনা,' ফিসফিসাল রানা। 'দুঃখিত, তোমার জন্যে কিছু করতে পারলাম না।'

করুণ চোখে ওর দিকে তাকাল দিনা। রানার মুখটা খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ভরা, তার তলায় রোদে পুড়ে কালচে হয়ে গেছে চামড়া, ফেটে গেছে খরাক্রান্ত জমির মত। চোখদুটো বসে গেছে কোটরে, ঠোঁটের চারপাশে ফোস্কা পড়েছে... সবমিলিয়ে বীভৎস একটা চেহারা। মৃত্যুর এত কাছাকাছি কাউকে দেখেনি ও আগে।

নড়তে গিয়ে কী যেন একটা ঠেকল দিনার হাতে, সেদিকে তাকাতেই চামড়ায় মোড়া একটা পুরনো বই দেখতে পেল। স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি লোপ পেয়েছে, তাই অবাক হলো না জিনিসটা পেয়ে। নীরবে হাতে তুলে নিল। রানাকে বলল, 'শান্ত হও, ঘুমানোর চেষ্টা করো। আমি তোমাকে বই পড়ে শোনাচ্ছি।'

'ঘুম-পাড়ানি গল্প?' হাসার চেষ্টা করল রানা, পারল না।

'দেখিই না!' বইটা কোলের উপর রেখে মেলে ধরল দিনা। কয়েক লাইন পড়েই বিস্মিত হয়ে বলল, 'আরে! এ-দেখছি শেক্সপিয়ার! ইটালিয়ানে অনুবাদ করা! অসুবিধে নেই। ভাষাটা আমি জানি, তোমাকে অর্থ বুঝিয়ে দেব।'

আচমকা সচেতন হয়ে উঠল রানা। বলে কী মেয়ে! এখানে শেক্সপিয়ারের বই আসবে কোত্থেকে? একটু উঁচু হলো ও, শক্তিটা কীভাবে পেল বলতে পারবে না।

'দেখো তো, আর কী আছে?'

'কী?' দিনা নির্দেশটা বুঝতে পারেনি।

'গুহায় আর কী আছে, দিনা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

বইটা নামিয়ে রেখে চারপাশে তাকাল দিনা। ভিতরের আবছায়া পরিবেশের সঙ্গে দৃষ্টি মানিয়ে যেতেই চমকে উঠল। 'ওহ্ গড! খাবার!! পানি!!!' কেঁদে ফেলল আনন্দে।

তাড়াতাড়ি একটা পানির ক্যান্টিন নিয়ে এল ও। মুখ খুলে ধীরে ধীরে ঢালতে শুরু করল রানার ঠোঁটে। অদ্ভুত একটা শান্তি অনুভব করল রানা। ঠাণ্ডা-সুপেয় ধারা ভিজিয়ে দিচ্ছে ঠোঁট আর জিভ, গলা বেয়ে নেমে যাচ্ছে শরীরের ভিতরে। সদ্যজাত শিশু যেভাবে মায়ের দুধ খায়, ঠিক সেভাবে পানি খেতে থাকল ও, শেষ করে ফেলল পুরো ক্যান্টিন। আরেকটা ক্যান্টিন এনে দিনাও খেতে শুরু করল। দৃশ্যটা দেখে অন্যরকম একটা শান্তিতে ছেয়ে গেল রানার মন। কীভাবে, কোত্থেকে এসেছে এই পানি, তা জানে না। তবে এটুকু বুঝতে পারছে, ভয়াল মরুভূমিকে হারিয়ে দিয়েছে ওরা। বেঁচে গেছে, ফিরে এসেছে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে। মুখে স্মিত একটা হাসি ফুটল ওর, আর ওই অবস্থাতেই ধীরে ধীরে বুজে এলো সব কিছু, জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ল রানা।

নয়

অন্যরকম একটা অনুভূতি নিয়ে জেগে উঠল রানা। কারণটা বুঝতে পারল না প্রথমে। একটু পরেই মাথা পরিষ্কার হয়ে গেল অবশ্য, ধরতে পারল ব্যাপারটা। *তোষক!* তোষকের উপর শুয়ে আছে ও! তেমন পুরু, কিংবা নরম নয়; কাপড়টাও বেশ খসখসে। তারপরও রানার মনে হলো মেঘের উপর শুয়ে আছে। অমানুষিক কষ্টের পর সামান্য আরামটুকুই বিশাল ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে। দেহটা এখনও অবশ্য টনটন করছে ব্যথায়—বিশেষ করে পিঠ আর পা দুটো। তারপরও ওই ব্যথাই স্বস্তি দিচ্ছে, প্রমাণ করে দিচ্ছে, মরেনি ও। বেঁচে আছে। গায়ের উপর একটা চাদর দেয়া আছে, ভাল করে ওটা জড়াতে গেল, সঙ্গে সঙ্গে খসখসে কাপড়ে ঘষা খেয়ে ফেটে গেল পায়ের পাতার একটা ফোস্কা, যেন বোলতার কামড় খেয়েছে, এমনি ভঙ্গিতে ঝট্ করে বিছানায় উঠে বসল ও। চক্কর দিয়ে উঠল মাথা, দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল... এখনও খুব দুর্বল ও।

তাড়াতাড়ি আবার বালিশে মাথা ঠেকাল, ফোস্কাটার কথা ভুলে গেছে।

কয়েক মিনিট চুপচাপ পড়ে থাকার পর সচকিত হয়ে উঠল ও, দিনার কথা মনে পড়ে গেছে। কোথায় মেয়েটা? ও নিজেই বা কোথায়? আরেকবার উঠে বসবার চেষ্টা করল, তবে এই দফায় ধীরে-সুস্থে। কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু হলো, সঙ্গে সঙ্গে কানে ভেসে এল একটা অপরিচিত কণ্ঠ। মাথা ঘুরিয়ে ডানে তাকাল রানা। কামরাটা বেশি বড় নয়, সিঙ্গেল খাট আর একটা পড়ার টেবিল রাখতেই ভরে গেছে। দেয়ালটা সাদা, দাগবিহীন; মেঝেটা খালি, ভাল করে মোছা হয়েছে। টেবিলের উপরে দেয়ালে ঝোলানো একটা ক্রুশ-ই শুধুমাত্র কামরার অলঙ্করণ। লম্বা আলখাল্লা-পরা এক কৃষ্ণাঙ্গ তরুণ দাঁড়িয়ে আছে ওর বিছানার পাশে, স্থানীয় ভাষায় কী যেন বলছে। বেশভূষা দেখে সন্ন্যাসী বলে মনে হলো ওর।

'সেলাম!' টিগ্রিনিয়ান ভাষায় নিজের স্বল্প শব্দভাণ্ডার হাতড়ে অভিবাদন জানাল রানা।

'সেলাম! সেলাম!!' উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠল তরুণ। *'কেমায়েলা হা?'*

নিশ্চয়ই কেমন আছে জানতে চাইছে—আন্দাজ করল রানা। জবাব দিল, *'হামাক।'* মানে, খারাপ।

'শেমায় টেডলা ইয়ু,' নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে বলল তরুণ। *'মেন শেম কা?'*

রানা বুঝল, ওর নাম টেডলা। তাই নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে জানাল, 'রানা।' তারপর জিজ্ঞেস করল, 'দিনা?'

লম্বা-চওড়া একটা প্রত্যুত্তর দিল টেডলা, তবে তার একবর্ণ বুঝতে পারল না ও। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ঘরের কোনার একটা কলসি থেকে মাটির পেয়ালায় পানি ঢেলে নিয়ে এল তরুণ সন্ন্যাসী। ওটা খেতেই চোখের পাতা ভারী হয়ে উঠল রানার, নিজের অজান্তে ঘুমিয়ে পড়ল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে। অবচেতনভাবে গুটিসুটি হয়ে শরীরটা জড়িয়ে নিল চাদরে।

পরেরবার যখন ঘুম ভাঙল, তখন অন্ধকার। কামরায় কেউ নেই, নিঃসঙ্গ একটা মোমবাতি জ্বলছে শুধু পড়ার টেবিলটার উপরে। সেই আলোয় বিছানার পাশে রাখা একটা প্লেট চোখে পড়ল, তাতে কয়েক রকমের ফলমূল। খেতে দেয়া হয়েছে ওকে। প্লেট থেকে একটা আম আর দুটো কলা তুলে নিয়ে, রাক্ষসের মত খেল রানা। পানির পেয়ালাও আছে প্লেটের সঙ্গে, ওটা খালি করে শুয়ে পড়ল আবার। ঘুমিয়ে গেল।

তৃতীয়বার জেগে উঠলে চোখে কিছু দেখল না রানা। মোমবাতিটা শেষ হয়ে গেছে, ঘরের ভিতর নিকষ কালো অন্ধকার। দূর থেকে ভেসে আসছে একটা অদ্ভুত গুঞ্জন, যেন অন্যভুবনের শব্দ। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে যা হয়, আতঙ্ক অনুভব করল রানা। কামড়ে ধরল ঠোঁট। ঘুম থেকে ওঠায় মস্তিষ্ক কাজ করছে না ঠিকমত, বুঝতে পারছে না কোথায় আছে। একটু পর বোধবুদ্ধি ফিরে এলে স্বাভাবিক হলো ও, কান পেতে বুঝতে পারল—অদ্ভুত গুঞ্জনটা আসলে সম্মিলিত কণ্ঠে প্রার্থনা। ধর্মসঙ্গীত। চোখের পলকে মনে পড়ে গেল সব—মরুভূমি পাড়ি

দেয়া, গুহাতে আশ্রয় নেয়া, ওখানে পানি পাওয়া। আবছাভাবে দেখতে পেল, আলখাল্লা পরা কয়েকজন মানুষ ওকে আর দিনাকে একটা খাড়া ট্রেইল ধরে প্রাচীন একটা বিল্ডিঙের দিকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকা প্রশ্নগুলোর জবাব পেয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে—আসলে মঠে পৌঁছে গেছে ওরা!

অদ্ভুত একটা প্রশান্তি অনুভব করল রানা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে। চোখ মুদল পরম স্বস্তি নিয়ে। সন্ন্যাসীদের বিচিত্র ধর্মসঙ্গীত শুনতে শুনতে ঘুমের অতলে তলিয়ে গেল আরও একটি বার।

জানালা দিয়ে সূর্যের আলো চোখে পড়তেই চতুর্থবারের মত ঘুম ভাঙল রানার। এবারের পরিস্থিতি আগের কয়েকবারের চাইতে ভিন্ন। খেয়াল করল, ঘোর-লাগা অবস্থাটা কেটে গেছে। ঘুমে আর জড়িয়ে আসছে না চোখ। শরীরে শক্তিও ফিরে এসেছে অনেকটা। টেবিলের উপর নিজের জামাকাপড় পরিষ্কার অবস্থায় দেখতে পেল, ধুয়ে-শুকিয়ে ভাঁজ করে রাখা হয়েছে। উঠে পড়ল ও, পোশাক পরে তৈরি হলো। বিছানার তলায় প্রাতঃকৃত্য সারার জন্য একটা গামলা রাখা আছে, তাতে প্রস্রাব করতে পেরে স্বস্তি পেল—কিডনি তার মানে নষ্ট হয়ে যায়নি।

নিজের কামরা ছেড়ে করিডোরে বেরিয়ে এল রানা। পা-দুটো এখনও শক্তি ফিরে পায়নি পুরোপুরি, শরীরের ভার নিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে, কিন্তু ব্যাপারটাকে পাত্তা দিল না ও। ব্যালান্স ধরে রেখে ধীর পায়ে এগোতে শুরু করল একদিকে। খানিক পরেই বিশাল একটা হলঘরে এসে পৌঁছুল। মাঝখানে একটা বড় টেবিল, চারদিকে চেয়ার—দেখে মনে হচ্ছে ডাইনিং টেবিল।

সামান্য হাঁটাচলাতেই আবার দুর্বলতা অনুভব করছে রানা, একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। টেবিলে মাথা রেখে বড় বড় শ্বাস ফেলতে শুরু করল। একটা চিন্তাই শুধু ঘুরপাক খাচ্ছে মাথায়—দিনা! ওকে খুঁজে বের করতে হবে।

কতক্ষণ কাটল ওভাবে, বলতে পারবে না। কাঁধে টোকা পড়তেই সচেতন হয়ে উঠল, মাথা তুলে দেখল—টেডলা দাঁড়িয়ে আছে পাশে। নিচু গলায় কী যেন বলছে।

'সবাই কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

জবাব দিল না তরুণ সন্ন্যাসী। ইশারায় ওকে অপেক্ষা করতে বলল, তারপর বেরিয়ে গেল ডাইনিং হল ছেড়ে। কয়েক মিনিট পর ফিরল আরেকজন সন্ন্যাসীকে নিয়ে। এই মানুষটি বয়স্ক, লম্বা ধূসর দাড়ি ঢেকে রেখেছে গাঢ় আলখাল্লার বুকের কাছটা। প্রবীণ সন্ন্যাসীকে দেখেই কেন যেন ভাল লাগল রানার, হাঁটার ভঙ্গিতে এক ধরনের আভিজাত্য রয়েছে, অবয়ব থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে আশার আলো। চোখদুটো অত্যন্ত মায়াময়, দেখে বোঝা যায়, তাঁকে বিশ্বাস করা চলে। ওর মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসলেন তিনি।

'*সেলাম!*' অভিবাদন জানাল রানা। 'ইংরেজি বোঝেন?'

'*সেলাম,*' প্রত্যুত্তর দিলেন সন্ন্যাসী। '*নো ইংলিশ। টিগ্রিনিয়ান?*'

মাথা নাড়ল রানা। ইরিত্রিয়ান টিগ্রিনিয়ান ভাষা জানা নেই। শেষ চেষ্টা হিসেবে বৃদ্ধ ফ্রেঞ্চ জানে কি না জিজ্ঞেস করল; নইলে আভাসে-ইঙ্গিতে কাজ

চালাতে হবে। '*পার্লে-ভোঁ ফ্রাঁসোয়া?*'

জবাব এল, '*উন প।*' মানে, একটু একটু।

মাথা ঝাঁকিয়ে ফ্রেঞ্চ ভাষায় বলতে শুরু করল রানা। 'আমার নাম মাসুদ রানা। শৌখিন আর্কিয়োলজিস্ট। বিশেষ একটা প্রজেক্ট নিয়ে ইরিত্রিয়ায় এসেছি।'

স্মিত হাসলেন প্রবীণ সন্ন্যাসী। 'আমি জানি।'

'কীভাবে জানলেন?'

'মাদমোয়াজেল দিনা আবান আপনার অনেক আগেই জেগেছেন, ওঁর সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। ডেব্রে আমলাক মঠে স্বাগতম, মসিয়ো রানা। আমি ব্রাদার অব্রাহাম, এই মঠের প্রধান।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। কতটা সময় ধরে এখানে আছি আমরা?' জানতে চাইল রানা।

'গতকাল ছিল আপনাদের দ্বিতীয় রাত।'

বিস্মিত হলো রানা—অন্তত ছত্রিশ ঘণ্টা ঘুমিয়েছে ও! ইরিত্রিয়ান রিফিউজিরা যে-কোনও মুহূর্তে খনিতে পৌঁছে যাবে। কে জানে, হয়তো পৌঁছে গেছেও! বুকের ভিতর শঙ্কা আর তাগাদা অনুভব করল ও। বলল, 'আমাদেরকে এখুনি যেতে হবে, ব্রাদার!'

টেডলার দিকে ফিরে কিছু বললেন অব্রাহাম। দৌড়ে হলঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে। একটু পরেই দিনাকে নিয়ে ফিরে এল সে। কামরাতে দিনা ঢুকল বরাবরের মত মাথা উঁচু করে। শারীরিক পরিশ্রমে শুকিয়ে গেছে ও, চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে উঠেছে, চোখদুটো বসে গেছে গর্তে। তারপরও চেহারার জৌলুস হারিয়ে যায়নি। ওকে দেখতে পেয়েই খুশি হয়ে উঠল রানার মন। উঠে দাঁড়াতে গেল, কিন্তু দিনা ওর কাঁধে চাপ দিয়ে বসিয়ে দিল। ঝুঁকে রানাকে আলিঙ্গন করল ও, গালে গাল ঠেকাল। ফিসফিস করে জানতে চাইল, 'কেমন আছ তুমি?'

ঢোক গিলল রানা। 'ভাল।' শরীরের সবকিছু যে দুর্বল হয়নি, তা টের পাচ্ছে। দিনার কোমল স্পর্শে আদিম কিছু ভাবাবেগ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে।

সজোরে গলা খাঁকারি দিলেন ব্রাদার অব্রাহাম। তাড়াতাড়ি রানাকে ছেড়ে সরে গেল দিনা, পাশের চেয়ারটা টেনে বসল। ওকে উদ্দেশ্য করে স্থানীয় তিগ্রে ভাষায় কিছু বললেন প্রবীণ সন্ন্যাসী, জবাবে ও-ও কিছু বলল। তারপর রানার দিকে ফিরে ইংরেজি অনুবাদ করে শোনাল আলাপটা।

'ব্রাদার অব্রাহাম এখানকার প্রধান সন্ন্যাসী। উনি বলছেন, মঠে মেয়েমানুষের উপস্থিতি খুবই দুর্লভ একটা ঘটনা। চিরকুমার-ব্রত নিয়েছেন ওদের সবাই, কাজেই আমাদের দুজনের সম্পর্ক নিয়ে দুশ্চিন্তা বোধ করতে শুরু করেছেন।'

'তুমি কী বললে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বললাম যে, তুমি একজন সত্যিকার ভদ্রলোক; আর আমিও এমন এক কুমারী-মেয়ে, যে কিনা অন্য একজনকে কথা দিয়ে রেখেছে।'

'প্রিস্টের সামনে মিথ্যে কথা বললে?'

'কী বলতাম তা হলে?'

'আমাকে ভদ্রলোক বলা উচিত হয়নি,' হাসল রানা। 'সেই সঙ্গে এটাও জানাতে পারতে, শরীরের এই অবস্থায় মঠের পবিত্রতা নষ্ট করবার মত ক্ষমতা নেই আমাদের।'

দিনাও হেসে ফেলল।

'ওঁকে ধন্যবাদ জানাও আতিথেয়তার জন্য। সেই সঙ্গে এটাও জানতে চাই, আমাদের খুঁজে পেলেন কী করে।'

ব্রাদার অব্রোহামের সঙ্গে কথা বলল দিনা। তারপর অনুবাদ করল, 'গুহাটা ওঁর একান্ত নিজস্ব জায়গা, একাকী সময় কাটান ওখানে। নিজেই খুঁজে পেয়েছেন আমাদেরকে, তারপর মঠ থেকে সঙ্গীদেরকে ডেকে এনে আমাদের উদ্ধার করেছেন।'

'এতবড় মঠ থাকবার পরও আলাদা জায়গা দরকার ওঁর?' একটু অবাক হলো রানা। 'অবশ্য তাতে আমাদের জন্য ভালই হয়েছে।'

'গতকাল ওঁর সঙ্গে কথা হয়েছে আমার,' বলল দিনা। 'তুমি তখন ঘুমিয়ে ছিলে। পুরনো খনিটার ব্যাপারে কথা বলতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু দেখলাম—ভদ্রলোক আগে থেকেই সব জানেন।'

'খনির ব্যাপারে?'

'খনি তো বটেই, সেইসঙ্গে আমাদের ব্যাপারেও! হাবভাবে মনে হলো, আমাদের... বিশেষ করে তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন!'

'হেঁয়ালি কোরো না, দিনা,' ভুরু কুঁচকে বলল রানা।

'যা ঘটেছে, তা-ই বলছি আমি। হেঁয়ালি করব কেন...'

ব্রাদার অব্রোহাম মুখ খোলায় বাধা পেল দিনা। বেশ কিছুটা সময় নিয়ে গড় গড় করে কী যেন বললেন তিনি, শুনতে শুনতে মুখ হাঁ হয়ে গেল ওর। দুয়েকটা প্রশ্ন করে ব্যাপারটা খোলাসা করে নিল দিনা। তারপর ফিরল রানার দিকে।

বলল, 'এই মঠের প্রধান সন্ন্যাসী হবার কথা ছিল না ব্রাদার অব্রোহামের। যুদ্ধশেষে দায়িত্বটা আর কেউ নিতে রাজি না হওয়ায় বাধ্য হয়েছেন উনি। তবে প্রধান সন্ন্যাসী হওয়ায় একটা বই হাতে এসেছে ওঁর। ওটা কারও পড়বার কথা নয়, কিন্তু উনি নিয়ম ভেঙে পড়েছেন...'

'কীসের কথা বলছ?'

'বইটার নাম: *সম্রাটদের লজ্জা।* গত কয়েকশ' বছরে একজন মাত্র মানুষ এর আগে পড়েছে ওটা—ডেব্রে আমলাক মঠের প্রাক্তন-প্রধান, ভদ্রলোকের ধর্মবিশ্বাস ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তার ফলে। অব্রোহাম বলছেন, তাঁর পূর্বসূরি-র বিশ্বাস ছিল: ওই বই পড়ে তিনি যে-অন্যায় করেছিলেন, সেটার শাস্তি হিসেবেই ইরিত্রিয়াকে এত বছর দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে।

'কয়েক সপ্তাহ আগে অব্রোহাম নিজেও পড়েছেন ওটা। কারণ, বৃদ্ধ এক সন্ন্যাসী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—প্রাচীন ওই গোমর ফাঁস হতে চলেছে। বহিরাগত মানুষ এসে সন্ন্যাসীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে ওটার ব্যাপারে।

আব্রাহামের বিশ্বাস, মানুষটা তুমি।'

বিস্মিত হলো রানা, কী বলবে বুঝতে পারছে না। প্রবীণ সন্ন্যাসীর দিকে তাকাতেই বুঝতে পারল, মানুষটা ঠাট্টা করছেন না। শরীরটা শিরশির করে উঠল কেন যেন। কোনোমতে প্রশ্ন করল, 'আমি কেন?'

'প্রথম কারণ হচ্ছে, মঠের ইতিহাসে বহুদিনের ভিতর আমরাই প্রথম বহিরাগত। তা ছাড়া খোঁড়াখুঁড়ির কাজে তুমি একজন বিশেষজ্ঞ বলে জানিয়েছি ওঁকে, সেটা শুনে ওঁর বিশ্বাসটা আরও দৃঢ় হয়েছে। বলছেন, তোমার যোগ্যতা আর উপস্থিতি বইয়ের বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিলে যায়।'

'পুরনো একটা ধর্মীয় গ্রন্থে আমার উল্লেখ আছে?' রানার কণ্ঠে চরম অবিশ্বাস।

'ঠিক তা নয়। ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করা দরকার।' দিনা বলল। '*সম্রাটদের লজ্জা* স্রেফ একটা ধর্মীয় গ্রন্থ নয়। ওটাকে একটা লিখিত বিবরণ বলতে পারো—ইরিত্রিয়ায় সম্রাট মেনেলিকের একটা হীরার খনি আবিষ্কার, এবং তখনকার সন্ন্যাসীদের তত্ত্বাবধানে সেটা খোঁড়াখুঁড়ির কাহিনি। ওই খনিটাই খুঁজছি আমরা।'

'মেনেলিক?' দ্বিধা ফুটল রানার গলায়। 'সলোমন নয়?'

'মেনেলিক ছিলেন রানী শেবা আর ইজরায়েলের রাজা সলোমনের ঔরসজাত সন্তান। ওঁর খুঁজে পাওয়া হীরার খনিই আসলে সলোমনের খনি আর সলোমনের গুপ্তধনের কিংবদন্তির জন্ম দিয়েছে। কাহিনিটা ছড়িয়েছে মুখে মুখে, শুরুতে হয়তো মেনেলিকের নামই ছিল, তবে ধীরে ধীরে গল্পটা বিকৃত হয়ে খনির সঙ্গে ওঁর বাবার নাম জড়িয়ে গেছে। সম্ভবত সলোমন মেনেলিকের চেয়ে বিখ্যাত মানুষ ছিলেন বলেই।' একটু থামল দিনা। 'তবে আমাদের এখনকার তল্লাশি হীরার জন্য নয়, তারচেয়ে অনেক বড় একটা জিনিস রয়েছে খনিতে।'

ওর কণ্ঠের পরিবর্তন কানে বাজল রানার। বুঝতে পারল, সেদিন সলোমনের খনির কথা বললেও কিছু একটা সত্যিই দিনা গোপন করে গিয়েছিল ওর কাছে। এখন সেটা প্রকাশ করতে চলেছে। নড়েচড়ে বসল ও রহস্যটা শুনবার জন্য।

'গল্পটা আসলে শুরু হয়েছে আরেকটা বইয়ে,' বলতে থাকল দিনা। 'ওটার নাম *কেবরা নাগাস্ট*... মানে সম্রাটদের বিজয়। সলোমনের সঙ্গে কুইন শেবা-র সাক্ষাতের কাহিনিটার ইথিওপিয়ান ভার্শান বলতে পারো বইটাকে। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে যে-গল্প বলা হয়েছে, তার চেয়ে এটা একেবারেই আলাদা। *কেবরা নাগাস্ট*-এ বলা হচ্ছে, ছোট্ট একটা কৌশল খাটিয়ে শেবাকে বিছানায় নেন সলোমন, একসঙ্গে রাত কাটাতে বাধ্য করেন। এর ফলে গর্ভবতী হয়ে পড়েন শেবা, ইথিওপিয়ায় যখন ফিরে আসেন, তখন কোলে সদ্যজাত এক সন্তান, মেনেলিক... সলোমনের উত্তরাধিকারী। বাইশ বছর বয়সে ঘটনা জানতে পেরে সেই সন্তান ছুটে যায় জেরুসালেমে, বাবার সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে এক উচ্চপদস্থ পুরোহিতের সঙ্গে পরিচয় হয় তার। পুরোহিত তাকে জানায়—ঈশ্বর চান মেনেলিক তাঁর বাণীকে ইথিওপিয়ায় নিয়ে যাক, যাতে ওদের

ধর্মের ভিত্তিপ্রস্তর ইজরায়েলের পরিবর্তে আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়।'

কঠিন কথাগুলো অনুধাবন করতে একটু অসুবিধে হচ্ছে রানার, খ্রিস্টান বা ইহুদি ধর্মের খুঁটিনাটি ইতিহাস জানা নেই ওর। কপালে ভাঁজ পড়ে রইল।

ব্যাপারটা লক্ষ করে দিনা বলল, 'ঠিক আছে, তা হলে সহজ করেই বলি। জেরুসালেমের মহামন্দির থেকে আর্ক অভ দ্য কাভানেন্ট চুরি করে মেনেলিক, ওটাকে নিয়ে আসে ইথিওপিয়ায়... নিজের সাম্রাজ্যে!'

'আর্ক অভ দ্য কাভানেন্ট?' হতবাক হয়ে গেল রানা। মনে হলো ভুল শুনছে। ব্যাপারটা সম্পর্কে জানা আছে ওর, দুনিয়ার ইতিহাসে সবচেয়ে দুর্জ্ঞেয় রহস্যগুলোর একটা।

আর্ক অভ কাভানেন্ট হচ্ছে স্বর্ণের তৈরি একটা বাক্স, বা চেস্ট... ইহুদিরা যেটায় টেন কমাণ্ডমেন্টস্ রাখত। আর টেন কমাণ্ডমেন্টস্ হচ্ছে মানুষের জন্য সরাসরি ঈশ্বরের কাছ থেকে জারি হওয়া দশটি নির্দেশনা—দুটো শিলালিপি, বা স্টোন ট্যাবলেটে খোদাই করা অবস্থায় পাঠানো হয়েছিল ওগুলো, ট্যাবলেটদুটো সিনাই পাহাড় থেকে নামিয়ে আনেন হযরত মুসা (আঃ)। কথিত আছে, ইহুদিদের অধঃপতন দেখে ওগুলো তিনি ভেঙে টুকরো করে ফেলেন। তিনি যখন পাহাড়ে উঠে আল্লাহর সঙ্গে কথা বলছেন, মানুষের জন্য আল্লাহর বিধি-বিধান বুঝে নিচ্ছেন, ওই সময় ইহুদিরা পাপাচারে ব্যস্ত ছিল, ব্যস্ত ছিল মূর্তি বানানোর কাজে। তাই রেগে গিয়ে ট্যাবলেটগুলো ভেঙে ফেলেন তিনি। এরপর ট্যাবলেটের ওই ভাঙা টুকরোগুলো একটা আধার বা আর্কে ভরে নেয় ইহুদিরা। যেখানেই গেছে ওরা, সঙ্গে করে নিয়ে গেছে ওটাকে। তারপর যখন থিতু হলো কানান-এ, আর্কটা রাখল সলোমন-এর মন্দিরে। বহুকাল ওখানেই ছিল ওটা... তারপর কখন-কীভাবে হারিয়ে গেল, তা সঠিকভাবে বলতে পারে না কেউ।

'ওটা নিয়ে এতকিছু?' কোনোমতে বিস্ময় সামলে বলল রানা। 'হীরা-টীরা নয়, তোমরা ভাবছ আর্ক-টা মেনেলিকের খনিতে লুকানো আছে?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল দিনা। 'প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী ইয়োরাম রাবাকের এজেন্টরা ওটার খোঁজেই তোমাকে পাঠিয়েছে ইরিত্রিয়ায়, আর্কটা ইজরায়েলে ফিরিয়ে নিতে চায় ওরা।'

এতক্ষণে রানা বুঝতে পারছে, খনি খোঁড়ার জন্য জিয়োলজিস্ট না পাঠিয়ে ওকে কেন পাঠানো হয়েছে। হীরা নয়, ইহুদি টেরোরিস্টরা চাইছে একটা আর্টিফ্যাক্ট। আর সেটার জন্য জিয়োলজিস্ট নয়, চাই আর্কিয়োলজিস্ট... রানার মত অভিজ্ঞ একজন সৌখিন আর্কিয়োলজিস্ট।

দিনার চেহারায় ভয় আর দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ল। বলল, 'আর্কটা রাবাকের হাতে পড়লে সর্বনাশ হবে, রানা। জেরুসালেমে মুসলমানদের *হারাম-শরীফ* ভেঙে দেবার অজুহাত পাবে সে, ওখানে সলোমনের তৃতীয় মহামন্দির গড়ে তুলবে, প্রাচীন আমলের অনুকরণে ওখানে রাখবে আর্কটা। তোমাদের মক্কা-শরীফের মত ইহুদিদের সবচেয়ে বড় তীর্থপীঠ হবে ওটা, লক্ষ লক্ষ মানুষ জড়ো হবে দুনিয়ার সব প্রান্ত থেকে। ওদের সাহায্য নিয়ে ভয়ঙ্কর একটা শক্তিতে

পরিণত হবে রাবাক।'

'তা-ই? সেজন্যেই ঠেকাতে চাও ওকে?' সকৌতুকে বলল রানা। 'মানছি, রাবাক মহা-ক্ষমতাবান হয়ে যাবে। কিন্তু তারপরও তো তোমাদের ধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনটা ফিরে যাচ্ছে যথাস্থানে। শুধুমাত্র ক্ষমতালোভী একজন রাজনীতিককে বাধা দেবার জন্য ওটা হাতছাড়া করবে তোমরা? দুঃখিত দিনা, কথাটা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না, রানা,' বলল দিনা। 'হ্যাঁ, আর্কটা ইজরায়েলে ফিরে যাক, সেটা আমরা সবাই চাই। জেরুসালেমের পাহাড়চূড়ায় তৃতীয় মহামন্দির মাথা তুলুক, সেটাও আমাদের স্বপ্ন। কিন্তু তার জন্য কী ধরনের মূল্য দিতে হবে, সেটা বুঝতে পারছ না? মুসলমানদের জন্য হারাম-শরীফ একটা পবিত্র স্থান, কাবা-র পরেই ওটার অবস্থান। ওটা ভাঙা সঙ্গে সঙ্গে পুরো মুসলিম-বিশ্বের সঙ্গে যুদ্ধ বেধে যাবে ইজরায়েলের। আমাদের দেশে শান্তি বলে আর কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না। তোমার কি ধারণা, সেটা আমরা চাই? ইজরায়েলের ব্যাপারে তুমি একটা ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে বসে আছ, রানা। আমাদের সবাই মন্দ-মানুষ নয়। সবার সঙ্গে সদ্ভাব রেখে শান্তিতে বসবাস করতে চাই আমরাও। হ্যাঁ, পারলে আর্কটা আমিও নিয়ে যাব ইজরায়েলে। কিন্তু নিশ্চিত থাকতে পারো, ওটা ব্যবহার করে সারা দুনিয়ার ইহুদি আর মুসলমানদের মধ্যে সংঘাত বাধানো হবে না।'

লম্বা বক্তৃতা শেষ করে হাঁপাতে শুরু করল দিনা। ওর কথায় আন্তরিকতা লক্ষ করে রানা বলল, 'দুঃখিত, আমি আসলে তোমাকে আঘাত দেবার জন্য কিছু বলিনি। যাক গে, ভুলে যাও আমার কথা। তা ছাড়া রাবাককে নিয়ে এত ভাবনার কিছু দেখছিও না আমি।'

'এ-কথা কেন বলছ?' অবাক হলো দিনা।

'আর্ক অভ দ্য কাভানেন্ট? কাম অন, দিনা! তোমার ধর্মবিশ্বাসকে অপমান করতে চাই না, কিন্তু ভেবে দেখো—ওল্ড টেস্টামেন্ট, কিংবা ওই *কেবরা* কী যেন বললে... কোনোটাই কিন্তু ঐতিহাসিক দলিল নয়। স্রেফ গল্পগাথা।'

'হোমারের *ইলিয়াড*-ও কিন্তু গল্পই ছিল,' যুক্তি দিল দিনা। 'কিন্তু হাইনরিখ শ্লিম্যান ওটাকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করে ট্রয় নগরীর ধ্বংসাবশেষ খুঁজে বের করেন। তার আগ পর্যন্ত আর্কিয়োলজিস্টরা ওটার অস্তিত্বে বিশ্বাস করত না। এখানেও তেমন কিছু ঘটতে পারে না? ব্রাদার আব্রাহামের পুরো গল্পটা যে এখনও শোনোনি তুমি, তা হলেই বুঝতে পারতে—রাবাক সত্যিই মরীচিকার পিছে ছুটছে কি না।'

'ঠিক আছে,' চেয়ারে হেলান দিল রানা। 'শোনাও তা হলে ওই গল্প।'

দশ

'আর্ক নিয়ে ইথিওপিয়ায় ফেরার পরই নানা রকম যুদ্ধবিগ্রহে জড়িয়ে পড়ে মেনেলিক,' বলতে শুরু করল দিনা, মাঝে মাঝে ওকে তথ্য জোগালেন ব্রাদার আব্রাহাম। 'সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটাতে শুরু করে সে। কিন্তু জনসাধারণের কাছ থেকে পাওয়া ট্যাক্সে ওসব অভিযানের খরচ পোষাচ্ছিল না, তাই *আযারিয়াহ্* নামে তার এক প্রিস্ট নতুন একটা বুদ্ধি জোগায়—রাজধানীর উত্তরে একটা হীরা-ভর্তি পাহাড়ের সন্ধান দেয় মেনেলিককে।

'*সম্রাটদের লজ্জা* বইয়ে এই পাহাড় আবিষ্কার, এবং মাইনিং অপারেশনের বিস্তারিত বিবরণ আছে। খনির দায়িত্বে থাকা সন্ন্যাসীরা শত্রুপক্ষের যুদ্ধবন্দি সৈন্যদেরকে শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করত। তবে একটা সময়ে যুদ্ধবিগ্রহ থেমে গেল, ফলে সঙ্কট দেখা দিল শ্রমিকের। সন্ন্যাসীরা তখন *কুশ*, বা বর্তমান সুদান এলাকা থেকে দাস আনতে শুরু করল। এভাবে প্রায় একশো বছর অপারেট করার পর সারফেসের কাছাকাছি হীরার মজুত শেষ হয়ে গেল। নতুন হীরার খোঁজে সন্ন্যাসীরা বাধ্য হলো মাটির নীচে সুড়ঙ্গ তৈরি করাতে। কিন্তু পূর্ণবয়স্ক শ্রমিক ঢুকবার জন্য বড় সুড়ঙ্গ দরকার হয়, তা বানাতে সময়ও লাগে বেশি, তাই ওরা *পিগ্‌মি*, মানে বামনদেরকে শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করল। তবে খনির ভিতরের বিরূপ পরিবেশে মানুষ বেশিদিন বাঁচতে পারত না, তাই পিগ্‌মি-রা খুব শীঘ্রি ঝাড়ে-বংশে শেষ হয়ে গেল। নতুন আর কোনও বামনও পাওয়া গেল না। বইটাতে এক জায়গায় এ-ব্যাপারে খুব হা-পিত্যেশ করা হয়েছে, কারণ পিগ্‌মিদের মাধ্যমে মাইনিং করে খুব ভাল ফলাফল পাওয়া যাচ্ছিল।'

'সন্ন্যাসী... মানে সৃষ্টিকর্তার একান্ত প্রিয় মানুষরা পুরো পিগ্‌মি জাতিকে শেষ করে দিল?' অবাক হলো রানা।

'এটাকে নিষ্ঠুর ভাবছ? আসল অংশে তো আসিইনি। এখন জানতে পারবে সেটা,' করুণ একটা হাসি ফুটল দিনার ঠোঁটে। 'পিগ্‌মি পাওয়া না যাওয়ায় ওদের বিকল্প খুঁজে বের করল সন্ন্যাসীরা... ছোট ছোট বাচ্চা! ছ'সাত বছরের! বিভিন্ন জায়গা থেকে দাসী জোগাড় করল ওরা, তাদেরকে গরু-ছাগলের মত ব্রিডিং স্টক হিসেবে ব্যবহার করে, বাচ্চা দেয়াত। তারপর বাচ্চারা বড় হলে দলে দলে পাঠানো হতো খনিতে কাজ করতে, ওদের কেউই আর কোনোদিন জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পারত না। এ-নিষ্ঠুরতার তুলনায় নাৎসিদের হলোকস্ট ধরতে গেলে কিছুই না, কারণ খনিটা প্রায় চারশো বছর সক্রিয় ছিল। হাজার-হাজার... কিংবা লাখ-লাখ নিরপরাধ শিশু ওখানে মারা গেছে কাজ করতে করতে। আর বিশ্বাস করতে পারো, এর জন্য দায়ী ইহুদি ধর্মের অনুসারীরা?'

দিনার চোখ ছলছল করছে। রানারও দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেছে গল্পটা শুনে। এ কীভাবে সম্ভব? মানুষ কীভাবে এত নিষ্ঠুর হয়? উঠে আসা আবেগটা কোনোমতে চাপা দিল ও, দিনার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'শান্ত হও। এসব দু'হাজার বছর আগে ঘটেছে।'

ওর চোখে চোখ রাখল দিনা। বলল, 'সবচেয়ে কষ্টের ব্যাপার কী, জানো? বইয়ে এই কাজটার জন্য কোনও অনুশোচনা করা হয়নি। ওরা বরং বুক ফুলিয়ে লিখেছে, কীভাবে কঠোর শাস্তি দিয়ে বাচ্চাদের কাজ করতে বাধ্য করা হতো: আর তাতে কত সুন্দর-সুন্দর পাথর বেরিয়েছে খনির ভিতর থেকে। যদি দুনিয়ার লোকে জানতে পারে, ইহুদিরাই ছিল ইতিহাসের প্রথম কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলোর প্রতিষ্ঠাতা, তা হলে কী ঘটবে, বুঝতে পারছ? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে আমরা যা সহানুভূতি পেয়েছি, মুহূর্তেই তা উবে যাবে!'

এতদিন আগের ঘটনাকে কেউ গুরুত্ব দেবে না—এই বলে দিনাকে সান্ত্বনা দিতে চাইল রানা, পারল না। সময় কোনও ফ্যাক্টর নয়: ঘৃণা এমন এক জিনিস, যা যে-কোনও পরিস্থিতিতে বিকোনো যায়। এই সত্য ওর চেয়ে ভাল আর কেউ জানে না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রসঙ্গটা পাল্টাবার চেষ্টা করল ও।

'ঠিক আছে, মানছি—*সম্রাটদের লজ্জা*-য় লেখা পুরনো খনির ঘটনা সত্যি। সত্যিই এখানে একটা হীরার খনি আছে, এবং সেটা খোঁড়ার প্রধান উদ্যোক্তা ছিল মেনেলিক। কিন্তু এর মধ্যে ইয়োরাম রাবাক, বা আর্ক অভ দ্য কাভানেন্ট আসছে কীভাবে?'

চোখ মুছে গল্পের খেই ধরল দিনা।

'রাবাকের এই তল্লাশি চলছে তিন দশকের বেশি সময় ধরে। প্রাচীন ধর্মীয় আর্টিফ্যাক্ট আর আর্কের ব্যাপারে অনেক আগে থেকেই তার একটা ফ্যাসিনেশন আছে। ১৯৮৪-তে যখন *অপারেশন মোজেস*-এর মাধ্যমে ইথিওপিয়ান ইহুদিদেরকে ইজরায়েলে নিয়ে যাওয়া হলো, তখন রিফিউজিদেরকে নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সে—ওদের ফেলে যাওয়া আর্টিফ্যাক্টগুলোর বিষয়ে খবর নিয়েছে। ইথিওপিয়ার প্রাচীন রাজধানী আকসুমের বিশেষ একটা চার্চ... *সেইন্ট মেরি অভ যায়ন* সম্পর্কে গুজব প্রচলিত ছিল বহুদিন থেকে: ওখানে নাকি আর্কটা লুকিয়ে রাখা আছে। গোপনে তাই একটা টিম পাঠায় রাবাক, ওরা চার্চে ঢুকে ভালমত তল্লাশি করে দেখে, কিন্তু কোনোকালে ওখানে জিনিসটা ছিল, এমন প্রমাণ পায়নি।'

'তারপরও ওর ধারণা, আর্ক অভ দ্য কাভানেন্ট ইরিত্রিয়ায় আছে?' বিদ্রূপ ফুটল রানার কণ্ঠে।

'ওফ্, রানা!' বিরক্ত হয়ে বলল দিনা। 'ব্যাপারটা তুমি বিশ্বাস করছ কি করছ না, তাতে কিছু যায়-আসে না। যতক্ষণ তোমার বন্ধু সোহেল ওর কবজায় আছে, ততক্ষণ ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিতে হবে তোমাকে। গত কয়েক সপ্তাহে তো অনেককে মরতে দেখেছ তুমি, এরপরও বুঝতে পারছ না, রাবাক কতটা সিরিয়াস?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে দিনা। সোহেলের কথা সামান্য

সময়ের জন্য ভুলে গিয়েছিল ও। কিন্তু দিনা মনে করিয়ে দেয়ায় অনুধাবন করল, পাগলাটে ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা-মন্ত্রীর মোটিভেশনকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে, সেটা সফল হবার সম্ভাবনা থাকুক, বা না-ই থাকুক। তা ছাড়া এখুনি চোখকান বন্ধ করে ফেলার মানে হয় না। খনির ব্যাপারে সঠিক তথ্য দিচ্ছে প্রাচীন বইটা, বাকি ঘটনাগুলোও তো সত্য হতে পারে।

'কিছু মনে কোরো না,' বিব্রত সুরে বলল ও। 'আসলে ব্যাপারটা এতই অবিশ্বাস্য যে... যাক গে, এখন বলো—রাবাক এতটা নিশ্চিত হচ্ছে কীভাবে?'

'পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন খ্রিস্টান দেশ ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়া। এখানকার ইহুদি কানেকশনটা আরও অনেক পুরনো। একটা ব্যাপার পরিষ্কার, ইজরায়েলে নেই আর্ক-টা। ওখানকার খুব কম জায়গাই খোঁজাখুঁজি করতে বাকি রেখেছে আর্কিয়োলজিস্টরা। ইজরায়েলকে বাদ দিলে তাই এখানেই ওটা থাকবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। আকসুমে ব্যর্থ হলেও তাই হাল ছাড়েনি রাবাক। রিফিউজিদের কাছে শোনা স্বল্প-প্রচারিত গুজবগুলোর দিকে মনোযোগ দেয় সে। একটা গুজব ছিল, আর্ক-টা *টানা* লেকের একটা দ্বীপে লুকানো আছে। তবে সেটাও ভুয়া বলে প্রমাণিত হয়। শেষ গুজবটা হলো, আর্কটা রয়েছে প্রাচীন একটা খনিতে: অশুভ আত্মাদের হাত থেকে খনি-শ্রমিকদের খুন হয়ে যাওয়া ঠেকাতে ওটা রাখা হয়েছে ওখানে। মেডিউসা-ফটোগ্রাফে কিম্বারলাইট পাইপের ছবি দেখে তাই সে নিশ্চিত হয়ে যায়, হারানো খনিটার সন্ধান পেয়েছে। ওর ধারণা, পাইপটার আশপাশেই কোথাও আর্ক-টা পাওয়া যাবে।'

'ও কি জানে, এই খনি সলোমনের ছেলে খুঁড়িয়েছে?'

'না। এবং তাতে কিছু যায়-আসে না। ও আর্কটা চায়, আর কিছু না।'

'তোমার ওই বইটা কী বলছে? জিনিসটা কি সত্যিই রাখা হয়েছে খনিতে?'

'আব্রাহাম বলছেন, পরিষ্কার বিবরণ নেই। হ্যাঁ, একটা অভিশাপের কথা বলা হয়েছে, ওতে বাচ্চারা মারা যাচ্ছিল। অদ্ভুত একটা রোগের কারণে খনির টানেলগুলোতে কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। সেটা *ঠেকাতে* শক্তিশালী একটা তালিসমান আনা হয়। জিনিসটা রাখা হয়েছে বিশেষ একটা চেম্বারে, ওটার আকার-আয়তনের সঙ্গে জেরুসালেমের মন্দিরে আর্ক অভ দ্য কাভানেন্ট রাখবার কক্ষটার মিল আছে। জিনিসটা কখনও বের করা হয়েছিল কি না, তার কোনও বর্ণনা নেই বইয়ে।'

'কাজ হয়েছিল? তালিসমানটা কি রোগটাকে *ঠেকাতে* পেরেছিল?'

আব্রাহামকে জিজ্ঞেস করে নিল দিনা। তারপর জানাল, 'না, বাচ্চারা আরও বেশি হারে মরতে শুরু করেছিল ওটা রাখবার পর থেকে। শেষ পর্যন্ত প্রিস্টরা উপলব্ধি করে, ওদের অন্যায়ের কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন ঈশ্বর, শাস্তি দিতে শুরু করেছেন। খনিটার মুখ চিরতরে বন্ধ করে দেয় ওরা, ওটার খবর গোপন করে ফেলে।'

ভাবনায় ডুবে গেল রানা। প্রাচীন বইয়ে লেখা খনিটা পেয়েছে ও, কাজেই ব্যাপারটা সত্যি। বাকিটাও কি সত্যি হতে পারে? গত দু'হাজার বছর ধরে ওখানে পা পড়েনি কারও, কাজেই যে-তালিসমানের কথা বলা হচ্ছে... সেটা

আর্ক অভ দ্য কাভানেন্ট হোক, বা না-হোক... নিঃসন্দেহে পড়ে আছে ভিতরে। আবিষ্কৃত হবার অপেক্ষায়। দিনার আশঙ্কা অমূলক নয়, ওটা হাতে পেয়ে ইয়োরাম রাবাক যদি *হারাম-শরীফ* ধ্বংস করতে চায়, তা হলে নিঃসন্দেহে গোটা মুসলিম বিশ্ব জ্বলে উঠবে। তার মধ্যে জড়িয়ে পড়বে বাংলাদেশের মুসলমানরাও। ভয়াবহ একটা দুঃসময়ের সূচনা ঘটবে এতে।

মানেটা পরিষ্কার—যেভাবে সম্ভব, ওকেই ঠেকাতে হবে এই সর্বনাশ। ঠেকাতে হবে পৃথিবীর বুকে দানা বাঁধতে থাকা এক ভয়ঙ্কর ধর্মীয় যুদ্ধকে। শুরুতে যে-মিশনটা শুধু প্রিয় বন্ধুকে উদ্ধার করবার জন্য হাতে নিয়েছিল, সেটা হঠাৎ করে খুব বড় আকার ধারণ করেছে।

মাথা ব্যথা শুরু হয়ে গেল রানার, এখনও সুস্থ নয় ও, তার উপর এমন কঠিন একটা চাপ সইতে পারছে না দেহ-মন। আবার দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। ইচ্ছে থাকুক, বা না-ই থাকুক, কাজটা করতে হবে ওকে—ইয়োরাম রাবাকের খুনে বাহিনীর আগে পৌঁছুতে হবে সলোমনের খনিতে, উদ্ধার করে আনতে হবে আর্ক অভ দ্য কাভানেন্ট। পারবে তো? ইতোমধ্যে তো সুদানিজ গ্রুপটাও পৌঁছে গেছে ওখানে। কীভাবে পাল্লা দেবে ওদের সঙ্গে? দিনাও একই কথা ভাবছে।

হঠাৎ একটা ব্যাপার বুঝতে পেরে কিছুটা স্বস্তি অনুভব করল রানা। দিনাকে বলল, 'একটা সুবিধে রয়েছে আমাদের হাতে। সুদানিজরা আর্ক অভ দ্য কাভানেন্টের কথা জানে না। ওদের ইটালিয়ান বস হীরা খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

'হ্যাঁ। খুঁজছে অন্য জিনিস, কিন্তু আমাদের লোকেশনেই: ভ্যালি অভ ডেড চিলড্রেনে। আমাদের সুবিধে হচ্ছে কীভাবে?'

হঠাৎ নামটার উৎস পরিষ্কার হয়ে গেল রানার কাছে। শিশু-শ্রমিকদের মৃত্যুর কারণেই রাখা হয়েছে নামটা! দিনার দিকে তাকাল ও। 'ওরা আর্টিফ্যাক্টের খোঁজে তল্লাশি চালাবে না, দিনা। কাজেই আমরা নিরাপদ। তবে রাবাকের দলটার ব্যাপারে একটা কিছু করতে হবে। ইরিত্রিয়ান সরকারে তোমার কানেকশন আছে না? মিলিটারিকে খবর দিতে পারবে?'

'মিলিটারি?'

'হ্যাঁ। উপত্যকায় একটা সৈন্যদল যদি নিয়ে যেতে পারি, তা হলে সুদানিজদেরকে আটক করতে পারব। রাবাকের টেরোরিস্টরাও ওখানে আর হানা দিতে পারবে না।'

'হুম। কিন্তু খবর দেব কীভাবে? এখানে তো রেডিও বা স্যাট-ফোন নেই।'

'কাছাকাছি কোথায় আছে, সেটাই জিজ্ঞেস করো ব্রাদারকে।'

জিজ্ঞেস করল দিনা, কিন্তু নেতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন আব্রাহাম। স্থানীয় ভাষায় যা বললেন, তার মানে দাঁড়াল, মঠের ধারেকাছে সভ্যজগৎ বলতে কিছু নেই। সবচেয়ে কাছের শহরটা আদোবা নদীর ওপারে, তবে পাহাড়ি ঢল নামায় নদী পেরুনো এ-মুহূর্তে অসম্ভব।

'আমরা পেরুব... যেভাবেই হোক!' দৃঢ় গলায় বলল রানা। 'ওঁকে জিজ্ঞেস করো, একজন গাইড দিতে পারবেন কি না।'

'পাগলামি হবে সেটা, রানা,' বলল দিনা। 'অব্রাহাম বলছেন, নদীর স্রোতে যা জোর, তাতে নৌকা-ভেলা কিছুই টিকবে না। কাছাকাছি কোনও ব্রিজও নেই। গোঁয়াতুর্মির বশে পার হবার চেষ্টা করলে মরতে হবে। প্রতি বছর অনেকেই মরে ওভাবে।'

'তারপরও আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে,' জোর দিয়ে বলল রানা। 'নইলে শুধু আবেল, আবুদা আর জিপ্সি নয়; নিরীহ রিফিউজিরাও মারা যাবে।'

'মানে?'

রিফিউজি ক্যাম্প থেকে শ্রমিক আনার ব্যাপারটা খুলে বলল রানা। সেটা শুনে দিনা বলল, 'তোমার উদ্বেগের কারণটা বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার মনে হয়, এভাবে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে তাড়াহুড়ো না করলেও চলবে। ওই রিফিউজিরা বরং খনিতেই ভাল থাকবে।'

'কী বলছ তুমি?' রানার কণ্ঠে বিস্ময়।

'চিন্তা করে দেখো, খনি থেকে হীরা তোলার জন্য ওদেরকে দরকার সুদানিজদের। মরে গেলে তো লাভ হবে না, তাই না? অন্তত শুরুতে বেশ কিছুদিন ভাল খাবারদাবার আর যত্ন পাবে ওরা। রিফিউজি ক্যাম্পের চেয়ে ভালভাবে থাকবে। ওদেরকে উদ্ধার করবার জন্য যথেষ্ট সময় পাব আমরা।'

'কিন্তু আর্কটা পেয়ে যেতে পারে ওরা! রাবাকের লোকেরা সুদানিজদের হাত থেকে ওটা ছিনিয়ে নিতে পারে!' যুক্তি দেখাল রানা।

'তেমন সম্ভাবনাও কম। ব্রাদার অব্রাহাম বলছেন, ওটা খনির একেবারে গভীরতম অংশে রাখা হয়েছে। অতদূর পর্যন্ত যেতে মাইনারদের অনেক সময় লাগবে, বিশেষ করে ওরা যেহেতু জিনিসটার খোঁজ করছে না। আর রাবাকের লোকজনের কথা বলছ? বর্ডারের কাছে সুদানিজদের কতজন সৈন্য জড়ো হয়েছিল, মনে আছে?'

'পঞ্চাশ জন... যাযাবর সর্দার শুনেছে,' জবাব দিল রানা।

'হ্যাঁ। কিন্তু রাবাকের হাতে বেশি লোক নেই, ওই মাপের একটা বাহিনীর উপর সরাসরি হামলা চালাতে পারবে না ওরা। সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে ওদেরকে। হয়তো বা শেষ পর্যন্ত কিছুই করতে পারবে না। কাজেই ব্যস্ত না হলেও চলে তোমার।'

'তাই বলে এখানে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না আমরা! নদীতে পানির ঢল কমতে অনেক সময় লাগবে।'

'বসে থাকতে তো বলছি না। নদী পেরুব আমরা, তবে তার জন্য শক্তি সঞ্চয় করা দরকার। কয়েকটা দিন বিশ্রাম নিয়ে যাই এখান থেকে।'

প্রস্তাবটা ভালমত ভেবে দেখল রানা। ভুল বলেনি দিনা, কিছু করতে চাইলে সুস্থ হতে হবে আগে। দুর্বল শরীরে খরস্রোতা আদোবা নদী পার হতে চাইলে ডুবেই মারা যাবে, তাতে কারও কোনও লাভ হবে না। যুক্তির সামনে হার মানতে বাধ্য হলো ও, মনের তাগিদটাকে চাপা দিল উপায়ান্তর না দেখে। বলল, 'ঠিক আছে, বিশ্রাম নেব আমরা। তবে দু'দিনের বেশি নয়। ব্রাদার অব্রাহামকে বলো, এরপর *ইলা বাবু* যেতে একজন গাইড দিতে হবে ওকে।'

প্রবীণ সন্ন্যাসীকে সিদ্ধান্তটা জানাল দিনা। মাথা ঝাঁকিয়ে প্রত্যুত্তর দিলেন তিনি।

রানার দিকে ফিরে দিনা বলল, 'উনি বলছেন, কোনও অসুবিধে নেই। ব্রাদার টেড্‌লা-ই আমাদেরকে নিয়ে যেতে পারবে। তবে সমস্যা হলো, ইলা বাবুতে টেলিফোন বা রেডিও আছে কি না জানা নেই ওঁর।'

'সেটা নিয়ে পরে ভাবা যাবে,' বলল রানা। 'এখন তা হলে উঠি, কী বলো?'

প্রবীণ সন্ন্যাসীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হলঘর থেকে বেরিয়ে এল ওরা। দিনাকে ওর রুম পর্যন্ত এগিয়ে দিল রানা। যাবার আগে আলতো করে চুমু খেল মেয়েটার হাতের উল্টোপিঠে।

'বাহ্! আজ দেখি পুরো ভদ্রলোকের আচরণ করছ,' হেসে বলল দিনা। 'কারণটা কী?'

'কেন, আগে অভদ্র ছিলাম নাকি?' বলল রানা।

'তা ছিলে না, কিন্তু এমন আচরণও পাইনি তোমার কাছে।'

'কারণ, তখন তোমাকে বিশ্বাস করতে পারিনি।'

'এখন পারছ?'

দিনার চোখে চোখ রাখল রানা। 'আর কখনও কিছু লুকাবে না তো?'

'না, রানা।' পরিষ্কার কণ্ঠে বলল দিনা।

'বেশ, তা হলে আমার বিশ্বাসও হারাবে না তুমি কোনোদিন।'

উল্টো ঘুরে নিজের রুমে চলে এল রানা।

পরের দুটো দিন পুরোপুরি বিশ্রামে কাটাল রানা। প্রয়োজন ছাড়া রুম থেকে বেরুল না একবারও। সন্ন্যাসীদের দেয়া সাধারণ খাবারই পেট পুরে খেল, সেই সঙ্গে পান করল প্রচুর পরিমাণ পানি। ঘুমাল যতটা সময় পারে। ধীরে ধীরে শক্তি ফিরে পাচ্ছে ও। দ্বিতীয় দিন বিকেলে বুঝতে পারল, মঠের আশপাশটা ঘুরে দেখতে পারবে। ব্রাদার আব্রাহামের অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল তাই। প্রবীণ সন্ন্যাসী সাবধান করে দিলেন, মঠের সীমানার বাইরে যেন না যায়, সবখানে ল্যাণ্ড-মাইন পোঁতা আছে। সতর্ক থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেরিয়ে এল রানা। অনেকক্ষণ হাঁটল মুক্ত বাতাসে। হাঁটল, আর ভাবল। *সম্রাটদের লজ্জা* নামের বইটা, আর আর্ক অভ দ্য কাভানেন্ট ওর সমগ্র চিন্তা-চেতনা আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ভ্যালি অভ ডেড চিলড্রেনে রেখে আসা নিজের দলের তিন সদস্য, আর রিফিউজিদের ভাবনাও দূর করতে পারছে না মাথা থেকে। ঠেকাতে হবে ইয়োরাম রাবাককে, সেইসঙ্গে যেমন করে হোক উদ্ধার করতে হবে নিরীহ মানুষগুলোকে—শপথ নিল ও।

সূর্য ডোবার আগেই মঠে ফিরে এল রানা। খাওয়াদাওয়া সেরে ফিরে গেল নিজের কামরায়, শুয়ে পড়ল বিছানায়। ঘুমিয়ে নেবে আরেক দফা। কাল সকালে ইলা বাবু-র উদ্দেশে রওনা হবে বলে ঠিক করেছে, তখন আর বিশ্রাম নেবার সময় পাওয়া যাবে না। আজ রাতেই ভাল করে সেঁটে ঘুমিয়ে নিতে হবে।

অন্ধকার নামার খানিক পরে কার যেন পায়ের শব্দ শুনতে পেল ও। মাথা

ঘোরাতেই দরজায় একটা ছায়ামূর্তি চোখে পড়ল, হাতছানি দিয়ে ডাকছে ও, পরমুহূর্তে সরে গেল ছায়াটা। কপালে ভাঁজ পড়ল রানার, বিছানা ছেড়ে প্যান্ট-শার্ট পরল, তারপর বেরিয়ে এল কামরা থেকে। চারদিক নিস্তব্ধ, সন্ন্যাসীরা শুয়ে পড়েছে। করিডোরের এক মাথা থেকে ভেসে আসছে কাঠের মেঝেতে পা ফেলার ক্যাচকোঁচ শব্দ, ওদিকে এগোল ও। একটু পরেই পৌঁছে গেল মঠের লাইব্রেরিতে।

কামরাটা তেমন বড় নয়, একপাশে একটামাত্র কাঠের আলমারিতে রয়েছে বইপত্র, অন্যপাশটায় দুটো বড় জানালা। তার একটার সামনে দাঁড়ানো পেলব দেহটা চোখে পড়ল ওর, জানালার শার্সি গলে আসা চাঁদের আলোয় শরীরের আঁক-বাঁক স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। কাছে গিয়ে মৃদু হাসল রানা। বলল, 'আমি বুঝেছিলাম, তুমি ছাড়া আর কেউ না। এখানে আঁধার নামার পর জেগে থাকবার মত আর কেউ নেই!'

দিনাও হাসল। 'কী করব? অন্ধকার না নামলে ঘর ছেড়ে বেরুতে পারি না যে!'

গত দু'দিনে ওর সঙ্গে দেখা হয়নি রানার। নারীসঙ্গ-বিবর্জিত সন্ন্যাসীদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে কামরার ভিতর নিজেকে বন্দি করে রেখেছিল দিনা, পাছে না সন্ন্যাসীদের ধর্মনাশ হয়! অল্প আলোয় ওকে এবার ভাল করে দেখল রানা, মুখটায় প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে।

'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল ও। 'নিশিডাকের কারণ?'

'কী আবার কারণ,' বলল দিনা। 'মানুষের গল্প করার ইচ্ছে হতে পারে না?'

'তা তো পারেই,' রানা বলল। 'এনিওয়ে, তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে হয়, আমাকে মত পাল্টাতে বাধ্য করেছিলে বলে। সেদিন রওনা দিলে আসলেই ইলা বাবু পৌঁছুতে পারতাম না। মারা পড়তাম মাঝপথে।'

'এখন কেমন বোধ করছ?' জানতে চাইল দিনা।

'আগের চেয়ে ভাল। তবে শরীর এখনও বেড়ালছানার মত দুর্বল।'

'আবার বলো, কতটা দুর্বল?' জিজ্ঞেস করল দিনা। সেঁটে এল গায়ের কাছে। ওর কণ্ঠের আবেদনটা চিনতে ভুল করল না রানা।

'উমম্... বেড়ালের মত,' বলল ও। ঢোক গিলল। দু'দিনের বিচ্ছেদের পর দু'জনের মধ্যকার শারীরিক আকর্ষণটা ফিরে আসছে তীব্র উন্মাদনা নিয়ে।

রানার গলা জড়িয়ে ধরল দিনা, একটা পা ঢুকিয়ে দিল ওর দু'পায়ের মাঝখানে। গাঢ় গলায় বলল, 'ঠিক করে বলো, কতটা দুর্বল?'

'আহত সিংহ বললে চলবে?'

'দ্যাটস্ বেটার,' হাসল দিনা। 'কাল আমরা মঠ ছাড়ব। ইলা বাবু পর্যন্ত ব্রাদার টেডলা প্রতিটা মুহূর্ত থাকবে আমাদের সঙ্গে। ওখানে পৌঁছেও সময় পাব না। সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ হবার পর থেকে আর দম ফেল্যার সুযোগ থাকবে না, দুজনে একান্তে সময় কাটানো তো স্রেফ দুরাশা। আজই শেষ সুযোগ আমাদের... এখুনি!'

'আরে! তুমি দেখছি খুবই স্ট্রেট-ফরোয়ার্ড মেয়ে!'

রানার ঠোঁটে আঙুল রাখল দিনা। 'আমি ঠাট্টা করছি না, রানা। তোমাকে আমি চাই।'

'দেখো দিনা...'

কথা শেষ করতে পারল না রানা, মেয়েটার আগ্রাসী চুমুর কারণে থেমে যেতে বাধ্য হলো মাঝপথে। ঝাপটে ধরে ওর ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে দিল দিনা। নিজের অজান্তেই সাড়া দিল রানা, দিনাকে আঁকড়ে ধরল দু'হাতে। মিশে গেল দুটো দেহ—বুকে বুক, মুখে মুখ।

কয়েক সেকেণ্ড পর নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রানা। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'দেখো, আমি বলতে চাইছিলাম যে, অন্তত একটা নির্জন জায়গা খুঁজে বের করা দরকার। আফটার অল, আমরা একটা পবিত্র উপাসনালয়ে আছি। এখানে এসব...'

'এসো, আমার সাথে,' রানার হাত ধরে টানল দিনা।

মঠ থেকে বেরিয়ে গেল ওরা, পাহাড়ি পথ বেয়ে নেমে গেল নীচের সমতলে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ব্রাদার আব্রাহামের একান্ত গুহাটা খুঁজে বের করল দিনা। তারপর এক হয়ে মিশে গেল দুটি দেহ। পাগলের মত আদর করছে পরস্পরকে। বিচিত্র শব্দমালায় একত্রিত হলো শরীরের সঙ্গে শরীর, মনের সঙ্গে মন...

নিজেদের নিয়ে ওরা এতই ব্যস্ত হয়ে উঠল যে, টের পেল না—দূর থেকে ভেসে আসছে ভারী ইঞ্জিনের গুঞ্জন। পূর্বদিক থেকে এগিয়ে এল ট্রাকের একটা বহর, দুই প্রেমিক-প্রেমিকার অজান্তে চলে গেল ডেব্রে আমলাক মঠের দিকে। আধঘণ্টা পর ওরা যখন ফিরতি পথে, ঠিক তখুনি রাতের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিল অটোমেটিক রাইফেলের গগনবিদারী আওয়াজ, স্বপ্ন আর ভালবাসার জগৎ থেকে ওদেরকে ফিরিয়ে আনল নিষ্ঠুর বাস্তবে।

এগারো

তেল আবিব, ইজরায়েল।

বিলি গেলারের বয়স তেইশ, ইহুদি। জন্ম আমেরিকাতে হলেও ষোলো বছর বয়সে পিতা-মাতার সঙ্গে পাড়ি জমিয়েছে ইজরায়েলে, অভিবাসী হয়েছে। দেশের সবচেয়ে বড় শহরটায় যতক্ষণ থাকছে, ততক্ষণ তার মনে কোনও খেদ নেই। তবে বাইরে যেতে হলেই যত সমস্যা। শখ করে কয়েক বছর আগে একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে গ্রাম্যজীবন কাটাতে গিয়েছিল ও। নির্মল প্রকৃতি আর সাদাসিধে জীবন নিয়ে বাড়াবাড়ি ধরনের প্রশংসা করে সবাই, অথচ ওর ভাল লাগেনি মোটেই। দু'দিনেই হাঁপ ধরে গিয়েছিল। তেল আবিবের শহুরে জীবন আর লেট-নাইট ডিসকো তার কাছে অনেক বেশি প্রিয়। তা ছাড়া, বিচের ধারে নগরীর সবচেয়ে বড় হোটেলগুলোর একটিতে বারটেণ্ডার হিসেবে পার্টটাইম

চাকরি হওয়ায় রোজ রাতেই নিত্যনতুন সুন্দরী মেয়েকে পটানোর চমৎকার সুযোগ রয়েছে। ছুটি কাটাতে প্রায়ই আমেরিকার কলেজ-ছাত্রীরা দল বেঁধে আসে তেল আবিবে, তাদেরকে নানা রকম গল্প শুনিয়ে মুগ্ধ করে ফেলে সে, নিয়ে যায় বিছানায়।

তবে আজ মঙ্গলবার রাত। আটটাও বাজেনি। ককটেল লাউঞ্জ জমজমাট হয়ে উঠতে দেরি আছে। কাস্টোমার বলতে শুধু ইজরায়েলি কয়েকজন ব্যবসায়ী, আর নিউ জার্সি থেকে ট্যুর-গ্রুপের সঙ্গে আসা জনাকয়েক বুড়োবুড়ি—লাউঞ্জের দরজার কাছে একটা টেবিলে বসে আছে। কাজ না পেয়ে পরিষ্কার গ্লাসগুলোই আবার তুলে নিয়েছে বিলি, ন্যাকড়া দিয়ে ঘষে চকচকে করে তুলছে। ওয়েইট্রেস লিজা তার নিজের পজিশনে অলসভাবে দাঁড়িয়ে আছে, একটা চোখ রাখছে কাস্টোমারদের দিকে, অন্যটা বার কাউন্টারের নীচের তাকে রাখা পড়ার বইয়ে—সামনে ওর পরীক্ষা। মেয়েটার সঙ্গে গল্পগুজব করার উপায় নেই। দুজনের কেউ কাউকে পছন্দ করে না। এর জন্য লিজাই দায়ী। ইজরায়েলের বাইরে জন্ম নেয়া যে-কোনও মানুষের ব্যাপারেই এক ধরনের বিদ্বেষ আছে ওর... হোক সে-মানুষ ইহুদি, বা বিধর্মী... বিদ্বেষটুকু লুকানোর কোনও চেষ্টাও নেই তার ভিতর।

'জাহান্নামে যাক হারামজাদী!' ব্যাপারটা মনে পড়ে যেতেই বিড়বিড় করে গাল দিল বিলি। তবে চোখ ফেরাতে পারছে না। সাদা ইউনিফর্ম ঠেলে উঁচু হয়ে থাকা লিজার সুডৌল স্তনদুটোর উপর দৃষ্টি আটকে যাচ্ছে।

ধড়াম করে একটা শব্দ হতেই দরজার দিকে মাথা ঘুরে গেল বিলির। বিদেশি এক যুবক এসে ঢুকেছে, তার গায়ের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেছে লবির সাইনবোর্ডটা। কৌতূহলী হয়ে উঠল ও, যুবকটির দুটো হাতই দেখা যাচ্ছে, কিন্তু একটা হাত স্থির হয়ে ঝুলছে—নড়ছে না। বাম হাতটা নকল। ডান হাতে সাইনবোর্ডের স্ট্যাণ্ডটা তুলে রেখে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। চেহারাসুরতের এ কী দশা! মনে হচ্ছে যেন ঝড় বয়ে গেছে মানুষটার উপর দিয়ে। এ-লোক হোটেলে ঢুকল কী করে? নিশ্চয়ই দরজার সেন্ট্রিদেরকে ঘুষ দিয়েছে। কিন্তু ঘুষ দেবার মত টাকাই বা পেল কোথায়?

ভাবনাটা শেষ করবার আগেই ওর সামনে চলে এল আগন্তুক। একটা টুল টেনে বসে পড়ল। ইংরেজিতে বলল, 'গলায় ঢালার মত কিছু দাও তো, বাছা!'

ভুরু কোঁচকাল বিলি। 'আপনি ঠিক আছেন, সার?'

নিজের ময়লা জামাকাপড়ের দিকে তাকাল যুবক, হাত বোলাল খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভরা গালে। 'খুব বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে, না?'

'তা তো দেখাচ্ছেই,' স্বীকার করল বিলি।

'চিন্তা কোরো না। শাওয়ার নিয়ে পোশাক পাল্টে ফেললে রাজপুত্রের মত লাগবে, চিনতেও পারবে না আমাকে। এখন একটা ড্রিঙ্ক দাও।'

'দাম দিতে পারবেন তো? নাকি মাগনা খাওয়াতে হবে?'

'নারে ভাই! দান-খয়রাত আর নিতে পারব না, এমনিতেই অনেক নিয়ে ফেলেছি। ওগুলো আবার শোধ করে দিতে হবে।' পকেট হাতড়ে একগাদা

খুচরো কয়েন বের করল যুবক। 'এই নাও। নগদেই খাব।'

বিলির বিস্ময় আরও বাড়ল। 'এতগুলো খুচরো টাকা নিয়ে ঘুরছেন আপনি?'

'কী করব, যেখান থেকে পেয়েছি, সেখানে একটাও বড় নোট ছিল না।'

কথাটার অর্থ বুঝতে পারল না বিলি। কাঁধ ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী দেব?'

'বারবন আছে? জ্যাক ড্যানিয়েলস্ হলে ভাল হয়।'

'দিচ্ছি,' ড্রিঙ্ক পরিবেশনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল বিলি। আড়চোখে দেখল, ভ্রুকুটি নিয়ে নবাগত কাস্টোমার আর ওকে দেখছে লিজা। বিদেশি মানুষ পছন্দ করে না, অথচ চাকরি নিয়েছে ছেমেরি আন্তর্জাতিক মানের একটা হোটেলে—হিপোক্রেট আর কাকে বলে! *হারামজাদী!* বিড়বিড় করে আবার গাল দিল বিলি। তারপর ড্রিঙ্কের গ্লাসটা বাড়িয়ে ধরল খদ্দেরের দিকে।

'আহ্!' চুমুক দিয়ে বলল যুবক। 'প্রাণটা বাঁচালে, ভাই! আরেকটু উপকার পেলে বড়ই ভাল হয়। এখানে খাওয়াদাওয়ার কোনও ব্যবস্থা আছে?'

'সরি, সার। খেতে চাইলে রেস্টুরেন্টে যেতে হবে।'

'তা হলে তো বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে,' লাউঞ্জের দেয়ালে ঝোলানো ঘড়ি দেখল যুবক। 'একজনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, তোমার এখানে কিছুক্ষণ বসলে অসুবিধে আছে?'

'জী না, সার। বসুন যতক্ষণ খুশি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ!' গ্লাস নামিয়ে রেখে হাত বাড়িয়ে দিল যুবক। 'বাই দ্য ওয়ে, আমি সোহেল আহমেদ।'

'বিলি গেলার, সার,' হাত মেলাল বিলি। 'নাইস টু মিট ইউ।'

বসে বসে তিন গ্লাস বারবন সাবাড় করল সোহেল। আধঘণ্টা পর পিছনে শুনতে পেল ডাক।

'অ্যাই ব্যাটা, সোহেল!'

ঘাড় ফিরাতেই বিসিআই-এর অন্যতম এজেন্ট ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু জাহেদকে দেখতে পেল চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। চোখদুটো বড় হয়ে গেল ওর। এ-শালা এখানে এল কোত্থেকে? হতচকিত ভাবটা সামলাবার আগেই জাহেদ জড়িয়ে ধরল ওকে। প্রিয় বন্ধুকে সুস্থ দেখতে পেয়ে আবেগটা চাপা দিতে পারছে না।

'অ্যাই ব্যাটা, ছাড়, ছাড়! লোকে কী ভাববে?'

সংবিৎ ফিরে পেল জাহেদ। তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গেল একপা। সোহেল বিস্মিত কণ্ঠে জানতে চাইল, 'তুই এখানে কেন? আমি তো ওসমানকে ফোন করেছিলাম!'

ওসমান ফারুক তেল আবিবে বিসিআই-এর আণ্ডারকাভার এজেন্ট। পিকআপের জন্য ওকেই আসতে খবর দিয়েছিল সোহেল। জাহেদ বলল, 'টেলিফোন লাইনটা নিরাপদ ছিল না, তাই ওসমান তোকে বলেনি কিছু। শুধু আমিই না, রূপা আর সলীলও এখন তেল আবিবে।'

'বলিস কী রে! এ-রকম একটা রেস্ট্রিক্টেড এরিয়ায় তোদের সবাইকে

পাঠিয়ে দিল বুড়ো? কী কাভার নিয়ে এসেছিস?'

'কাভার নিতে হয়নি। আমেরিকান প্রেসিডেন্টের অনুরোধে তোকে উদ্ধারের জন্য সব রকম সাহায্য করতে রাজি হয়েছেন ইজরায়েলি প্রাইম মিনিস্টার লিওনিদ হালপেরিন। আমাদেরকে তেল আবিবে তিনিই ডেকে এনেছেন খোঁজাখুঁজিতে সহায়তা করার জন্য।'

'অ্যা! নিজেকে তো ভিভিআইপি মনে হচ্ছে রে! আমার জন্য খোদ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট অনুরোধ করছে?'

'লাথ মেরে ঠ্যাংটাও ভেঙে দেব, শালা—তখন বুঝবি ভিভিআইপি হবার মজা!' চোখ পাকাল জাহেদ। 'ব্যাটা ছাগল, এভাবে কিডন্যাপ হয় কেউ? জানিস, তোর কারণে গত দু'টো সপ্তাহ আমাদের নাওয়া-খাওয়া সব হারাম করে দিয়েছে বুড়ো? রানাও আফ্রিকার মরুভূমিতে রোদে ভাজা-ভাজা হচ্ছে শুধু তোরই জন্যে, জানিস?'

চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এলো সোহেলের—কুঁচকে গেল গাল, ঠোঁট কাঁপছে। অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে জ্যাকেটের হাতায় চোখ মুছল। 'ওর কী খবর?'

'জানি না। ওর সঙ্গে যোগাযোগ নেই আমাদের কারও।'

'কী বলিস?'

'হ্যাঁ। ফিরে এসে তোর মাথা ফাটাবে রানা। চল্ এখন, বাইরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে এসেছি। তোর গা থেকে পাঁঠার গন্ধ বেরুচ্ছে। সেফ-হাউসে নিয়ে গিয়ে ঝামা দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করতে হবে।'

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু খিদে পেয়েছে যে খুব? এখানকার রেস্টুরেন্টটা বেশ ভাল বলে শুনেছি...'

'পাঁঠা নিয়ে রেস্টুরেন্টে যেতে পারব না আমি। তা ছাড়া রূপা তোর জন্য রান্নাবান্না করছে, বাইরে থেকে খেয়ে গেলে ঝাড়ু নিয়ে তাড়া করবে।'

'বাপ রে! তা হলে তো দেরি করা ঠিক হবে না। চল, চল্!'

হোটেল থেকে বেরিয়ে সরকারি গাড়িতে উঠল দুজনে। হায়ারকন স্ট্রিট ধরে দ্রুতবেগে গাড়ি ছুটল নিউ শানান এলাকায় ওদের সেফ-হাউসের উদ্দেশে। এই সুযোগে বন্দিদশার পুরো বিবরণ জাহেদকে শোনাল সোহেল, জানাল কীভাবে পালিয়ে এসেছে চরমপন্থীদের হাত থেকে।

'জেরুসালেমের পুরনো শহর থেকে বেরুতে খুব একটা কষ্ট হয়নি,' বলল সোহেল। 'কারফিউ চললেও গোলাগুলির কারণে সমস্ত টহল ওদিকে চলে গিয়েছিল, নিরাপদে শহরের গেট পেরিয়ে এপারে চলে যেতে পেরেছি। ওখানে ঘণ্টাখানেক উদ্দেশ্যবিহীনভাবে হেঁটেছি। কী করব, বুঝতে পারছিলাম না। টাকাপয়সা ছিল না সাথে; ফোন করবার, বা কোথাও যাবার উপায় ছিল না তাই। শেষে একটা গির্জা পেয়ে যাওয়ায় সমস্যার সমাধান হয়ে গেল...'

'কীভাবে?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল জাহেদ। কথাটার অর্থ বুঝতে পারছে না।

'গির্জার বাইরে একটা দানবাক্স ছিল,' বলল সোহেল। 'ওটা ভেঙে যা ছিল

সব নিয়ে নিয়েছি। একটা ফোনবুদ থেকে কল করেছি ওসমানকে, পিকআপের জন্য হোটেলটা ঠিক করেছি। তারপর তেল আবিব-গামী একটা ট্রাকের ড্রাইভারকে কিছু টাকা দিয়ে রাজি করিয়েছি আমাকে প্যাসেঞ্জার হিসেবে সঙ্গে নিতে। বাকিটা তো জানিস-ই...'

অবিশ্বাসের চোখে বন্ধুর দিকে তাকাল জাহেদ। ওদের ফ্রেণ্ড-সার্কেলের মধ্যে ও-ই সবচেয়ে ধর্মভীরু। 'তুই গির্জার দানবাক্স থেকে টাকা চুরি করেছিস? হায় হায়! ওটাও তো স্বীকৃত ধর্ম রে, নরকে পচবি!'

'যাব্ব্যাটা, জ্ঞান দিস না। প্রাণ বাঁচানো ফরজ, ওর জন্য সবকিছুই জায়েজ,' বলল সোহেল। 'তা ছাড়া... চুরি তো করিনি আমি, ধার নিয়েছি। যা নিয়েছি, তোর কাছ থেকে ধার করে তার দ্বিগুণ টাকা আবার ফিরিয়ে দেব ওখানে, ব্যস। দে, ছাড় দেখি কিছু টাকা, সিগারেট কিনব।'

পকেটে হাত দিয়েই সতর্ক হয়ে গেল জাহেদ।

'কিল খাবি!' সোহেলের ঠাট্টা বুঝতে পেরে মুঠি পাকাল জাহেদ। 'শালা...'

'ঠিক আছে, যা, ধার দিতে হবে না। এবার রানার খবর বল্। ইরিত্রিয়ায় গেছে ও?'

'হ্যাঁ। তুই কিডন্যাপ হবার কয়েক দিনের মধ্যেই। আসমারায় পৌঁছুনোর পর থেকে আর কোনও যোগাযোগ করেনি আমাদের সঙ্গে। অনেকভাবে চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু ওর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।'

'চুপচাপ থাকার তো কথা নয় ওর,' চিন্তিত গলায় বলল সোহেল। 'নিশ্চয়ই কোনও বিপদে পড়েছে।'

'সেটার সম্ভাবনাই বেশি,' স্বীকার করল জাহেদ। 'খুব জটিল একটা পরিস্থিতিতে জড়িয়ে পড়েছে ও।' ইজরায়েলি প্রাইম মিনিস্টারের কাছে শোনা পুরো ব্যাপারটা মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানকে ইতোমধ্যে জানিয়েছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। বসের কাছ থেকে জাহেদও জেনেছে। সোহেলকে সব খুলে বলল ও।

'ইন্নাল্লা!' চমকে গেল সোহেল। 'আর্ক অভ দ্য কাভানেন্ট, আর সলোমনের খনি? কী বলছিস তুই এসব?'

'ঠিকই শুনছিস,' মাথা ঝাঁকাল জাহেদ। 'রানা এবার মস্ত বড় ঝামেলায় পড়েছে।'

'আমরা ওকে সাহায্য করছি না কেন?'

'বস তো চাইছেন, কিন্তু পারছেন না। ইরিত্রিয়ায় আমাদের নিজস্ব কোনও ইউনিট নেই। সুদানে জাতিসঙ্ঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশি কন্টিনজেন্ট আছে, আপাতত ওদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। রানা সাহায্য চাইলেই যেন ছুটে যায়।'

'ইরিত্রিয়ান সরকারকে ব্যাপারটা জানিয়ে কিছু করা যায় না?'

'যায়, কিন্তু আমেরিকান প্রেসিডেন্ট এ-মুহূর্তে কিছু ফাঁস করতে চাইছেন না। তা হলে থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়বে; দুনিয়ার সবাই জেনে যাবে স্পাই স্যাটেলাইটের কথা। গোপনে কাজ করবার পক্ষপাতি উনি।'

'আমরা তাতে রাজি হচ্ছি কেন?'

'ভদ্রলোক তোকে উদ্ধার করবার জন্য যা করেছেন, তাতে বস কৃতজ্ঞ। তা ছাড়া... অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনও অনুরোধ করেছেন কাউকে কিছু না জানাতে। অন্যরকম ব্যবস্থা হচ্ছে।'

'দিস ইজ অ্যাবসার্ড!' রানার কথা ভেবে উত্তেজিত হয়ে উঠল সোহেল। 'এভাবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার কোনও মানে হয় না। ওখানে... মরুভূমির ভিতর রানা হয়তো মরতে বসেছে...'

'শান্ত হ,' ওর কাঁধে একটা হাত রাখল জাহেদ। 'রানা অত সহজে মরবে না। অন্তত একটিবার আমাদের সঙ্গে অবশ্যই যোগাযোগ করবে। সে-আশাতেই রয়েছি আমরা।'

'খোদা,' বিড় বিড় করল সোহেল। 'তা-ই যেন হয়!'

বারো

উত্তর ইরিত্রিয়া।

রাইফেলের আওয়াজ চিনতে পারল রানা, ওই শব্দ না চেনার কোনও কারণ নেই। পেশাগত রিফ্লেক্সের বশে মুহূর্তে সচল হয়ে উঠল তাই, সঙ্গিনীর হাত ধরে টান দিল, একছুটে দুজনে পাহাড়ের খাড়া ক্লিফের গোড়ায় গিয়ে শুয়ে পড়ল মাটিতে। ওদের মাথার উপর থেকে হয়েছে শব্দটা—ক্লিফের মাথায়, মঠের দিক থেকে। আশপাশে ধুলো ওড়েনি, তারমানে ওদের লক্ষ্য করে গুলি করা হয়নি; তারপরও গ্রাউণ্ড লেভেলে নজর বোলাল রানা—নীচে কোনও স্কাউট, বা রি-এনফোর্সমেন্ট আছে কি না, বোঝার চেষ্টা করল। দেখা গেল না কিছু, বরাবরের মত নিথর হয়ে আছে মরুভূমি।

দিনার শরীর কাঁপছে। ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে গুলি করছে?'

জবাব না দিয়ে চিন্তা করল রানা। ইয়োরাম রাবাকের খুনিদের পক্ষে ওদের খোঁজ বের করা সম্ভব নয়, বাকি থাকে সুদানিজরা। আবেল নিঃসন্দেহে ধরা পড়েছে, ওকে ইন্টারোগেট করে এখানকার খবর পেয়েছে ওরা। না জানি কী পরিমাণ অত্যাচার করা হয়েছে ওকে!

আরেক দফা গুলির শব্দ ভেসে এল মঠের দিক থেকে।

কী করা যায়, ভাবল রানা। ওর হাতে তেমন কোনও বিকল্প নেই—সন্ন্যাসীদেরকে বাঁচাতে হবে, এটাই আসল কথা। ও-ই এখানে টেনে এনেছে সুদানিজ টেরোরিস্টদেরকে, ওর কারণেই শান্তিপ্রিয় মানুষগুলো বিপদে পড়েছে। এদেরকে ফেলে পালিয়ে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। জ্যান্ত ধরা পড়লে কী ঘটবে, সেটা জানা কথা। ওকে খনিতে নিয়ে যাওয়া হবে। সেটা ঘটলেও মন্দ হয় না। ওখান থেকে পালানোর একটা চেষ্টা করা যাবে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও। তাকাল দিনার দিকে। বলল, 'এখানেই থাকো।'

কণ্ঠে আশ্চর্য দৃঢ়প্রত্যয়।

উঠে দাঁড়িয়ে বাঁয়ে ঘুরল রানা। দিনা বলল, 'কোথায় যাচ্ছ? মঠের রাস্তা তো ডানে!'

'জানি। কিন্তু আমরা এসেছিলাম দক্ষিণ... মানে বাঁ-দিক থেকে। ওদিকেই কোথাও ন্যাপস্যাকটা ফেলে এসেছি। ওটা নিয়ে আসা দরকার।'

পাহাড়ি পাঁচিলে পিঠ ঠেকিয়ে সাবধানে হাঁটল রানা, উপর থেকে কেউ যেন দেখতে না পায়। অবশ্য আবছা আলোয় বালির মাঝখানে খাকি পোশাক পরা কাউকে স্পট করা খুব কঠিন, তবু ঝুঁকি নিতে চাইছে না। একটু পরেই পেয়ে গেল প্যাকটা। ভেবেছিল কমপক্ষে আধ-মাইল যেতে হবে, কিন্তু বাস্তবে যেতে হলো মাত্র তিনশো গজের মত। দূরত্বটা লক্ষ করে অবাক না হয়ে পারল না। শক্তি ফুরিয়ে গিয়েছিল সেদিন, দিনাকে বইতে হচ্ছিল পিঠে... তারপরও এক ঘণ্টায় মাত্র তিনশো গজ পেরিয়েছিল—তা কী করে হয়? কতটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল আসলে?

আনমনে মাথা নেড়ে প্যাকটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রানা। চাঁদের আলো মোটামুটি ভালই আছে, ভিতরটা দেখে নিশ্চিত হয়ে নিল—দিনার পিস্তলটা আছে কি না। পেল ওটা, বের করে গুঁজল কোমরে। পুরো এক ক্লিপ অ্যামিউনিশন আছে, কাজ চালানো যাবে কিছুক্ষণ। ন্যাপস্যাকটা পিঠে ঝুলিয়ে দিনার কাছে আবার ফিরে এল।

'এত তাড়াতাড়ি ফিরলে কীভাবে?' বিস্মিত হয়ে জানতে চাইল দিনা।

'নিজেকে যতটা সুপারম্যান ভেবেছিলাম, ততটা আসলে নই। প্যাকটা খুব কাছেই পড়ে ছিল।' হাসল রানা। প্যাক থেকে আরও কিছু জিনিস বের করে পকেটে ভরতে শুরু করল। উপরে তাকাতেই হলুদ রঙের একটা রশ্মি দেখতে পেল। ক্লিফের কিনারা থেকে টর্চের আলো ফেলছে কেউ। তাড়াতাড়ি মাথা নামিয়ে শরীর মিশিয়ে দিল বালিতে। আলোটা সরে যেতেই আবার উঠে বসল।

'মঠে যাচ্ছি আমি,' বলল রানা। 'টোপ সেজে লোকগুলোকে বের করে আনার চেষ্টা করব। যদি না পারি, তা হলে আত্মসমর্পণ করব। আমাকে পেলে হয়তো প্রিস্টদেরকে ছেড়ে দেবে ওরা।'

'আমার কী হবে?' জানতে চাইল দিনা।

'তোমাকে ওরা খুঁজছে বলে মনে হয় না। আমিই টার্গেট। মেডিউসা-ফটোগ্রাফগুলো আমার কাছে আছে। গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারলে কিচ্ছু হবে না তোমার।'

'তুমি গিয়ে একা লড়াই করবে, আর আমি ভীরুর মত গা-ঢাকা দিয়ে বসে থাকব?' দিনার কণ্ঠে অসন্তোষ ফুটল। 'তা হয় না, রানা!'

'দেখো, এখানে সাহসের প্রতিযোগিতা চলছে না,' বিরক্ত গলায় বলল রানা। 'আমি যাচ্ছি নিতান্ত বাধ্য হয়ে। অন্য কেউ উপরের বদমাশগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। ধরা পড়ার ঝুঁকি আছে, তাই একজনকে অন্তত মুক্ত থাকতে হবে, যাতে মিলিটারিকে খবর দেয়া যায়। তুমিই বেস্ট চয়েস, কারণ ইরিত্রিয়ান অথরিটি আমার কথা শুনবে না। বুঝেছ?'

'বোঝাবুঝিতে কাজ নেই,' গোঁয়ারের মত বলল দিনা। 'আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে—দ্যাটস্ ফাইনাল। দেখো, আমাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা কোরো না। তোমার মত আমিও একজন ট্রেইনিং-পাওয়া এজেন্ট। এ-ধরনের পরিস্থিতি সামলাবার মত যোগ্যতা আছে আমারও। দু'জন একসঙ্গে গেলে সফল হবারও সম্ভাবনা বাড়বে।'

'কিন্তু...'

কথা শেষ হলো না রানার, তার আগেই একটা তীব্র আর্তচিৎকারে কেঁপে উঠল দুজন। শব্দটার উৎসের দিকে চোখ ফেরাতেই শূন্যে কালো একটা আকৃতি দেখতে পেল—সবেগে নেমে আসছে নীচে। একজন মানুষ... সন্ন্যাসী... তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে ক্লিফের মাথা থেকে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই নীচে আছড়ে পড়ল দেহটা, দূর থেকেও মাংস থেঁতলানোর বীভৎস আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল দিনা।

রানার চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। তর্ক করবার সময় নেই এখন, শয়তানেরা সন্ন্যাসীদেরকে খুন করতে শুরু করেছে! দিনার হাত ধরে টেনে ওঠাল ও। রুক্ষ গলায় বলল, 'চলো!'

পাঁচিল ধরে মঠে যাবার পথটার দিকে এগোতে শুরু করল ওরা। কিছুদূর যাবার পর মাটিতে পড়ে থাকতে দেখল হতভাগ্য সন্ন্যাসীকে—মাটিতে প্রায় মিশে গেছে দেহটা, চারপাশে রক্তের বন্যা। বেঁচে আছে কি না, সেটা দেখার কোনও প্রয়োজন নেই। মন শক্ত করে লাশটা পেরিয়ে এল রানা। একটু পরেই ঊর্ধ্বমুখী পথটার সামনে পৌঁছে গেল। তবে থামল না, এগোতে থাকল আরও। থামল মঠের পিছনদিককার ক্লিফের তলায় পৌঁছে।

চাঁদের আলোয় পাঁচিলটা ভাল করে দেখে নিল রানা, ছোট-বড় নানা রকম খাঁজে ভরে আছে শরীর—হাত-পা বাধিয়ে উপরে ওঠা যাবে। শত্রুরা ওর অপেক্ষায় আছে, তবে এখান দিয়ে উঠলে প্রয়োজনে ওদের উপর পিছন থেকে হামলা চালানো যাবে। সন্তুষ্ট হয়ে দিনার দিকে ফিরল ও। জিজ্ঞেস করল, 'আগে কখনও পাহাড়ে চড়েছ?'

'না।'

'হুম। তা হলে তুমি সামনে থাকবে। আমি নীচ থেকে ডিরেকশন দেব। যদি পড়ে যাও, তা হলে হয়তো ধরেও ফেলতে পারব।' সঙ্গে দড়ি থাকলে রানা নিজেই আগে যেত, সেফটি-লাইনে আটকে রাখত দিনাকে। এখন এ-পদ্ধতিতেই এগোতে হবে।

একশো ফুট উঁচু পাঁচিলটার দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলল দিনা। 'ইয়ে, রানা... আমার উচ্চতা-ভীতি আছে।'

'আর আমার আছে মাকড়সা-ভীতি,' মুচকি হেসে কৌতুক করল রানা। সঙ্গিনীর টেনশন দূর করতে চাইছে। 'তোমাকে আগে পাঠাচ্ছি সেজন্যেই। পথ থেকে মাকড়সাগুলো সরিয়ে দিয়ো। তা হলে আমিও তোমার দেখভাল ঠিকমত করতে পারব। ঠিক আছে?'

হাসল দিনা। 'ঠিক আছে।'

শুরুতে নির্ঝঞ্ঝাটেই উঠতে পারল ওরা। ক্লিফের নীচের অংশ কিছুটা ঢালু, পাথরের কিনারাও কালের প্রবাহে বেশ মসৃণ ও চওড়া। পাঁচিলের গায়ে সারাক্ষণ শরীরের তিনটে পয়েন্ট বাধিয়ে রাখল ওরা, সতর্কতার সঙ্গে এগোলেও চমৎকার গতি ধরে রাখতে পারল। কিন্তু ত্রিশ ফুট পরেই একেবারে খাড়া হয়ে গেল দেয়াল, ঝুঁকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ল। বাধ্য হয়ে নিজেদের শরীরও সিধে করতে হলো ওদেরকে, গা মিশিয়ে রাখতে হলো পাথরের সঙ্গে, হাতের পেশিতে চাপ পড়তে শুরু করল। মাধ্যাকর্ষণের টান বাড়ছে প্রতি মুহূর্তে। রানা টের পেল, আতঙ্কিত হতে শুরু করেছে দিনা। আস্তে করে ওর গোড়ালি স্পর্শ করল, বোঝাতে চাইল—ও সঙ্গেই আছে।

'একটু বাঁয়ে চাপো,' বলল রানা। 'একটা ন্যাচারাল চিমনি দেখতে পাচ্ছি; ওটা ধরে বিশ ফুট ওপরে ওঠা যাবে। ওখানে একটা তাক দেখতে পাচ্ছি—বিশ্রাম নিতে পারব।'

চিমনিটা বেশি চওড়া নয়, রানার কাঁধ আটকে গেল বারে বারে। তাতে অবশ্য সুবিধেই হলো, বাড়তি সাপোর্ট পেল শরীর। তবে এগোনোর গতি কমে গেল। দিনা অবশ্য রানার তুলনায় হালকা-পাতলা, কোথাও আটকাল না তাই, তর তর করে চিমনি বেয়ে উঠে গেল উপরে। খানিক পরে তাকটাতে পৌঁছে গেল ওরা, পাশাপাশি শুয়ে জোরে জোরে শ্বাস ফেলল কয়েক মিনিট। ঘড়ি দেখল রানা, আধঘণ্টা পেরিয়ে গেছে রওনা হবার পর।

'আঙুল নাড়তে থাকো,' দিনাকে বলল ও। 'নইলে জয়েন্টগুলো জমে যাবে।'

'কেমন এগোচ্ছি আমি?'

'চমৎকার!'

'সব তোমার কৃতিত্ব। একা হলে কোনোদিনই পারতাম না।' রানার ঠোঁটে আলতো চুমু খেল দিনা। 'রেডি?'

'হ্যাঁ, চলো।'

উঠে দাঁড়াল রানা। দিনার ইতিবাচক মনোভাব দেখে স্বস্তি পাচ্ছে। তাকের কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল ও। পরের নির্দেশনা দিল। 'ডানদিকে যেতে হবে তোমাকে। আমাদের ছ'ফুট উপরে একটা ছোট্ট তাক আছে, ওটায় উঠতে হবে একটু কঠিন, তবে অসম্ভব নয়। ওখানে উঠলে আরেকটা খাড়া ফাটল পাব, তখন আর অসুবিধে হবে না উঠতে।'

ছোট্ট তাকটার দিকে তাকিয়ে বুক শুকিয়ে গেল দিনার। একটু নয়, খুবই কঠিন হবে ওটায় ওঠা। ওর কাঁধে হাত রাখল রানা। 'রিল্যাক্স, আমি আছি তোমার সঙ্গে। ভয় পেয়ো না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে পাঁচিলে হাত রাখল দিনা। পায়ের ডগা ঢোকাল একটা খোঁড়লে, তারপর তাকের উপর থেকে টেনে তুলল শরীর। পাঁচিল বেয়ে ডানদিকে উঠতে শুরু করল ও, নীচে অবারিত শূন্যতা। জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে, শুনল রানা, বুঝল, ভয় পেতে শুরু করেছে। তাড়াতাড়ি পাঁচিল ধরে অনুসরণ করল ওকে। কেউ কোনও কথা বলল না, হালকা বাতাস আর পাথরের গায়ে কাপড় ঘষার আওয়াজ ছাড়া কানে আসছে না কিছু।

খাটতে হলো খুব, পাঁচিলের গায়ে সেঁটে থাকতে শরীরের সমস্ত শক্তি ব্যয় করতে হলো, তবে একটু পরেই দশ-ইঞ্চি চওড়া দ্বিতীয় তাকটায় পৌঁছে গেল ওরা। আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের হিসেবের ভুল টের পেল রানা। নীচ থেকে মনে হচ্ছিল, তাকটা বারো গজের মত বিস্তৃত, গিয়ে ঠেকেছে খাড়া ফাটলটাতে। কিন্তু কাছে পৌঁছে দেখল, কয়েক ফুট গিয়েই সরু হতে শুরু করেছে ওটা, ছায়ায় মিশে গেছে। মাঝখানে প্রায় চারফুটের মত জায়গা সম্পূর্ণ ফাঁকা, তারপর অবশ্য আবার মাথা বের করেছে, শেষ প্রান্তটা ঠেকেছে ফাটলের ঠিক তলাতে—তবে ওই অংশটা এপাশের চাইতে সরু। পা রাখা যাবে কোনোমতে। কিন্তু তার জন্য ফাঁকা জায়গাটা পেরুতে হবে আগে।

উপর দিকে বিকল্প পথের খোঁজে তাকাল রানা—কিন্তু মন দমে গেল তেলতেলে মসৃণ পাথর দেখতে পেয়ে। প্রায় বিশ ফুট জায়গা অমন পরিষ্কার, একটা খাঁজও নেই যে বেয়ে ওঠা যাবে। নীচের দিকে তাকাল—যে-পথে এসেছে, সে-পথে ফিরে যাওয়াও অসম্ভব। ওরা ফাঁদে পড়ে গেছে।

ব্যাপারটা দিনাও বুঝতে পেরেছে। শঙ্কিত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী করব এখন?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'একটাই তো উপায় দেখছি—লাফ দিয়ে ওপারে যেতে হবে আমাদেরকে!'

'কী!'

'লং-জাম্প দেবার কথা বলছি না,' আঙুল তুলল রানা। 'ফাঁকা জায়গাটা দেখছ? ওখানে পাহাড়ের গা থেকে ওই যে একটা ছুঁচালো পাথর বের হয়ে আছে, ওটা ধরে দোল খেলে ওপারে পৌঁছে যেতে পারবে।'

'মাথা খারাপ হয়েছে তোমার?' দিনা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

'আর কোনও আইডিয়া থাকলে বলতে পারো। আমি ভেবে দেখতে রাজি আছি।'

অনিশ্চিত দৃষ্টিতে ফাঁকা জায়গাটার দিকে তাকাল দিনা। রানা যে-পাথরটার কথা বলছে, ওটা মাত্র চার-ইঞ্চি বেরিয়ে আছে। মুঠো করে ধরা যাবে না, কোনোমতে আঙুল আটকে দোল খেতে হবে। ভয়ার্ত গলায় বলল ও, 'আ... আমি পারব না, রানা। কাজটা অসম্ভব!'

'মোটেই অসম্ভব নয়,' জোর দিয়ে বলল রানা। 'পারলে আমি দেখিয়ে দিতাম, কিন্তু এইটুকুন তাকের ওপর দিয়ে তোমাকে টপকে ওদিকে যেতে পারছি না। শোনো, আমার দিকে তাকাও। মনকে শক্ত করো। ভয় পেলে সহজ কাজও কঠিন হয়ে যায়। নিজেকে বিশ্বাস করাও যে, তুমি পারবে। তা হলেই আর অসুবিধে হবে না।'

ঢোক গিলল দিনা। দুরু দুরু বুক নিয়ে এগোতে শুরু করল। ফাঁকা জায়গাটার কিনারে গিয়ে ঝুঁকে একটা হাত বাড়িয়ে ধরল পাথরটা, তারপর সৃষ্টিকর্তার নাম জপে ছেড়ে দিল শরীরটাকে। নীচে যে প্রায় ষাট ফুট শূন্যতা রয়েছে, তা আর ভাবতে চাইছে না। রুক্ষ পাথরে কাপড় ঘষা খাবার শব্দ হলো, কানের পাশে বয়ে গেল বাতাস... হঠাৎ দিনা খেয়াল করল, নীচে তাকটা আবার

উদয় হয়েছে। তাড়াতাড়ি একটা পা নামিয়ে দোল খাওয়া ঠেকাল ও, হাঁটু সামান্য মুড়ে ব্যালান্স ধরে রাখল, তারপর নিয়ে এল অন্য পা-টাও। ছেড়ে দিল পাথরটা। রানার দিকে চোখ ফেরাতেই বুঝতে পারল—নিরাপদে ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে এসেছে ও। উপলব্ধিটা ঠোঁটে একটা নার্ভাস হাসি এনে দিল।

'গুড গার্ল!' প্রশংসা করল রানা। তারপর দিনাকে অনুকরণ করতে গেল। এক পা এগোতেই সবেগে একটা ছোট পাথর ওর কানের পাশ দিয়ে নীচে চলে গেল। আরেকটু হলেই চাঁদি ফেটে যেত। দিনার আঁতকে ওঠার শব্দ পেল ও, উপরে তাকাতেই ক্লিফের কিনারায় আকাশের পটভূমিতে একটা ছায়ামূর্তি দেখতে পেল—ঝুঁকে আছে নীচের দিকে। আরেকটা ঢিল রয়েছে লোকটার হাতে, কাঁধের উপর দিয়ে মাথা উঁচু করে আছে পিঠে ঝোলানো অ্যাসল্ট রাইফেল। একজন গার্ড! রানাকে উপরে তাকাতে দেখেই খুশি হয়ে উঠল সে, ঢিলটা দু'হাতে লোফালুফি করল বারকয়েক—ছুঁড়বার আগে শিকারকে আতঙ্কিত করে তুলতে চাইছে। প্রমাদ গুনল রানা, উপায়ান্তর না দেখে দূর থেকেই ঝাঁপ দিল পাঁচিলের গা থেকে বের হয়ে আসা ছোট অবলম্বনটার দিকে।

বাতাস কেটে ছুটে গেল দেহটা, পিছনে লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো গার্ডের ছোঁড়া ঢিল। রানার মনে হলো, অনন্তকাল ধরে ভাসছে, নীচের জমিনে আছড়ে পড়বে যে-কোনও মুহূর্তে। হঠাৎ চোখের সামনে দেখতে পেল ছুঁচালো পাথরটাকে। হাত ছুঁড়ল ও, ডানদিকেরটা ছুটে গেল... তবে বাম তালুতে ঠেকল পাথুরে রুক্ষতা, সজোরে খামচে ধরল আঙুল বাঁকা করে। প্রচণ্ড চাপ পড়ল জয়েন্টে, রানার মনে হলো—আঙুলগুলো মটমট করে ভেঙে যাবে এখুনি, পড়ে যাবে ও।

দোল খেল ও। পৌঁছে গেল তাকের অন্যপাশে। ওর বেল্ট আঁকড়ে ধরে ফেলল দিনা। দ্রুত তাকের মেঝেতে পা ঠেকাল রানা। বলল, 'কুইক! এগোতে থাকো! ব্যাটা আবার ঢিল মারবে।'

পাহাড়ের সরু কার্নিশ ধরে দ্রুত সরে যেতে শুরু করল ওরা। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে গার্ডের দৃষ্টিসীমার আড়ালে পৌঁছে গেল। পাশেই খাড়া ফাটল, কিছুদূর লম্বালম্বি উঠে বেঁকে গেছে ক্লিফের চূড়ার দিকে। ওটাতে ঢুকে পড়ল দুজনে। ভিতরে খাঁজের অভাব নেই, হাত-পা বাধিয়ে তরতর করে ওঠা গেল। বাঁকা অংশটা আরও সহজ, র‍্যাম্প ধরে এগোনোর ভঙ্গিতে ওটা বাইতে পারল ওরা। গার্ডের দৃষ্টি এড়িয়ে চূড়ায় যে পৌঁছুনো যাবে না, তা রানা খুব ভাল করেই জানে। তবে ব্যাটাকে চমকে দেবার মত একটা উচ্চতায় পৌঁছুতে পারবে বলে আশা করছে।

চূড়া যখন মাত্র পনেরো ফুট দূরে, তখন দিনার পা টেনে ধরে থামাল ও। বলল, 'নিচু হও।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ঢালু ফাটলে শরীর মিশিয়ে দিল দিনা, ওকে টপকে সামনে চলে গেল রানা। সিধে হতেই দেখতে পেল, গার্ড লোকটা হাতে অ্যাসল্ট রাইফেল নিয়ে ফাটলের মুখে ওদের জন্য অপেক্ষা করছে—একা। চাইলে এতক্ষণে দুজনকেই গুলি করে ফেলে দিতে পারত, না-করার কারণ একটাই হতে পারে—ওদেরকে জ্যান্ত ধরে নিয়ে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে ওকে, খুন

করতে নয়। ঢিলদুটো সম্ভবত ইচ্ছে করেই মিস করেছে সে। মনটা খুশি হয়ে উঠল রানার, ভাল একটা জায়গাই বেছেছে পাহাড়ে চড়বার জন্য। এখান থেকে চেঁচিয়ে সঙ্গীসাথীদেরকে ডাকতে পারবে না গার্ড, শুনতেই পাবে না কেউ। রি-এনফোর্সমেন্ট চাইলে দৌড়ে মঠে যেতে হবে ব্যাটাকে, সময়টা গা-ঢাকা দেবার জন্য ব্যবহার করতে পারবে দিনা আর ও।

'চুপচাপ পড়ে থাকো,' পিছনে তাকিয়ে বলল রানা। 'আমি না ডাকলে নোড়ো না।'

ফাটলের ভিতরকার ছায়ায় মিশে গিয়ে উঠতে শুরু করল ও, খুব দ্রুত এগোচ্ছে। গার্ডকে একটু ঝুঁকে পড়তে দেখল, ওকে ঠিকমত দেখার চেষ্টা করছে। সঙ্গে পিস্তল আছে, লোকটাকে গুলি করার ইচ্ছে হলো রানার, তবে আওয়াজটাতে মঠের সমস্ত টেরোরিস্ট সতর্ক হয়ে যাবে। বিকল্প পন্থাটা ভাবতেই মুখে একটা নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠল ওর, আস্তে করে শার্টের ভিতর থেকে বের করে আনল একটা *জিয়োলজিস্ট'স্ হ্যামার*—রওনা হবার আগে ন্যাপস্যাক থেকে নিয়ে নিয়েছিল। হাতুড়িটার একটা মাথা অত্যন্ত ছুঁচালো, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পাথর ভাঙার জন্য ডিজাইন করা। ওই প্রান্তটা শত্রুর দিকে তাক করল ও, তারপর কাছাকাছি পৌঁছে নিখুঁত নিশানায় থ্রো করল।

আবছা অন্ধকারে জিনিসটা দেখতে পায়নি গার্ড, যখন পেল, তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে। পাক খেয়ে সোজা তার দিকে ছুটে এল ওটা, ছুঁচালো দিকটা ঘ্যাচ করে বিঁধে গেল গলায়। চিৎকার দিতে চাইল টেরোরিস্ট, পারল না। ধমনী ছিঁড়ে বেরুতে থাকা রক্তে কণ্ঠনালী ভরে গেছে, ঘড় ঘড় করে আওয়াজ হলো শুধু। দুনিয়া আঁধার হয়ে গেল চোখের সামনে, ঝুঁকে থাকা অবস্থা থেকে সোজা ফাটলের ভিতরে পড়ে গেল সে। এখানে-ওখানে ড্রপ খেতে খেতে নেমে এল নীচের দিকে।

'সাবধান!' চেঁচাল রানা। একটু সরে গিয়ে দেহটার সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াল ও, দেখাদেখি দিনাও। ঢালু জায়গাটা পেরিয়ে ফাটলের খাড়া অংশে চলে গেল গার্ড, সেখান থেকে একেবারে নীচে, মরুভূমির মেঝেতে আছড়ে পড়ল।

কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল রানা, কিন্তু ফাটলের মুখে আর কাউকে উদয় হতে দেখল না। দিনাকে ডাক দিয়ে আবার উঠতে শুরু করল, খানিকক্ষণের মধ্যেই ফাটল থেকে বেরিয়ে এল ক্লিফের চূড়ায়। গার্ডের রাইফেলটা পড়ে থাকতে দেখল ফাটলের মুখের কাছে, হাতে তুলে নিল ওটা। একটু পর যোগ দিল দিনা ওর সঙ্গে।

'এবার কী?'

'দুঃখিত, ক্লিফে ওঠা পর্যন্তই প্ল্যান করেছিলাম নীচে থাকতে।' দিনাকে পিস্তলটা দিল রানা। নিজে রাখল এ.কে-ফোরটি সেভেন অ্যাসল্ট রাইফেলটা।

দূরে, মঠের দুর্গের মত দেয়াল আলোকিত করে রেখেছে কয়েকটা গাড়ির জোরালো হেডলাইট। মাঝে মাঝে আলোর ধারার সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে মানুষ, তাতে ছায়া পড়ছে দেয়ালের গায়ে। তিনটে পিকআপ-ট্রাক নজরে পড়ল রানার, তার মানে অন্তত এক ডজন সুদানিজ দস্যু হাজির হয়েছে মঠে।

এ.কে-ফোরটি সেভেনের ব্যানানা ম্যাগাজিনে ত্রিশ রাউণ্ড অ্যামিউনিশন থাকে, রানা বুঝতে পারল—প্রতিটা বুলেট হিসেব করে খরচ করতে হবে ওকে।

'যদ্দূর বুঝতে পারছি, চুপিসারে হামলা করতে হবে,' বলল ও। 'ওদেরকে ঘায়েল করতে হবে সুযোগ বুঝে।'

'প্রথম গুলিটা করার সঙ্গে সঙ্গে ওরা টের পেয়ে যাবে, কী ঘটছে,' মনে করিয়ে দিল দিনা।

'তা অবশ্য ঠিক। তবে যা-ই করতে চাই, আমাদেরকে আগে কাছাকাছি পৌছতে হবে। চলো।'

ক্লিফের কিনারা ঘেঁষে এগোতে শুরু করল ওরা, ছায়ায় মিশে। বিল্ডিঙের ত্রিশ গজের মধ্যে পৌঁছুতেই দেখতে পেল প্রতিপক্ষকে। কমপক্ষে দশজন সৈনিক, ট্রাকগুলোকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। মঠের দেয়ালের পাশে লাইন ধরে দাঁড় করানো হয়েছে সন্ন্যাসীদেরকে—তাদের কালো মুখগুলো ঘামে ভেজা, আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে আছে চোখ। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল দুজনে, কী ঘটে দেখতে চায়।

হঠাৎ সৈনিকদেরকে সটান দাঁড়িয়ে যেতে দেখল ওরা, নতুন চারজন মানুষ উদয় হলো আলোকিত জায়গাটাতে। ওদের একজন শ্বেতাঙ্গ। চালচলনে সহজাত নেতৃত্বের ছটা বেরুচ্ছে। কপালে ভাঁজ পড়ল রানার, কে এই লোক?

সৈনিকদের দিকে ফিরে কী যেন নির্দেশ দিল সাদা চামড়ার লোকটা, পাশে দাঁড়ানো একজন অনুবাদ করে শোনাল সেটা। পরমুহূর্তে কয়েকজন লোক উঠে পড়ল একটা ট্রাকে, ওটা নিয়ে রওনা হয়ে গেল ক্লিফ থেকে নামার রাস্তা ধরে। নিশ্চয়ই ওদের দুজনের খোঁজে নীচে যাচ্ছে। সাদা লোকটা ফিরে গেল মঠে, পিছন পিছন বন্দি সন্ন্যাসীদেরকে খেদিয়ে নিয়ে চলল তার চ্যালা-চামুণ্ডারা।

রানার নজর কাড়ল একজন সৈনিক, হাতে ফ্ল্যাশলাইট আর অ্যাসল্ট রাইফেল নিয়ে এগিয়ে আসছে ক্লিফের কিনারায়—সম্ভবত আরেকজন গার্ড। দিনাকে নিয়ে একটা খাদের মধ্যে শুয়ে পড়ল রানা, ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় ওদেরকে যেন দেখতে না পায় লোকটা।

প্রতিপক্ষের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন নয় নতুন গার্ড। অলস ভঙ্গিতে আলো ফেলতে ফেলতে হাঁটছে। রানার লুকিয়ে থাকা খাদটা পেরিয়ে চলে গেল, ভিতরে আলো ফেলল না। ক্লিফের কিনারে গিয়ে থামল সে। রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে একটা সিগারেট ধরাল, টানছে আয়েশ করে। মাথা তুলে রানা দেখল, ওর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। সন্তর্পণে খাদ থেকে বেরিয়ে এল ও, পায়ের পাতায় ভর দিয়ে ছুটে গেল শিকারের কাছে। পিছন থেকে খপ্ করে ওর চুল চেপে ধরল রানা, অপর হাতের তালু ঠেকাল চিবুকে, তারপর প্রচণ্ড এক ঝটকায় মটকে দিল ঘাড়। নিঃশব্দে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল লাশটা।

দিনাকে নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল রানা। একটু ঘুরে অন্যদিক হয়ে মঠের দিকে এগোচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে সুদানিজদের শ্বেতাঙ্গ নেতার কথা ভাবল ও—কে হতে পারে লোকটা? মুহূর্তেই পেয়ে গেল জবাব। এ-ই সেই নাটের গুরু, রহস্যময় ইটালিয়ান! ভ্যালি অভ ডেড চিলড্রেনে পাওয়া শূন্য খনিটার কথা

মনে পড়ল, ইটালিয়ান উপনিবেশ আমলে খোঁড়া হয়েছিল ওটা, বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল তাড়াহুড়ো করে। এই লোক নিশ্চয়ই ওটার সঙ্গে কোনোভাবে জড়িত, পূর্বপুরুষদের অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে এসেছে।

মনে মনে নিজেকে গাল দিল রানা—এক অর্থে পথ দেখিয়ে ও-ই উপত্যকায় নিয়ে গেছে এদের। এমনকী খোঁড়াখুঁড়ির জন্য শ্রমিকও জোগাড় করে দিয়েছে। কিন্তু কথা হলো, ও যে ইরিত্রিয়ায় খনির খোঁজে আসছে, সেটা এই ইটালিয়ান জানল কীভাবে? অনেক ভেবেও বের করতে পারল না জবাবটা।

কিছুক্ষণের মধ্যে মঠের পিছনের সবজি খেতে পৌঁছে গেল ওরা। একটু থেমে সামনেটা দেখে নিল রানা, কিন্তু কোনও প্রহরী চোখে পড়ল না। এদিক দিয়ে কেউ আসতে পারে, সেটা ভাবেইনি বোধহয় প্রতিপক্ষ। নিশ্চিন্ত হয়ে একছুটে খেতটা পেরুল দুজনে, উঠে পড়ল মঠের পিছনের বারান্দায়। খোলা একটা জানালা পেতে সময় লাগল না, চৌকাঠ টপকে ভিতরে ঢুকে পড়ল ওরা।

রানার কামরাটার মতই আরেকটা কামরা—সাজসজ্জা হুবহু এক। সিঙ্গেল খাট, পড়ার টেবিল আর দেয়ালে ক্রুশ। সাবধানে দরজা খুলে কান পাতল রানা। কয়েকটা কণ্ঠে গমগম করছে মঠের অভ্যন্তর। হুঙ্কার শোনা গেল, তারপর গোঙানি—সন্ন্যাসীদের উপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে। হুঙ্কার ছাড়তে থাকা কণ্ঠটা কী বলছে পরিষ্কার বোঝা গেল না দূরত্বের কারণে; তবে বোঝা গেল, ভাষাটা ইটালিয়ান। হাতছানি দিয়ে দিনাকে কাছে ডাকল ও। দিনার শ্রবণশক্তি ওর চেয়ে ভাল। মেয়েটা ইটালিয়ানও জানে, সেদিন ব্রাদার অব্রাহামের গুহায় ইটালিয়ানে অনূদিত শেক্সপিয়ারের বই পড়ে শোনাতে চাইছিল।

'শোনো তো, কী নিয়ে কথা হচ্ছে বুঝতে পারো কি না।'

চুপ করে কিছুক্ষণ শুনল দিনা, তারপর বলল, 'ব্রাদার অব্রাহামকে জেরা করা হচ্ছে। জানতে চাইছে, তুমি কোথায়। মনে হচ্ছে—যতবার তিনি জানেন না বলছেন, ততবারই দলের আরেক প্রিস্টকে মারধর করছে ওরা। দয়ামায়া দেখাচ্ছে না। ইটালিয়ান লোকটা ভেনিশিয়ান উচ্চারণে কথা বলছে, গলা শুনে মনে হলো, খুবই একরোখা মানুষ। তোমার খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত টর্চার চালিয়ে যাবে। কী করা যায়, রানা?'

রানার চোখ রাগে জ্বলছে। পেয়েছেটা কী এরা? ভেবেছে যা-খুশি-তাই করতে পারবে? এরই মধ্যে একজন সন্ন্যাসীকে খুন করেছে ওরা। এ-অনাচার অনির্দিষ্ট কাল চলতে দেয়া যায় না।

'থামাব ওদেরকে,' থমথমে গলায় বলল ও। 'এসো, আমাকে কাভার দাও।'

দরজা খুলে করিডোরে বেরুতেই একজন সুদানিজের সামনে পড়ে গেল ওরা। হতচকিত লোকটা কাঁধের রাইফেল নামাতে গেল, কিন্তু রানা সে-সুযোগ দিল না। হাতের এ.কে.-ফোরটি সেভেনটা সজোরে মুগুরের মত চালাল। শক্ত বাটের আঘাতে চোয়ালের হাড় চুরমার হয়ে গেল টেরোরিস্টের, হাঁ হয়ে যাওয়া মুখ থেকে বেরিয়ে এল রক্ত আর ভাঙা দাঁতের একটা দলা। দেয়ালের উপর আছড়ে পড়ে জ্ঞান হারাল সে।

বিদ্যুৎবেগে এগোল রানা। ফাঁকা করিডোর ধরে ছুটল হাঁকডাকের উৎসের দিকে। একটু পরেই পৌঁছে গেল ডাইনিং হলের দরজায়। পাল্লাটা একটু ফাঁক হয়ে আছে, সেখান দিয়ে উঁকি দিল ভিতরে।

ইন্টারোগেশনের দিকে মনোযোগী থাকায় করিডোরের সংঘর্ষ, কিংবা দুই পলাতকের ছুটে আসার শব্দ শুনতে পায়নি কেউ। ব্রাদার আব্রাহামকে দেখতে পেল রানা, হাঁটু গেড়ে বসে আছেন রক্তাক্ত আরেকজন সন্ন্যাসীর পাশে। উপর্যুপরি আঘাতে আহত মানুষটির নাক আর ঠোঁট থেঁতলে দেয়া হয়েছে। বাকি সন্ন্যাসীরাও হলঘরে উপস্থিত, একপাশের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরা, বেশ কয়েকজন সুদানিজ সৈন্য অস্ত্র তাক করে রেখেছে তাঁদের দিকে। আর সবকিছুর মূলে যে-লোকটি, সেই ইটালিয়ান নেতা কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজা বরাবর একটু সামনে, রানার দিকে পিঠ দিয়ে।

দাঁতে দাঁত পিষল রানা, পাল্লাটা নিঃশব্দে সরিয়ে ঢুকে পড়ল ডাইনিং হলে। একজন সুদানিজ দেখতে পেল ওকে, তবে তখন দেরি হয়ে গেছে। খপ্ করে ইটালিয়ান নেতার কোটের কলার পিছন থেকে মুঠো করে ধরল ও, রাইফেলের মাজল ঠেকাল লোকটার শিরদাঁড়ায়।

চমকে গেল ইটালিয়ান লোকটা। চেঁচিয়ে উঠল, 'হিলাল!'

ঝট্ করে ওদের দিকে ঘুরল এক সুদানিজ যোদ্ধা, হাতের অ্যাসল্ট রাইফেল ছেড়ে দিয়ে কোমরের হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল, লক্ষ্যস্থির করল রানার কপালে, হ্যামার টানল।

'দিনা!' রানাও হাঁক ছাড়ল।

নিঃশব্দে দরজা পেরিয়ে হলঘরে ঢুকল দিনা। নিজের পিস্তল তাক করল হিলালের দিকে।

'ওকে অস্ত্র নামাতে বলো,' শীতল গলায় পরিষ্কার ইংরেজিতে নিজের জিম্মিকে বলল রানা। 'আর একটা অস্ত্রও যদি এদিকে ঘোরানো হয়, তা হলে তোমার নাড়িভুঁড়ি সামনের মেঝেতে গড়াগড়ি খাবে।' হুমকিটাকে জোরালো করার জন্য ব্যারেলটা আরেকটু চেপে ধরল ও।

আশ্চর্যের ব্যাপার, ইটালিয়ান লোকটা মোটেই নার্ভাস হলো না। হালকা গলায় বলল, 'এটাকে বোধহয় *স্ট্যাণ্ডঅফ* বলা হয়, তাই না?' গলায় ভীতির কোনও রেশ নেই। 'ব্যাপারটার ইতি ঘটাই, কী বলেন, মি. রানা?'

পরমুহূর্তে একটা গুলির শব্দ হলো। নিল-ডাউন ভঙ্গিতে বসে থাকা ব্রাদার আব্রাহাম ঝাঁকি খেলেন, তাঁর বুকে একটা ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। উল্টে মেঝেতে পড়ে গেলেন তিনি। কোটের পকেটে লুকিয়ে রাখা পিস্তল থেকে ফায়ার করেছে ইটালিয়ান লোকটা। হাসিমুখে বলল, 'গো অ্যাহেড, মি. রানা। গুলি করুন। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের কারও কোনও লাভ হবে না।'

জবাব দিতে পারল না রানা, ঘটনার আকস্মিকতায় স্থবির হয়ে গেছে ও। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেঝেতে পড়ে থাকা প্রধান সন্ন্যাসীর দিকে। বেদনার্ত ভঙ্গিতে শ্বাস ফেলছেন আব্রাহাম, দু'হাতে চেপে ধরেছেন বুকের ক্ষত,

আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে।

'এখানে আরও এক ডজন সন্ন্যাসী আছে, মি. রানা,' থমথমে গলায় বলল ইটালিয়ান নেতা। 'গ্যারান্টি দিতে পারি, আমাকে গুলি করার পর পাঁচ সেকেণ্ডও বাঁচবে না ওরা।'

নীচের ঠোঁট কামড়াল রানা, প্রাণের পরোয়া না করে ভাল একটা চাল দিয়েছে লোকটা। শয়তানটাকে খুন করতে পারে ও, তবে তারপর দিনাকে সহ নিজেও মরবে। মারা পড়বে নিরীহ সন্ন্যাসীরাও। তাতে কারও কোনও লাভ হবে না। হতাশায় ছেয়ে গেল রানার মনটা, বুঝতে পারছে—হার না মেনে উপায় নেই। আত্মসমর্পণ করলে পরে হয়তো একটা সুযোগ পাওয়া যেতে পারে প্রতিশোধ নেবার। জিম্মির কলার ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে গেল ও, হাত থেকে ফেলে দিল রাইফেলটা।

ঘোঁত ঘোঁত জাতীয় একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল হিলালের মুখ দিয়ে। লড়াইটা না হওয়ায় খুব হতাশ হয়েছে। রানার দেখাদেখি দিনাও ফেলে দিয়েছে পিস্তল, পায়ে পায়ে দুজনে এগিয়ে গেল ব্রাদার অব্রাহামের দিকে। কেউ বাধা দিল না। হাঁটু গেড়ে বসল ওরা মৃত্যুপথযাত্রী মানুষটার দু'পাশে। মাথাটা তুলে কোলে রাখল দিনা। হিলাল এগিয়ে গিয়ে মেঝে থেকে ওদের অস্ত্রদুটো তুলে নিল।

'আ... আমি দুঃখিত!' ফিসফিস করে বলল রানা, নিজের কানেই ফাঁপা ঠেকল ক্ষমাপ্রার্থনাটা।

ওর দিকে মায়াভরা দৃষ্টিতে তাকালেন প্রবীণ সন্ন্যাসী, দু'হাতে চেপে ধরলেন ওর হাত। অস্পষ্ট গলায় বললেন কিছু, তারপর এলিয়ে পড়লেন। হাতদুটো আলগা হয়ে খসে পড়ল মেঝেতে।

বুকটা খাঁ খাঁ করে উঠল। দিনার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'কী বললেন উনি?'

'খনির বাচ্চাদের কথা,' ধরা গলায় জানাল দিনা। 'ওরা নাকি মারা গেছে...' কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল ওর।

'কীসে? বলো দিনা!'

'ঠিক বুঝলাম না। মনে হলো, পাপের কারণে ওরা মারা গেছে বললেন। সিন...'

আর কথা বলার সুযোগ পেল না ওরা। দুজন সৈনিক এসে টান দিয়ে দাঁড় করাল ওদেরকে। ইটালিয়ান নেতা বলল, 'যথেষ্ট সময় নষ্ট হয়েছে আজ রাতে। মি. রানা, গত দু'দিন ধরে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি আমি—প্রাচীন খনিটার ব্যাপারে কয়েকটা প্রশ্নের জবাব জানার জন্য।'

রানা আন্দাজ করল, খনিটার মুখ খুলে ফেলেছে লোকটা; তবে ওটা যে আসলে কী, তা জানে না। বলল, 'কী জানতে চান আপনি?'

'ওই খনির ইতিহাস। এখানে আসার আগে যতটুকু দেখেছি, তাতে বোঝা গেছে—বহুদিন আগেই সারফেসের কাছাকাছি সমস্ত হীরা বের করে নেয়া হয়েছে। রয়ে গেছে শুধু খালি টানেল... ওভার-বারডেনের ডাস্ট ভরে সিল করে

দেয়া হয়েছে সব। আমরা থই খুঁজে পাচ্ছি না। এখন আপনার এক্সপার্টিজ দরকার। মেডিউসা-ফটোগ্রাফ দেখে আপনি আমাকে জানাবেন, ঠিক কত গভীরে... এবং কোন্-জায়গায় গেলে হীরা ভর্তি কিম্বারলাইট পাইপটার নাগাল পাওয়া যাবে আবার। সেই মোতাবেক টানেল রি-ওপেন করব আমরা।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। হার মানার ভঙ্গিতে বলল, 'ঠিক আছে, কিন্তু তার আগে আপনার পরিচয়টা জানা দরকার আমার।'

'আমার নাম মার্সেলো মানসিনি,' মৃদু হেসে বলল ইটালিয়ান টাইকুন। 'হীরাবিহীন যে-খনিটা আপনি আবিষ্কার করেছেন, ওটা আমার এক পূর্বপুরুষ খুঁড়েছিলেন। যতদূর বুঝেছি, ভদ্রলোকের হিসেবে ভুল ছিল। অ্যাকচুয়াল পজিশনের কয়েক মাইল দক্ষিণে খোঁড়াখুঁড়ি করায় ব্যর্থ হয়েছিলেন তিনি।'

'ওখানে পাইকারী হত্যার আলামত পেয়েছি আমি,' থমথমে গলায় বলল রানা। 'কয়েকশো মাইনারের লাশ পড়ে আছে টানেলের ভিতরে। কীর্তিটা তা হলে আপনার ওই পূর্বপুরুষের?'

'আসলে বেচারার কপালটাই মন্দ ছিল,' বলল মানসিনি। 'প্রসপেক্টিঙের নেশার পিছনে অনেক টাকা খরচ করেছেন, কিন্তু সফল হননি কোনও প্রজেক্টেই। তাঁর বড় ভাই... মানে, আমার পিতামহ খুব খেপে গিয়েছিলেন সে-কারণে। মানা করে দিয়েছিলেন উদ্ভট নেশার পিছনে ছুটতে। তারপরও গোপনে ওই খনিটা খোঁড়েন তিনি, ভেবেছিলেন হীরা উদ্ধার করে ভাইকে দাঁত-ভাঙা জবাব দেবেন। কিন্তু বেচারার প্ল্যানটা মাঠে মারা পড়ে। হীরা পাননি, অন্যদিকে ব্রিটিশরাও ইরিত্রিয়ায় ঢুকে পড়েছে... সে-অবস্থায় নিজের ব্যর্থ-প্রচেষ্টা, সেইসঙ্গে পটেনশিয়াল ওই সাইটটার কথা ধামাচাপা দেয়ার জন্য একমাত্র পথটাই বেছে নেন তিনি। খনির সঙ্গে জড়িত সবার মুখ চিরতরে বন্ধ করবার ব্যবস্থা করেন। তবে আমার বেলায় অমন কিছু ঘটাতে হবে না বলে আশা করছি। কিম্বারলাইট পাইপটা খুঁজে বের করব আমি, মি. রানা; আর আপনি তাতে আমাকে সাহায্য করবেন!'

হঠাৎ করেই রানা বুঝতে পারল, মরার সময় ব্রাদার আব্রোহাম কোন্ পাপের কথা বলেছেন। মার্সেলো মানসিনির প্রতিটা আঁশে আঁশে মিশে আছে ওটা, ভদ্রলোকী চেহারা আর পোশাকের তলা থেকে উঁকি দিচ্ছে হিংস্র পশুর মত। এ হচ্ছে ভয়ঙ্করতম পাপগুলোর একটি—লোভ! মানুষের লোভ-ই খুন করেছে হতভাগ্য শিশুদেরকে, আর কিছু নয়।

তেরো

হাত-পা বেঁধে একটা ট্রাকের পিছনে তোলা হলো রানাকে, সহযাত্রী হলো ভারী অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত জনা-ছয়েক সুদানিজ সৈন্য। মানসিনি কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। দিনাকে নিজের সঙ্গে আরেকটা ট্রাকের ক্যাবে ওঠাল—সম্ভবত

সৈন্যদের হাতে সম্ভ্রমহানি ঠেকাবার জন্যই। কাজটার পিছনে সৎ-উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হলো না রানার, সুন্দরী মেয়েটাকে নিজেই ভোগ করবার মতলবে আছে হয়তো, তাই চ্যালা-চামুণ্ডাদের ভাগ দিতে চাইছে না।

মানসিনি নামটা অপরিচিত নয় রানার কাছে। পরিবারটা ইয়োরোপের ব্যবসায়িক ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে বহুকাল থেকে, খ্যাতিতে রথসচাইল্ড পরিবারের চাইতে কোনও অংশে কম নয়। পার্থক্য শুধু এটুকুই যে, মানসিনিদের ধনসম্পদের মাঝে মিশে আছে মানুষের রক্ত। ইয়োরোপের অগণিত যুদ্ধ ওদের টাকায় সংঘটিত হয়েছে, বিশ ও ত্রিশের দশকে ফ্যাসিস্ট আন্দোলনের সঙ্গেও জড়িত ছিল ওরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আবার ভোল পাল্টে চলে গিয়েছিল আমেরিকার ছত্রছায়ায়, কমিউনিজম-বিরোধী চালচলনের মাধ্যমে। বিখ্যাত এ পরিবারটার বর্তমান প্রধানের ব্যাপারে অবশ্য বিশেষ কিছু জানে না ও, তবে যে-বংশের রক্ত বইছে মার্সেলোর শরীরে, তাতে ভাল কিছু আশা করাটা ভুল। আজ রাতে চোখের সামনে সেটার জলজ্যান্ত প্রমাণ পাওয়া গেছে।

সূর্য ওঠার কয়েক ঘণ্টা পর ভ্যালি অভ ডেড ছিনজেলে পৌঁছুল ট্রাকের বহরটা। গিরিখাদ পেরিয়ে মোড় নিল, ছুটে চলল সোজা প্রাচীন খনিটার দিকে। খানিক পর যখন থামল, তখন সবগুলো ট্রাক থেকে নেমে এল সৈন্যরা, অস্ত্র তাক করে নামানো হলো রানা আর বন্দি সন্ন্যাসীদেরকে গৃহত্যাগী মানুষগুলো অযথা অন্ন ধ্বংস করছে, তাই শ্রমিক হিসেবে খাটাবার জন্য নিয়ে আসা হয়েছে।

চোখ পিট পিট করে চারদিকে তাকাল রানা। শেষবার দেখার পর খুব বেশিদিন কাটেনি, তারপরও আমূল বদলে গেছে জায়গাটা। আগের চেহারার সঙ্গে বিন্দুমাত্র মিল নেই। প্রচণ্ড আওয়াজ হচ্ছে চারপাশে, কানের উপর অত্যাচারের মত ঠেকছে সেটা। ট্রাক-মাউন্টেড দুটো ভারী জেনারেটর চোখে পড়ল খনির কাছে, এ ছাড়াও রয়েছে দুটো বুলডোজার, বেশ কয়েকটা ববক্যাট স্কিপলোডার আর রানার ভাড়া করা কাটারপিলার এক্সকাভেটরটা—সমান তালে চলছে সবগুলো। একটা ইঙ্গারসল র‍্যাণ্ড রোটারি ড্রিল-রিগও বসানো হয়েছে—ওটা মাটির ভিতর থেকে কোর-স্যাম্পল তুলে আনছে। গোটা জায়গা ধুলোয় আচ্ছন্ন, তার ভিতর জনা-পঞ্চাশেক কৃষকায় শ্রমিক কোদাল, শাবল আর বাস্কেটের সাহায্যে মাটি সরাচ্ছে, স্তূপ করে রাখছে একপাশে।

স্তূপের আকার দেখে বিস্মিত হলো রানা, পাহাড়ের ঢালটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ধসিয়ে দেবার সময় মনে হয়নি এত মাটি-পাথর আছে ওখানে। খনিমুখের সামনে থেকে সরিয়ে সামান্য দূরে যেখানে জড়ো করা হয়েছে, সেখানে রীতিমত নতুন একটা টিলার জন্ম হয়েছে। মাত্র কয়েকদিনে এই পরিমাণ জঞ্জাল সরাতে নিঃসন্দেহে প্রচুর খাটতে হয়েছে সবাইকে।

পাহাড়ের ঢালটা যেখানে ছিল, সেদিকে চোখ ফেরাতেই কাঙ্ক্ষিত খনিমুখটা দেখতে পেল রানা। কালো একটা গহ্বর, পাহাড়ের ভিতরদিকে চলে গেছে। মোটামুটি চওড়াই বলা চলে, স্কিপলোডারগুলো ভিতরে ঢুকে জঞ্জাল-বারজেনের ডাস্ট নিয়ে ফিরে আসতে পারছে। বেশ ভাল গতিতেই কাজ চলছে এখানে।

নিজের ভাড়া করা হাইড্রলিক শোভেল-টার কথা ভাবল রানা, ওটা যদি এরা নিয়ে আসতে পারে, তা হলে আরও দ্রুতবেগে এগোতে পারবে।

ইতোমধ্যে রানার বাঁধন খুলে দেয়া হয়েছে, পিঠে সঙ্গীনের খোঁচা দিয়ে হাঁটতে ইশারা করল ওকে এক সৈনিক। মানসিনি খনিমুখের কাছে ওর জন্য অপেক্ষা করছে। হাঁটতে হাঁটতে একজন গার্ডের উপর নজর আটকে গেল রানার, টলমল পায়ে এগোতে থাকা এক শ্রমিকের পাছায় লাথি হাঁকছে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল দুর্বল মানুষটা, মাথার উপর থেকে ছিটকে গেল ময়লাভর্তি ঝুড়ি। কাছে এসে শ্রমিকটির পেটে মাথায় আরও কয়েকটা লাথি হাঁকল গার্ড, কুঁকড়ে গোল হয়ে গেল বেচারা। গার্ড সরে যেতেই তাড়াতাড়ি আবার ঝুড়িটা ভরে মাথায় তুলে নিল, চেষ্টা করল দ্রুত হাঁটতে। ওর সাহায্যে এগিয়ে এল না কেউ। বাঁচার তাগিদে সবাই নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত, আর কারও দিকে তাকাবার উপায় নেই।

ক্রীতদাস প্রথা ফিরে এসেছে ভ্যালি অভ ডেড চিলড্রেনে।

'কী বুঝছেন, মি. রানা?' ওকে কাছাকাছি পৌঁছুতে দেখে বলে উঠল মানসিনি। দিনা তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে, আর আছে বিশালদেহী আরেক শ্বেতাঙ্গ—চওড়া কাঁধ, পেটা শরীর। 'ইম্প্রেসিভ অ্যারেঞ্জমেন্ট, স্বীকার করবেন নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ, মানছি,' বলল রানা। টিটকারির ঝোঁকটা দমাতে পারল না, 'তবে ওয়ার্কারদের সঙ্গে যে-ধরনের আচরণ করা হচ্ছে, তাতে শ্রম-আদালতে মামলা খাবেন নির্ঘাত!'

উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল ইটালিয়ান টাইকুন। 'সত্যিই, আপনার সেন্স অভ হিউমারের প্রশংসা না করে পারছি না। আসুন, পরিচয় করিয়ে দিই।' বিশালদেহীকে দেখাল সে। 'এ হচ্ছে ওয়ালেস মায়ার, আমার মাইনিং-সুপারভাইজর। ওয়ালেস, ইনিই মাসুদ রানা—বিখ্যাত প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর কাম আর্কিয়োলজিস্ট।'

হাত মেলাল না দক্ষিণ আফ্রিকান সুপারভাইজর, তবে তার চোখে সমীহ ফুটে উঠল। মনে হলো, রানার নাম শুনেছে সে আগে।

'খনি সম্পর্কে কিছু শোনার আগে ভিতরে একটা চক্কর দিয়ে এলে কেমন হয়?' বলল মানসিনি। 'আমি যাবার পর কাজ কতটা এগিয়েছে, সেটাও দেখা হয়ে যাবে।'

'আমার আপত্তি নেই,' রানা বলল।

'তা হলে আসুন।'

খনির মুখটা ছ'ফুট উঁচু, চওড়ায়ও একই সমান। ঢোকা আর বেরুবার সময় স্কিপলোডারগুলো ছাদে ঘষা খেয়েছে, সেখানে শুকনো পেইন্টের চলটা লেগে থাকতে দেখা গেল। একজন গার্ড দৌড়ে গিয়ে মানসিনি আর ওয়ালেসকে দুটো মাইনিং হেলমেট এনে দিল। বলা বাহুল্য, রানা আর দিনার মাথা খালি থাকল।

হাঁটতে হাঁটতে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে নিয়োগকর্তাকে ব্রিফ করল দক্ষিণ আফ্রিকান ওয়ালেস। টানেল থেকে আরও সত্তর ফুটের মত ওভার-বারডেন

সরিয়েছি আমরা। তবে যতই ভিতরে যাচ্ছি, জঞ্জালটা ততই জমাট বাঁধা অবস্থায় পাচ্ছি। মনে হচ্ছে যারা খনিটা সিল করে দিয়েছিল, তারা চায়নি, এটা আর কখনও খোলা হোক। যে-অবস্থা দেখছি, তাতে খোঁড়াখুঁড়ির জন্য খুব শীঘ্রি ব্লাস্টের প্রয়োজন পড়বে।'

'টানেলের স্লোপে কোনও ধরনের ডেভিয়েশন পেয়েছ?' জিজ্ঞেস করল মানসিনি।

'নাহ্। এখনও পনেরো ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে নীচে নামছে। একটু অপেক্ষা করুন, আপনি নিজেই দেখতে পাবেন।'

টানেলের বিশফুট ভিতরে গিয়ে হেলমেটের হেডল্যাম্প জ্বালল মানসিনি আর ওয়ালেস। জমাট বাঁধা অন্ধকার ভেদ করে সামনে চলে গেল দুটো আলোকরশ্মি। তারপরও পুরোপুরি আলোকিত হলো না জায়গাটা, স্কিপলোডারের একজস্টের কারণে বাতাসও ভারী হয়ে আছে। কিছুদূর যেতে ছাদ নিচু হতে শুরু করল, ফলে মাথা একটু নুইয়ে হাঁটতে হলো রানাকে। ও আর দিনা অনুসরণ করছে মানসিনি-ওয়ালেসকে, পিস্তল হাতে দুজন গার্ড রয়েছে ওদের পিছনে।

পঁচিশ মিনিটের মত হাঁটল দলটা। রানা আন্দাজ করল, অন্তত দেড় মাইল ভিতরে ঢুকে পড়েছে ওরা। মাঝে মাঝে থেমে দাঁড়াচ্ছে ও, দুই গার্ডের হাতে ধরা ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় টানেলের দেয়াল আর ছাদ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। গার্ডরা ধমকে উঠলে ফের শুরু করছে হাঁটতে।

'কী খুঁজছ?' ফিসফিসিয়ে জানতে চাইল দিনা।

'পালাবার পথ,' সংক্ষেপে জবাব দিল রানা।

পিছনদিকে এক পলকের জন্য তাকাল দিনা কথাটা শুনে। পাথরের তৈরি একটা কফিনের মত লাগল জায়গাটাকে, কেঁপে উঠল বুক।

চওড়া একটা কার্নিশের উপর এসে শেষ হলো টানেলটা। ওটার নীচে একটা বিশাল ফাঁকা জায়গা, কিম্বারলাইট পাইপের ফরমেশনের কারণে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে। দেখতে এখন একটা গম্বুজ আকৃতির গ্যালারির মত লাগছে—মনুষ্য-নির্মিত। প্রায় তিনশো ফুট ডায়ামিটার। বুঝতে অসুবিধে হলো না, এটাই প্রাচীন খনির মূল ওয়ার্কিং স্পেস। লাখ লাখ বছর আগে অবিশ্বাস্য তাপ আর চাপে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে এ-পথেই উঠে এসেছিল গ্যাস, তরল পাথর আর কার্বনের মিশ্রণ; ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বেঁধেছিল। হীরা বের করার জন্য পরে শাবল-গাঁইতির সাহায্যে খোঁড়া হয়েছে জায়গাটা, ধীরে ধীরে একটা গ্যালারির আকৃতি পেয়েছে।

গুমগুম করে একটা জেনারেটর চলছে কার্নিশের এক প্রান্তে, সেখান থেকে লাইন নিয়ে নীচে গ্যালারির মেঝেতে জ্বালানো হয়েছে অনেকগুলো ট্রাইপড-মাউন্টেড হ্যালোজেন ল্যাম্প, ভূ-গর্ভের গুহাটার প্রতিটা ইঞ্চি আলোকিত করে তোলা হয়েছে। মেঝেতে দাবার বোর্ডের মত চতুষ্কোণ গ্রিড দেখা গেল, কাজের সুবিধের জন্য প্রাচীন খনি-শ্রমিকেরা সম্ভবত ভাগ করে নিয়েছিল মেঝেটা। কয়েকটা অংশ অন্যগুলোর চাইতে গভীর, তলা বোঝা যাচ্ছে

না। কী পরিমাণ আকরিক এখান থেকে তোলা হয়েছে, অনুমান করা কঠিন। তবে চেম্বারটার আকৃতি দেখে মনে হচ্ছে না, এতে কয়েকশো বছর কাজ করা হয়েছে। ব্রাদার অব্রাহাম নিশ্চয়ই ভুল ধারণা করেছিলেন।

'মাই গড!' নীচের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল মানসিনি। 'এ তো দেখছি ব্লু-গ্রাউণ্ড!' নিশ্চিত হবার জন্য সুপারভাইজরের দিকে তাকাল, মুচকি হেসে মাথা ঝাঁকাল ওয়ালেস।

চেম্বারের মেঝেটা ডায়মণ্ডের আলট্রামিফিক লোডস্টোনে গড়া। স্টকটার সত্যিকার মূল্য জানতে স্যাম্পল অ্যানালিসিস করতে হবে, বের করতে হবে কিম্বারলাইট আর হীরার অনুপাত; তবে এটা বলা নিরাপদ যে, বিশাল এক গুপ্তধনের উপর দাঁড়িয়ে আছে ওরা। ইরিত্রিয়ার জনগণ যার মালিক। রানা বুঝতে পারছে, জলদি কিছু করতে না পারলে অভাবী মানুষের বদলে এই গুপ্তধন সোজা গিয়ে ঢুকবে মার্সেলো মানসিনির পকেটে। তা হতে দেয়া যায় না।

'গত পরশু এটা খুঁজে পেয়েছি আমরা,' বলল ওয়ালেস। 'আপনি ফিরলে যেন দেখাতে পারি, তাই শ্রমিকদের দিয়ে মেঝেটা পরিষ্কার করিয়েছি।' গলায় বিরক্তি ফুটে উঠল তার। 'জায়গাটা যারা আগে খুঁড়েছে, তারা পাক্কা হারামি ছিল। মাটি-পাথর ফেলে পুরো চেম্বার আবার ভরে রেখে গেছে। খুব খাটতে হয়েছে আমাদেরকে।'

গ্রিডের মাঝখানে মুখ ব্যাদান করে থাকা গর্তগুলোর দিকে ইশারা করল মানসিনি। 'ভার্টিকাল শাফটগুলো কতটা গভীর?'

'একটার মধ্যে দুজন কাফ্রিকে নামিয়েছিলাম, ত্রিশ ফুট ওভার-বার্ডেন সরিয়েও তল খুঁজে পায়নি ওরা। পাইপের এই শাখাটা সম্ভবত খুব রিচ ছিল, পুরনো মাইনাররা তাই ভালমত খুঁড়েছে এটা। তবে খনির ভিতরে আরও শাখা আছে বলে বিশ্বাস আমার।' চেম্বারের একটা প্রান্ত নির্দেশ করল ওয়ালেস। 'ওখান থেকে আরেকটা টানেল গেছে ভিতরদিকে। বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ওটার মুখ-ই খোলার কথা বলছিলাম একটু আগে।'

'আরও শাখা আছে?' খুশি খুশি গলায় বলল মানসিনি। 'এ তো খুবই ভাল খবর!' রানার দিকে ফিরল। 'দেখা যাচ্ছে, ওয়ালেসের ওপর আস্থা না রেখে ভুল করেছি আমি, মি. রানা। আপনার এক্সপার্টিজের আর কোনও প্রয়োজন নেই, পাইপটা খুঁজে বের করতে ও একাই যথেষ্ট।'

প্রমাদ গুনল রানা—প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবার মানে একটাই হতে পারে, ওর নাম খরচের খাতায় লিখতে চলেছে মানসিনি। নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে প্রমাণ করতে না পারলে বাঁচার কোনও আশা নেই। তাড়াতাড়ি বলল, 'হ্যাঁ, ভাল একটা লোকই বেছেছেন বটে। পাইপ তো খুঁজতে পারবেই, আপনাকেও কবর দিতে পারবে।'

'কী!' চমকে উঠল মানসিনি।

'ঠিকই শুনছেন। এখানে ব্লাস্ট ঘটাবার সঙ্গে সঙ্গে উপরের পাহাড়টা নেমে আসবে আপনার চাঁদির উপর। জ্যান্ত কবর হয়ে যাবেন।'

'আমাকে ভেবেছেন কী আপনি, মি. রানা?' রাগী গলায় বলল ওয়ালেস।

অপমানিত বোধ করছে। 'মাটির তলায় কীভাবে ব্লাস্ট ঘটাতে হয়, তা জানি না?'

'ব্লাস্ট ঘটাতে হয়তো জানো, কিন্তু জিয়োলজির কিছুই জানো না তুমি,' বলল রানা। 'তিন হাজার বছরের পুরনো খনি এটা। এর ভিতর সারফেসের টপোগ্রাফি অনেক বদলেছে। খনির উপরে পাহাড়ের ওজন বেড়েছে। টানেল, কিংবা চেম্বারের দেয়ালগুলোকে মোটেই স্টেবল বলা যাবে না আর। বেকুবের মত বিস্ফোরণ ঘটালে সব ধসে পড়বে।'

'পাগলের মত কথা বলবেন না!' অবিশ্বাসের সুরে বলল ওয়ালেস। 'তিন হাজার বছরের পুরনো খনি? চারপাশটা ভাল করে দেখুন, মি. রানা। আধুনিক যন্ত্রপাতি ছাড়া এত গভীরে কারও পক্ষে খোঁড়াখুঁড়ি সম্ভব নয়।'

'থামো তুমি!' ধমক দিয়ে উঠল মানসিনি। তারপর ফিরল রানার দিকে। 'এই খনি সম্পর্কে যা জানেন, সব খুলে বলুন, মি. রানা।'

'আপনার ওই মাথামোটা সুপারভাইজরের কথায় কান দেবেন না, আমি সত্যি কথা বলছি,' বলল রানা। প্রতিপক্ষের অজ্ঞতা উপভোগ করছে। নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসেট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবার একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেছে। 'খনিটার বয়স আমি প্রমাণও করে দিতে পারব। ডেব্রে আমলাক মঠে যাবার আগে খনির প্রবেশপথের কাছে একটা স্টোন-হ্যামার পেয়েছি আমি, ওটা আমার ক্যাম্পে রয়েছে। চাইলে এনে দেখাতে পারি। যাদের হাতে আধুনিক যন্ত্রপাতি আছে, তারা প্রস্তর যুগের হাতুড়ি ব্যবহার করবে কেন, বলতে পারেন? তা ছাড়া আসবার পথে টানেলের দেয়ালগুলো পরীক্ষা করেছি আমি, ওতেও পুরনো আমলের মাইনিং টেকনিকের নিদর্শন আছে। সে-আমলে আগুন দিয়ে পাথরকে গরম করে তুলত ওরা, তারপর ঢেলে দিত পানি আর ভিনিগার অ্যাসিডের মিশ্রণ। এতে আচমকা তাপমাত্রা কমে যেত, ফেটে যেত পাথরের গা। তখন হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে সহজেই গুঁড়ো করে ফেলা যেত পাথরগুলোকে। খুবই সময়সাপেক্ষ একটা পদ্ধতি... দিনে এক ফুটের বেশি খোঁড়া যেত না, তবে টানেলে গেলে দেয়ালের গায়ে ওই টেকনিকের কারণে সৃষ্টি হওয়া প্রচুর ফাটল দেখতে পাবেন আপনারা। আমার তো মনে হয়, যে-পথটা ধরে আমরা এখানে এসেছি, ওটা খুঁড়তে অন্তত পঁচিশ বছর লেগেছে।'

সুপারভাইজরের দিকে তাকাল মানসিনি। 'কথাটা কি সত্যি হতে পারে?'

'ইয়ে... মানে... হ্যাঁ। হতে তো পারেই...' তোতলাল ওয়ালেস।

'আপনার এই সুপারভাইজর আসলেই মাইনার কি না, সে-ব্যাপারে সন্দেহ জাগছে আমার মনে,' টিটকিরির সুরে বলল রানা। 'সত্যিকার মাইনার হলে *প্লাইনি*-র বিবরণটা পড়ত, ওতে তিনি স্পেনের অস্টোরিয়াসে রোমানদের গোল্ড-মাইনিঙের কাহিনি লিখেছেন।' বুঝে-শুনে চাল দিচ্ছে ও, প্রতিপক্ষের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিচ্ছে। রোমান ইতিহাসবেত্তা প্লাইনি-র নাম অ্যাকাডেমিক সার্কেলেও খুব কম লোক জানে। ও নিজে জেনেছে স্রেফ কৌতূহলের বশে নানা রকম বিষয়ে লেখাপড়া করেছে বলে।

'সিস্টেমটাকে প্লাইনি বলতেন *পাহাড়-ধ্বংস*,' বলে চলল ও। 'আমি যে-পদ্ধতিটার কথা বলেছি, ওভাবে পাহাড়ের ভিতর অসংখ্য টানেল বানাত ওরা,

চূড়ায় বসাত পানিভর্তি রিজারভয়ার। টানেল খোঁড়া হলে উপর থেকে ছেড়ে দিত পানি, প্রচণ্ড প্রেশারে পুরো পাহাড়ই বিস্ফোরিত হতো। সোনার আকরিক-ভর্তি কাদা ছড়িয়ে পড়ত চারপাশে। সেখান থেকে মিনারেল আলাদা করা সহজ হয়ে যেত। এভাবে ইয়োরোপের অসংখ্য পাহাড় ধ্বংস করেছে রোমানরা, আজকের হিসেবে প্রায় পনেরো বিলিয়ন ডলারের সোনা উত্তোলন করে নিয়ে গেছে।'

'ইন্টারেস্টিং ব্যাপার,' স্বীকার করল মানসিনি। 'কিন্তু রোমান সভ্যতা তো তিন হাজার বছরের পুরনো নয়। এই খনিটার বয়স অত বেশি ভাবছেন কেন?'

'কাল রাতে যে-সন্ন্যাসীকে আপনি খুন করলেন, তাঁর কাছে শুনেছি—হারানো একটা ধর্মীয় গ্রন্থে এই খনিটার উল্লেখ আছে। বইটা তিন হাজার বছরের পুরনো ছিল।' সত্যি-মিথ্যে মিশিয়ে কথা বলছে রানা। 'প্রাচীন এক রাজা খুঁড়িয়েছিলেন এটা, পরে শত্রুপক্ষের হামলায় দেশ দখল হয়ে যেতে দেখে এটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এমন একটা খনি অন্য কারও হাতে পড়ুক, তা চাননি তিনি।'

'বাপ রে, আপনার গল্প শুনে তো সলোমনের খনির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। এটা সেই খনি না তো?'

'হতে পারে, আমি শিয়োর না,' বলল রানা। ইটালিয়ান টাইকুন সত্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, তাকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা চালাল ও। 'গল্পটার জন্ম হয়তো সলোমনের খনির কারণে হয়েছে, তবে আপনার সুপারভাইজরকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন—এমন গল্প আফ্রিকার বেশিরভাগ খনিকে ঘিরেই শোনা যায়।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা ঝাঁকাল ওয়ালেস, কথাটা মিথ্যে নয়।

'ফ্যাসিনেটিং!' বলল মানসিনি। চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে, বন্দির জ্ঞানের বহর তাকে মুগ্ধ করেছে। 'বুঝতে পারছি, আপনাকে ধরে এনে ভুল করিনি। তা, মি. এক্সপার্ট... ব্লাস্টের কারণে পাহাড়-ধসের যে-আশঙ্কাটা করলেন, সেটা মোকাবেলার কোনও কায়দা জানা আছে?'

'ব্লাস্ট-ম্যাট ব্যবহারের পরামর্শ দেব আমি,' বলল রানা। 'ডেটোনেশনের শকওয়েভ যদি টানেলের ভিতর দিয়ে ডিফ্লেক্ট করে দিতে পারেন, তা হলে ছাদ বা দেয়াল ভেঙে পড়ার ভয় থাকবে না।'

'আমাদের সঙ্গে ব্লাস্ট-ম্যাট আছে?' ওয়ালেসকে জিজ্ঞেস করল মানসিনি।

'জী না,' মাথা নাড়ল সুপারভাইজর। 'তবে খার্তুম থেকে অর্ডার দিয়ে দু-চারদিনের মধ্যে আনিয়ে নেয়া যাবে।'

'আর কোনও পরামর্শ?' রানার দিকে তাকাল মানসিনি।

'হ্যাঁ,' রানা বলল। 'বাইরে যে-আয়োজন দেখলাম, তাতে মনে হলো, ওভার-বারডেনের স্তূপটা রি-চেক করবার প্ল্যান করেছেন আপনারা—অরিজিনাল ওয়ার্কারদের চোখ এড়িয়ে যাওয়া হীরা বের করে নিতে চাইছেন। তবে খামোকা কষ্ট করবার কোনও মানে দেখতে পাচ্ছি না। কিম্বারলাইটকে ওরা যেভাবে গুঁড়ো করেছে, তাতে কোনও হীরা অবশিষ্ট থাকার কথা না। ফ্লুরোস্কোপ থাকলে দু'চারটে কণা হয়তো পাওয়া যেতে পারে, তবে সেটার পিছনে একমাত্র

বোকারাই সময় ব্যয় করবে।'

অপমানে মুখ লাল হয়ে উঠল ওয়ালেসের। ওভার-বারডেন ঘাঁটাঘাঁটি করার আইডিয়াটা তার।

'যুক্তিসঙ্গত কথাই বলছেন আপনি,' স্বীকার করল মানসিনি। 'এত খাটাখাটনি করে পাহাড় খোঁড়ার পর কেউ হীরার একটা টুকরোও ফেলে যাবে না।' হাসি ফুটল তার মুখে। 'ওয়েল, দেখা যাচ্ছে আপনাকে আমার দরকার। মাইনিঙের কাজে সাহায্য করতে পারবেন। ওয়ালেস, মি. রানাকে শ্রমিকদের নেতা বানিয়ে দাও। দেখা যাক, বুদ্ধি-পরামর্শের পাশাপাশি গতর খাটিয়েও তিনি আমাদের কতটা সাহায্য করতে পারেন।'

ওয়ালেসের মুখেও হাসি ফুটে উঠল। এবার বেয়াদব লোকটাকে ইচ্ছেমত শায়েস্তা করতে পারবে সে। গদগদ গলায় বলল, 'নিশ্চয়ই, সার। আপনার যা ইচ্ছে।'

রানাও হাসল, তবে সেটা মনে মনে। ওকে বাঁচতে দিয়ে মহা-ভুল করছে এরা। সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে ও, যথাসময়ে ওদের এই বোকামির উপযুক্ত প্রতিদান দেবে। দুজনকেই খুন করবে ও!

চোদ্দ

এক সপ্তাহ কাটল। কষ্টকর, ভয়ঙ্কর সাতটি দিন। পিটিয়ে একজন শ্রমিককে খুন করল গার্ডরা এর মাঝে, পরিশ্রমের ধকলেও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল বেশ কয়েকজন। তবে এসব মৃত্যুর কোনও প্রভাব পড়ল না কাজে। একাকার হয়ে খেটে গেল মানুষ আর যন্ত্র, নিউম্যাটিক ড্রিল আর খালি হাতের সাহায্যে মাটির গভীর থেকে তুলে আনল চাকা চাকা কিম্বারলাইট। শারীরিক সহ্যশক্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেল প্রতিটি মানুষ।

বারো ঘণ্টার শিফটে পালা করে পুরুষ রিফিউজিদের কাজ করাচ্ছে মানসিনি আর ওয়ালেস, দু'ঘণ্টা অন্তর দশ মিনিটের বিরতি দেয়া হয় বিশ্রাম আর সামান্য খাওয়া-দাওয়ার জন্য। মরে যাবার মত খাটুনি বলা যাবে না, তবে রিফিউজিদের অপুষ্ট শরীর ধকলটা সইতে পারছে না। ইতোমধ্যে ওভার-বারডেন সরিয়ে কিম্বারলাইটের একটা শিরা আবিষ্কার করা হয়েছে, ওটা থেকেই তোলা হচ্ছে আকরিক। রানাকে আণ্ডারগ্রাউণ্ড একটা পিটের শিফট ম্যানেজার বানানো হয়েছে, ভুতাল নামে ওয়ালেসের এক দক্ষিণ আফ্রিকান সহকারীর অধীনে কাজ করতে হচ্ছে ওকে, সঙ্গে আবেল আকরাকিও আছে। প্রতি শিফটে অন্তত দশজন সশস্ত্র সৈনিক পাহারা দেয় ওদেরকে, ডান-বাম করার উপায় নেই। প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামের জান্তব প্রতিচ্ছবি দেখা যায় মাটির নীচের এই গুহাটাতে। কমপ্রেসড় এয়ার-ড্রিল আর জ্যাকহ্যামারের মুহুর্মুহু আওয়াজ, ধুলোয় ভারী হয়ে থাকা বাতাস, তাতে ঘাম-ময়লায় ঢেকে

থাকা শ্রমিক..., সব মিলিয়ে ভয়াবহ একটা অবস্থা। হাই-স্পিড ফ্যান-সহ একটা ভেন্টিলেটর টিউব লাগানো হয়েছে পিটের ছাদে, পরিবেশটা সহনীয় করবার জন্য; কিন্তু তাতে ভিতরের ধুলো, বা অসহনীয় উত্তাপ খুব কমই অপসারিত হয়।

এখন পর্যন্ত ঠিকভাবে কাজ করে চলেছে রানা, কিম্বারলাইট আকরিক উত্তোলনে সর্বাত্মক পরিশ্রম করছে। সময়মত ঠিকই আঘাত হানবে ও, তার আগে কাউকে অভিযোগ তোলার সুযোগ দিতে চায় না। এমনিতেই ওয়ালেস মায়ারের শ্যেনদৃষ্টি রয়েছে ওর উপর, এটা-ওটা ছুঁতোয় বারো ঘণ্টার শিফটে চোদ্দো-পনেরো ঘণ্টাও খাটতে হয় ওকে। লোকটার সন্দিহান মনোভাব দূর করবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ও। ওকে ঢোঁড়া সাপ ভেবে যখন গা-ছাড়া ভাব আসবে প্রতিপক্ষের মধ্যে, তখনই হানবে অপ্রত্যাশিত আঘাত।

আপাতত শক্তি-সামর্থ্য অনুসারে নিজের অধীনস্থ রিফিউজিদের কয়েক ভাগে ভাগ করেছে রানা। শারীরিক অবস্থা যাদের ভাল, তাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছে ড্রিল আর জ্যাকহ্যামার অপারেট করবার। ছোটখাট কিছু কৌশলও শিখিয়ে দিয়েছে, যাতে কার্যকরভাবে ইকুইপমেন্টগুলো ব্যবহার করতে পারে তারা। অপারেটরদের সহকারী হিসেবে কাজ করছে অপেক্ষাকৃত দুর্বলরা। আর যারা ও-দুটো কাজে অক্ষম, তারা কুলিগিরি করছে—আকরিকের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে উঠে যায় সারফেসে।

খনিমুখের কাছে একটা ছাউনিতে চলছে আকরিক ভেঙে হীরা বের করার কাজ। ওখানে শুধুমাত্র বাছাই করা শ্রমিক আর গার্ড ছাড়া আর কারও প্রবেশাধিকার নেই। একটা মাঝারি আকারের সিন্দুক আছে ছাউনিতে, কিম্বারলাইট থেকে আলাদা করা হীরা ভরে রাখা হচ্ছে ওতে। এখন পর্যন্ত কত হীরা পাওয়া গেছে, তা বলতে পারবে না রানা, তবে পরিমাণটা নেহায়েত কম হবার কথা নয়। কিম্বারলাইটের যে-শিরাটায় ওরা কাজ করছে, সেটা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। টনপ্রতি আকরিকে বারো ক্যারাটের বেশি হওয়ার কথা। শুনতে আহামরি মনে না হলেও আসলে ওটা অবিশ্বাস্য একটা রেশিও। পিটের ভিতর কয়েকটা পাথর রানা নিজেও দেখেছে—এর মধ্যে একটা ছিল পুরো বিশ ক্যারাট ওজনের। ওর সঙ্গী মাইনাররা জিনিসটার গুরুত্ব বুঝতে পারেনি, কারণ কাটা এবং পালিশ করবার আগে পর্যন্ত হীরকখণ্ডকে ঘোলাটে পাথরের মত দেখায়। ইতোমধ্যে দৈত্যাকায় একটা হীরার গুজবও ছড়িয়ে পড়েছে—আকরিক ভাঙার কাজে নিয়োজিত এক মহিলা নাকি পেয়েছে ওটা, পুরো হাতের মুঠির মত সাইজ।

শ্রমিক-হত্যার ঘটনাটা রানার পিটেই ঘটেছে। হতভাগ্য লোকটি ওয়ালেসের জারি করা কোনও আইন ভেঙেছিল, নাকি সুদানিজ গার্ডের অকারণ রোষের শিকার হয়েছে, তা জানা যায়নি। কারণটা নিয়ে আসলে কেউ মাথা ঘামাতে পারেনি, অবিশ্বাসের চোখে শুধু দেখে গেছে রাইফেলের বাটে একজন মানবসন্তানের মাথার খুলি দু'ভাগ হয়ে যাবার দৃশ্য। দু'ঘণ্টা কাজশেষে দশ মিনিটের বিরতি চলছিল তখন, আচমকা খেপে উঠল সুদানিজ এক গার্ড,

ঝাঁপিয়ে পড়ল অসহায় ইরিত্রিয়ান লোকটির উপর। রানা কিছু করবার আগেই তার মাথা ফাটিয়ে দেয়া হলো। প্রচণ্ড ক্রোধে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল রানা, কিন্তু এগোতে পারেনি, পাশ থেকে আবেল জড়িয়ে ধরেছিল ওর কোমর। বলেছিল, অযথা নিজের প্রাণ বিপন্ন না করতে। তাতে কারও কোনও লাভ হবে না। বেঁচে থাকলে বরং পরে একটা সুযোগ পাওয়া যেতে পারে।

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে ফের বসে পড়া ছাড়া আর কিছু করার ছিল না রানার, কারণ ততক্ষণে মারা গেছে হতভাগা শ্রমিক। মনে মনে বার বার প্রতিশোধ নেবার শপথ করছে ও। ডুভাল অবশ্য বিরতির সময় শেষ হতেই আবার সবাইকে কাজ করতে নামিয়েছে, শিফট শেষ হবার আগে লাশটা বের করতে দেয়নি ওখান থেকে।

এভাবেই কেটে গেছে এক সপ্তাহ। পালা করে বিরতিহীনভাবে চলছে মাইনিং। মাটি খোঁড়া হচ্ছে, কিম্বারলাইট বের করা হচ্ছে, সেটা নিয়ে আসা হচ্ছে আকরিক-শোধনের ছাউনিতে। ধীরে ধীরে ভারী হচ্ছে মার্সেলো মার্নাসিনির সিন্দুক। ইতোমধ্যে রানার মনে পরিষ্কার হয়ে গেছে—সবাইকে আমৃত্যু খাটানোর পরিকল্পনা করেছে ইটালিয়ান টাইকুন। তাতে শুধু সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের মুখই বন্ধ হবে না, খনি থেকেও যথেষ্ট পরিমাণ হীরা বের করে নিতে পারবে সে।

সপ্তম রাতে আবেলের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করল ও। কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে খোলা আকাশের নীচে খোঁয়াড়ের মত একটা জায়গাকে শ্রমিকদের অ্যাকোমোডেশন নাম দেয়া হয়েছে, ওখানেই শুয়ে ছিল ওরা। কথা বলে বোঝার চেষ্টা করছিল, মার্নাসিনির কাজে তাড়াহুড়োর কারণ কী হতে পারে।

'হয়তো কারও চোখে পড়ে যাবার ভয় পাচ্ছে,' আন্দাজ করল আবেল। 'আসমারায় সরকারের কাছে খবর চলে গেলে তো পাততাড়ি গোটাতে হবে, তাই তাড়াতাড়ি যত পারে হীরা বের করে নিতে চাইছে আর কী!'

যুক্তিটা ঠিক মেনে নিতে পারল না রানা। 'উঁহুঁ, আমার তা মনে হয় না,' দ্বিমত পোষণ করল ও। 'ভাল করে ভেবে দেখো, আমরা যখন এলাম, তখন কোনও মানুষজন চোখে পড়েনি এদিকে। তা ছাড়া বাদন গ্রামের ওই সর্দারও বলছিল, অভিশাপের ভয়ে এই এলাকা এড়িয়ে চলে স্থানীয় লোকেরা। ল্যাণ্ড-মাইনের আতঙ্কও মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট। এমনকী একটা বিমানও তো উড়ে যেতে দেখিনি আমি এখন পর্যন্ত। তারমানে রেগুলার ফ্লাইং রুট থেকে অনেক দূরে রয়েছি আমরা।'

'তা অবশ্য ঠিক বলেছেন,' কাত হয়ে পিঠের তলায় পড়া একটা পাথর সরাল আবেল। 'তা হলে এভাবে পাগলের মত সবাইকে খাটানোর কারণটা কী?'

'বুঝতে পারছি না,' স্বীকার করল রানা। ক্লান্তিতে দু'চোখ মুদে আসছে ওর।

ব্যাপারটা নিয়ে মাইনিং অপারেশনের প্রথম দিনটি থেকেই ভাবছে ও, কিন্তু জবাব পাচ্ছে না। দিনের বেলা অবশ্য ভাবনাচিন্তার সময় পাওয়া যায় না,

ধুলোবালি আর তাপে ভরা পিটে অন্য কোনোদিকে মনোযোগ দেবার অবকাশ থাকে না, তবে রাতের বেলা রিফিউজি পরিবারের মহিলাদের রান্না করা সাদামাঠা ডিনার খেয়ে শুয়ে পড়লেই দুশ্চিন্তায় মাথাটা ভার হয়ে থাকে। দিনার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন ও। ওর সঙ্গে কথা বলার কোনও সুযোগ নেই। মহিলাদের জন্য নির্ধারিত আলাদা একটা কম্পাউণ্ডে থাকে ও, তাদের সঙ্গে রান্নাবান্নার কাজ করে। মানসিনি, বা তার চ্যালাচামুণ্ডাদের মনোরঞ্জনও করতে হয় কি না কে জানে। প্রতি রাতেই মেয়েদের কম্পাউণ্ড থেকে দু'চারজনকে নিয়ে যায় সৈনিকরা, দিনাও কি তাদের একজন? মাঝে মাঝে খাবার পরিবেশনের সময় দেখা হয় দুজনের, মুখে হাসি ফুটিয়ে সাহস দিতে চায় রানা, পারে না। চেহারাসুরত দেখে বোঝা যায়, মারধর সহ্য করতে হয় মেয়েটাকে—চোখের চারপাশ আর হাতের উন্মুক্ত চামড়ায় ফুটে থাকে কালশিটে। ওকে সাহায্য করতে না পারায় ক্ষোভ জমে রানার ভিতর।

নানারকম চিন্তা করতে করতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল রানা। ভোরে ঘুম ভাঙতেই দেখল, আকাশে মেঘ জমেছে। সূর্য দেখা যাচ্ছে না, গাঢ় ছায়ায় ঢেকে গেছে গোটা উপত্যকা। অবশেষে বর্ষার দেখা পেতে চলেছে ইরিত্রিয়ার মরু-অঞ্চল। নাশতার জন্য যখন শ্রমিকরা লাইনে দাঁড়াল, তখন ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে, ছেঁড়াখোঁড়া পোশাকের তলায় কাঁপছে সবাই।

'আজকের দিনের মধ্যেই বৃষ্টি নামবে,' জানাল আবেল। 'ঝুম বৃষ্টি।'

চোরা চাহনিতে আশপাশে তাকাল রানা। গার্ডরা কেউ কাছে আছে কি না দেখল। তারপর ফিস ফিস করে বলল, 'যা করবার, তা তাড়াতাড়ি করতে হবে, আবেল। রিফিউজিদেরকে তাঁবু দেবে না ওরা। বৃষ্টিতে ভিজলে রোগ বাধবে, ওষুধ পাওয়া যাবে না। মরবে সবাই!'

'বুঝতে পারছি,' মাথা ঝাঁকাল আবেল। 'আপনার কোনও প্ল্যান আছে?'

জবাব না দিয়ে দিনার দিকে তাকাল রানা, লাইনের সামনে টেবিলে দাঁড়িয়ে খাবার পরিবেশন করছে। শুকিয়ে গেছে অনেক, ক্লান্তিতে দেহটা আগের চেয়ে ন্যুব্জ, তবে চোখের দীপ্তি কমেনি। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল রানা, দুজনের চোখাচোখি হতেই ইশারায় কাছে ডাকল।

ইতিউতি তাকিয়ে রুটি আর ঝোলভর্তি একটা প্লেট তুলে নিল দিনা, ওটা নিয়ে চলে এল ওর কাছে। প্লেটটা নিতে নিতে চাপা গলায় বলল রানা, 'আমরা আজ রাতে পালাচ্ছি। আমার শিফট শেষ হবার দু'ঘণ্টা পর তৈরি থেকো।'

'আমার কথা ভুলে যাও, রানা,' বলল দিনা। 'ক্যাম্প ছেড়ে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে গার্ডরা ধাওয়া করবে। আমি থাকলে তুমি এগোতেই পারবে না। তারচেয়ে একা গেলে একটা সুযোগ থাকে। কাছাকাছি কোনও গ্রামে পৌঁছে বাইরের সাহায্য চাইতে পারবে।'

'কোথায় যাব?' রানা বলল। 'সাতদিনের আগে পায়ে হেঁটে কোথাও পৌঁছুনো সম্ভব নয়, ততদিনে রিফিউজিরা মরে সাফ হয়ে যাবে। না দিনা, ক্যাম্প ছাড়ছি না আমরা। অন্যরকম একটা প্ল্যান আছে আমার—পাগলামি মনে হতে পারে, বিপজ্জনকও... তবু আমাদেরকে চেষ্টা করে দেখতে হবে।'

'ঠিক আছে, আমি তৈরি থাকব,' কথা না বাড়িয়ে রাজি হলো দিনা। 'আমি কিছু খাবার আর পানিও জমিয়েছি। সেগুলো নিয়ে নেব।'

মেয়েটির প্রতি অদ্ভুত একটা শ্রদ্ধা সৃষ্টি হলো রানার মনে। দাসত্ব, মারধর... হয়তো বা ধর্ষণেরও শিকার হতে হচ্ছে দিনাকে, তারপরও হাল ছেড়ে দেয়নি। আশার আলো বুকে ধরে খাবার আর পানি জমিয়েছে! এ-কাজ সবার পক্ষে সম্ভব নয়। ওকে স্পর্শ করতে ইচ্ছে হলো রানার, সাহস জোগাতে মন চাইল, পিছিয়ে গেল শুধু প্রহরীদের কথা ভেবে।

'আজ রাতে দেখা হবে আমাদের,' সংক্ষেপে শুধু জানিয়ে দিল ও।

দশ মিনিটের মধ্যে নাশতা সেরে খনিতে নামতে হলো ওদেরকে। জেনারেটরের ফুয়েল বাঁচানোর জন্য রাতে সারফেসের কাজকর্ম বন্ধ থাকে, তবে মাটির তলায় খোঁড়াখুঁড়িতে কোনও বিরতি দেয়া হয় না। রানার টিম যখন ভিতরে ঢুকছে, তখন ওদের পেরিয়ে চলে যাচ্ছে রাতের শিফটের শ্রমিকরা—ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, পা ফেলছে টলমল করে।

রাত নামার আগে কিছুই করা যাবে না, তাই শিফট শুরু হতে দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রানা। আবেলকে বলে দিল সুযোগ বুঝে শ্রমিকদেরকে রাতের পরিকল্পনা জানিয়ে দিতে। এস্কেপ-পার্টিটা যতটা সম্ভব ছোট রাখবার ইচ্ছে রানার, তবে যথাসময়ে ডাইভারশন সৃষ্টির জন্য বাকি শ্রমিকদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রয়োজন।

তবে যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়। পোড়া কপাল রানার পিছু ছাড়ল না। হঠাৎ করে পিটে হাজির হলো ওয়ালেস মায়ার, গত এক সপ্তাহে রানাকে যথেষ্ট হেনস্থা করেও সাধ মেটেনি তার, আজ ভালমত প্রতিশোধ নেবে বলে প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে। বিশেষ একটা শাফটে কয়েক ঘণ্টা আগে কাজ করেছে রানা, ওটায় দ্বিতীয়বার নামতেই মুখের কাছে হাজির হলো ওয়ালেস। চেঁচিয়ে ডাকল, 'রানা! উপরে উঠে এসো! কথা আছে তোমার সঙ্গে!' যন্ত্রপাতির আওয়াজ ছাপিয়ে সংকীর্ণ শাফটের ভিতর গমগম করে উঠল কণ্ঠটা।

সম্বোধনটা *আপনি* থেকে *তুমি*-তে নেমে আসায় প্রমাদ গুনল রানা, বুঝতে পারল—আজ খারাবি আছে কপালে। সাবধানে দড়ির মই বেয়ে পঞ্চাশ-ফুট গভীর শাফটটা থেকে বেরিয়ে এল ও ওয়ার্কিং এরিয়ার ফ্লোর লেভেলে। মনটা তিক্ত হয়ে গেল কাজে বাধা পড়ায়, এক পলক চাইল শাফটের দিকে, তারপর মুখোমুখি হলো সুপারভাইজরের।

'কী হয়েছে?' জানতে চাইল ও। 'হার্ড-রক মাইনিঙের ব্যাপারে নতুন কিছু শিখতে চাও নাকি?'

'শিখতে নয়, শেখাতে এসেছি,' ফোঁস ফোঁস করে বলল ওয়ালেস। 'মি. মানসিনি বাইরে গেছেন, সন্ধ্যার আগে ফিরবেন না। কাজেই কীভাবে তুমি মারা পড়লে, সেটার অজুহাত খাড়া করবার জন্য যথেষ্ট সময় পাব আমি।'

ঢোক গিলল রানা, সমীহ-ভরা দৃষ্টিতে দক্ষিণ আফ্রিকানের চওড়া কাঁধ আর পিপের মত বুকের ছাতিটা দেখল। ওর চাইতে এক-মাথা উঁচু লোকটা, ওজনও কমপক্ষে পঞ্চাশ পাউণ্ড বেশি। মুঠো পাকানো হাতদুটো দেখে স্লেজহ্যামারের

কথা মনে পড়ে যায়। আঙুলের ফাঁকগুলোতে ছেঁড়া-কাটার দাগ পুরনো অসংখ্য লড়াইয়ের সাক্ষ্য বহন করছে। তারমানে লোকটা অভিজ্ঞ। এসবের চেয়েও বড় ব্যাপার হচ্ছে, ওয়ালেস মায়ার সম্পূর্ণ সুস্থ-সবল; আর ও দাঁড়িয়ে আছে শারীরিক সহ্যশক্তির সর্বশেষ সীমায়।

কথা বলে লাভ নেই, ব্যাটা সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে, তাই আগে আক্রমণ করাই শ্রেয় মনে হলো রানার কাছে। ওয়ালেস কিছু বুঝে ওঠার আগেই এক পা সামনে এগিয়ে প্রচণ্ড এক নক-আউট পাঞ্চ কষাল ও। ঘুসি খেয়ে দুই কদম পিছিয়ে গেল দৈত্য। ঠোঁট থেঁতলে গেছে, ভেঙে মুখের ভিতর ঢুকে গেছে দুটো দাঁত, নাকের ফুটো দিয়ে গড়াতে শুরু করেছে রক্ত। নিজের অজান্তেই আরও কয়েক পা পিছিয়ে গেল দক্ষিণ আফ্রিকান, তবে পড়ল না মাটিতে।

কাজ থামিয়ে হই হই করে উঠল শ্রমিকরা, সুদানিজ সৈনিকরাও নাক গলাল না লড়াইয়ে, হাতের ভাঁজে রাইফেল ধরে রেখে তামাশা দেখতে থাকল। কাঠখোট্টা খনি-জীবনে এই প্রথম একটা বিনোদন পাচ্ছে তারা।

হামলার আকস্মিকতায় বোকা বনে গেছে ওয়ালেস। কল্পনাই করতে পারেনি, হালকা-পাতলা বাঙালিটার গায়ে এক সপ্তাহের খাটুনিশেষেও এত শক্তি থাকতে পারে! সিধে হয়ে থুঃ করে ভাঙা দাঁত আর রক্তের দলা ফেলল মাটিতে, তারপর হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখ মুছল। চেহারায় ব্যথা-ট্যথার কোনও ছাপ ফুটল না অবশ্য। মুখ বাঁকা করে বলল, 'হুম, তা হলে লড়াই করে মরতে চাও? তাতে ব্যাপারটা অবশ্য বেশ উপভোগ্যই হয়। আফটার অল, প্রচুর দর্শক আছে এখানে।'

কিছু বলল না রানা, কথা বলতে গেলে খামোকা শক্তিক্ষয় হবে। হাঁটু একটু মুড়ে বক্সিঙের পজিশন নিল। খিক্ খিক্ করে হেসে উঠল ওয়ালেস, হাসিটা ভাঙা দাঁতের ফাঁক দিয়ে বেরুনোয় শিসের মত শোনাল। রানাকে আসলে গ্রাহ্যই করছে না সে, একটু আগের ঘুসিটাকে স্রেফ অসতর্ক থাকার মাশুল বলে ভাবছে। নিজের উপর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস তার, আজ পর্যন্ত গায়ের জোরে কেউ পারেনি তার সঙ্গে; আজ এই পুঁচকে বাঙালিটা পারবে—সেটা একেবারেই অসম্ভব। লোকটার এই মনোভাব রানাও বুঝতে পারছে। ভাবছে, অহমিকা-টাকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে হারানো যায় তাকে।

চকিতে এক কদম এগিয়ে বাঁ হাত চালাল ওয়ালেস। রানা আসতে দেখল ওটা, কিন্তু সরে যাওয়ার আগেই ওর চোয়ালে যেন মুগুরের বাড়ি পড়ল। পা টলে উঠল। কর্কশ সুরে চেঁচিয়ে উঠল জনতা। প্রতিপক্ষকে সোজা হতে দিয়ে পিছিয়ে গেল ওয়ালেস। রানা উঠে দাঁড়াতেই ধীর গতিতে একে অপরের দিকে এগিয়ে গেল।

ঘুসিটার কারণে মাথা ঝনঝন করছে রানার, এগোতে গিয়ে একটা নুড়িপাথরে পা বেধে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল। তখুনি ছুটে এল ওয়ালেসের দ্বিতীয় ঘুসিটা, আবারও টলে উঠল, কিন্তু খাড়া থাকল দুই পায়ে। চোখে সর্ষেফুল দেখছে ও এখন। সামলে নিয়ে পাল্টা আঘাত হানার চেষ্টা করল, কিন্তু ব্যালে নর্তকের মত নেচে বেড়াচ্ছে ওয়ালেস। হঠাৎ ওর তলপেটে আঘাত হানল

ওয়ালেসের ডান হাত।

মাটিতে পড়েই উঠে দাঁড়াল রানা। ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু আচমকা পাঁজরে রানার সাইড-কিক খেয়ে ধূলিশয্যা নিল ওয়ালেস। রানা পিছিয়ে গেল, ওকে ওঠার সুযোগ দিয়ে একটু আগেকার বদান্যতার প্রতিদান দিল। ব্যাপারটা টের পেয়ে ক্রোধ জমল ওয়ালেসের চোখে। এতো বড় আস্পর্ধা, হারামজাদা বাঙালিটা কিনা তাকে দয়া দেখাচ্ছে!

ওয়ালেসের থুতনির এক জায়গায় ফুলে গেছে, রক্ত পড়ছে ঠোঁট কেটে। সতর্কভাবে এগোল সে, ভয়াল হয়ে উঠেছে চেহারা। মাথা খেলাতে শুরু করেছে... বিপজ্জনক হয়ে উঠছে সে। হঠাৎ লঘু পায়ে ক্ষিপ্র বেগে এগিয়ে এল দৈত্য, ডান হাতে রদ্দা ঝাড়ল রানার ঘাড়ে, রানা পিছিয়ে যেতে পরক্ষণেই আগে বেড়ে বাঁ হাত চালাল। সেয়ানে সেয়ানে লড়াই হচ্ছে, দ্রুতহাতে মেরে চলেছে একে অপরকে। এক সুযোগে বাঁ হাতে ওয়ালেসের চোয়ালে মারল রানা আবার, পরমুহূর্তে রাইট আপারকাটে ওর ঠোঁট আরেকদফা ফাটিয়ে দিল। আবার দু'হাত মুঠো করে ক্ষিপ্ত বুনো মোষের মত তেড়ে এল দক্ষিণ আফ্রিকান দানব। জিভ দিয়ে চেটে নিজের রক্তের স্বাদ নিল।

পাল্টা আঘাতের সুযোগ বের করে নিল ওয়ালেস, রানার মাথায় বাঁ হাতের চেটো দিয়ে আঘাত করল, পরপরই ওর সংক্ষিপ্ত রাইট আপারকাটে রানার হেলে-পড়া মাথাটা সোজা হয়ে গেল আবার। পিছিয়ে গেল রানা, হাঁ করে শ্বাস টানছে। কতক্ষণ হলো লড়ছে ওরা? আধ-মিনিট? এক মিনিট?

ওয়ালেস এগিয়ে এসে আবার বাঁ হাত চালাল। ওর কবজি চেপে ধরে চকিতে ঘুরে গেল রানা, কাঁধের ওপর দিয়ে নিপুণভাবে হিপ-থ্রো করল। কিন্তু তৈরি ছিল সুপারভাইজর, মাটিতে পড়েই ডিগবাজি খেলো। আবার উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে এল সে, ফের হাতাহাতি শুরু হলো। দুজনের শরীরেই ঘামের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। ইরিত্রিয়ান-সুদানিজ নির্বিশেষে ভিড় করে সবাই চেঁচাচ্ছে খ্যাপার মত। ডান-হাতি এক রাইট জ্যাবে রানাকে ধরাশায়ী করল ওয়ালেস।

ধপাস করে মাটিতে পড়ে গড়ান দিল রানা। কয়েক মুহূর্ত পড়ে রইল নিঃসাড়ে। বুঝতে পারছে, এভাবে পেরে উঠবে না। শরীরে বল পাচ্ছে না, প্রতিপক্ষের শক্তি ও স্ট্যামিনা ওর চাইতে অনেক বেশি। ব্যবধানটা কমাতে ভিন্ন কৌশল খাটাতে হবে। সাবধানে শোয়া অবস্থায় চোখের মণি নাড়ল, দৃষ্টি আটকে গেল কয়েক হাত দূরে নির্জীব দাঁড়িয়ে থাকা একটা স্কিপলোডারের উপর, ওটার অপারেটর এখনও যোগ দেয়নি কাজে। বাকেটটা অসহায়ের মত ঝুলে আছে মেঝে থেকে কয়েক ফুট উপরে।

সময় নিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা, হাতের ধুলোবালি ঝেড়ে হেঁটে এগিয়ে এল। আবার হামলা চালাল ওয়ালেস, বাউলি কেটে ঘুসিটা এড়াল ও, কিন্তু পাল্টা হামলা চালাল না। এখন কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। পরবর্তী কয়েক মিনিট ও ব্যয় করল শুধু আত্মরক্ষার কাজে। ওয়ালেসের ফাটা ঠোঁটে হাসি ফুটতে শুরু করল, ভাবছে রানাকে বাগে পেয়ে গেছে সে।

লোকটার অজ্ঞতাকে চমৎকারভাবে কাজে লাগাল রানা, প্রতিটা আক্রমণ

ঠেকানোর ছলে ধীরে ধীরে পিছিয়ে যাচ্ছে স্কিপলোডারের দিকে। কিছুক্ষণ পর কায়দামত পেয়ে গেল ওয়ালেসকে, ওরা তখন স্কিপলোডারের একফুট সামনে। উপর্যুপরি ঘুসি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে এল সুপারভাইজর, মারের ভয়ে রানা বরাবরের মত পিছিয়ে যাবে ভাবছে, কিন্তু এবার সেটা ঘটল না। আচমকা সিধে হয়ে সামনে বাড়ল রানা, একহাতে আঘাত ঠেকিয়ে অপর হাতে প্রাণপণ শক্তিতে ঘুসি ঝাড়ল প্রতিপক্ষের অরক্ষিত বাঁ-কানের উপর। ভীষণ একটা ঝাঁকি খেল ওয়ালেসের মাথা, মড়াৎ করে ঘাড়ের হাড় ফুটল, চোখে অন্ধকার দেখছে। পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে পড়ল সে ব্যথাটা সহ্য করতে। পরমুহূর্তে উরুসন্ধিতে রানার লাথি খেয়ে চেঁচিয়ে উঠল গলা ছেড়ে। নিজের অজান্তেই দু'হাত দিয়ে চেপে ধরল জায়গাটা।

ল্যাং মারল রানা, মাটিতে ফেলে দিল শত্রুকে। কিন্তু ওয়ালেস উঠে দাঁড়াল না, কাত হয়ে পড়ে তখনও নিজের জননাঙ্গ ধরে রেখেছে সে। বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে, এক লাফে উঠে বসল স্কিপলোডারে। স্টার্ট দিয়েই লিভার চেপে ধরল, সঙ্গে সঙ্গে বাকেটটা নেমে এল ওয়ালেসের মাথার উপর, মাটিতে চেপে ধরল তাকে পিন-গাঁথা প্রজাপতির মত। চাইলে খুলিটা চূর্ণ করে দিতে পারে রানা, কিন্তু করল না, শুধু চাপ দিয়ে আটকে রাখল লোকটাকে। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল ওয়ালেস আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে, জননাঙ্গ ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে নিষ্ফল খামচি দিল স্কিপলোডারের ধাতব বাকেটে।

এতক্ষণ লড়াই দেখায় মগ্ন ছিল সুদানিজ গার্ডরা, বাধা দেয়নি কোনও কিছুতে। হঠাৎ চমক ভাঙল তাদের, টের পেল কী ঘটে গেছে। ঝট্ করে সিধে হলো তারা, রানার দিকে তাক করল হাতের রাইফেল।

'খবরদার!' লিভারে হাত রেখে চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'গুলি করার চেষ্টা করলে কিন্তু তোমাদের সুপারভাইজরের খুলি নারকেলের মত ভাঙব!' থমকে গেল সৈনিকরা। বাকেটের তলা থেকে ওয়ালেসের যন্ত্রণাকাতর চিৎকার ভেসে এল। ওদিকে তাকাল ও। 'চেঁচা ব্যাটা! চেঁচিয়ে বল্, কেমন ব্যথা লাগছে। বল্, তুই মরতে চাস না!'

চেঁচাল ওয়ালেস। হাত-পা ছুঁড়ল খানিক। তারপর গোঙাতে গোঙাতে বলল, 'কী চাও তুমি, রানা?'

'আমি চাই, তোমার গার্ডেরা অস্ত্র নামিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাবে। ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যে যদি না যায়, তা হলে মেঝেতে লেপ্টে যাবে তোমার মগজ। মানসিনি ফেরার আগে ওদের চেহারা আর দেখতে চাই না আমি। বলো ওদের!'

'আ... আমার কথা ওরা বোঝে না। বিশ্বাস করো!'

'আবেল, ওর কথা বুঝিয়ে দাও ওদেরকে।'

হড়বড় করে নির্দেশ দিল ওয়ালেস, আবেল সেটা দোভাষী হিসেবে পুনরাবৃত্তি করল। একটু দ্বিধা করল সৈনিকরা, তারপর লাইন ধরে বেরিয়ে গেল গুহা থেকে।

'প্রার্থনা করো, তোমার বস্ যেন জলদি ফিরে আসে,' ওয়ালেসকে বলল রানা। 'ও না-আসা পর্যন্ত থাকবে তুমি এভাবেই।'

স্কিপলোডারের কন্ট্রোল আবেলের হাতে তুলে দিল ও, রক্তে ভেজা মুখ-হাত মুছতে যাচ্ছে। বলল, 'ব্যাটা তেড়িবেড়ি করলে মাথাটায় আরেকটু চাপ বাড়িয়ে দিয়ো।'

মুচকি হেসে ইঞ্জিনের গুঞ্জন একটু বাড়িয়ে দিল আবেল। আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল ওয়ালেস।

মার্সেলো মানসিনি পিটে হাজির হলো ঘণ্টাদেড়েক পর। খবর পেয়ে তাড়াহুড়ো করে ফিরে এসেছে, সঙ্গে সশস্ত্র একদল গার্ড। পরনে পরিষ্কার খাকি পোশাক, মুখে গাম্ভীর্য। গুহায় ঢুকে দৃশ্যটা নির্বিকার চোখে দেখল সে, তারপর চোখ ফেরাল রানার দিকে—ও তখন স্কিপলোডারের পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

'একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে দেখছি,' মুচকি হেসে বলল ইটালিয়ান ধনকুবের।

'আপনার সুপারভাইজরের মাথাটা পচা আঙুরের মত থেঁতলে দেবার অনুমতি দিলে সমস্যাটা মিটে যায়,' গম্ভীর গলায় বলল রানা।

হাসিটা বিস্তৃত হলো মানসিনির। 'সেটা মোটেই উচিত হবে না। বড়ই কাজের লোক, মরে গেলে আরেকজন পেতে কষ্ট হবে।'

'তা হলে আপনার সম্মানে মাফ করে দিচ্ছি ওকে,' আবেলকে ইশারা করল রানা বন্দি সুপারভাইজরকে মুক্তি দিতে। ইঞ্জিনের শব্দ তুলে উঠে গেল বাকেটটা।

'এসবের মানে কী, জানতে পারি?' জিজ্ঞেস করল মানসিনি।

'আপনাকে দেখানো দরকার ছিল, বদমাশটাকে সুযোগ পেয়েও খুন করিনি আমি,' বলল রানা। 'সমস্ত শ্রমিক... এমনকী আপনার গার্ডদেরকেও জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন, ব্যাপারটা কে শুরু করেছে? ওই নোংরা শুয়োরটাকে আর আমি ধারেকাছে দেখতে চাই না। ও যেন আমাকে আমার মত চলতে দেয়।'

'নিজের মত চলবেন বলতে ঠিক কী বোঝাতে চাইছেন?'

'কথা পেঁচাবার প্রয়োজন নেই, মি. মানসিনি,' বিরক্ত গলায় বলল রানা। 'ওয়ালেসকে সরিয়ে নিলে আমি আবার কাজে ফিরে যাব।'

'তারমানে পালাবার কোনও ইচ্ছে নেই আপনার?' হাসল মানসিনি।

'নিশ্চিন্ত থাকুন,' রানাও হাসল, 'যে-দিন আমার পালাতে ইচ্ছে হবে, সে-দিন আপনিই সবার আগে জানতে পারবেন।'

'আপনার দুঃসাহসের প্রশংসা না করে পারছি না,' কাঁধ ঝাঁকাল মানসিনি। তাকাল সুপারভাইজরের দিকে, মাটিতে বসে দু'হাতে মাথা চেপে ধরে রেখেছে সে। 'ওয়ালেস, যথেষ্ট হয়েছে। রানাকে আর ঘাঁটাবার চেষ্টা কোরো না। ওর সঙ্গে হিসেব যদি মেটাতেই হয়, সেটা এই প্রজেক্ট শেষ হবার পর মিটিয়ো। ক্লিয়ার?'

গোঙানির মত একটা শব্দ করে মাথা ঝোঁকাল ওয়ালেস।

'গুড!'

'মি. মানসিনি,' বলে উঠল রানা, 'একটা প্রশ্ন করতে পারি?' এই প্রথম

লোকটার সঙ্গে কথা বলার একটা পরিবেশ পেয়েছে। সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইছে না। 'কী ঘটছে এখানে? খনিটার কথা বলছি... আপনার টাকার অভাব আছে বলে মনে হয় না; পূর্বপুরুষের ধারণা সত্যি বলে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন... তা-ও হয়েছে। কয়েক হাজার ক্যারাট তোলার জন্য নিরীহ লোকজনকে খাটিয়ে মেরে লাভটা কী?' হঠাৎ আরেকটা চিন্তা খেলল মাথায়, তাই যোগ করল, 'তা ছাড়া *সেন্ট্রাল সেলিং সিস্টেম* আপনাকে এই হীরা বাজারেও ছাড়তে দেবে না। তা হলে এই প্রজেক্ট চালাচ্ছেন কেন?'

ভুরু কোঁচকাল মানসিনি। 'আপনি বড্ড কৌতূহলী মানুষ, মি. রানা!'

'কৌতূহলটা মেটাতে অসুবিধে আছে? আমার কপালে তো মৃত্যুই লিখে রেখেছেন। গোমর ফাঁস হবার ভয় নেই।'

'হুম, তা অবশ্য ঠিক বলেছেন,' মাথা ঝাঁকাল মানসিনি। 'ঠিক আছে, আপনার কৌতূহল মেটাচ্ছি। *সেন্ট্রাল সেলিং সিস্টেম*-এর কথা বললেন না? একেবারে জায়গামত লাগিয়েছেন আন্দাজ...'

'*সেন্ট্রাল সেলিং সিস্টেম*-টা আবার কী জিনিস?' জানতে চাইল আবেল।

মুচকি হাসল মানসিনি, প্রশ্নটায় বিরক্ত হলো না, লেকচারের ভঙ্গিতে দিতে শুরু করল জবাব। '*সেন্ট্রাল সেলিং সিস্টেম*, বা *সিএসএস* হলো দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের একটা গোপন সংগঠন। হীরার ব্যবসাটা অন্যান্য ব্যবসার মত নয়, অর্গানাইজড মনোপলির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয় ওটা। মাইনিং, কাটিং, সেলিং... সবকিছুর লাগাম ধরে রাখা হয় শক্ত হাতে। কাজটা করে সিএসএস। ওরাই ঠিক করে—কোন্ খনি থেকে কতটা হীরা তোলা হবে, সেটা কোথায় কাটা হবে, কে-ই বা বিক্রি করবে! নিজস্ব পলিসির মাধ্যমে ডায়মণ্ডের মূল্য নির্ধারণ করে ওরা, কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি করে রাখে... যাতে দামটা দিন দিন বাড়ে, কমতে না পারে।' রানার দিকে ফিরল এবার সে। 'আপনি ভাবছেন, সিএসএস তাদের মনোপলি বজায় রাখার জন্য আমার এই মাইনিং অপারেশন বন্ধ করে দেবে?'

'নিঃসন্দেহে,' রানা বলল। 'দুনিয়ার ব্যবসায়ী-সমাজে সবচেয়ে শক্তিশালী সংগঠন ওটা, নিজেদের কাজে দক্ষ এবং রুথলেস। মার্কেটে আসা হীরার প্রতিটি টুকরোর খোঁজ রাখে *সিএসএস।* অচেনা উৎস থেকে হীরা এলে সেটা তদন্ত করে দেখার জন্য আলাদা উইং আছে। মনোপলি বজায় রাখার জন্য ভয়াবহ সব পদক্ষেপ নেয় ওরা, অতীতে বহুবার নিয়েছে। অনেক মানুষ খুন করেছে, অনেক খনি বন্ধ করে দিয়েছে, বা নিজেরা দখল করে নিয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, ওদের ওসব কাজের বিরুদ্ধে কারও কিছু করা সম্ভব নয়। দুনিয়ার বড় বড় দেশের মাথাদের নিজেদের পকেটে ভরে রেখেছে ওরা, যা-খুশি-তাই করে পার পেয়ে যেতে পারে অনায়াসে।'

'ওয়েল... ঠিকই বলেছেন আপনি,' বলল মানসিনি। 'সত্যি বলতে কি, আমি চাই ওরা জানুক খনিটার ব্যাপারে। আর সেটা নিশ্চিত করবার জন্য আমি নিজেই ওদেরকে খবরটা দেব।'

'কী!' চমকে গেল রানা।

'হ্যাঁ, ভুল শুনছেন না আপনি। আমিই খবর দেব, তবে সেটা ওদের সঙ্গে টক্কর দেবার জন্য নয়, বরং নিজেও ওদের দলে ভিড়ে যাবার জন্য।'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না...'

'আরও খোলাসা করতে হবে?' হাসল মানসিনি। 'আপনিই তো বললেন, দুনিয়ার ব্যবসায়ী-সমাজের সবচেয়ে শক্তিশালী সংগঠন সিএসএস। আমি ওটার অংশ হতে চাই, ওটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাই। কিন্তু ওরা কখনোই দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে বুকে টেনে নেবে না, ওদেরকে বাধ্য করতে হবে। কীভাবে বাধ্য করব? এই হীরা দিয়ে! এই খনি থেকে তোলা হীরা আমি ওদের মুখের উপর ছুঁড়ে মারব, বলব—হয় আমাকে তোমাদের দলে নাও, নইলে দুনিয়ার ডায়মণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি ধ্বংস করে দেব আমি অল্প দামে হীরা ছেড়ে দিয়ে...'

'ওরা চুপচাপ বসে থাকবে?'

'না, মি. রানা। স্বীকার করছি, আমাকে ঠেকাবার চেষ্টা করতে পারে ওরা। তবে সেটা দু'পক্ষের জন্যই মস্ত ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে। ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেব আমি, শান্তিপূর্ণ একটা পাল্টা-প্রস্তাব দেব—হয় আমাকে ডায়মণ্ড কার্টেলের প্রেসিডেন্ট বানাবে ওরা, নয়তো আমার হীরাগুলো বাজার থেকে সরিয়ে রাখার জন্য মাসে মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিতে থাকবে। যেটাই করুক, দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যবসায়িক সংগঠনটার উপর ছড়ি ঘোরাতে পারছি আমি। ব্যাপারটা চমৎকার নয়?'

ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা ভেবে দেখল রানা—প্ল্যানটা তারিফ করবার মতই বটে! খনির মালিকানা দরকার নেই মানসিনির, চুরি করে বিপুল পরিমাণ হীরা তুলে নিয়ে ভল্টে জমালেই হয়। সিএসএস অত্যন্ত ক্ষমতাবান একটা সংগঠন বটে, তবে ওদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে, মনোপলি হারানোর ভয়। হীরা ব্যবসাতে একচ্ছত্র আধিপত্য ধরে রাখবার জন্য যে-কোনও কাজ করতে রাজি তারা। এই দুর্বলতাকে পুঁজি করেই চাল দিতে চাইছে মার্সেলো মানসিনি। তার মত একজন টাইকুনের সঙ্গে লড়াই করে যে সুবিধে হবে না, সেটা ওরা বুঝতে পারবে সহজে। কাজেই বিকল্প প্রস্তাবটাই মেনে নেবে মনোপলি ধরে রাখার স্বার্থে। মানসিনিকে হয়তো প্রেসিডেন্ট বানাবে না, কিন্তু তাকে টাকা দিতে রাজি হয়ে যাবে নিঃসন্দেহে। কারণ টাকাটা নিজেদের পকেট থেকে খরচ করতে হবে না তাদেরকে।

'আপনার এই কাজের ফলে কী ঘটবে, জানেন?' শান্ত গলায় বলল ও। 'আপনার টাকা জোগাতে হীরার দাম একলাফে বাড়িয়ে দেবে ওরা। দাম বাড়াবার জন্য খনি থেকে হীরা তোলা বন্ধ করে দেবে। সাউথ আফ্রিকার অর্থনীতি সম্পূর্ণ ধসে যাবে!'

'তাতে কার কী এসে-যায়? নাহয় বেকুব ছেলেরা তাদের গার্লফ্রেন্ডের জন্য বাড়তি কয়েক হাজার ডলার খরচ করে এনগেজমেন্ট রিং কিনবে। আর সাউথ আফ্রিকার কথা বলছেন? আমি তো চাই-ই দেশটা ভেঙে পড়ুক, সাদারা আবার ক্ষমতায় আসুক। কালো-রা ক্ষমতা পাবার পর থেকে ওখানে আমার সমস্ত ব্যবসা মার খেয়ে গেছে, সাদা-রা এলে আমি বরং লাভবান-ই হবো।'

দিব্যচোখে পরিস্থিতিটা দেখতে পাচ্ছে রানা—দক্ষিণ আফ্রিকার নাজুক অর্থনীতি কিছুতেই এই ধাক্কা সামলাতে পারবে না। হাজার হাজার লোক বেকার হয়ে যাবে। দেশব্যাপী শুরু হয়ে যাবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, দুর্ভিক্ষ আর মৃত্যু! তীব্র ঘৃণায় রি রি করে উঠল রানার ভিতরটা, কিন্তু কণ্ঠ স্বাভাবিক রেখে বলল, 'আপনি একটা পিশাচ! মানুষের জীবন নিয়ে খেলছেন আপনি!'

'হাহ্! মানুষের জীবন!' অবজ্ঞা প্রকাশ পেল মানসিনির কণ্ঠে। 'ওটা দুনিয়ার সবচেয়ে সস্তা জিনিস!'

'এই *সস্তা জিনিস* কতটা খরচ করবার ইচ্ছে আপনার? কত জীবন চাই, কত হীরা?'

'যত বেশি সম্ভব, মি. রানা... চাই যতটা বেশি সম্ভব! সিএসএস-কে আমি যত বেশি হীরা দেখাতে পারব, ওরা ততটাই মচকাবে। ...এবং আপনি সে-কাজে আমাকে সাহায্য করবেন। তিন সপ্তাহ পর ডায়মণ্ড কার্টেলের মিটিং হবে লণ্ডনে। ততদিনে প্রচুর হীরা তুলে নিতে হবে আমাকে। এরপর যারা বেঁচে থাকবে, তাদের ছেড়ে দিতে রাজি আছি আমি। কারণ তখন খনিটার খবর ফাঁস হলে কিছু যাবে-আসবে না।'

'তিন সপ্তাহ পর এখানে দশজনকেও জ্যান্ত পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ!' বলল রানা।

'সেটা আপনার মাথাব্যথা, আমার নয়। চেষ্টা করে দেখুন, শ্রমিকদেরকে জ্যান্ত রেখে আমার প্রয়োজনমাফিক হীরা তুলে দিতে পারেন কি না।' ওয়ালেসের দিকে তাকাল মানসিনি। 'হাঁদার মত ওখানে বসে থেকো না, ওয়ালেস। ওঠো, নিজের চিকিৎসার ব্যবস্থা করো গে। আর ডুভালকে পাঠিয়ে দিয়ো এখানকার বাঁদরগুলোকে দেখেশুনে রাখতে।' রানার দিকে ফিরল আবার। 'গুডবাই, মি. রানা।'

গটমট করে হেঁটে চলে গেল ইটালিয়ান ধনকুবের।

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। সোহেল, দিনা, আবেল আর এখানকার রিফিউজিদের পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকার নিরীহ জনগণের কথাটাও এবার চাপ সৃষ্টি করছে ওর মধ্যে। যে-পরিকল্পনা এঁটেছে, তাতে এখন সফল না হয়ে উপায় নেই। যে-ভাবেই হোক, ব্যর্থ করে দিতে হবে মানসিনির ঘৃণ্য পরিকল্পনা।

সত্যিই পারবে তো?

পনেরো

ঢোল বাজার মত মুহুর্মুহু আওয়াজে কাঁপছে প্রকৃতি, শিফট শেষে টানেল ধরে বেরুতে থাকা মানুষগুলোর বুকে কাঁপন জাগিয়ে তুলল। সুড়ঙ্গমুখে পৌঁছুনোর আগেই অবশ্য চেনা গেল শব্দটা। রিফিউজিদের প্রায় সবাই এককালে কৃষিকাজ

করত, বজ্রপাত বা বৃষ্টির আওয়াজ তাদের জন্য পরম আকাঙ্ক্ষিত ব্যাপার।

রাতের আটটা বাজে। ঘন মেঘে আকাশ ঢেকে থাকায় বাইরেটা এতই অন্ধকার যে, টানেলের ঘনঘোর কৃষ্ণবর্ণের সঙ্গে খুব একটা তফাত নেই। সুড়ঙ্গের মুখে বৃষ্টির ধারা চোখে পড়ে, সেই ধারা ভেদ করে ভেজা শরীরে নতুন শিফটের শ্রমিকরা ঢুকতে শুরু করেছে, পুরনোরা যাচ্ছে বেরিয়ে। ঘন বর্ষণ আর বজ্রপাতের গগনবিদারী আওয়াজে গমগম করছে টানেল, কথা বলা কঠিন, গলা তুলে না বললে হারিয়ে যাচ্ছে প্রকৃতির চিৎকারের মাঝে।

'বৃষ্টিটাতে লাভ হলো, নাকি ক্ষতি?' রানার কানের কাছে মুখ এনে জানতে চাইল আবেল।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা, জবাবটা জানা নেই। কাজে নামলে বোঝা যাবে। দিনাকে শিফট শেষ হবার দু'ঘণ্টা পর তৈরি থাকতে বলেছে ও, এর মাঝে অনেককিছু সেরে নিতে হবে ওকে আর আবেলকে। সুড়ঙ্গ থেকে বৃষ্টির মাঝে বেরুনোর আগে দাঁড়িয়ে পড়ল ও, টান দিয়ে থামাল আবেলকেও। কথা বলে নেয়া দরকার। গার্ডরা সবাই পিছনে, রানার শিফটের শ্রমিকদেরকে খেদিয়ে নিয়ে বেরিয়ে আসছে, ওদের দুজনের কথা শুনতে পাবে না।

'যা বলেছি, সব মনে আছে তো?' জিজ্ঞেস করল রানা। ক্লান্তিতে শরীরটা ভেঙে আসছে ওর। ওয়ালেসকে ছেড়ে দেবার পর থেকে হালকা কাজ করেছে ও, শক্তি বাঁচাতে চেয়েছে। কেউ মানা করতেও আসেনি, সুপারভাইজর ডুভাল আর প্রহরীরা এড়িয়ে চলেছে ওকে। তারপরও খুব দুর্বল বোধ করছে, ব্যথা করছে সারা শরীর। কপাল ভাল যে, ওয়ালেসের লাথি-ঘুসিতে হাড়-গোড় কোনোটা ভাঙেনি। তা হলে দাঁড়াতেই পারত না।

'কিচ্ছু ভাববেন না,' রানার প্রশ্নের জবাবে বলল আবেল। 'সময়মত টানেলের সামনে থাকব আমি, সবকিছু রেডি রাখব।'

'সাবধানে কাজ কোরো। নইলে পালানোর ইতিহাসে সবচেয়ে জঘন্য ব্যর্থতা হয়ে যাবে আমাদের চেষ্টাটা।' বলল রানা। 'সবাইকে জানিয়ে দিয়েছ তো, কী করতে হবে?'

'বললাম তো, চিন্তার কিছু নেই। যাদেরকে জানানো দরকার, জানিয়েছি। যাদের সঙ্গে কথা হয়নি... যেমন ধরুন নতুন শিফটের লোকেরা... ওরাও মুখে মুখে জেনে যাবে সব। সময়মত তৈরি থাকবে সবাই।'

আবেলের হাজারো আশ্বাসেও সান্ত্বনা পাচ্ছে না রানা। স্রেফ একটা অনুমানের উপর ভর করে ছকটা সাজিয়েছে ও। যদি ওটা ভুল হয়, তা হলে ওকে কাবাব বানিয়ে খাবে মানসিনি আর ওয়ালেস মায়ার। বাকিদের মারবে গুলি করে।

'আরে, আপনি দেখি আমাদের নিয়ে চিন্তায় মরে যাচ্ছেন,' পরিবেশটা হালকা করার জন্য বলল আবেল। 'আপনার নিজের কী করতে হবে, সেটা ভুলে যাননি তো? তৈরি আছেন?'

মলিন হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'দু'ঘণ্টার মধ্যেই জানা যাবে।'

টানেল ছেড়ে বেরুতেই দেখা গেল, রানার সন্দেহটা ঠিক—রিফিউজিদের

জন্য তাঁবু বা ছাউনির ব্যবস্থা করেনি মানসিনি। অথচ সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে বড় বড় বেশ কয়েকটা তাঁবু দখল করে রেখেছে সে। ওগুলোতে এয়ার-কণ্ডিশনার চলছে, দূর হয়ে যাচ্ছে বাড়তি আর্দ্রতা। ভিতরে জ্বলছে উজ্জ্বল আলো। শ্রেণী-বিভাজনের চরম নমুনা।

বৃষ্টির কারণে মহিলাদেরকে খাবার পরিবেশনে বাধ্য করা হয়নি, তারপরও ওরা টেবিলে শিফট থেকে ফেরা শ্রমিকদের জন্য প্লেটে খাবার সাজিয়ে রেখেছে। একটা থালা তুলে নিতেই রানা দেখল, রুটি ভিজে কাদার মত হয়ে গেছে। সবজির বাটিতেও পানির বন্যা। খিদে মরে গেল ওর, প্লেট নামিয়ে রেখে রওনা হলো শ্রমিকদের *খোঁয়াড়*-এর দিকে।

মাটিতে নীল রঙের তারপুলিন বিছানো হয়েছে বৃষ্টির কারণে, প্লাস্টিকের এই সামান্য আবরণের নীচে সহকর্মী শ্রমিকদের জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকতে দেখল রানা, পরস্পরকে জাপটে ধরে শরীরের উত্তাপ ভাগাভাগি করবার চেষ্টা চালাচ্ছে। আকাশে বিজলি চমকাচ্ছে, কানে তালা লাগিয়ে দিচ্ছে প্রচণ্ড আওয়াজ। প্রতিবার বজ্রপাতের সঙ্গে ভয়ে গুটিয়ে উঠছে অসহায় রিফিউজিরা।

শ্রমিকদেরকে পাহারার দায়িত্বে রয়েছে তিনজন সুদানিজ সৈনিক, বৃষ্টি থেকে বাঁচতে খোঁয়াড়ের কাছাকাছি একটা তাঁবু খাটিয়েছে তারা। তাঁবুটা পেরিয়ে আসার সময় রানা খেয়াল করল, একজন ইতোমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে, বাকি দুজন-ও তন্দ্রায় ঢুলছে। দুর্যোগকবলিত এই রাতে বন্দিদের তরফ থেকে কোনও ধরনের ঝামেলার আশঙ্কা করছে না তারা।

হালকা একটা হাসি খেলা করে গেল রানার ঠোঁটে। তা-ই ভাবুক ওরা... নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ুক!

রানা আর আবেলের জন্য তারপুলিনের একটা কোনা খালি রেখেছে রিফিউজিরা, ওখানে গিয়ে শুয়ে পড়ল ও। আবেল এখনও আসেনি, খাওয়াদাওয়া সারছে, অপেক্ষায় রইল তাই। শরীরের শিরা-উপশিরায় অ্যাড্রেনালিনের প্রবাহ টের পাচ্ছে রানা, উত্তেজনা অনুভব করছে। তবুও জোর করে চোখ মুদল, কাজে নামার আগে একটু বিশ্রাম নিতে পারলে ভাল হয়। ওর ঘুম ভাঙল আবেল পাশে এসে মৃদু ঝাঁকি দেয়ায়।

'আপনি ঘুমাচ্ছেন!' বিস্মিত কণ্ঠে বলল ইরিত্রিয়ান গাইড। 'পারছেন কী করে?'

'ঘুমানোর জন্য আবার আলাদা ক্ষমতা লাগে নাকি?' হালকা গলায় বলল রানা। 'যাক গে, জিনিসটা পেয়েছ?'

জামা তুলে কোমরে গোঁজা একটা ছোট মাইনার'স্ হ্যামার দেখাল আবেল। 'চুরি করে এনেছি, কেউ দেখতে পায়নি।'

'খুব ভাল। আমাকে সাহায্য করার জন্য দুজন লোক ম্যানেজ করতে বলেছিলাম...'

'একজনকে পেয়েছি, আমার পাশে শুয়ে আছে। দ্বিতীয়জন আমি নিজেই।'

'উঁহুঁ, আবেল। তোমার হাত কেটে গেলে সমস্যা আছে। খোঁয়াড় থেকে বেরুনোর পর সূক্ষ্ম কাজ করতে হবে তোমাকে।'

কাঁধ ঝাঁকাল আবেল। 'ঠিক আছে, তা হলে আরেকজনকে নিয়ে আসছি।'

ঘন ও মজবুত কাঁটাতার দিয়ে তৈরি হয়েছে খোঁয়াড়ের বেড়া—ব্লেডের মত ধারালো ওগুলোর দাঁত। বেড়ার নীচের দিকটা দশ ফুট চওড়া, উপরে সরু... পুরো আট ফুট উঁচু। এই ত্রিভুজাকৃতির মাঝখানটা ফাঁকা নয়, দলা পাকানো কাঁটাতার ভরে দেওয়া হয়েছে ওখানে বাণ্ডিল-কে-বাণ্ডিল। রানার পরিকল্পনাটা জটিল কিছু নয়, ওই দুর্ভেদ্য বেড়ার ফাঁক গলে বেরিয়ে যাবে বলে ঠিক করেছে... কিন্তু কাজটা সফল করতে হলে অস্বাভাবিক সহ্যক্ষমতা চাই—ধারালো কাঁটাতারের খোঁচায় শরীর যে ক্ষত-বিক্ষত হবেই!

মনে মনে তৈরি হয়ে সঙ্গীদেরকে ইশারা করল ও। প্রথম রিফিউজি উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল বেড়ার সামনে, তারপর বুকে ভর দিয়ে এগোতে শুরু করল। সাবধানে আগে বাড়ল লোকটা, কিন্তু তারপরও বেড়ার ভিতর ফুট দেড়েক যেতে না যেতে বাহুর চামড়া কেটে গেল তার, রক্ত গড়াতে শুরু করল। চেঁচাল না মানুষটা, নিঃশব্দে সহ্য করল ব্যথা, যন্ত্রের মত এগিয়ে চলল। অন্যান্য শ্রমিকদের কাছ থেকে নিয়ে বেশ কয়েক পরত কাপড় জড়ানো হয়েছে তার গায়ে, কিন্তু কাঁটাতারের জঙ্গলে যতই ভিতরে ঢুকল, ততই ছিঁড়ে-ফেটে গেল ওগুলো। কেটে-ছড়ে যেতে থাকল উন্মুক্ত চামড়া, বৃষ্টির পানি ধুয়ে নিয়ে যেতে থাকল রক্ত। একবারই চেঁচাল সে—কাঁটাতারের খোঁচায় কপাল কেটে গেছে। দু'ইঞ্চি চামড়া দু'ফাঁক হয়ে গেল, সেলাই ছাড়া জোড়া লাগবে না।

দশটা মিনিট ধরে দম আটকে দুঃসাহসী মানুষটার অগ্রগতি দেখল রানা, আবেল আর অপর রিফিউজি। আবছা চিৎকারটা শুনে আঁতকে উঠল ওরা। কিন্তু কয়েক মিনিট পরই পিছনে তাকিয়ে লোকটা জানাল, চিন্তার কিছু নেই, এগোতে পারবে সে।

শ্বাসরুদ্ধকর আরও পাঁচটা মিনিট কাটল। তারপর কাঁটাতারের অপর প্রান্তে পৌঁছে গেল রিফিউজি লোকটা। শরীর পুরোপুরি বের করল না, পা-দু'টো বেড়ার ভিতরেই রেখে ইশারা করল দ্বিতীয়জনকে।

মাথা ঝাঁকিয়ে এবার অপর লোকটা ঢুকে পড়ল বেড়ার জঙ্গলে। প্রথমজনের ট্র্যাক অনুসরণ করে এগোতে শুরু করল সে। কাজটা অপেক্ষাকৃত সহজ হলো তার জন্য, প্রথম লোকটা যাবার পথে বাঁকানো কাঁটাতার যতটা পারে সরিয়ে জায়গা করে দিয়েছে। তারপরও অবশ্য হাত-পা আর পিঠ কেটে-ছড়ে গেল তার, ধীরে ধীরে তৈরি হতে থাকা পথটা চিহ্নিত হয়ে রইল কাঁটায় বেঁধা কাপড়ের টুকরো আর চামড়া লেগে। দশ মিনিটের ভিতর সামনের জনের পা স্পর্শ করল লোকটা। ইশারা দিল পিছনে তাকিয়ে।

এবার রানার পালা। ইতস্তত না করে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল ও, সরীসৃপের মত ক্রল করে এগোতে শুরু করল। শীর্ণকায় ইরিত্রিয়ানদের তুলনায় ওর কাঁধ চওড়া, শরীরও বড়; এ-কারণেই ওদেরকে আগে পাঠিয়েছিল, বেরুনোর মত একটা পথ তৈরি করতে। কিন্তু নিজে ঢুকে টের পেল, খুব একটা লাভ হয়নি। মুখের অংশটা রক্ষা পেলেও কাঁধ আর পিঠ ক্ষত-বিক্ষত হতে শুরু করল ধারালো কাঁটার খোঁচায়, অসহ্য হয়ে উঠল জ্বলুনি। হাত দিয়ে একটা তার সরাতে গিয়ে

কাঁটা ঢুকে গেল নখের নীচে। সঙ্গে সঙ্গে দপ করে কী যেন একটা জ্বলে উঠল মাথার ভিতর। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ব্যথাটা সামলাল রানা, তারপর আবার এগিয়ে চলল।

একটু পরেই দ্বিতীয় রিফিউজির পা দেখতে পেল ও বজ্রপাতের আলোয়। গোড়ালি ধরে ঝাঁকি দিয়ে সঙ্কেত দিল। সে-ও সামনের জনকে একই কায়দায় ইশারা দিতেই বেড়ার তলা থেকে বেরিয়ে গেল লোকটা। তাকে অনুসরণ করল দ্বিতীয়জন আর রানা। তিনজন যাওয়া-আসার ফলে মোটামুটি চলনসই একটা পথ ততক্ষণে তৈরি হয়ে গেছে বেড়ার ভিতর দিয়ে। আবেলকে ডাক দিতেই সে ঝটপট এপারে চলে এল।

বৃষ্টির মাঝেই মুক্ত বাতাসে প্রাণভরে শ্বাস নিল আবেল। বলল, 'পথটা ধরে আরও অনেকেই বেরিয়ে আসবে।'

'আসুক,' বলল রানা। তাকাল দুই রিফিউজির দিকে। বজ্রপাতের আলোয় তাদের চেহারাসুরত দেখে চমকে উঠল—সারা শরীরে অসংখ্য ক্ষত। বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে গিয়ে হাঁ হয়ে আছে কাটা চামড়া, গোলাপি ধারা নামছে গা বেয়ে—রক্ত মেশা পানি। ওদের অবস্থা দেখে খারাপ লাগল রানার, তবে এ ছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না। ওদেরকে সামনে না পাঠালে নিজে ওরকম জখম হতো, পরের কাজগুলো করতে পারত না।

আবেলের দিকে তাকাল রানা। 'ওদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার, নইলে রক্তক্ষরণে মারা পড়বে।'

'ওষুধ নেই আমাদের কাছে, *এফেন্দি।* কিছুই করা সম্ভব নয়।' বলল আবেল। 'ঝুঁকিটা জেনেবুঝেই এসেছে ওরা।'

'এটা কোনও কথা হলো?' রাগী গলায় বলল রানা। 'আপাতত ভেজা মাটি লেপে ক্ষতগুলোর মুখ বন্ধ করতে বলো। আমাদের প্ল্যানটা সফল হলে ওদের জন্য ওষুধের ব্যবস্থা করা যাবে।'

কাঁধ ঝাঁকাল আবেল। টিগ্রিনিয়ান ভাষায় দুই স্বদেশীর সঙ্গে কথা বলল সে। আহত লোকদুটো খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেল একদিকে। ওদের গমনপথের দিকে কয়েক মুহূর্ত একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রানা, মাথাটা কৃতজ্ঞতায় নুয়ে আসতে চাইছে। প্রাণের পরোয়া না-করে যারা অপরের জন্য এভাবে স্বেচ্ছায় বিপদের মুখে ঝাঁপ দিতে পারে, তাদের উপর শ্রদ্ধা না-এসে উপায় আছে? কেন ইথিওপিয়ানরা এদের স্বাধীনতার স্পৃহাকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি, বোঝা যাচ্ছে স্পষ্ট।

একটু পরেই সংবিৎ ফিরল ওর। আবেলকে বলল, 'রেডি?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে,' কবজিতে বাঁধা ঘড়ি দেখল রানা। আনমনে মাথা নাড়ল, শিডিউলে পিছিয়ে পড়েছে। 'এখন থেকে এক ঘণ্টা বিশ মিনিট পর টানেলের মুখে দেখা করব আমরা। সময়টা একটু কম হয়ে যাচ্ছে, কাজ সারতে অসুবিধে হবে না তো?'

একটু ভাবল আবেল। 'আরেকটু সময় পেলে ভাল হতো... আচ্ছা, থাক।

অসুবিধে হবে না। ঠিক সময়েই ওখানে পাবেন আমাকে।'

'যাও তা হলে,' আবেলের পিঠ চাপড়ে দিল রানা। অন্ধকারে মিশে গেল প্রাক্তন যোদ্ধা।

মাইনিং ক্যাম্পের ওপাশে বিছিয়ে থাকা আঁধার উপত্যকার দিকে চোখ একটু আটকে গেল রানার। চাইলে এখুনি বেরিয়ে যেতে পারে ও এখান থেকে, কেউ কিছু টের পাবার আগেই বহুদূর চলে যেতে পারবে। বৃষ্টির কারণে পায়ের ছাপও মুছে যাবে, শত্রুরা পিছু নিতে পারবে না। পানির অভাবেও ভুগবে না। একটু চেষ্টা করলেই এই নরক থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। সোহেল কাদের হাতে বন্দি, সেটা জেনে গেছে, ওকে উদ্ধার করতেও কষ্ট হবে না। সম্ভাবনাটা হাতছানি দিচ্ছে ওকে, লোভী করে তুলছে। মাথা ঝাঁকিয়ে চিন্তাটা দূর করে দিল রানা। নিজের উপরই ক্ষুব্ধ হলো এমন ভাবনাকে মাথায় আসতে দেয়ায়।

হোক অনিচ্ছাকৃত, তাও অনেক বড় একটা দায়িত্ব চেপে বসেছে ওর কাঁধে। গোটা পৃথিবীর শান্তি বজায় রাখতে হলে ইয়োরাম রাবাকের উদ্দেশ্য পূরণ করতে দেওয়া যায় না। ঠেকাতে হবে ওকে। আর তার আগে ঠেকাতে হবে মার্সেলো মানসিনিকে। মুক্ত করতে হবে বন্দি ইরিত্রিয়ান রিফিউজিদের। দিনার কথাও ভুলতে পারছে না, এই নরক থেকে মুক্তি দিতে হবে ওকেও। চোয়াল শক্ত হয়ে গেল রানার। দৃঢ় পায়ে হাঁটছে মানসিনির অ্যাকোমোডেশন এরিয়ার দিকে।

ইটালিয়ান টাইকুনের তাঁবু-সহ শ্বেতাঙ্গ সুপারভাইজর, আর সুদানিজ সৈনিকদের তাঁবুগুলো টাঙানো হয়েছে শ্রমিকদের খাঁচা থেকে সিকি মাইল দূরে, বায়ুপ্রবাহের উল্টোদিকে। রিফিউজিদের গায়ের, কিংবা মলমূত্রের গন্ধ যেন নাকে না আসে, তাই এ-ব্যবস্থা। খোঁয়াড়ের পাশে পাহারারত তিন সৈনিককে এড়িয়ে যাবার পর খোলামেলা ভঙ্গিতে এগোতে পারল রানা। তুমুল বৃষ্টির কারণে বাইরে নেই কেউ, ওর পায়ের আওয়াজও চাপা পড়ে যাচ্ছে বজ্রপাত আর মুষল ধারার মাঝে। মানসিনির ক্যাম্পে আবছা আলো দেখা যাচ্ছে, সেটা লক্ষ্য করে হাঁটতে থাকল ও।

গন্তব্য যখন মাত্র ত্রিশ গজ দূরে, তখনই থমকে দাঁড়াল রানা। শিরদাঁড়া বেয়ে উঠে এল শীতল স্রোত। আঁধারের মাঝ থেকে হঠাৎ এক সুদানিজ সৈনিক বেরিয়ে এসেছে। গায়ে বর্ষাতি, হাতে একে-ফোরটি সেভেন। টহল দিচ্ছে মালিকের ক্যাম্পটা ঘিরে। ঢোক গিলল রানা, একেবারে উন্মুক্ত জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ও, আশপাশে গা-ঢাকা দেবার জায়গা নেই। ওর দিকে পিঠ ফিরিয়ে হাঁটছে সৈনিক, তবে সন্দেহ নেই—যে-কোনও মুহূর্তে উল্টো ঘুরবে।

সিদ্ধান্ত নিতে একটা মুহূর্ত অপেক্ষা করল রানা, তারপরই জ্যা-মুক্ত তীরের মত ছুটল সামনে। সৈনিককে লক্ষ্য করে এগিয়ে যাচ্ছে দ্রুতবেগে। মনে মনে প্রার্থনা করল, ব্যাটা যেন না ঘোরে; ঘুরলেই সর্বনাশ! প্রার্থনাটা পুরোপুরি কবুল হলো না, তিন ফুটের মধ্যে পৌঁছুতেই বিপদটা টের পেয়ে গেল অভিজ্ঞ সৈনিক, পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল। ভূতের মত ছুটে আসা ছায়াটাকে দেখে চমকে উঠল সে, তাড়াতাড়ি তুলতে চেষ্টা করছে হাতের একে-ফোরটি সেভেন।

লোকটার গায়ের উপর ডাইভ দিয়ে পড়ল রানা, কাঁধ আর মাথা দিয়ে সজোরে আঘাত করল পাঁজরের উপর। ধাক্কা খেয়ে হুড়মুড় করে চিৎ হয়ে পড়ল মাটিতে। হাত থেকে ছুটে পড়ে গেল অস্ত্র। লাফ দিয়ে তার পেটের উপর চেপে বসল রানা, ইস্পাতকঠিন মুঠোয় টিপে ধরল গলা। চোখদুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল সৈনিকের, খামচি দিয়ে সরাতে চাইল কণ্ঠনালীতে চেপে বসা হাতদুটো, কিন্তু পারল না। একচুল আলগা হলো না রানার বজ্রমুষ্টি। কয়েকবার পা ছুঁড়ল লোকটা, তারপর নিস্তেজ হয়ে গেল।

হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দাঁড়াল রানা। বড় বাঁচা বেঁচেছে। গার্ডটা চেঁচিয়ে উঠলেই পরিকল্পনার বারোটা বেজে যেত। নিচু হয়ে অ্যাসল্ট রাইফেলটা তুলে নিল ও, মৃত সৈনিকের ইউনিফর্ম ঘেঁটে বাড়তি ম্যাগাজিন আর একটা ছোট ছুরিও পাওয়া গেল। হাতে অস্ত্র আসায় আত্মবিশ্বাস বাড়ল, সন্তর্পণে এগোতে শুরু করল মানসিনির তাঁবুর উদ্দেশে।

দু'ভাগে ভাগ হয়ে আছে ক্যাম্পটা। বড় বড় চারটে তাঁবু মাঝখানে, বৃত্তের মত সেগুলোকে ঘিরে তোলা হয়েছে আরও কিছু ছোট তাঁবু। বুঝতে অসুবিধে হলো না, ছোটগুলোতে সুদানিজরা থাকে; তাদের শ্বেতাঙ্গ মনিবরা নিয়েছে মাঝখানের বড় বাসস্থান। সাবধানে সৈনিকদের তাঁবুর সারি পেরুল রানা, তবে তার প্রয়োজন ছিল না। ওয়ার্কিং পিট আর বাইরে পাহারা দেবার জন্য অর্ধেকের মত সৈনিক ক্যাম্পে নেই, বাকিরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

একটু কুঁজো হয়ে বড় তাঁবুগুলোর কাছে পৌঁছুল রানা। মাঝখানের একটা তাঁবু মনে হলো মানসিনির, কাছে গিয়ে কান পাতল। তবে শোনা গেল না কিছু। ওটার পিছনের ক্যানভাস দেড়-ফুটের মত কেটে একটা ফোকর তৈরি করল ও, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে। কম পাওয়ারের একটা বালব জ্বলছে তাঁবুর মাঝখানে, সেই আলোয় দুটো খালি বাঙ্ক দেখতে পেয়ে বুঝল—ভুল জায়গায় ঢুকেছে। মানসিনির মত লোক কারও সঙ্গে থাকার জায়গা শেয়ার করবে না। এই তাঁবুতে সম্ভবত ওয়ালেসের সহকর্মী দুই সুপারভাইজর থাকে, এ-মুহূর্তে চলতে থাকা শিফটের দেখাশোনা করতে গেছে।

ওখান থেকে বেরিয়ে পড়ল রানা, গেল পাশের তাঁবুটার কাছে। ভিতরে মানুষের কণ্ঠ শোনা গেল—দুজন কথা বলছে। তাঁবুর ক্যানভাসে ছোট্ট একটা ফুটো করল ও, তাকাল ভিতরে। কিন্তু দেখা গেল না কিছু, এদিকটায় তাঁবু ঘেঁষে রাখা হয়েছে কয়েকটা সুটকেস, দৃষ্টি আটকে দিচ্ছে। চোখ সরিয়ে ফুটোয় কান রাখল রানা, শুনতে পেল ইটালিয়ান টাইকুন আর তার প্রধান সুপারভাইজরের গলা। ওকে খুন করবার কায়দা নিয়ে আলোচনা করছে তারা।

'...ববক্যাট ব্যবহারের দরকার কী?' বলল মানসিনি। 'এক্সক্যাভেটরের বাকেট দিয়ে ওকে দু'টুকরো করলেই তো হয়।'

'তারচেয়ে সুদানিজদের হাতে তুলে দিন বাঙালিটাকে,' বলে উঠল ওয়ালেস। 'হারামজাদাকে রেপ করে মেরে ফেলবে।'

'খ্রিস্টানরা এ-জাতীয় কাজ করে না বলে জানতাম।'

'হাহ, খ্রিস্টান! কাফ্রিগুলোর প্রথম পরিচয় হলো, ওরা আফ্রিকান। সারী

হোক বা পুরুষ, শত্রুকে বলাৎকার করাটা ওদের বহু পুরনো রেওয়াজ।'

'তাই নাকি?' হেসে উঠল মানসিনি। 'ইন্টারেস্টিং! ব্যাপারটা ভেবে দেখব আমি।' ঘড়ি দেখল বোধহয় সে। 'আরে, সাড়ে ন'টা বেজে গেছে দেখি! কিছু মনে কোরো না, ওয়ালেস। আমাকে এখুনি ভেনিসে ফোন করতে হবে।'

'নিশ্চয়ই, সার। দুঃখিত, গল্প করতে গিয়ে আপনাকে বোধহয় দেরি করিয়ে দিলাম।'

'না, দেরি হয়নি। তবে আমাকে আবার একটু টয়লেটে যেতে হবে। এখানকার পানি আর ইমপোর্টেড খাবার খেয়ে পেটের একেবারে বারোটা বেজে গেছে।'

'আমি বলব, আফ্রিকার অভিশাপে পেয়েছে আপনাকে।'

'ঠাট্টা কোরো না, ওয়ালেস!'

তাঁবুর ফ্ল্যাপ খোলার শব্দ হলো। আবছা হতে হতে কণ্ঠদুটো মিলিয়ে গেল দূরে—বেরিয়ে গেছে ইটালিয়ান টাইকুন আর সুপারভাইজর।

কপাল ভাল, মনে মনে ভাবল রানা, মানসিনি বেরিয়ে যাওয়ায় সুবিধে হয়েছে ওর। নইলে কাজটা অনেক বেশি কঠিন হয়ে যেত। আন্দাজ করল, মোটামুটি দশটা মিনিট পাওয়া যাবে। এরই মধ্যে সারতে হবে কাজটা। ক্যানভাসের নীচের দিকটা ছুরি দিয়ে কেটে জায়গা করল ও, হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল তাঁবুতে। ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল সুটকেসগুলো।

ওগুলো নিয়ে ব্যস্ত হলো না রানা, একধার থেকে শুরু করল তল্লাশি। বাক্স-টাক্স যা পাচ্ছে, সব হাতড়ে দেখছে। বেশ কিছু ফার্নিচার এনেছে মানসিনি, তারমধ্যে একটা হলো আয়রনউডের অ্যান্টিক ক্যানোপি বেড—মশারির স্ট্যাণ্ডসহ। তোষকটা উল্টে দেখল, দেখল স্প্রিঙের বক্সটাও। নীচে দুটো ড্রয়ার আছে, একটা খুলতেই পাওয়া গেল স্যাটেলাইট ফোন—ওটা আবেলকে দিয়েছিল রানা নাকফাতে যাবার সময়। ফোনটা পকেটে ভরল ও, যে-দুটো জিনিসের জন্য এসেছে, তার মধ্যে এটা একটা। আরেকটা বাকি রয়ে গেছে।

মানসিনির ডেস্ক নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও এরপর। ওটাও অ্যান্টিক, দশটা ড্রয়ার আছে। তবে সবগুলো খুলেও কাঙ্ক্ষিত বস্তুটা পাওয়া গেল না। ঘড়ি দেখল, আট মিনিট পেরিয়ে গেছে। তাড়া অনুভব করল, সময় ফুরিয়ে আসছে। ডেস্কের পাশে একটা ছোট টেবিল আছে, ওপরটা কাগজপত্রে বোঝাই। সেগুলো উল্টেপাল্টে কিছু পাওয়া গেল না। হতাশা ভর করল রানার ভিতরে, প্ল্যানটা মাটি হতে চলেছে। খোঁয়াড়ে ফিরে গিয়ে আগামীকাল রাতে ফের চেষ্টা করাটাই হয়তো বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কিন্তু তাই বা সম্ভব কেমন করে? মৃত সৈনিকের লাশ আবিষ্কৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে মানসিনির সন্দেহ তুঙ্গে উঠবে। ওর শরীরের কাটাছেঁড়া দেখে আসল ঘটনা অনুমান করতে মোটেই অসুবিধে হবে না ধুরন্ধর লোকটার।

নায়লনের ছাদে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার শব্দ হচ্ছে, মানসিনির তাঁবুতে ফেরার শব্দ শোনা যাবে না। আবার সময় দেখল রানা। এগারো মিনিট... ওকে বেরিয়ে যেতে হবে। উল্টে পড়া লাগেজগুলো গোছাতেও মূল্যবান কয়েকটা মুহূর্ত ব্যয়

করতে হবে, ভিতরে আর দেরি করা চলে না। হতাশায় পা বাড়াতে গিয়ে থমকে গেল রানা, ওর ঠিক পাশেই গুঞ্জন করে উঠেছে মানসিনির ছোট্ট ফ্রিজটা—মোটর চালু হয়েছে। ওটা দেখা হয়নি। তাড়াতাড়ি ফ্রিজের দরজাটা খুলতেই মুখে হাসি ফুটল ওর। ভিতরে, নীচের তাকে পড়ে আছে ওর ন্যাপস্যাক, হাত ঢুকিয়ে ওর মধ্যে মেডিউসা-ফটোগ্রাফগুলোরও অস্তিত্ব টের পাওয়া গেল। বিড়বিড় করে ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাল ও, ছবিগুলো না পেলে ওর প্ল্যানটা মাঠে মারা যেত। মানসিনি নিশ্চয়ই মরুভূমির আর্দ্রতা থেকে বাঁচাতে ওগুলোকে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রেখেছিল।

ন্যাপস্যাকটা পিঠে ঝোলাল রানা, ফ্রিজ বন্ধ করে গোছাতে শুরু করল সুটকেসগুলো, সামান্য একটু জায়গা রাখল শুধু হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে যাবার জন্য। কাজটা শেষ হতে না হতে ইটালিয়ান টাইকুনের কণ্ঠ শুনে জমে গেল ও। আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে, তাঁবুর ঠিক বাইরে থেকে কথা বলছে লোকটা। চড়া গলায় ডাকছে কাকে যেন।

তাড়াতাড়ি মাটিতে শুয়ে পড়ল ও, আঁচড়াআঁচড়ি করে বেরিয়ে এল ফোকর দিয়ে। তার ঠিক পর পরই তাঁবুর ফ্ল্যাপ ঠেলে ভিতরে ঢুকল মানসিনি। কয়েক সেকেণ্ডের ব্যবধানের কারণে রানাকে দেখতে পেল না। দেখতে পেল না তাঁবুর কাটা জায়গাটাও—ওটা ঢাকা পড়ে গেছে সুটকেসের স্তূপের পিছনে।

কাদার মধ্যে শুয়ে জোরে জোরে শ্বাস ফেলতে শুরু করল রানা, উত্তেজনায় বেরিয়ে আসা ঘাম ধুয়ে যাচ্ছে বৃষ্টির পানিতে। মানসিনির কণ্ঠ শুনতে পেল, নিজের স্যাট-ফোনে কথা বলতে শুরু করেছে। বড় বাঁচা বেঁচে গেছে ও। একটুর জন্য ধরা পড়েনি। ধাতস্থ হয়ে উঠে বসল, কুড়িয়ে নিল রাইফেলটা—ওটা বাইরে রেখে তাঁবুতে ঢুকেছিল। পকেট থেকে বের করে ন্যাপস্যাকে ভরে ফেলল স্পেয়ার ম্যাগাজিন। তারপর ঘড়ি দেখল।

'ধ্যাত্তেরি!' নিচুস্বরে গাল দিল রানা। মাত্র পনেরো মিনিট আছে হাতে, এর ভিতর দিনাকে মুক্ত করে খনিমুখের কাছে পৌঁছুতে হবে। ন্যাপস্যাকটা পিঠে ঝুলিয়ে ছুট লাগাল ও।

ভাবছে, মানসিনিকে জিম্মি না করে ভুল করল কি না। ওর মাথায় অস্ত্র ঠেকিয়ে রিফিউজিদের হয়তো মুক্ত করা যেত। এখন যে-প্ল্যানটা নিয়ে এগোচ্ছে, তার চেয়ে জটিলতা অনেক কম ছিল তাতে। একটু ভেবে আনমনে মাথা নাড়ল ও। নাহ্, প্ল্যান যেটা করেছে, সেটাই ভাল। সফল হলে সব কূল রক্ষা করা যাবে ওতে। দৌড়ের গতি বাড়িয়ে দিল।

মেয়েদের খোঁয়াড়টা হুবহু পুরুষদেরটার মত। দুটোর মধ্যে দূরত্ব মাত্র চল্লিশ গজের মত। জনাত্রিশেক বিভিন্ন বয়সী নারী আর শিশু থাকে ওখানে। সময় কম, কাঁটাতারের বেড়া ভেদ করে দিনাকে বের করা সম্ভব নয়। গার্ডদেরকে কাবু করেই ওকে উদ্ধার করবে বলে ঠিক করল রানা। অ্যাকশনে যাবার আগে চেক করে দেখল অস্ত্রটা।

ঝটিকা-আক্রমণ চালাল ও, আচমকা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল প্রহরীদের ছাউনিতে। দু'জন রয়েছে ভিতরে—প্রথমজন টুলে বসে ঝিমোচ্ছে, অন্যজন

দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে। তৃতীয়জনকে দেখা গেল না কোথাও—হয় প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেছে, নয়তো মেয়েদের খোঁয়াড়ে ঢুকেছে রাতের শিকার আনতে।

ব্যাপারটা নিয়ে ভাববার সময় পেল না। ওকে ঢুকতে দেখেই ঝট করে সিধে হলো সিগারেট টানতে থাকা গার্ড। চেহারাটা চিনতে পেরেই বিস্ফারিত হয়ে গেল দৃষ্টি। কাঁধে ঝোলানো অস্ত্র হাতে নিতে গেল, কিন্তু সুযোগ পেল না। সাবমেশিনগানের বাট দিয়ে সজোরে তার কপালে আঘাত করল রানা, হাড় ভাঙার বিশ্রী শব্দে তন্দ্রা টুটে গেল দ্বিতীয়জনের; প্রথমজন উল্টে পড়ে যেতেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা। একই কায়দায় একেও ঘায়েল করতে চাইল রানা, কিন্তু পারল না। বাউলি কেটে আঘাতটা ফাঁকি দিল সৈনিক। ঝাঁপ দিল একপাশে নামিয়ে রাখা অস্ত্রের দিকে। পিছন থেকে লাথি কষল রানা, রাইফেলে হাত পৌঁছুনোর আগেই হুমড়ি খেল সৈনিক, কয়েক হাত সামনে ছিটকে পড়ল। হাত-পা ঝাপটে উঠে বসল—অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। দুই কদম এগিয়ে ফ্রি-কিক নেয়ার ভঙ্গিতে প্রচণ্ড এক লাথি মারল লোকটার চোয়ালের নীচে। দাঁতে দাঁত বাড়ি খেল লোকটার, বন্ধ হয়ে গেল চোখ। টুঁ শব্দ না করে নেতিয়ে পড়ল দ্বিতীয় সৈনিক।

ছাউনি থেকে বেরিয়ে মেয়েদের খোঁয়াড়ের দিকে তাকাল রানা। কিন্তু ভালমত দৃষ্টিগোচর হলো না কিছু। আলো নেই, বিজলি চমকালেও প্রবল বর্ষণের কারণে দশ ফুটের বেশি দৃষ্টি চলে না। ছুটতে শুরু করল ও, খোঁয়াড়ের গেটের কাছে পৌঁছুতেই তালাটা খোলা অবস্থায় পেল। ওর সন্দেহই ঠিক, তৃতীয় প্রহরী ভিতরে ঢুকেছে শিকার ধরতে। ও-ও ঢুকে পড়ল।

পুরুষদের খোঁয়াড়টার মত এখানেও প্লাস্টিকের তেরপল বিছানো হয়েছে। নীচে অসহায়ভাবে শীতে কাঁপছে নারী-শিশু। হঠাৎ একটা নারীকণ্ঠের চিৎকার ভেসে এল একপ্রান্ত থেকে। সেদিকে এগোতেই বৃষ্টির মাঝে দুটো ছায়ামূর্তি চোখে পড়ল, ধস্তাধস্তি করছে। ওর দিকে পিছন ফিরে আছে দুজনেই, কোনটা কে বোঝা যাচ্ছে না। লম্বাজনকেই প্রহরী ধরে নিয়ে এগোল রানা, রাইফেলটা ঝোলাল পিঠে। গুলি করা যাবে না, গুলির শব্দে মানসিনির গোটা বাহিনী জেগে উঠবে। তাই ছোট ছুরিটা নিল হাতে।

কাছে পৌঁছে আঘাত হানতে গেল ও, আর তখুনি টের পেল ভুলটা। আসলে খাটো মানুষটা সুদানিজ, লম্বাজন আর কেউ নয়—দিনা আবান! একটু ঘুরে গিয়ে সৈনিকটার গলা পেঁচিয়ে ধরল রানা, পাশ থেকে ছুরিটা আমূল ঢুকিয়ে দিল বুকের খাঁচায়। চেঁচাতে চাইল লোকটা, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বের করতে পারল না; তড়পাল, কিন্তু নিজেকে মুক্ত করতে পারল না রানার বাঁধন থেকে। উপর্যুপরি আরও কয়েকটা ঘা বসাল রানা, লোকটা নিস্তেজ হয়ে যেতেই ছুঁড়ে ফেলল ওকে কাদার মধ্যে। ছুরিটা কোমরে গুঁজে দিনার দিকে ফিরল ও। 'দেরি করে ফেলিনি তো?'

সোজা হলো দিনা। বলল, 'দেরি কোথায়, একেবারে ঠিক সময়ে এসেছ।' রানাকে জড়িয়ে ধরতে গেল ও।

'ওসব পরে হবে,' কাঠখোট্টা গলায় বলল রানা। 'আবেলের সঙ্গে দেখা করার জন্য মাত্র তিন মিনিট সময় আছে আমাদের হাতে। এসো!'

খোঁয়াড়ের অন্যান্য নারী ও শিশুরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, ওদের শান্ত থাকতে বলল দিনা। তারপর ছুটে ওখান থেকে বেরিয়ে এল দুজনে। গার্ডদের ছাউনি পেরুতে পেরুতে দিনা জানাল, 'অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। একটু পরেই বেরিয়ে গিয়ে পুরুষদেরকে মুক্ত করবে। তারপর সবাই লুকিয়ে পড়বে আশপাশের পাহাড়ে।'

'ভাল,' বলল রানা। 'আমাদের খোঁজ পাওয়াটা তা হলে খুব কঠিন হয়ে যাবে মানসিনির জন্য।' মনে মনে প্রার্থনা করল, ইটালিয়ান লোকটার প্রতিশোধস্পৃহা যেন শুধু ওর জন্যই বরাদ্দ থাকে। নইলে ধরা পড়া শ্রমিকদের কপালে খারাবি আছে।

খনিমুখের কাছে আরেকটা জায়গা কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা—ওখানে মহিলা-রা আকরিক ভেঙে হীরা বের করে। জায়গাটাতে এখন কেউ নেই, শুধুমাত্র একপাশের ছাউনির নীচে... যেখানে হীরা-ভর্তি সিন্দুকটা রাখা হয়েছে... সেখানে পাহারা দিচ্ছে দুজন নিঃসঙ্গ সৈনিক। ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে সাবধানে এগোল রানা। ক্যাটারপিলার এক্সক্যাভেটরটার উল্টোপাশে পৌঁছে থামল।

আবেলকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। দেরি করে ফেলেছে রানা আসতে, লোকটা যে কোথায় লুকিয়েছে, কে জানে। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল ও। খনিতে ঢোকার আগে আবেলের সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। আরেকটা কাজ দেবে—খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

'এবার কী?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল দিনা।

একটু দূরে নিথর দাঁড়িয়ে থাকা একটা ববক্যাটের উপর নজর আটকে গেল রানার। হালকা হাসি ফুটল ঠোঁটে। বলল, 'ওই যে... ওটা আমাদের ট্যাঙ্ক! এসো!'

দুজনে স্কিপলোডারটার কাছে পৌঁছুতেই জঞ্জালের একটা স্তূপের পিছন থেকে বেরিয়ে এল আবেল। বলল, 'আপনাদের নিয়ে চিন্তা হচ্ছিল। ভাবলাম, দুজনে অভিসারে চলে গেলেন কি না!'

'ইচ্ছে ছিল, কিন্তু পরিবেশটা দিনার পছন্দ হলো না,' হালকা রসিকতা করল রানা। 'মেয়েদের মন... বোঝোই তো!' আবেলের হাত ধরে হাসল ও।

'সব তৈরি,' জঞ্জালের স্তূপটা দেখাল আবেল। 'ডিটোনেটরটা ওর পিছনে আছে। মাইন-এন্ট্রান্সের ওপর ত্রিশ পাউণ্ড এক্সপ্লোসিভও বসিয়ে দিয়েছি। বৃষ্টির কারণে গার্ডরা কিচ্ছু দেখেনি।'

'অসুবিধে হয়নি তো?'

'উঁহু। আপনার ধারণাই ঠিক। মাইনিং হ্যামারটা দিয়ে সহজেই এক্সপ্লোসিভ লকারের তালা ভাঙতে পেরেছি—ওটা তেমন শক্ত ছিল না। পাহারাও রাখেনি ওরা ওখানে।'

'রাখবে কেন? গার্ড তো বসিয়েছে শুধু মানুষকে পাহারা দিতে। লকারটার কাছে কেউ পৌঁছুতে পারবে বলে ভাবেনি। ভাল তালাও লাগায়নি তাই। আমি

আগেই খেয়াল করেছি ব্যাপারটা।'

'কী নিয়ে কথা বলছ তোমরা?' জানতে চাইল দিনা।

'একটু পরেই দেখতে পাবে,' বলল রানা। পকেট থেকে স্যাটেলাইট ফোনটা বের করে দিল আবেলকে। 'নাম্বারটা সেটের মধ্যে প্রোগ্রাম করা আছে। টু-ফাইভ চেপে ডায়াল করলেই কল চলে যাবে। পাহাড়ের কারণে সিগনাল পাওয়া যাবে না এখানটায়, তোমাকে একটু দূরে যেতে হতে পারে। এখানকার কাজটা শেষ হলেই চলে যেয়ো।'

'কার সঙ্গে কথা বলব? কী বলব?' জানতে চাইল আবেল।

'মেজর জেনারেল রাহাত খান নামে এক ভদ্রলোক রিসিভ করবেন কলটা। তিনি আমার বস। বলবে যে, এমআরনাইন জরুরি মেসেজ দিচ্ছে, স্পেশাল কোড: *জিএক্স ফাইভ থ্রি যিরো*। তা হলেই উনি বুঝতে পারবেন—কলটা ভুয়া নয়। এখানকার লোকেশন আর পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবে ওঁকে। বলবে সাহায্য পাঠাতে। দরকার হলে যেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন, বা এফবিআই ডিরেক্টর রবার্ট সোয়ানের সাহায্য নেন। ভালমত বুঝিয়ে দিয়ো, পুরোদস্তুর মিলিটারি ট্রুপস দরকার এখানে, নইলে খুব শীঘ্রি অনেকে মারা যাবে। ...আর হ্যাঁ, এ-কথাও বোলো—সোহেল আহমেদকে ইজরায়েলি ডিফেন্স মিনিস্টার ইয়োরাম রাব্বাকের প্রাইভেট এজেন্টরা বন্দি করে রেখেছে, ওকে যেন উদ্ধারের ব্যবস্থা নেয়া হয়। কী, মনে থাকবে সব?'

'থাকবে,' মাথা ঝাঁকাল আবেল। 'কিন্তু আপনার অর্ধেক কথারই তো মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছি না। সোহেল আহমেদটা কে? তার সঙ্গে আমাদের এখানকার সম্পর্ক কোথায়?'

'পরে কখনও বুঝিয়ে বলব। এখন দেরি হয়ে যাচ্ছে, খনিতে ঢুকতে হবে আমাদেরকে।'

'তার দরকার কী?' বলল দিনা। 'ফোনটা তো তুমি নিজেই করতে পারো। সাহায্য চেয়ে আমরা নাহয় কিছুটা সময় লুকিয়ে থাকি! ট্রুপস এলে আবার চেহারা দেখানো যাবে।'

'ওরা কখন আসবে, তার কোনও ঠিক নেই, দিনা,' রানা বোঝাল। 'এর ভিতর আমাদের পালানোর খবর পৌঁছে যাবে মানসিনির কাছে। ফোনটা যে আমি চুরি করে এনেছি, তা-ও টের পেয়ে যাবে। দুইয়ে দুইয়ে চার মেলাতে কষ্ট হবে না ওর, আমরা কী করতে যাচ্ছি—বুঝে ফেলবে। হাতের কাছে যাদেরকে পাবে, তাদের সবাইকে খুন করে সঙ্গে সঙ্গে সটকে পড়বে বদমাশটা। আমি তা হতে দিতে পারি না। যত যা-ই হোক, ওকে আটকে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। উপত্যকায় থাকতে যেন বাধ্য হয় ও। ক্লিয়ার?'

মাথা ঝাঁকাল দিনা।

'ফোনটা উনি করলে ভাল হয় না?' ইতস্তত করে বলল আবেল। 'ওঁর ইংরেজি আমার চাইতে অনেক ভাল।'

'না, দিনাকে আমার দরকার,' সঙ্গিনীর দিকে ফিরল রানা। 'অবশ্য তোমার যদি খনিতে ঢুকতে আপত্তি না থাকে আর কী!'

'আপত্তি নেই,' পরিষ্কার গলায় বলল দিনা। 'আমি তোমার সঙ্গেই আছি।'

'ঠিক আছে, অ্যাবেল। তা হলে রেডি হয়ে যাও। আমরা এন্ট্রান্সে ঢুকতে শুরু করলেই ফাটিয়ে দিয়ো বোমাটা। তারপর চলে যেয়ো ফোন করতে।'

'ঠিক আছে,' জঙ্গালের পিছনে হারিয়ে গেল আবেল।

দিনার হাতে একে-ফোরটি সেভেনটা তুলে দিল রানা। 'কেউ বাধা দিতে এলেই গুলি চালাবে।'

মাথা ঝাঁকাল দিনা। দুজনে উঠে পড়ল স্কিপলোডারে। চাবিটা ইগনিশনেই ঝোলানো আছে, ওটা ঘুরিয়ে ইঞ্জিন চালু করল রানা, বাকেটটা মাটি থেকে তুলে সামনের ছাউনির দিকে ছোটাল বাহনটাকে। বাকেটটা আরেকটু তুলল ও, গুলি করা হলে যেন বর্ম হিসেবে কাজ করে।

গুরু গুরু আওয়াজে চমকে উঠল সিন্দুকের ছাউনিতে বসে থাকা দুই গার্ড। ছাদে লাগানো স্পটলাইটের আলোয় বিকট একটা মূর্তির মত ছুটে আসতে দেখল ওটাকে। অ্যাসল্ট রাইফেল তুলে ফায়ার শুরু করল তারা। ইস্পাতের বাকেটে ফুলকি তুলে ছিটকাতে শুরু করল বুলেট।

'গুলি করো!' ইঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে চেঁচাল রানা।

মাথা ঝাঁকিয়ে ক্যাব থেকে শরীরের একাংশ বের করে দিল দিনা, পাল্টা গুলি শুরু করল। পরমুহূর্তে প্রাকৃতিক বৃষ্টিকে হার মানিয়ে বুলেটের বৃষ্টি ছুটে এল ববক্যাটের দিকে। চোখের পলকে সামনের দুটো চাকা ফুটো হয়ে গেল, বেরিয়ে গেল বাতাস। অবাক হয়ে গেল রানা, মাত্র দুজনের পক্ষে এত গুলি কীভাবে ছোঁড়া সম্ভব? হঠাৎ বুঝতে পারল, হিসেবে ভুল হয়েছে ওর—শুধু ছাউনির তলার দুজনই নয়, খনিমুখের কাছে আরও গার্ড আছে, তাদেরকে দেখতে পায়নি ওরা। ববক্যাট নিয়ে হামলা চালাবার সঙ্গে সঙ্গে ছাউনির দুই গার্ডের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে তারা। ব্যাপারটা নিয়ে এখন আর উদ্বিগ্ন হয়ে লাভ নেই, ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেছে, এখন ঢেউ সামলাতেই হবে। থ্রটলের লিভার পুরো শেষ মাথায় ঠেলে দিল রানা, কিছুতেই থামবে না। ফাটা-টায়ারের দুই চাকায় ভর দিয়েই ছুটে চলল ববক্যাট, ঝাঁকি খাচ্ছে অনবরত।

ঝুঁকি নিয়ে বাকেটের তলা দিয়ে একটু উঁকি দিল রানা। সঙ্গে সঙ্গে গুলি খেয়ে ছিটকে পড়ল এক গার্ড, কাদায় তাকে মুখ থুবড়ে পড়তে দেখল ও। লক্ষ্যভেদের জন্য দিনাকে বাহবা দিতে গিয়েই থমকে গেল—মেয়েটা ম্যাগাজিন বদলাচ্ছে! ও গুলি করেনি! কে করল তা হলে? পরমুহূর্তে আরেকজন সুদানিজ ঘায়েল হলো, তার খুলি উড়িয়ে নিয়ে গেল ঘাতক বুলেট। আবেলের কথা ভাবল রানা, আড়াল থেকে ও-ই গুলি করছে নাকি? কিন্তু এই অ্যাঙ্গেলে তো ওর পক্ষে ফায়ার করা সম্ভব নয়! আরেকটা ফায়ার হতেই রানার কানে ধরা পড়ল হাই-পাওয়ার রাইফেলের আওয়াজ—এ-অস্ত্র ওদের কারও কাছে নেই।

মানেটা পরিষ্কার হয়ে গেল রানার কাছে। তৃতীয় একটা পক্ষ রয়েছে লড়াইটাতে। একজন স্নাইপার... রানা আর দিনাকে সাহায্য করে চলেছে। লোকটা কোন্ দলের হতে পারে, তা বুঝতেও অসুবিধে হচ্ছে না। নিশ্চয়ই ইজরায়েলি টেরোরিস্ট গ্রুপের! ওদের ছায়াও দেখতে পায়নি রানা আসমারা

ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর, ভেবেছিল ফাঁকি দিতে পেরেছে... কিন্তু স্নাইপ-শটের মাধ্যমে প্রতিপক্ষ বুঝিয়ে দিচ্ছে—কতটা ভুল করেছিল ও। কতদিন ধরে ওরা ক্যাম্পটার উপর নজর রাখছে, এবং কী-ই বা ওদের প্ল্যান... তা জানার উপায় নেই। তবে আপাতত যে-টুকু সাহায্য ওরা করে চলেছে, তার পূর্ণ-সদ্ব্যবহার করবে বলে ঠিক করল রানা।

'ক্লিপটা তাড়াতাড়ি খালি করো,' দিনাকে বলল রানা। 'সময় হয়ে গেছে।'

মাইন-এন্ট্রান্স থেকে বিশ গজ দূরে ওরা তখন। আরও কয়েকজন সুদানিজ পটল তুলল, উপর থেকে অচেনা আততায়ীর গুলিতে লুটিয়ে পড়ছে বিনা-প্রতিরোধে। রানা বুঝতে পারল, এন্ট্রান্স বরাবর পাহাড়ের উপরে আছে ইজরায়েলি স্নাইপার, আবেল ওর কাছাকাছিই বিস্ফোরক পেতেছে, অন্ধকার আর বৃষ্টির কারণে ব্যাটা টের পায়নি বোধহয়। বিস্ফোরণ ঘটলেই মারা পড়বে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে সেজন্য অনুতাপ নেই রানার ভিতর, নিঃস্বার্থভাবে ওদেরকে সাহায্য করছে না ইজরায়েলি লোকটা, করছে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। ওর বাঁচামরা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।

তুমুল বেগে ছোট্ট টিনের ছাউনিটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ববক্যাট। ব্লেড আর ধাতব দেয়ালের মাঝে চাপা পড়ল একজন গার্ড। তাসের ঘরের মত পুরো কাঠামোটাই ধসে পড়ল আচমকা আঘাতে। মাঝখানে মাথা জাগাল দুধ-সাদা সিন্দুকটা। অত্যাধুনিক ডিজাইনে তৈরি ওটা, আকার একটা স্টিমার-ট্রাঙ্কের মত। বাকেটের এক ঝটকায় কাঁটাচামচের মত ওটাকে তুলে নিল রানা। সিন্দুকটা অত্যন্ত ভারী, বাড়তি বোঝা বইতে গিয়ে গোঁ গোঁ করে প্রতিবাদ জানাল ববক্যাটের ইঞ্জিন, কমে গেল গতি।

খনিমুখের দশ ফুটের মধ্যে পৌঁছুতেই কেঁপে উঠল মাটি। উপরে... অন্ধকারে... পাহাড়ের গায়ে রক্তলাল শিখা মেলল কয়েকটা বিস্ফোরণ। ডিটোনেটরটা অ্যাক্টিভেট করেছে আবেল। পাহাড়ি ঢালের স্ট্যাবিলিটি নষ্ট হয়ে গেল শকওয়েভের ধাক্কায়, ভূমিধস হয়ে নামতে শুরু করল পাহাড়ের লাখ লাখ টন মাটি-পাথর। সারা দুনিয়া কেঁপে উঠছে ভয়াবহ আওয়াজে। প্রমাদ গুনল রানা, স্কিপলোডারের ইঞ্জিনটা মরণ-আর্তনাদ ছাড়ছে। গুলিতে নাজুক কোনও অংশ ঘায়েল হয়েছে ওটার। বাহনটা নিয়ে খনিমুখের ভিতরে ঢোকা সহজ হবে না।

রানা চেঁচাল, 'গেট রেডি! দৌড়াতে হতে পারে আমাদের!'

আরেকটু সামনে বাড়ল ববক্যাট। ওটার ছাদে পাথরের টুকরো বাড়ি খাবার শব্দ হতেই লিভারটা আরেকটু চেপে ধরল ও। 'কাম অন! ডোবাসনে, ভাই!'

কথাটা শুনেই যেন গতি একটু বাড়াল স্কিপলোডার, দশ গজ দূরের মাইন-এন্ট্রান্সের দিকে গা-ঝাড়া দিয়ে আগে বাড়ল। বৃত্তাকার মুখটা পেরিয়ে টানেলের ভিতর প্রায় লাফ দিয়ে ঢুকল বাহনটা, পিছনে প্রবল ঢলের মত নেমে এল মাটি-পাথরের উদ্দাম ঢল। এন্ট্রান্সের খোলা জায়গাটা ঢেকে গেল চোখের পলকে, উপত্যকার সারফেসে বাড়ি খেয়ে টানেলের ভিতরেও ঢুকে পড়ল একটা ধারা।

'রানা!' আচমকা চেঁচিয়ে উঠল দিনা।

ওর ডাক শুনে ছাদের দিকে তাকিয়েই আঁতকে উঠল রানা। বিস্ফোরণের ধাক্কায় প্রাচীন টানেলটার কাঠামো দুর্বল হয়ে গেছে। চোখের সামনে সৃষ্টি হচ্ছে আঁকাবাঁকা অসংখ্য ফাটল। খসে পড়তে চলেছে পুরো টানেলটা। বাহন ছেড়ে নেমে পড়বে কি না, ভাবল একবার ও। কিন্তু বাতিল করতে হলো চিন্তাটা। হীরা-ভর্তি সিন্দুকটা যতটা সম্ভব খনির ভিতরে নিয়ে যেতে হবে ওকে, যাতে সহজে ওটা উদ্ধার করা না যায়। ওটাই ওর টোপ। এন্ট্রান্সের এত কাছে ফেলে যাওয়া যাবে না। দাঁতে দাঁত পিষে থ্রটলটা ধরে রাখল ও। নেমে আসতে থাকা ছাদের টুকরোগুলো ঠেলে পিষে ছুটে চলল স্কিপলোডার। পিছনে ভয়ানক আওয়াজ হলো, টানেল ধসে পড়তে শুরু করেছে। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে যেন জীবনবাজি রেখে ছুটছে স্কিপলোডার। প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে বাহনের উপর আছড়ে পড়তে থাকা ছোট পাথরের পরিমাণ, বড় চাঁই নেমে আসাটা স্রেফ সময়ের ব্যাপার।

তাও হাল ছাড়ল না রানা, লিভার চেপে এগিয়ে নিয়ে চলল বাহনটাকে। দুইশ' গজের মত যেতেই ছাদের ফাটলগুলোকে পেরিয়ে এল ওরা, পাথর ধসকে ফেলে দিল পিছনে। রুদ্ধশ্বাস আরও কয়েকটা মিনিট পেরুনোর পর কমে গেল বুক-কাঁপানো গর্জন। ইঞ্জিনটা ততক্ষণে বন্ধ হবার জোগাড়, যক্ষ্মারোগীর মত অনবরত কেশে চলেছে। ইগনিশন-কি ঘুরিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল রানা। তাকাল পিছনে।

থেমে গেছে টানেলের ধস। পেরিয়ে আসা দুইশ' গজ জায়গা এখন পুরোপুরি মাটি আর পাথরের দখলে। তবে তাণ্ডবটা শেষ হয়নি, পায়ের নীচে এখনও কাঁপছে জমি—বাইরের অবস্থা পুরোপুরি শান্ত হয়নি। হালকা একটু কাশল রানা, ধুলো ঢুকে গেছে নাকে-মুখে। কেশে উঠল দিনাও। ওরা থামতেই অদ্ভুত এক নীরবতা নেমে এল টানেলের ভিতর।

সামনের দিকে তাকাল রানা। ওয়ার্কিং এরিয়ার মেইন জেনারেটর থেকে লাইন এনে দেয়ালের গায়ে সার বেঁধে ঝোলানো হয়েছে অনেকগুলো বালব, দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ভেঙে গেছে কয়েকটা, বাকিগুলো জ্বলছে। আলো-আঁধারির এক বিচিত্র পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে সুড়ঙ্গটার ভিতর, একটু ঢালু হয়ে নেমে গেছে পাতালের দিকে।

'এসবের মানে কী?' একটু ধাতস্থ হয়ে পিছন ফিরে তাকাল দিনা, হতভম্ব হয়ে গেছে তাণ্ডব কাণ্ডটা দেখে। ওকে রানার প্ল্যান খুলে বলা হয়নি।

'কিছু না,' হালকা গলায় বলল রানা। 'কবর হলো আরকী আমাদের। এসো।'

ষোলো

দু-চোখে অবিশ্বাস নিয়ে দেখল ইয়াশাদ পাহাড়ি ঢালটার ধসে পড়া। ঘটনাস্থলের কোয়ার্টার মাইল দূরে আরেকটা পাহাড়ের গায়ে একটা চাতালে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে সে। নিজের স্নাইপার সঙ্গীটির চমৎকার শুটিঙের তারিফ করছিল মনে মনে, পরমুহূর্তেই নরক ভেঙে পড়ল। ইয়াশাদকে হতবাক করে দিয়ে মাটি-পাথরের প্রবল স্রোতের ভিতর হারিয়ে গেল স্নাইপার। সেকেণ্ড-জেনারেশন নাইট-ভিশন গ্লাস চোখে থাকায় ধ্বংসযজ্ঞটা পরিষ্কার দেখতে পেল টেরোরিস্ট নেতা। নিজের নিবেদিতপ্রাণ এক সঙ্গীকে তো হারালই, রানা আর দিনা আবানও টানেলে ঢুকতে পেরেছে কি না—বুঝতে পারল না। ওরাও অ্যাভালাঞ্চের তলায় পড়ে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে গেছে সম্ভবত।

তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় টিমটার সঙ্গে রেডিওতে যোগাযোগ করল ইয়াশাদ, দু'মাইল দূরে পজিশন নিয়েছে ওরা। মাইনিং ক্যাম্পের উপর হামলা করা হয়েছে কি না, নিশ্চিত হতে চায়। কিন্তু নেতিবাচক রিপোর্ট এল। তার মানে মাইন-এন্ট্রান্স ছাড়া আর কোথাও গোলমাল নেই।

বিভ্রান্ত হয়ে গেল টেরোরিস্ট নেতা। কী ঘটছে, বুঝতে পারছে না। নাইট-ভিশনের কল্যাণে রানাকে বন্দিশালা থেকে কাঁটাতার ভেদ করে বেরিয়ে আসতে দেখেছে সে। তারপর ওকে সুপারভাইজরদের লিভিং এরিয়ায় অনুপ্রবেশ করতে দেখেছে, দেখেছে দিনা আবানকে মুক্ত করতেও। খনির দিকে ওদের দুজনের ফিরে আসাটাই ধাঁধার মত লেগেছে তার কাছে। উপত্যকা থেকে পালিয়ে না গিয়ে খনির দিকে এল কেন—সেটা বুঝতে পারছিল না। তারপর তো পাহাড়টাই ধসে পড়ল! নিশ্চয়ই বাঙালি গর্দভটা কোনও বুবি ট্র্যাপ অ্যাক্টিভেট করেছে। এ ছাড়া এর পিছনে আর কোনও যুক্তি থাকতে পারে না।

কারণ যা-ই হোক, ঘটনাটার ভয়াবহ ফলাফল আঁচ করতে অসুবিধে হচ্ছে না ইয়াশাদের। অ্যাভালাঞ্চের ফলে প্রাচীন খনিটা চাপা পড়ে গেছে। যে-মহাযজ্ঞ চালিয়ে ওটাকে খোলা হয়েছিল, চোখের পলকে তা ভণ্ডুল হয়ে গেছে। দোষটা সম্পূর্ণ মাসুদ রানার। হতাশায় ছেয়ে গেল ওর অন্তর। ইয়াশাদ প্রার্থনা করল: ব্যাটা যেন পাথরে চাপা পড়ে ভর্তা হয়ে যায়। ওদের মহাপবিত্র ধর্মীয় নিদর্শন—আর্ক অভ দ্য কাভানেন্ট উদ্ধারের সমস্ত সম্ভাবনা নস্যাৎ হয়ে গেছে রানার কারণে। আর কিছুতেই ইয়াশাদের পক্ষে খনির মুখটা খোলা সম্ভব নয়।

ইকুইপমেন্ট আর রিফিউজি ইরিত্রিয়ানরা এসে পৌঁছুনোর পর থেকেই খনিটাকে অবজারভেশনে রাখছে ইজরায়েলি টিমটা। আসমারা থেকে চার্টার করা বিমানে চড়ে এসেছে ওরা, আকাশ থেকে উপত্যকাটা খুঁজে বের করতে কোনও অসুবিধে হয়নি। ওখানে সুদানিজরা আগেই পৌঁছে গেছে দেখে বিকল্প প্ল্যান সাজিয়েছে ইয়াশাদ, ভ্যালি অভ ডেড চিলড্রেন থেকে দশ মাইল দূরে

প্যারা-জাম্প করে নেমেছে; তারপর পায়ে হেঁটে, পাহাড় টপকে পৌঁছেছে টার্গেটের কাছাকাছি। পাহাড়ের গায়ে লুকানোর মত জায়গা খুঁজে নিয়ে অবজারভেশন পোস্ট বসিয়েছে, সেখানে পালা করে ডিউটি দিচ্ছে সবাই।

ধৈর্য ধরবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইয়াশাদ। সহজ একটা প্ল্যান এঁটেছে। খোঁড়াখুঁড়ির কাজটা প্রতিপক্ষই করুক, সেধে নিজের ঘাড়ে ঝামেলা নেবার মানে হয় না। তা ছাড়া সুদানিজ বাহিনীটা বড়, খনির দখল নিতে গেলে অযথা নিজেরা মরবে। তারচেয়ে অপেক্ষা করাটাই শ্রেয় বলে মনে হয়েছে তার কাছে। এক সময় না এক সময় ঠিকই আর্কটা খুঁজে পাবে সুদানিজরা, ওটা খনি থেকে বের করে আনলেই চুরি করবে ওরা, কিংবা ছিনিয়ে নেবে।

কিন্তু এক সপ্তাহের বেশি সময় পেরিয়ে যাবার পরও আর্টিফ্যাক্টটাকে উদ্ধার হতে দেখেনি ইজরায়েলিরা। ইয়াশাদ তাতে চিন্তিত নয়, কিন্তু দেশ থেকে প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী ইয়োরাম রাবাক ক্রমাগত চাপ দিয়ে চলেছেন—দরকার হলে যেন খনির দখল নিয়ে আর্কটা খুঁজে বের করা হয়। ওটা নিয়ে যাবার জন্য একটা সিএইচ-৫৩ সুপার স্ট্যালিয়ন হেলিকপ্টার বসিয়ে রেখেছেন তিনি, খবর দিলেই চার ঘণ্টার ভিতর ইরিত্রিয়ায় হাজির হয়ে যেতে পারবে যান্ত্রিক ফড়িংটা।

ইয়োরাম রাবাকের এই অস্থিরতার কারণ বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না ইয়াশাদের। সোহেল আহমেদ পালিয়ে গেছে, সর্বাত্মক চেষ্টা করেও তাকে খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হয়েছেন ডিফেন্স মিনিস্টার। ইয়াশাদকে আসল খবর বলছেন না বটে, কিন্তু ওর বুঝতে বাকি নেই—বাঙালি লোকটাকে ইতোমধ্যে বিসিআই উদ্ধার করে ফেলেছে; হয়তো এর মধ্যে দেশেও ফিরে গেছে সে। এই ব্যর্থতার জন্য ইয়াশাদের টিম যতটা দায়ী, তার চেয়ে রাবাক নিজেই বেশি দায়ী। লোকটা নিজেই সেফ প্যাসেজ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল ওদেরকে, তার ফলেই কারফিউ ভেঙে বের হয়েছিল টিমটা, বিপদে পড়ে গিয়েছিল। এই সত্য ডিফেন্স মিনিস্টার নিজেও জানে, তাই চোটপাট করেনি ইয়াশাদের উপর। ওকে খালি তাড়া দিয়ে চলেছে আর্কটা উদ্ধারের জন্য। সোহেল আহমেদ মুখ খুললে বিপাকে পড়ে যাবে লোকটা, এখন শুধু আর্ক উদ্ধারের কৃতিত্ব দিয়েই সমস্ত সমালোচনা আর অভিযোগ চাপা দিতে পারবে সে, অন্য কিছু দিয়ে নয়। নির্বাচন নিয়ে আর মাথা ঘামাচ্ছে না রাবাক। পিঠ বাঁচানোর জন্যই আর্কটা তার চাই। পরে ওটা কী কাজে আসবে, তা সময়মতই নাহয় দেখা যাবে।

শালা দু'মুখো সাপ! বিড়বিড় করে গাল দিল ইয়াশাদ। পাগল করে দিচ্ছে লোকটা ওকে। রাবাকের কারণেই মাসুদ রানাকে এখন পর্যন্ত খুন করতে পারেনি সে। ডিফেন্স মিনিস্টারের ধারণা: এতদূর যখন পৌঁছতে পেরেছে, আর্কটা দ্রুত উদ্ধার করে আনবার ক্ষমতা শুধুমাত্র রানারই আছে। জিনিসটা হাতে পাবার আগে তাই ওর গায়ে ফুলের টোকাও দিতে নিষেধ করে দিয়েছে সে। আজ রাতে ওই একই কারণে বাঙালিটাকে বাঁচাবার জন্য সঙ্গী স্নাইপারকে নির্দেশ দিতে হয়েছে ইয়াশাদের। খনির দিকে রানাকে ফিরতে দেখে মনে হচ্ছিল, কিছু একটা প্ল্যান করেছে ও, তাতে ওদেরই উপকার হবে। কিন্তু হায়... শেষ পর্যন্ত ব্যাকফায়ার করেছে ওই প্ল্যান, পাহাড় ধসে খনিটাই বন্ধ হয়ে গেছে।

ব্যর্থতার স্বাদ পেতে শুরু করেছে সে।

নীচের দিকে চোখ ফেরাল টেরোরিস্ট নেতা। গণ্ডগোলটার জায়গায় জটলা পাকাচ্ছে ক্যাম্পের লোকেরা। সাদা চামড়ার দুজন মানুষ প্রচণ্ড হাঁকডাক ছাড়ছে। একজন নিশ্চয়ই মার্নাসিনি, অন্যজন তার বিশালদেহী সুপারভাইজর। এত দূর থেকে কথাবার্তা ঠিকমত শোনা গেল না, তবে ওদের দুজনের প্রশংসনীয় নেতৃত্ব দেখে মুগ্ধ হলো ইয়াশাদ। খুব দ্রুত হতভম্ব লোকজনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করল তারা, কাজে নামাল সবাইকে। কয়েক মিনিটের ভিতর লণ্ঠন এনে আলোকিত করা হলো পাহাড়ি ধসের জায়গাটা। এক্সক্যাভেটরটা চালু করা হলো, ওটার সাহায্যে সরানো হচ্ছে মাটি-পাথরের স্তূপ। যন্ত্রের পাশাপাশি শ্রমিকদেরও হাত লাগাতে হলো, কোদাল আর ঝুড়ি নিয়ে কাজে নেমে পড়ল তারা। বেশ কিছু রিফিউজি পালিয়ে গেছে রানা আর দিনা আবানের পিছু পিছু, তাদের ধরে আনার জন্য পাঠানো হলো সৈনিকদের ছোট একটা গ্রুপ।

ঝড়-বৃষ্টির বাধা না মেনে বিস্ফোরণ ঘটার আধঘণ্টার মধ্যেই অনেকখানি জায়গা পরিষ্কার করে ফেলা হলো। মার্নাসিনি ও তার সুপারভাইজরদের দক্ষতা দেখে অবাক হয়ে গেল ইয়াশাদ। খুবই সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করে চলেছে তারা। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে—খুব শীঘ্রি খনির মুখটা আবার খুলে ফেলবে। খুশি হয়ে উঠল ইয়াশাদ, আশা তা হলে এখনও ফুরিয়ে যায়নি। খনিটা রি-ওপেন করলে চুরি করে ভিতরে ঢুকতে পারবে ওর টিম। রানা নির্ঘাত মারা পড়েছে, বেঁচে থাকলেও ওর ওপর আর ভরসা রাখার মানে হয় না, তারচেয়ে নিজেরাই আর্কটা খুঁজে বের করবে। আর্কটা শুধু ইয়োরাম রাবাকের নয়, ওদেরও প্রয়োজন। ওটার বিনিময়ে দুষ্ট-মন্ত্রীর কাছ থেকে নিজেদের নিরাপত্তা আদায় করে নেবে ইয়াশাদ।

ভাবতে অবশ্য খারাপ লাগে—আর্কটা শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার হবে। যে-পদ্ধতিতে ওটাকে হস্তগত করতে চলেছে ওরা, সেটা ওই পবিত্র বস্তুটির ভিতরে ধারণ করা ঐশ্বরিক নির্দেশের সরাসরি বরখেলাপ। তবে জিনিসটা শেষ পর্যন্ত ইজরায়েলে ফিরে যাবে, সেটুকুই সান্ত্বনা।

পাহাড়ি চাতালের দুটো বোল্ডারের মাঝখানে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে টেরোরিস্ট নেতা। সহ্য করে চলেছে প্রবল বর্ষণের নির্দয় আক্রমণ। পাহাড় থেকে নেমে আসা কাদার স্রোতে নোংরা হয়ে গেছে গা। নীচের দিকে তাকিয়ে ভাবনার সাগরে ডুবে গিয়েছিল, হঠাৎ সতর্কিত হয়ে উঠল একটা নতুন শব্দ পেয়ে। পাহাড়ি ঢালে কার যেন পায়ের আওয়াজ। সম্ভবত কোনও রিফিউজি... পাহাড় টপকে পালাবার চেষ্টা করছে। সুদানিজ সৈনিকও হতে পারে, পলাতকদের খোঁজে বের হয়েছে। দুই পাথরের খাঁজে আরেকটু জড় সড় হয়ে গেল ইয়াশাদ, আগন্তুককে ফাঁকি দিতে পারলে ভাল হয়, নইলে খুনোখুনির মধ্যে যেতে হবে।

কয়েক মিনিট পর আবার মনোযোগ টুটে গেল—এবার মানুষের গলা শোনা যাচ্ছে। কান পাতল সে, হয়তো দুজন ইরিত্রিয়ান একসঙ্গে উঠে এসেছে

পাহাড়ে, পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে। কিন্তু কিছুটা সময় পেরোতেই টের পেল—ঘটনা তা নয়। একটাই কণ্ঠ ভেসে আসছে কানে। আলাপচারিতা শুনে বুঝতে অসুবিধে হলো না, লোকটা ফোনে কথা বলছে... কথা বলছে ইংরেজিতে!

ওয়াশিংটন ডিসি। হোয়াইট হাউস।

এসকর্ট করে ওভাল অফিসে নিয়ে যাওয়া হলো সম্মানিত তিন অতিথিকে। ন্যাশনাল আণ্ডারওয়াটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সির চিফ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন, এফবিআই ডিরেক্টর রবার্ট সোয়ান এবং বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর চিফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান। বিশেষ আমন্ত্রণ পেয়ে এসেছেন বিসিআই চিফ, অন্য দুজনকেও মিটিঙে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ফিটফাট পোশাক পরা একজন এজেন্ট খুলে ধরল দরজাটা, একে একে গোলাকার অফিস কক্ষটাতে প্রবেশ করলেন তিনজনে।

মার্কিন প্রেসিডেন্টকে খাঁটি ভদ্রলোক বললে কম বলা হয়, অহমিকা বলতে কিছু নেই তাঁর ভিতর। অতিথিদেরকে ঢুকতে দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন, এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানালেন করমর্দন করে। রাহাত খানের হাত ধরে ঝাঁকি দিয়ে বললেন, 'নাইস টু মিট ইউ, মেজর জেনারেল। আপনার কথা অনেক শুনেছি।'

'আমি সম্মানিত বোধ করছি, মি. প্রেসিডেন্ট,' মৃদু হেসে বললেন রাহাত খান।

'প্লিজ, বসুন আপনারা।' সোফার দিকে ইশারা করলেন প্রেসিডেন্ট।

বেল বাজিয়ে একজন স্টিউয়ার্ডকে ডাকলেন তিনি, সম্ভবত রাহাত খানের সম্মানেই উইস্কির পরিবর্তে কফি পরিবেশনের নির্দেশ দিলেন। তারপর ফিরলেন অতিথিদের দিকে। বললেন, 'বিশেষ কারণে আপনাদের সবাইকে আসতে বলেছি আমি। মিটিঙে মেজর জেনারেল রাহাতের উপস্থিতিটা খুবই প্রয়োজন বলে মনে হয়েছে আমার কাছে। বেশ কয়েকদিন কেটে গেছে ইতিমধ্যে। আর হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা চলছে না। আপনাদের পরামর্শ চাই।'

'ইরিত্রিয়ার ব্যাপারটা নিয়ে?' জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।

'একজ্যাক্টলি,' মাথা ঝাঁকালেন প্রেসিডেন্ট। 'বিভিন্ন দিক থেকে রিপোর্ট এবং পরামর্শ আসছে আমার কাছে। কিন্তু সরাসরি আপনাদের মতামত জানা দরকার আমার। পরিস্থিতিটা কী, অ্যাডমিরাল?'

'রিপোর্ট করবার মত তেমন কিছু নেই, মি. প্রেসিডেন্ট। খনিটার লোকেশন খুঁজে বের করার জন্যে নুমার কম্পিউটার ফ্যাসিলিটি এখনও কাজ করছে।'

'এগিয়েছে কতদূর?'

'আগে যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি আমরা।'

'সার্চটা ত্বরান্বিত করবার কোনও কায়দা আছে?'

'মহাশূন্যে এ-মুহূর্তে যে-তিনটে মেডিউসা স্যাটেলাইট আছে, সেগুলোকে

ইরিত্রিয়ার উপরে নিয়ে স্ক্যান করবার ইচ্ছে ছিল আমাদের, কিম্বারলাইট পাইপটার লোকেশন পেলে খনিটারও খোঁজ পেতাম। কিন্তু এনএসএ প্রস্তাবটাতে রাজি হয়নি। আপনি সেটা জানেন।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন প্রেসিডেন্ট। 'ওদের যুক্তিটাও জোরালো। স্যাটেলাইটগুলো মধ্যপ্রাচ্য-সহ অন্যান্য বৈরী রাষ্ট্রের উপর নজর রাখছে। অরবিট শিফট করলে দীর্ঘ সময়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ইন্টেলিজেন্স থেকে বঞ্চিত হব আমরা।'

'সেক্ষেত্রে অপেক্ষা করা ছাড়া তো আর কোনও উপায় নেই।'

'আপনার কী ধারণা, মেজর জেনারেল?' রাহাত খানের দিকে ফিরলেন প্রেসিডেন্ট। 'ওখানে তো আপনার সেরা এজেন্ট রয়েছে। তার সঙ্গে যোগাযোগের কোনও উপায় আছে আপনার?'

'সেরা এজেন্ট নয়, সেরা এজেন্টদের অন্যতম একজন,' সংক্ষেপে শুধরে দিলেন রাহাত খান।

'তারমানে আপনি সত্যি ভাগ্যবান,' দীর্ঘশ্বাস চেপে মন্তব্য করলেন প্রেসিডেন্ট। 'আমাদের সি.আই.এ. চিফের মুখে আমরা শুধু একটা কথাই শুনে আসছি—ভাল এজেন্টের বড় অভাব, আজকাল কারও ওপর ভরসা রাখা যায় না। এনিওয়ে, ওর সঙ্গে যোগাযোগ...'

'দুঃখিত, মি. প্রেসিডেন্ট। যতক্ষণ ও নিজে যোগাযোগ না করছে, ততক্ষণ আমাদের কিছুই করবার নেই।'

'এক্সকিউজ মি, স্যর,' বলে উঠলেন রবার্ট সোয়ান। 'দশদিন হয়ে গেল অপেক্ষাই করছি আমরা। রানার উপর অনাস্থা থেকে বলছি না, কিন্তু খারাপ দিকটাও মাথায় রাখতে হবে আমাদেরকে। ও হয়তো আর কোনোদিনই যোগাযোগ করতে পারবে না আমাদের সঙ্গে...'

'না!' জোর গলায় বলে উঠলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'রানা বেঁচে আছে, রবার্ট। আমি শিওর! আগেও বহুবার ভয়ানক সব পরিস্থিতি থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে ও!'

'দুঃখিত, আমি আসলে ওভাবে কথাটা বলতে চাইনি,' বললেন সোয়ান। 'রানা হয়তো বেঁচে আছে, কিন্তু নিরাপদে আছে, এ-কথা বলবার উপায় নেই। যদি সবকিছু ঠিকঠাক-ই থাকত, তা হলে এর মধ্যে অন্তত একবার নিশ্চয়ই যোগাযোগ করত আমাদের সঙ্গে।'

'কী করা যায় তা হলে?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

'আমি বলব, ইরিত্রিয়ানদেরকে ব্যাপারটা জানিয়ে একটা টিম পাঠানো হোক ওখানে। পুরোদস্তুর মিলিটারি টিম।' বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।

'পারলে সেটা শুরুতেই করতাম আমি, অ্যাডমিরাল,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'কিন্তু আপনারা জানেন, এমনিতেই বিদেশি মাটিতে সামরিক অভিযান চালানো নিয়ে সারা দুনিয়া আমাদের সমালোচনায় মুখর হয়ে আছে। ইরিত্রিয়ায় নতুন কিছু ঘটিয়ে সেই সমালোচনায় রসদ জোগাতে চাই না আমি। তা ছাড়া একেবারে বাধ্য না হলে ইরিত্রিয়ানদেরকে সলোমনের খনি, কিংবা আর্ক অভ দা

কাভানেন্টের কাহিনি শুনিয়ে নার্ভাস করে তোলারও পক্ষপাতী নই আমি। ওখানকার ধর্মীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে জানা আছে নিশ্চয়ই আপনাদের? সুদানের মত ওখানেও খ্রিস্টান আর মুসলমানদের মধ্যে একটা বিস্ফোরণোন্মুখ অবস্থা বিরাজ করছে। ইরিত্রিয়ার মাটিতে আর্ক আছে... এমন কোনও খবর ফাঁস হলে সলতেয় আগুন ধরে যাবে। ঝুঁকিটা নেয়া উচিত হবে না।'

'ছোট কোনও টিম পাঠানো যায় না?' বললেন সোয়ান। 'গোপনে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে আসবে?'

'ওদের অবস্থাও রানার মতই হবে,' গম্ভীর গলায় বললেন রাহাত খান। 'ফুলস্কেল মিলিটারি অপারেশন ছাড়া গতি নেই। কিন্তু তার আগে খনিটার লোকেশন জানা দরকার।'

'আমার ডিলেমা-টা বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই?' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি নষ্ট হয়ে যাবার উপক্রম... অথচ জেনেশুনেও হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হচ্ছে। এ-কারণেই খবর দিয়েছি আপনাদের। একটা পথ দেখান। কীভাবে সব কূল রক্ষা করা যায়?'

'ফোর্স পাঠাবার একটা ব্যবস্থা আমরা করে রেখেছি,' বললেন রাহাত খান। 'সুদানে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশি কন্টিনজেন্ট আছে। রেসকিউ মিশনের জন্য ওদেরকে স্ট্যাণ্ডবাই রাখা হয়েছে। ইরিত্রিয়া থেকে কোনও রকমের সাহায্যের আবেদন পেলেই ওরা মুভ করবে।'

'খুব ভাল একটা খবর দিলেন,' মাথা ঝাঁকালেন প্রেসিডেন্ট। 'জাতিসংঘের ফোর্স পাঠালে ব্যাপারটাকে আর আমেরিকান আগ্রাসন বলে হইচই বাধাতে পারবে না মিডিয়া।'

'তা ঠিক,' রাহাত খান মাথা ঝাঁকালেন। 'কিন্তু সাহায্যের আবেদনটাই তো পাচ্ছি না আমরা। তা ছাড়া শুধু আবেদন পেলেই হবে না, ইরিত্রিয়ায় ঢুকতে হলে ওখানকার সরকার, ও জাতিসংঘ... দু'দিক থেকেই অনুমতির প্রয়োজন হবে।'

'ওসব আমরা ম্যানেজ করে নেব,' বলে উঠলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'মি. প্রেসিডেন্ট ফোন করলেই অনুমতি পাওয়া যাবে। মাথা ঘামানো দরকার খনির লোকেশন আর রানার সঙ্গে যোগাযোগ করা নিয়ে।'

নীরবতা নেমে এল ওভাল অফিসে। বেশ কিছুক্ষণ কথা বললেন না কেউ। সবাই গভীর চিন্তায় ডুবে আছেন। শেষ পর্যন্ত রবার্ট সোয়ান বললেন, 'এক্সকিউজ মি, স্যর। মেডিউসা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে কিম্বারলাইট পাইপটার লোকেশন খুঁজে বের করা ছাড়া আর কোনও উপায় দেখতে পাচ্ছি না আমি। অ্যাডমিরালের প্রস্তাবটা আরেকটু ভেবে দেখতে আপনাকে অনুরোধ করছি আমি। চিন্তা করে দেখুন, নর্থ কোরিয়ান মিসাইল সাইলো... যেখান থেকে আমাদের উপর ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়ার তেমন কোনও সম্ভাবনাই নেই... ওখানটাতে নজর রাখা কি খুবই জরুরি? নাকি ইরিত্রিয়ার এই সিচুয়েশনটাতে? আফটার অল, আর্ক অভ দ্য কাভানেন্ট ভুল লোকের হাতে পড়লে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যেতে পারে।'

কথাটাতে বেশ প্রভাবিত হলেন প্রেসিডেন্ট। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, অ্যাডমিরাল। আপনার প্রস্তাবটা মেনে নিচ্ছি আমি। এনএসএ-কে বলছি, যত দ্রুত সম্ভব, একটা স্যাটেলাইট যেন ইরিত্রিয়ার উপরে...'

কথা শেষ হলো না তাঁর, বেরসিকের মত বেজে উঠল একটা সেলফোন। বিব্রত ভঙ্গিতে তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিলেন রাহাত খান। 'সরি, মি. প্রেসিডেন্ট। ফোনটা অফ করবার কথা মনে ছিল না।'

'ইটস্ ওকে,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'আপনি গুরুত্বপূর্ণ মানুষ, ফোন বন্ধ রাখা উচিতও নয়। প্লিজ, রিসিভ করুন কলটা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সেটটা বের করলেন রাহাত খান। ডিসপ্লে-র দিকে তাকাতেই মুখভঙ্গি পাল্টে গেল তাঁর। 'হায় খোদা! ইটস রানা!'

'তাড়াতাড়ি ধরো কলটা!' তাড়া লাগালেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।

রিসিভ বাটন চাপলেন বিসিআই চিফ। সেট কানে ঠেকিয়ে বললেন, 'ইয়েস?' উত্তেজনায় গলা কাঁপছে।

'মেজর জেনারেল র‍্যাহাত খান?' অচেনা একটা কণ্ঠ ভেসে এল ওপাশ থেকে। উচ্চারণটা অন্য ধাঁচের, নামটা ঠিকমত বলতে পারছে না। রাহাত হয়ে গেছে *র‍্যাহাট!*

'হ্যাঁ,' বললেন রাহাত খান। 'কে বলছেন, প্লিজ?'

'আমার নাম আবেল আফরাকি, সার,' বলল লোকটা। 'মি. মাসুদ রানার গাইড। জরুরি একটা মেসেজ দিয়েছেন উনি। স্পেশাল কোড: *জিএক্স ফাইভ থ্রি যিরো।*'

'রানা কোথায়?'

'মাটির তলায় আটকা পড়েছেন উনি...'

'মানে?'

'সব বলব, সার। শুরুতে আমাদের লোকেশন আর পরিস্থিতি সম্পর্কে জানাই...' আচমকা থেমে গেল লোকটা। পরমুহূর্তে তার কণ্ঠে আতঙ্ক ফুটল। 'ওহ্ গড, আমার খোঁজ পেয়ে গেছে ওরা! মেজর জেনারেল, আমাকে যেতে হচ্ছে। পরে কথা বলব।'

'দাঁড়াও...' বাধা দিতে পারলেন না রাহাত খান, তার আগেই কেটে গেল লাইনটা। তাড়াতাড়ি আবার কলব্যাক করতে চাইলেন, কিন্তু লাভ হলো না। ওপাশে ফোনটা অফ করে দেয়া হয়েছে।

'কে ছিল ওটা?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

'রানার গাইড,' চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে বিসিআই চিফের। 'রানা নাকি মাটির তলায় আটকা পড়েছে! লোকেশনটা বলার সুযোগ পায়নি, নিজেও সম্ভবত বিপদে পড়ে গেছে ও।'

'মাই গড!' বলে উঠলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'আমাদের এখুনি কিছু করা দরকার!'

'কীভাবে?' তিক্ত গলায় বললেন সোয়ান। 'লোকটা তো লোকেশনই বলতে

পারল না! এনএসএ যদি এ-মুহূর্তে মেডিউসা স্যাটেলাইট মুভ করতে শুরুও করে, তারপরও অনেক সময় লাগবে পাইপটার পজিশন বের করতে।'

'ফোনটাই আমাদের ভরসা,' বললেন রাহাত খান। 'লোকটার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ওটাই একমাত্র উপায়।'

নার্ভাস ভঙ্গিতে রি-ডায়াল করে চললেন তিনি।

সতেরো

পায়ের তলায় মাটির কাঁপুনি থামতেই দিনার কাছ থেকে একে-ফোরটি সেভেনটা নিয়ে নিল রানা। ওটার বাট দিয়ে ভেঙে দিতে থাকল দেয়ালের সঙ্গে ঝুলতে থাকা অক্ষত সবক'টা বালব। টানেলটাকে অন্ধকারে ডুবিয়ে দিচ্ছে। দিনা কিছু বলল না, পাতালে নেমে যাওয়া সুড়ঙ্গটার দিকে তাকিয়ে আছে। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার খনিতে ঢুকল ও, ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেছে—কাদের হাতে এই খনি গড়া। ছোট ছোট শিশুরা প্রাণ দিয়েছে এখানে, কাজ করতে করতে! ব্যাপারটা মনে পড়ে যেতেই ধর্মবিশ্বাস টলে উঠছে। অনুভব করতে পারছে ডেব্রে আমলাক মঠের প্রাক্তন প্রধান সন্ন্যাসীর অবস্থা, *সম্রাটদের লজ্জা* নামের বইটা পড়বার পর কেন পাগলপ্রায় হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

'দিনা!' ডাকল রানা।

'কী?'

'দাঁড়িয়ে থেকো না। কী ঘটেছে দেখার জন্য ওয়ার্কিং পিটের গার্ডরা চলে আসবে যে-কোনও মুহূর্তে। আমাদেরকে তৈরি থাকতে হবে।' কাছে এসে অন্ধকারে দিনার বাহু ধরে চাপ দিল রানা। আশ্বস্ত করছে। ন্যাপস্যাক থেকে একটা ছোট্ট পেনলাইট বের করে ওর হাতে দিল। 'এটা রাখো। আমি তোমার হাতে টোকা দিলেই লাইটটা জ্বেলে আলো ফেলবে টানেলের ভিতর। ঠিক আছে?'

'আচ্ছা।'

'গুড। এসো আমার সঙ্গে।'

স্কিপলোডারের পাশে পজিশন নিল রানা-দিনা। অপেক্ষা করছে গার্ডদের জন্য। সন্দেহ নেই, বিস্ফোরণের শব্দ আর পায়ের নীচের কাঁপুনি অনুভব করেছে ওরা। কারণটা জানবার জন্য নিশ্চয়ই কাউকে পাঠাবে। কয়েক মিনিট কেটে গেল শ্বাসরুদ্ধকর নীরবতায়, তবে অস্থির হলো না রানা। ওয়ার্কিং পিটটা ওদের পজিশন থেকে দেড় মাইল দূরে, রাতের শিফটে গার্ড-ও থাকে কম—মাত্র পাঁচজন। আসার আগে আলাপ-আলোচনা করে নিচ্ছে হয়তো, আসতেও সময় লাগবে।

পুরো বিশ মিনিট পর শোনা গেল পদশব্দ—টানেলের মেঝেতে পড়ে থাকা নুড়িপাথরে এলোমেলো পা ফেলছে কেউ। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে এগোতে

হচ্ছে লোকটাকে, সঙ্গে টর্চ আনেনি, দরকার হবে বলে ভাবেইনি বোধহয়। শব্দটা জোরালো হবার জন্য অপেক্ষা করল রানা, যখন মনে হলো, শিকার বিশ ফুটের মধ্যে পৌছে গেছে, তখনই টোকা দিল দিনার হাতে। সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল ছোট্ট পেনলাইটটা।

আলোটা সামান্য, কিন্তু অনেকক্ষণ নিকষ আঁধারে থাকায় ওটাকেই চোখ-ধাঁধানো মনে হলো। সামনে ঘোলা একটা পর্দার মত ঝুলে রয়েছে ধুলোর স্তর, ওপাশে দেখা গেল একজন সুদানিজ সৈনিককে, ভুরু কুঁচকে আলোর উৎসের দিকে তাকিয়ে আছে। একে-ফোরটি সেভেনের মাজলটা আলতো ভঙ্গিতে ঘুরিয়ে সিঙ্গেল শট নিল রানা। বদ্ধ টানেলে কানে তালা লাগানোর মত শব্দ হলো, ছোট্ট একটা আওয়াজ করে উল্টে পড়ে গেল সৈনিক।

নিষ্ঠুর একটা হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'একটা গেছে, আরও চারটে বাকি।'

উঠে দাঁড়াল ও, এগিয়ে গিয়ে তুলে নিল নিহত সৈনিকের রাইফেলটা। দুটো অস্ত্র জমল হাতে। একটা দিনাকে দিয়ে অন্যটা নিজে রাখল। কাঁধে ঝোলাল ন্যাপস্যাকটা। পেনলাইটের আলোয় দুজনে এগোতে শুরু করল টানেল ধরে।

'রানা, তোমার মতলবটা কী, জানতে পারি?' জিজ্ঞেস করল দিনা। 'এখান থেকে বেরুব কীভাবে আমরা? এন্ট্রান্সটা অন্তত দুই হাজার টন পাথরে ব্লক হয়ে গেছে।'

হাসল রানা। 'কিচ্ছু ভেবো না, উপায় বেরিয়ে যাবে। পাথর দেখে ভয় পাবার কিছু নেই। আমাদের কাজ শেষ হলে হাজার না... লাখ লাখ টন পাথর ধসে পড়বে খনির ভিতর।'

কিছুদূর এগোতেই আবার আলোর দেখা পাওয়া গেল—টানেলের দেয়ালে জ্বলছে অক্ষত বালব। পেনলাইটটা নিভিয়ে ফেলল দিনা। সাবধানে পা ফেলল রানা, হঠাৎ করে আর কোনও গার্ড উদয় হলে যেন সামাল দিতে পারে। তবে সতর্কতা পালন করে বিশেষ লাভ হলো না, আধঘণ্টা হেঁটে ওয়ার্কিং পিটের কাছাকাছি পৌঁছুল ওরা, এর মাঝে আর কোনও গার্ডের দেখা পাওয়া গেল না। রাইফেলের বাট দিয়ে আবার ভেঙে দিতে শুরু করল রানা পিটের মুখের কাছাকাছি বালবগুলো। অন্ধকারে নিজেদের লুকিয়ে রাখতে চায়। মাইনিং চেম্বারের চল্লিশ ফুট দূরে একটা স্পট বেছে নিয়ে আবার ওঁৎ পেতে বসল দুজনে।

ধীরে ধীরে পেরিয়ে গেল দশ মিনিট। কারও দেখা নেই। তিক্ত গলায় রানা বলল, 'ব্যাটাদেরকে যতটা আনাড়ি ভেবেছিলাম, আসলে ততটা নয়। বুদ্ধি আছে মাথায়, ধৈর্যও আছে। তাই টানেলে আসছে না আর কেউ। ইশ্‌শ্, এখানে আরেকটাকে ঘায়েল করতে পারলে খুব ভাল হতো।'

'আসছে না তো,' বলল দিনা। 'কী করবে এখন?'

'এগোতে হবে,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'এসো।'

ক্রল করে ওয়ার্কিং পিটের কার্নিশে বেরিয়ে এল দুজনে। পড়ে থাকা কয়েকটা বোল্ডারের আড়ালে লুকিয়ে উঁকি দিল নীচে। বরাবরের মত জায়গাটা জেনারেটরের শব্দে গুমগুম করছে, সেজন্যেই সম্ভবত রানার গুলির আওয়াজ

শুনতে পায়নি। এ-মুহূর্তে জেনারেটরের আওয়াজ ছাড়া আর কোনও শব্দ হচ্ছে না নীচে। ভয়ানক একটা কিছু যে ঘটেছে, তা বুঝতে পারছে সবাই। শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে দিয়েছে, সুদানিজ গার্ডরা তাতে আপত্তি করছে না—ওরাও স্থবির হয়ে গেছে। খোঁজ নিতে পাঠানো লোকটার ফিরবার আশায় নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে পিটের প্রতিটি মানুষ, চেহারা থমথম করছে। নড়াচড়া করছে শুধুমাত্র শিফটের সুপারভাইজর... ম্যাকেঞ্জি নামে এক দক্ষিণ আফ্রিকান, পিটের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে উঁচু ছাদের দিকে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলছে—ভূ-কম্পনে গম্বুজটার কোনও ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে কি না বোঝার চেষ্টা করছে সে।

'আমাদের হাতে সময় নেই,' দিনার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল রানা। 'এন্ট্রান্সের ধসটা যত খারাপই হোক, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই খনিতে ঢোকার মত একটা পথ বের করে ফেলবে মানসিনি। ও আসার আগেই যা করার করে ফেলতে হবে।'

'কী করবে?' জানতে চাইল দিনা।

'গার্ডদেরকে আগে অচল করতে হবে। তারপর...'

'তারপর কী?'

'ছোট্ট একটা জাদু দেখাব আমি... উধাও হবার জাদু!'

'কী বললে?' ভুরু কোঁচকাল দিনা।

'খনির ভিতরের সবাইকে বাতাসে মিলিয়ে দেব আমি,' মুচকি হাসল রানা। 'বিশ্বাস করো!'

সিল হয়ে যাওয়া মাইন-এন্ট্রান্সের বাইরে পাগলের মত খেটে চলেছে শ্রমিকরা। ঝড়-বাদলের বাধা মানছে না মানসিনি, হৈচৈ করে কাজ চালু রাখছে। তার হুকুমে শ্রমিকদের উপর ক্রমাগত চাপ বাড়িয়ে চলেছে ওয়ালেস মায়ার, তার সঙ্গী সুপারভাইজর, আর সুদানিজ সৈন্যরা। গালাগাল থেকে শুরু করে লাথি-গুঁতো, ফাঁকা গুলি... সব কৌশলই প্রয়োগ করা হচ্ছে অসহায় মানুষগুলোর উপর।

উন্মাদ-প্রায় হয়ে গেছে ইটালিয়ান টাইকুন। চোখ টকটকে লাল, অবিন্যস্ত পোশাক-আশাক। কিছুক্ষণ পর পরই নিষ্ফল আক্রোশে লাথি মেরে কাদামাটি [illegible] পাগল না হয়ে উপায়ও নেই। কী ঘটেছে, সেটা ইতিমধ্যে টের

'গোটা একটা পাহাড় ধসে পড়ল, আর তুমি বলছ ক্ষতি হয়নি?'

'ওটা স্রেফ একটা ডাইভারশন,' বলল ওয়ালেস। 'আমরা যাতে এন্ট্রান্সটা রি-ওপেন করায় ব্যস্ত হই, সেজন্যে ধস নামানো হয়েছে। রানা ভেবেছে, খনিমুখে কাজ করতে থাকলে পলাতকদের ধরে আনার জন্য লোক পাঠাতে পারব না। ওর ধারণা ভুল। এখনও যথেষ্ট পরিমাণ লোক আছে আমাদের হাতে। এদিক-ওদিক... দু'দিকই ম্যানেজ করবার জন্য। খনির ভিতরে ম্যাকেঞ্জি আছে, আমরা যে ওদেরকে বের করে আনব, তা জানে। কাজেই শিফটের কাজ চালিয়ে যাবে ও, মাইনিঙে ব্যাঘাত ঘটবে না। সবচেয়ে বড় কথা, রানা নিজেই খনির ভিতর আটকা পড়ে গেছে। ইউ সি... কয়েকজন গার্ডকে খুন করেছে, এন্ট্রান্স খোঁড়াখুঁড়ি আর রিফিউজিদের রাউণ্ড-আপের কাজ বাড়িয়েছে, এ ছাড়া আর কোনও অসুবিধেই ও করতে পারেনি আমাদের।'

'ওটা ভেবেই বগল বাজাতে থাকো!' খ্যাপাটে গলায় বলল মানসিনি। 'গাধা কোথাকার! আমার দু'হাজার ক্যারাটের হীরা-ভর্তি সিন্দুকটা নিয়ে গেছে শালা খনির ভিতরে। ওগুলো যদি পাওয়া না যায়, তা হলে গোটা অপারেশনটা... এতদিন আমরা যা করেছি... সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। তোমার কাছে ক্ষতিটা বড় বলে মনে হচ্ছে না বুঝি?'

'রিল্যাক্স, মি. মানসিনি,' বলল ওয়ালেস। 'সিন্দুকটা খনির মুখের কাছাকাছিই পাওয়া যাবে। প্রত্যক্ষদর্শী একজন গার্ড আমাকে জানিয়েছে, স্কিপলোডারটার গতি কমে গিয়েছিল টানেলে ঢোকার সময়, খুব বেশিদূর যেতে পারেনি ওটা... আমি শিয়োর! কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সিন্দুকটা উদ্ধার করব আমরা।'

'তা-ই যেন হয়,' বলল মানসিনি। 'রানার স্যাটেলাইট ফোনটা গায়েব। মানেটা বুঝতে পারছ? খুব শীঘ্রি ইরিত্রিয়ান সরকার জেনে যাবে খনিটার খবর। মিলিটারি পাঠিয়ে দেবে। বেশি সময় নেই আমাদের হাতে। যত শীঘ্রি সম্ভব, হীরাগুলো উদ্ধার করা চাই।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল ওয়ালেস। গালাগাল করলেও খানিক পরে কাজের অগ্রগতি দেখে খুশি না হয়ে পারল না ইটালিয়ান টাইকুন। দক্ষিণ আফ্রিকান দানবটার মাথায় বুদ্ধি আছে। শুধু এক্সক্যাভেটর আর শ্রমিকদের উপর নির্ভর না করে নতুন একটা কৌশল খাটাচ্ছে সে। হাই-পাওয়ারের একটা ওয়াটার-পাম্প

করতে পারল না রানা। ফায়ারফাইটে যাবার ইচ্ছে নেই ওর। অস্ত্র আর লোকবল... দু'দিক থেকেই এগিয়ে আছে প্রতিপক্ষ। তা ছাড়া গোলাগুলি শুরু হলে সবার আগে মরবে নিরীহ শ্রমিকরা। কাজেই ঝুঁকিটা নেয়া চলে না। পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থেকে সমস্যাটা নিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলছিল ও, হঠাৎ দিনার চাপা গলায় ডাক শুনতে পেল। চোখ ফেরাতেই দেখল, র‍্যাম্প ধরে উঠে আসছে সুপারভাইজর ম্যাকেঞ্জি... অপেক্ষা করতে করতে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে সে, নিজেই আসছে ব্যাপারটা কী—তা তদন্ত করতে।

দিনার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট নেড়ে নির্দেশ দিল রানা, বুঝিয়ে দিল কী করতে হবে। মাথা ঝাঁকিয়ে ক্রল করতে শুরু করল মেয়েটা, ঢুকে গেল টানেলে। মোটামুটি ত্রিশ গজ ভিতরে গিয়ে পজিশন নেবে, ম্যাকেঞ্জি ওদিকে ছুটতে শুরু করলে যেন সামনে থেকে বাধা দিতে পারে। পাথরের আড়ালে রানা নিজেকে ভালমত লুকাল, সুপারভাইজর যাতে দেখতে না পায় ওকে।

ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে টানেলে ঢুকে পড়ল ম্যাকেঞ্জি, পিছু পিছু হামাগুড়ি দিয়ে রানাও ঢুকল। কিছুদূর এগিয়ে উঠে দাঁড়াল, একে-ফোরটি সেভেনটা তাক করল সুপারভাইজরের পিঠে। শান্ত কণ্ঠে বলল, 'একদম জমে যাও, ম্যাকেঞ্জি! নড়বার চেষ্টা কোরো না।'

সামনে থেকে অস্ত্র তাক করে দিনাও বেরিয়ে এসেছে, ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় ওকে দেখতে পেয়ে রক্ত সরে গেল সুপারভাইজরের চেহারা থেকে। ফাঁদটা বুঝতে পেরেছে। ধীরে ধীরে উপরে তুলল দু'হাত। এগিয়ে গিয়ে তার পিঠে রাইফেলের মাথা ঠেকাল রানা। বলল, 'বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছ। চলো, পিটে ফেরা যাক। দেখি, সুদানিজ কুকুরগুলোকেও একই কাজ করতে রাজি করাতে পারো কি না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল ম্যাকেঞ্জি। পিছন থেকে কলার ধরে তাকে উল্টো ঘোরাল রানা। টানেল থেকে বেরিয়ে কার্নিশের ফাঁকা কিনারায় নিয়ে গেল। একটা চিৎকার দিয়ে নীচের লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল ও।

পাঁই করে ঘুরল চার গার্ড, হাতের অস্ত্র উঠে এসেছে বুকের কাছে। ম্যাকেঞ্জির শরীরের পিছনে আড়াল নিল রানা। দিনাও বোল্ডারের আড়ালে গিয়ে পজিশন নিল। নিজের অস্ত্র তাক করল সুদানিজদের দিকে। টিগ্রিনিয়ান ভাষায় চেঁচাল, 'খবরদার! গুলি কোরো না! অস্ত্র ফেলে দাও সবাই!'

দ্বিধা ভর করল সুদানিজদের চেহারায়, সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। ওদের ভাষা জানা নেই ম্যাকেঞ্জির, তারপরও হাউমাউ করে উঠল, অস্ত্র নামাতে অনুরোধ করল। বুঝতে পারছে, গোলাগুলি শুরু হলে সবার আগে সে-ই মারা পড়বে। নার্ভাস হয়ে গেল চার গার্ড। আড়চোখে দেখল, শ্রমিকরা ঘিরে ফেলতে শুরু করেছে ওদেরকে। লড়াই করে লাভ হবে না। শেষে হার মানল ওরা—প্রথমে মুখে ব্যান্ডেজ-বাঁধা একজন, তারপর ওর দেখাদেখি বাকিরা হাত থেকে ফেলে দিল অস্ত্র। তাড়াতাড়ি সেগুলো কুড়িয়ে নিল কয়েকজন শ্রমিক। এককালে স্বাধীনতার লড়াই করেছে ওরা, অস্ত্র ব্যবহার করতে জানে। রাইফেলগুলো প্রতিপক্ষের দিকে তাক করে দিনার কাছে জানতে চাইল,

ওদেরকে গুলি করবে কি না।

প্রশ্নটা বুঝতে পেরে মাথা নাড়ল রানা। দিনা বলল, 'না, মেরো না ওদেরকে। অ্যামিউনিশন বাঁচাতে হবে আমাদেরকে। তা ছাড়া খনি থেকে বেরুনোর সময় ওদেরকে জিম্মি হিসেবেও ব্যবহার করা যাবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে পিছিয়ে গেল শ্রমিকরা।

ম্যাকেঞ্জিকে নিয়ে র‍্যাম্প ধরে ওয়ার্কিং পিটের মেঝেতে নেমে এল রানা আর দিনা। ধাক্কা দিয়ে লোকটাকে শ্রমিকদের মাঝখানে ফেলা হলো চার গার্ডের পাশাপাশি। রানা নির্দেশ দিল, 'বেঁধে ফেলো ওদের।'

ব্যস্ত হয়ে পড়ল শ্রমিকরা।

সুপারভাইজারের বসার জন্য পিটের একপাশে চেয়ার-টেবিল আছে, ওখানে চলে গেল রানা। সাজিয়ে রাখা রক-স্যাম্পল ফেলে দিয়ে খালি করল টেবিলটা। তারপর দিনার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি ধরে নিচ্ছি, ঘণ্টাতিনেকের মধ্যে মানসিনি ঢুকে পড়বে খনিতে। আমাদের কাজের জন্য সময়টা যথেষ্ট নয়। কাজেই ওকে পিছিয়ে দিতে হবে।'

'তোমার প্ল্যানটা কী?' জানতে চাইল দিনা।

'প্রথমে কয়েকজন লোক পাঠাও, সিন্দুকটা ধরাধরি করে এখানে নিয়ে আসতে হবে। তারপর বিস্ফোরক বসিয়ে টানেলের বাকি অংশটাও ধসিয়ে দেব আমরা... যতদূর সম্ভব। পিটে যথেষ্ট পরিমাণ এক্সপ্লোসিভ আছে, অসুবিধে হবে না।'

'শকওয়েভটা ডিফ্লেক্ট করবে কীভাবে? টানেলটা তো বন্ধ হয়ে গেছে! তুমিই তো সেদিন বলেছিলে, শকওয়েভটা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে পুরো গম্বুজটাই ধসে পড়বে মাথার উপর।'

হাসল রানা। 'ওয়ালেস লোকটা মাইনার হতে পারে, কিন্তু এসব ব্যাপারে একেবারে আনাড়ি। ওকে সেদিন বোকা বানিয়েছি আমি। এই চেম্বারটা কয়েক হাজার বছরের পুরনো, বসে আছে একটা আকটিভ ফল্ট লাইনের মাথায়। এত বছরে বহুবার ভূমিকম্প সয়েছে, তারপরও যখন ধসে পড়েনি... আমার তো মনে হয় নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোশন ছাড়া কিছুই করা যাবে না এটার।'

'হুম! বুঝতে পেরেছি,' মাথা ঝাঁকাল দিনা। 'ভালই ধোঁকা দিয়েছ ওদেরকে। বেশ, টানেল ধসিয়ে মানসিনির কাজ বাড়ালাম আমরা... তারপর কী হবে?'

'আগেই বলেছি, সবাইকে হাওয়ায় মিলিয়ে দেব আমি!'

'ধ্যাত্! হেঁয়ালি কোরো না তো!'

হাসল রানা। ন্যাপস্যাক থেকে মেডিউসা ফটোগ্রাফগুলো বের করে টেবিলের উপর বিছাল। ওখান থেকে যেটা খুঁজছিল, সেটা বের করে নিল ও, বাড়িয়ে ধরে দেখাল দিনাকে।

'কী এসব?' ভুরু কুঁচকে রঙ-বেরঙের হাজারো রেখায় ভরা ছবিটা দেখল দিনা। 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'মাই ডিয়ার, দিনা,' বলল রানা, 'এটাকে একটা ম্যাপ বলতে পারো।

অ্যালিসের কাছে যদি এ-জিনিস থাকত, তা হলে ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডে কোনোদিন ও পথ হারাত না।'

'আবার হেঁয়ালি শুরু করলে?'

'পরে সব ব্যাখ্যা করব। আগে কাজ শুরু করা দরকার। এসো, লোকজনকে দু'ভাগ করে নিই। একদল সিন্দুকটা আনবে। অন্যেরা এক্সপ্লোসিভ বসাতে সাহায্য করবে আমাকে। দেখো, ইংরেজি জানা কাউকে পাও কি না। নইলে দোভাষী হিসেবে তোমাকে ডাবল ডিউটি করতে হবে।'

দ্রুত কাজে নেমে পড়ল ওরা। একদলকে সিন্দুকের জন্য পাঠিয়ে দিয়ে অন্যদলের চারজনকে ড্রিল-মেশিনসহ সঙ্গে রাখল রানা। ফ্লুরোসেন্ট পেইন্ট দিয়ে দাগিয়ে দিল টানেলের ছাদ—বিশ গজ দূরত্বে পর পর অনেকগুলো ফুটো করতে হবে। ওগুলোতে এক্সপ্লোসিভ বসাবে ও। দিনার সাহায্য নিয়ে কাজটা ভাল করে বুঝিয়ে দিল—পালা করে খাড়া এবং কোনাকুনি গর্ত তৈরি করতে হবে ছাদে, বিস্ফোরণের সর্বোচ্চ এফেক্ট পাবার জন্য।

কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে কাজের অগ্রগতি তদারক করল রানা। তবে তার প্রয়োজন ছিল না। গত কিছুদিনের মাইনিঙের কারণে ড্রিল ব্যবহারে দক্ষ হয়ে উঠেছে রিফিউজিরা। একেকটা যন্ত্র একশো পাউণ্ড ওজনের, আকারও বিদঘুটে, তারপরও ঝানু মাইনারের মত ওগুলো নাড়াচাড়া করছে ইরিত্রিয়ানরা। প্রতিটা ড্রিলের কাটিং হেড ভেজানো হচ্ছে পানি দিয়ে, ছাদে ঠেকাতেই পাথরের টুকরো কাদামাটির সরু ধারা গড়াতে শুরু করছে। প্রথম গর্তটা শেষ করে রানার দিকে তাকাল এক শ্রমিক।

'গুড জব!' বুড়ো আঙুল তুলে বাহবা দিল রানা। 'এবার আরেকটা খোঁড়ো।'

সন্তুষ্ট হয়ে ওয়ার্কিং পিটে ফিরে এল ও। চেয়ার টেনে টেবিলে বসল মেডিউসা ফটোগ্রাফ নিয়ে। খাবার আর পানি পরিবেশন করল দিনা, সেগুলো মুখে দিতে দিতে ছবিটা স্টাডি করতে থাকল। একটা টুল টেনে পাশে বসল দিনা, কথা বলল না, নীরবে তাকিয়ে থাকল রানার মুখের দিকে। ওখানে নানা রকম অভিব্যক্তি দেখা যাচ্ছে।

হাজারটা চিন্তা চলছে রানার মাথায়। হিসেবি চাল দিয়েছে ও, তারপরও ব্যাপারটা ব্যাকফায়ার করতে পারে। মানসিনিকে ব্যস্ত রাখাটা ওর উদ্দেশ্য, তাকে দেরি করিয়ে দিতে চায়। কিন্তু লোকটা যদি তার হীরার আশা ছেড়ে দেয়, তা হলে স্রেফ ফাঁদে পড়ে যাবে ওরা। জেনেশুনে সবাইকে জ্যান্ত কবর দিয়েছে রানা, যদি মানসিনি এন্ট্রান্সটা না খোলে... যদি বিকল্প পথ পাওয়া না যায়... ভয়াবহ একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। যে-পরিমাণ ফুয়েল আর ইকুইপমেন্ট আছে, তা দিয়ে ওরা নিজেরা আবার এন্ট্রান্সটা খুঁড়ে বের হতে পারবে না। ব্যাপারটা ভাবলেই দুশ্চিন্তা ভর করছে রানার মাথায়। কে জানে, হয়তো দিনা-সহ চল্লিশজন নিরীহ রিফিউজির মৃত্যু ডেকে এনেছে ও!

রানার চিন্তাধারা ধরতে পারছে দিনা। আলতো করে ওর হাতে হাত রাখল। মৃদু গলায় বলল, 'তোমার উপর আমার বিশ্বাস আছে, রানা।'

'শুধু বিশ্বাসে এবার কাজ হবে না, দিনা,' বলল রানা থমথমে গলায়। 'রীতিমত জুয়া খেলছি আমি। ফলাফলটা ভয়াবহ হতে পারে। জুয়াতে যা হয়... ভাগ্যের সহায়তা লাগবে।'

উঠে দাঁড়াল ও। হাতছানি দিয়ে ডাকল দ্বিতীয় দলে অবশিষ্ট শ্রমিকদেরকে। সবাইকে নিয়ে মেঝেতে খোঁড়া একটা প্রাচীন শাফটের মুখে গিয়ে দাঁড়াল। ওটা পঞ্চাশ ফুট গভীর, তলাটা আঁধারে ছাওয়া। গায়ে একটা মই লাগানো আছে। লম্বা করে দম নিল রানা, অন্যদেরকে অনুসরণ করতে বলে নামতে শুরু করল। শাফটটা তেমন চওড়া নয়, দিনা-সহ আরও দুজন শ্রমিক নামতেই তলাটায় চাপাচাপি হয়ে গেল। অন্যদেরকে অপেক্ষা করতে বলে পকেট থেকে ফ্লুরোসেন্ট পেইন্টের স্প্রে-ক্যানটা বের করল রানা। কয়েকবার ঝাঁকি দিয়ে টর্চের আলোয় দেখে নিল মেডিউসা-ফটোগ্রাফটা, তারপর মেঝের একটা কোণে আড়াআড়িভাবে দুটো সরলরেখা আঁকল পেইন্টের সাহায্যে।

'এক্স মার্কস্ দ্য স্পট,' বলল রানা। 'এখানেই খুঁড়তে হবে আমাদেরকে। কপাল ভাল বলতে হবে, এখানটাতে কিম্বারলাইট নেই, রক-ফর্মেশনও কিছুটা নরম। নইলে প্ল্যানটা কাজ করত না। যদি দ্রুত একটা টানেল করতে পারি নীচে যাবার জন্য, তা হলে হয়তো এ-যাত্রা প্রাণে বেঁচে যাব সবাই।'

দিনার প্রশ্নটা হট্টগোলের ভিতর চাপা পড়ে গেল। শ্রমিকরা ইকুইপমেন্ট নামাতে শুরু করেছে শাফটের ভিতর। একটা ড্রিল মেশিন তুলে নিয়ে হাইড্রলিক এয়ার-ভালভ ওপেন করল রানা। চালু করল যন্ত্রটা।

ওর শার্টের হাতা ধরে টান দিল দিনা। জানতে চাইল, 'রানা, কী আছে নীচে?'

'সলোমনের খনি... আসলটা!'

নির্বিকার কণ্ঠে জবাব দিল রানা।

আঠারো

আবেল আফরাকির বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না, কেউ তার পিছু নিয়েছে। ভয়ের কথা হলো, অনুসরণকারী লোকটা অত্যন্ত দক্ষ। মাথার উপর চলতে থাকা ঝড়-বাদলের সুবিধেও পাচ্ছে সে, পায়ের শব্দ চাপা পড়ে যাচ্ছে এমনিতেই, বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হচ্ছে না। তবে আবেল নিজেও কম যায় না, শিকারী পশুর মত তীক্ষ্ণ ওর কান। ওটার কল্যাণেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাঝ থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছে ও।

সমস্যার অন্ত নেই—আবেল নিরস্ত্র, অনুসরণকারী ঠিক তার বিপরীত। পিচ্ছিল পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে চলাচলেও খুবই অসুবিধে হচ্ছে, বৃষ্টির কারণে উপত্যকার মেঝে আবার হয়ে আছে ঢাল, বার বার পা হড়কে যেতে চায়। খনি থেকে যতই দূরে যাচ্ছে, সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, ওখানে আড়াল পাওয়া যাবে না।

ততই খোলা জায়গায় নেমে আসতে হচ্ছে ওকে। অনুসরণকারী লোকটা যে সুদানিজ নয়, সেটা পরিষ্কার। গার্ডরা সার্চে বেরুতে সময় নেবে, কিন্তু পাহাড়ে চড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তো এ-ব্যাটা উদয় হয়েছে। এর অর্থ একটাই হতে পারে, মি. রানা খনিতে ঢোকার সময় যারা স্নাইপার-শট নিয়েছিল গার্ডদের উপর... এ-লোক তাদেরই দলের। উপলব্ধিটা আতঙ্ক জাগাবার মত। অনুসরণকারী লোকটার কাছে নাইট ভিশন গগলস্ এবং হাই-পাওয়ারের রাইফেল আছে। দূর থেকে... অন্ধকারের মধ্যেই ওকে খুন করে ফেলতে পারবে।

স্নাইপার লোকটা নিঃসন্দেহে ইজরায়েলি এজেন্ট। খনির উপর নজর রয়েছে ওদের। আবেল যে ফোনে কথা বলছিল, সেটা নিশ্চয়ই শুনে ফেলেছে। মানসিনির মত এরাও চায় না, উপত্যকায় মিলিটারি আসুক, তা হলে ওরাও গোপনে কাজ করতে পারবে না। তাই ওকে বাধা দিতে চাইছে নিশ্চয়ই। বুঝতে পারছে, খনি থেকে আরও দূরে গিয়ে ফোনটা করা উচিত ছিল, আরও সতর্ক থাকা উচিত ছিল। ভুলটার প্রায়শ্চিত্ত শেষে না প্রাণ দিয়ে করতে হয়!

কতদূর এসেছে, বলতে পারবে না আবেল। হঠাৎ বিজলি চমকাতেই নীচে একটা পরিচিত অবয়ব চোখে পড়ল—ওর অবস্থান থেকে প্রায় এক হাজার গজ দূরে। চট্ করে বুদ্ধি খেলল মাথায়... কথা হচ্ছে, স্নাইপার লোকটা ওকে সেটা কার্যকর করতে দেবে কি না। স্নাইপারের স্কোপে বন্দি থেকে হাজার গজ খোলা ময়দান পাড়ি দেয়াটাকে চমৎকার কোনও রণকৌশল বলা চলে না, কিন্তু উপায়ও তো নেই। ভেবে দেখল আবেল, যদি স্বাভাবিক গতিতে হাঁটে, শত্রুকে বুঝতে না দেয় নিজের পরিকল্পনা, তাকে নার্ভাস না করে... তা হলে হয়তো বা পৌঁছানো সম্ভব গন্তব্যে।

আবার বিদ্যুৎ চমকাল। প্রান্তরের মাঝখানে আলোকিত হয়ে উঠল ইটালিয়ানদের খোঁড়া খনিটার কম্পাউণ্ড। জাদুঘরে দেখা প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর কঙ্কালের মত মাঝখানে মাথাচাড়া দিয়ে আছে জং-ধরা হেড গিয়ারটা। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল আবেল, পাহাড়ের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল, হনহন করে হাঁটতে শুরু করল খনিটার দিকে। প্রতি মুহূর্তে পিঠে একটা বুলেট বেঁধার আশঙ্কা করছে। কিন্তু চল্লিশ গজ যাবার পরও যখন কিছু হলো না, সাহস পেল ও। দাঁড়িয়ে পড়ে একটু অপেক্ষা করল, ব্যাটা কাছে আসুক। ওকে অস্থির করে লাভ নেই। শিকার পালাবার চেষ্টা করছে না, এটা ভেবে নিশ্চিন্ত থাকুক।

আবার হাঁটতে শুরু করল আবেল। বোঝার চেষ্টা করছে, প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্য কী হতে পারে। খুন, নাকি অন্য কিছু? ওকে জ্যান্ত ধরতে চাইতে পারে লোকটা, হয়তো জানার ইচ্ছে—কোথায়, কাকে ফোন করছিল। তেমনটাই মনে হচ্ছে এখন পর্যন্ত। খুন করতে চাইলে এতক্ষণে গুলি করতে পারত। কিছুদূর যেতেই হঠাৎ একটা চিন্তা খেলল মাথায়। অপেক্ষায় রইল আবেল। পরেরবার বিজলি চমকাতেই ঝেড়ে দৌড় দিল। শরীরের কাছ দিয়ে দুটো গুলি ছুটে গেল, কিন্তু লক্ষ্যভেদ করতে পারল না আততায়ী। আওয়াজও হয়নি, ব্যারেলে সাইলেন্সার লাগানো আছে নিশ্চয়ই। নিশ্চিত হলো আবেল, ওর ধারণাটাই সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। নাইট ভিশন ব্যবহার করছে না প্রতিপক্ষ—অন্ধকারে খুব

কাজের জিনিস ওটা; কিন্তু বজ্রপাতের সময় একেবারেই অচল। চোখ ধাঁধিয়ে যাবে উজ্জ্বল আলোতে, কাজেই ওটা ব্যবহার করা সম্ভব নয়। লোকটাকে এখন অন্ধকারের মধ্যে আন্দাজ আর স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির উপর নির্ভর করে গুলি চালাতে হচ্ছে। এই ঘনঘোর রাতে সেটা মোটেই সহজ কাজ নয়।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে ইটালিয়ান মাইনিং কম্পাউণ্ডে পৌঁছে গেল আবেল—অক্ষত শরীরে! হেড গিয়ারটাকে পাশ কাটিয়ে ওদের পুরনো ক্যাম্প-বিল্ডিঙে ঢুকে পড়ল। হাতে সময় নেই, ইজরায়েলি লোকটা যে-কোনও মুহূর্তে পৌঁছে যাবে। ঝটপট ভেজা কাপড়চোপড় খুলে একেবারে নগ্ন হয়ে গেল ও, হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। বৃষ্টির ঠাণ্ডা পানির স্পর্শে কেঁপে উঠল গোটা শরীর, তবে ব্যাপারটাকে পাত্তা দিল না। উদ্দেশ্য সফল হয়েছে ওর, মিশমিশে কালো শরীরটা এখন অন্ধকার এবং মাটি-কাদার ভিতর প্রায় অদৃশ্য।

ইজরায়েলি লোকটা প্রথম শ্রেণীর মিলিটারি ট্রেইনিংপ্রাপ্ত হতে পারে, কিন্তু অভিজ্ঞতার দিক থেকে আবেলের তুলনায় অনেক পিছিয়ে। অনবদ্য একটা গুণ রয়েছে ওর—শত্রুর পরবর্তী পদক্ষেপ আগেভাগেই আন্দাজ করতে পারে। সেটাই ওকে টিকিয়ে রেখেছে এত বছর। আজও রাখবে কি না, সেটা জানতে হলে একটু অপেক্ষা করতে হবে। সরীসৃপের মত হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল আবেল, হেড গিয়ারের কাছে পৌঁছে থামল। স্যাট-ফোনটা নিয়ে এসেছে সঙ্গে, ওটা দাঁতে কামড়ে ধরে লোহা-লক্কড়ের উঁচু কাঠামোটা বেয়ে উঠতে শুরু করল। নীচে যে দেড়শো ফুট গভীর টানেল আছে, হাত ফস্কালেই নির্ঘাত মৃত্যু, সেটা নিয়ে ভাবছে না।

হেড গিয়ারের জং ধরা, খসখসে শরীরে ঘষা খেয়ে চামড়া ছিলে গেল আবেলের, কিন্তু থামল না। উঠে গেল দশ ফুট উপরের একটা সাপোর্ট বিমে। ইস্পাতের বেড়াজালের ভিতরে মিশিয়ে ফেলল শরীরটাকে। স্যাট-ফোনটাকে গুঁজে রাখল দুটো লোহার পাতের মাঝখানের খাঁজে। অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারছে, শাফটটা আগ্রহী করে তুলবে ইজরায়েলি লোকটাকে, কাছে এসে উঁকি না দিয়ে পারবে না সে। তখুনি আঘাত হানবে সে।

একটু পরেই বিজলি চমকালে শত্রুকে দেখতে পেল আবেল, পা টিপে টিপে ঢুকছে কম্পাউণ্ডে। লম্বা একটা লং-রেঞ্জ রাইফেল হাতে, শরীরের একপাশে ঝুলছে একটা উজি সাবমেশিনগান, নাইট-ভিশন গ্যাজেটটা কপালে তোলা। ঘিলি সুট পরে আছে সে—জিনিসটা হরেক রকম ছেঁড়া কাপড় জোড়া দিয়ে তৈরি, হঠাৎ দেখলে আবর্জনার মত লাগে। এ-মুহূর্তে বৃষ্টিতে ভিজে চুপচুপে হয়ে আছে পোশাকটা। আবেল আন্দাজ করল, অন্তত ত্রিশ পাউণ্ড বাড়তি বোঝা বইতে হচ্ছে লোকটাকে তার ফলে। নড়াচড়ায় ক্ষিপ্রতা কমে গেছে।

আবার বাজ পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে গড়ান দিয়ে একটা বাড়ির আড়ালে চলে গেল লোকটা। আবছা আলোয় তাকে রাইফেলটা নামিয়ে রাখতে দেখল আবেল, স্লিং থেকে হাতে নিল উজি-টা। লোকটা বুঝতে পেরেছে, কম্পাউণ্ডের ভিতর ক্লোজ রেঞ্জ অ্যাসল্টের জন্য রাইফেলের চাইতে মেশিনগানটাই বেশি কার্যকর হবে। নাইট ভিশন গগলস্-টা চোখে লাগিয়ে পুরো জায়গাটার উপর একবার

নজর বোলাল, তাকাল হেড-গিয়ারটার দিকেও। কিন্তু আবেলকে স্পষ্ট করতে পারল না। আস্তে আস্তে কম্পাউণ্ডের এক ধার থেকে তল্লাশি শুরু করল সে।

আবেলের ধারণাই ঠিক, খনির শাফটটার প্রতি আকর্ষণ এড়াতে পারল না ইজরায়েলি লোকটা। দুটো বাড়ি তল্লাশি করেই ধৈর্য হারাল সে, পা টিপে টিপে এগোতে শুরু করল গভীর গর্তটার দিকে। দম বন্ধ করে ফেলল আবেল, এখুনি ঝাঁপ দিতে হবে ওকে। সুবিধেমত পজিশনে শত্রুকে আসবার সময় দিল, তারপর সাপোর্ট বিমের খাঁজ থেকে তুলে নিল স্যাট-ফোনটা। ওটা অফ্ করে দিয়েছিল পাহাড়ি ঢাল ধরে পালাবার সময়, এখন আবার অন্ করল। ডিসপ্লে-তে ফুটে উঠল হালকা একটা আলোর আভা। দেরি করল না আবেল, সঙ্গে সঙ্গে একটু দূরে ছুঁড়ে দিল ফোনটা।

ধনুকের মত একটা পথে ছোট্ট আলোর আভাটা উড়ে যেতে দেখল ইজরায়েলি আততায়ী, রিফ্লেক্সের বশে থমকে গেল সে, উজি উঁচু করে গুলি করল ওটার দিকে। ব্যারেলটা অন্যদিকে ঘুরে গেছে দেখেই উপর থেকে ঝাঁপ দিল আবেল, কালো একটা ছায়ার মত সবেগে নেমে এল শত্রুর উপর। লোকটাও কম যায় না, বিপদটা টের পেয়ে গেল কীভাবে যেন, আবেল তার ঘাড়ের উপর পড়ার আগেই ডাইভ দিয়ে পড়ল কাদায়। ধপাস করে খালি মাটিতে নেমে এল ইরিত্রিয়ান যোদ্ধা। সোজা হতেই দেখল, ওর দু'হাত দূরে মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে উজিটা তাক করছে প্রতিপক্ষ। লাথি দিয়ে ব্যারেলটা সরিয়ে দিল আবেল, লক্ষ্যভ্রষ্ট এক পশলা গুলি চলে গেল আকাশের দিকে।

শত্রুকে অস্ত্রটা আর সিধে করার সুযোগ দিল না ইরিত্রিয়ান যোদ্ধা, চাপা একটা হুঙ্কার ছেড়ে সিংহের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হলো কুস্তি। ইজরায়েলি লোকটা বেকায়দায় পড়ে গেছে, উজিটা ব্যবহার করতে পারছে না, আবার ফেলে দেবারও সাহস পাচ্ছে না। এক হাতে আবেলকে জাপটে ধরতে চাইছে, কিন্তু নগ্ন দেহটায় আঁকড়ে ধরবার মত কিছু নেই, হাত বার বার পিছলে যাচ্ছে।

প্রতিপক্ষের ঘিলি সুটের একটা অংশ খামচে ধরল আবেল, ঝাঁকাতে শুরু করল তাকে; মাটিতে বাড়ি খাওয়াচ্ছে মাথাটা। তবে প্রচেষ্টাটা সফল হলো না, পা দিয়ে পেঁচিয়ে ওকে শরীরের উপর থেকে ফেলে দিল প্রতিপক্ষ। কিন্তু মুঠোটা ছাড়ল না ও, কাত হবার সময়ও শত্রুকে ধরে রাখল দেহের সঙ্গে, কিছুতেই অস্ত্রটা ব্যবহারের সুযোগ দেবে না।

বিচিত্র ভঙ্গিতে লড়ে চলল দুজনে, হাত-পা দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে রেখেছে পরস্পরকে। উল্টাচ্ছে, পাল্টাচ্ছে দুটো দেহ—কখনও এ ওর উপরে, কখনও ও এর উপরে, কখনও বা পাশাপাশি জড়িয়ে ধরে রেখেছে একে অন্যকে। কিন্তু কেউ কাউকে হারাতে পারছে না। বেশ কিছুক্ষণ চলল এভাবে। শেষে ইজরায়েলি লোকটা ফেলে দিল উজি, মুক্ত হাতে খপ্ করে ধরে ফেলল আবেলের গোপনাঙ্গ। ওর মুঠোর প্রচণ্ড চাপে চোখে অন্ধকার দেখল আবেল, নিজের অজান্তেই চেঁচিয়ে উঠল গলা ছেড়ে। শরীর মোচড়াল, কিন্তু একচুল আলগা করতে পারল না বাঁধন। উপায়ান্তর না দেখে কপাল দিয়ে সজোরে আঘাত করল লোকটার মুখে। নাক থেঁতলে গেল ইজরায়েলির, কয়েকটা দাঁত

ভেঙে ঢুকে গেল মুখের ভিতর, স্বাভাবিক রিফ্লেক্সের বশে আবেলকে ছেড়ে দিয়ে আহত মুখ ঢাকতে চাইল সে দু'হাতে। কিন্তু তাকে সে-সুযোগ দিল না আবেল, চিৎ হয়ে পড়া শরীরটার উপর ঘোড়ায় চড়ার ভঙ্গিতে বসে পড়ল ও, হাঁটু দিয়ে আটকে ফেলল হাতদুটো। তারপর একের পর এক ঘুসি চালাল লোকটার কণ্ঠা লক্ষ্য করে। শ্বাসনালী ভেঙে গেল ইজরায়েলি এজেন্টের, বাতাসের অভাবে খাবি খেতে থাকল। ইস্পাতকঠিন দু'হাতে তার টুঁটি চেপে ধরল আবেল, শরীরের সমস্ত ভর চাপিয়ে দিল কব্জিতে। দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল লোকটার, আবেলের শরীরের নীচে মোচড়ামুচড়ি করল, কিন্তু ছাড়া পেল না। কিছুক্ষণ পর স্থির হয়ে গেল দেহটা। প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে। তারপরও হাত সরাল না আবেল, নিশ্চিত হবার জন্য ধরে রাখল গলাটা। শেষে যখন সন্তুষ্ট হলো, তখনই কেবল ছাড়ল লাশটাকে।

বিদ্যুৎ চমকাল এ-সময়। এক ঝলকের জন্য মৃত ইজরায়েলির চেহারা দেখতে পেল আবেল। অচেনা লোক, আগে কখনও দেখেনি। অ্যাম্বাসেডর হোটেলে দেখা দুই ইজরায়েলির মধ্যে এ-ব্যাটা ছিল না। আসলেও তা-ই। আবেলকে স্পট করতে পারার কৃতিত্ব ইয়াশাদের হলেও সে ওর পিছু নেয়নি। দলের আরেকজনকে রেডিওতে মেসেজ দিয়ে পাঠিয়েছিল ওর পিছনে। কপাল ভাল ইয়াশাদের, নিজে এলে তার-ও একই দশা হতে পারত।

এসব অবশ্য আবেলের জানা নেই। লাশটার পাশে বসে হাঁপাতে থাকল ও, সারা শরীর ব্যথা করছে। হঠাৎ স্যাট-ফোনের রিং শুনে সংবিৎ ফিরে পেল ও। তাড়াতাড়ি আছড়ে-পাছড়ে এগোল শব্দের উৎসের দিকে। কাদার মধ্যে হাতড়ে বের করল ফোনটা। ডিসপ্লে-তে ভেসে ওঠা নম্বরটা দেখে নিল, তারপর রিসিভ করল কল।

'হ্যালো, মেজর জেনারেল! দুঃখিত, ছোট্ট একটা কাজ সারার জন্য লাইনটা কেটে দিয়েছিলাম। তো যা বলছিলাম...'

এন্ট্রান্স পরিষ্কার করায় ব্যস্ত দলটার কানে হঠাৎ ভেসে এল একটা চাপা বিস্ফোরণের আওয়াজ। মাটির গভীর থেকে ভেসে এসেছে ওটা, পায়ের নীচে কম্পন অনুভব করা গেল। কয়েক মিনিটের জন্য স্থির হয়ে গেল সবাই। ওয়ালেসকে ডেকে জিজ্ঞেস করল মানসিনি, বিস্ফোরণটার উৎস কোথায়। জবাব দিতে পারল না ওয়ালেস, আন্দাজে ঢিল ছুঁড়তেও চাইল না। শুধু বলল, খুব শীঘ্রি জানা যাবে সব। লোকজনকে আবার কাজে লাগিয়ে দিল সে। চল্লিশ মিনিট পর একজন মানুষ ঢোকার মত একটা ফোকর তৈরি করে ফেলল সে।

ওয়ালেস নিজেই ঢুকল সবার আগে। মাইনারস হেলমেটের হেড-ল্যাম্পের পাশাপাশি হাতে একটা শক্তিশালী ফ্ল্যাশলাইট রেখেছে। মানসিনি তাকে অনুসরণ করল। দেয়াল আর ছাদের দিকে নজর রাখল ওয়ালেস, বোঝার চেষ্টা করছে—নতুন কোনও ফাটল আছে কি না। কয়েক ফুট পর পর থেমে পাথরের গায়ে একটা হাতুড়ি দিয়ে টোকা দিচ্ছে, চেষ্টা করছে শব্দ শুনে টানেলের স্ট্যাবিলিটি নির্ণয়ের। মানসিনি অবশ্য ওসব নিয়ে ভাবছে না, সামনের অন্ধকার

চিরে দেখতে চেষ্টা করছে হীরার বাক্সটা কোথায়। চিন্তা-চেতনায় হীরা উদ্ধার ছাড়া আর কিছু স্থান পাচ্ছে না।

'রানা নিশ্চয়ই সিন্দুকটার ডালা ভাঙার চেষ্টা করেছে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে,' হঠাৎ বলল সে। 'বেকুবটা নিজের মরণই ডেকে আনছে তাতে। পিটের মধ্যে ব্লাস্ট-ম্যাট রাখিনি আমরা, গম্বুজটা ধসে পড়ে ছাতু হয়ে যাবে ব্যাটা।'

'হয়তো,' কাঁধ ঝাঁকাল ওয়ালেস।

উড়তে থাকা ধুলোয় ছেয়ে আছে টানেলের অভ্যন্তর, ফ্ল্যাশলাইটের আলো কয়েক ফুটের বেশি দূরত্ব ভেদ করতে পারছে না। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিস্ফোরকের গন্ধ। নাক কুঁচকে রেখেছে সুপারভাইজর। এখন পর্যন্ত অবশ্য টানেলটা পরিষ্কারই পেয়েছে ওরা, তবে সামনে কী অপেক্ষা করছে, কে জানে!

একটু পরেই নতুন বাধাটা আবিষ্কার করল ওরা। ওয়ার্কিং পিটের দুইশ' গজ দূরে। পাথর ধসে টানেলটার মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত সিল হয়ে গেছে। তবে এখানকার অবস্থা প্রবেশপথের মত ভয়াবহ নয়। পাথরের টুকরোগুলো অনেকটাই আলগা। পা দিয়ে খোঁচা মেরে কয়েকটা সরাল ওয়ালেস, নীচটা শূন্য হয়ে যাবার পরও উপর থেকে নতুন কোনও পাথর বা মাটি খসে পড়ল না।

'কী এসব?' বিরক্ত গলায় জানতে চাইল মানসিনি।

'বুঝতে পারছি না,' বলল ওয়ালেস। 'তবে রানা যদি এই ধস নামিয়ে আমাদেরকে ঠেকাবার মতলব করে থাকে, তা হলে মস্ত বোকামি করছে। এ-জায়গাটা পরিষ্কার করতে মোটেই কষ্ট হবে না আমাদের। খুব সহজেই পিটে পৌঁছে যাব।'

'তুমি শিয়োর?' ভুরু কোঁচকাল মানসিনি।

'অবশ্যই!' জোর দিয়ে বলল ওয়ালেস। 'সিলিংটা স্টেবল-ই মনে হচ্ছে! তারপরও ঝুঁকি নেব না। উপরটা কাঠের তক্তা লাগিয়ে নিরাপদ করে নেব।' ঝুঁকে ধসটা পরীক্ষা করল সে। তারপর উঠে দাঁড়াল। ফিরল নিয়োগকর্তার দিকে। ইতোমধ্যে একটা বোনাস ঘোষণা করেছে মানসিনি। হীরাগুলো যত দ্রুত উদ্ধার করা হবে, ততই বেশি টাকা দেয়া হবে তাকে। কাজেই খনিতে ঢোকার জন্য মুখিয়ে উঠেছে লোভী দক্ষিণ আফ্রিকান। 'রানা লোকটাকে আরও বুদ্ধিমান ভেবেছিলাম আমি। টানেল ব্লক করে আমাদেরকে ঠেকানোর চিন্তা শুধু বোকারাই করতে পারে। ব্যাটার মতলবটা ঠিক বুঝতে পারছি না বটে, কিন্তু ও আমার মেজাজটা খাট্টা করে দিচ্ছে।'

'আমারও,' বলল ইটালিয়ান টাইকুন। 'হাতে পেয়ে নিই হারামজাদাকে। ব্যাটা তখন হায়-হায় করবে—অ্যাভালাঞ্চটার তলায় চাপা পড়ে মরল না কেন।'

নতুন ধসটা পরিষ্কার করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওয়ালেস। শ্রমিকদের নিয়ে এল ভিতরে। বিস্ফোরণের ফলে পাথরগুলো ছোট ছোট খণ্ডে পরিণত হয়েছে, অনায়াসেই একেকটা টুকরো একজন মানুষ হাতে তুলতে পারে। শ্রমিকদেরকে সার বেঁধে পুরো টানেলের দৈর্ঘ্য জুড়ে দাঁড় করানো হলো। একটা একটা পাথর তুলে হাতে হাতে ওগুলো নিয়ে যাওয়া হতে থাকল খনির বাইরে। কাজটা কঠিন না হলেও সময়সাপেক্ষ। পুরো দু'ঘণ্টা লেগে গেল মানুষ যাবার

মত একটা পথ করে নিতে।

শেষ পাথরটা সরানো হতেই হাতে একটা পিস্তল নিল ওয়ালেস, সাবধানে উঁকি দিল ফোকর গলে। কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল সে, তারপর সোজা হয়ে ফিরল মানসিনির দিকে।

'অল ক্লিয়ার,' বলল সে। 'আসুন।'

ফোকর গলে ওয়ার্কিং পিটের কার্নিশে বেরিয়ে এল সুপারভাইজর আর ইটালিয়ান টাইকুন। গম্বুজ আকৃতির বিশাল চেম্বারটা সুনসান... কোনও আওয়াজ নেই। জেনারেটরগুলো নিস্তব্ধ, ওগুলো ভেঙে চুরমার করে দেয়া হয়েছে। দেখে বোঝা গেল, মেরামত করা যাবে না। ইমার্জেন্সি পাওয়ারের ব্যাটারিতে চলা কয়েকটা বাতি অবশ্য জ্বলছে ভিতরে, জায়গাটা অন্ধকার নয়। স্বল্প আলোয় চেম্বারের উপর নজর বোলাল মানসিনি। একটা মানুষও চোখে পড়ল না তার।

'নেই!' ফিসফিসিয়ে বলল ইটালিয়ান টাইকুন। ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছে না। 'ওরা কেউ নেই!'

পাশে দাঁড়ানো ওয়ালেসেরও চোয়াল ঝুলে পড়েছে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, চেম্বারের ভিতর মাসুদ রানা, ইরিত্রিয়ান শ্রমিক দল, কিংবা সুদানিজ গার্ডদের চিহ্নমাত্র নেই। সবাই বাতাসে মিলিয়ে গেছে!

রয়ে গেছে শুধু একটা মেসেজ। পিটের দূর প্রান্তের দেয়ালে হলুদ রঙের ফ্লুরোসেন্ট পেইন্টে লিখে রাখা হয়েছে একটা কথা, সেটা দেখে শীতল স্রোত বয়ে গেল দুই দর্শকের শরীরে। ওখানে লেখা: *নরকে স্বাগতম!*

উনিশ

আড়াই ঘণ্টা আগের কথা।

ওয়ার্কিং পিটের দৃশ্যটা তখন সম্পূর্ণ অন্যরকম। মেশিনারি আর ইকুইপমেন্টের আওয়াজে ভরে আছে পুরো জায়গাটা। গম্বুজ আকৃতির ছাদে প্রতিধ্বনিত হয়ে বেড়ে গেছে বহুগুণ, চাপা পড়ে যাচ্ছে ইরিত্রিয়ান শ্রমিকদের হৈচৈ আর চেঁচামেচি। রানার ঠিক করে দেয়া প্রায়-অসম্ভব ডেডলাইনটার কারণে পাগলের মত খেটে চলেছে সবাই। প্রাচীন শাফটটার তলা খুঁড়ে একজন মানুষ ঢোকার মত ফোকর তৈরি করছে, সদ্য খোঁড়া মাটি-পাথর বের করে আনছে চেম্বারের মেঝেতে। একটা নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেলে খোঁড়া হচ্ছে সুড়ঙ্গ, ইতোমধ্যে পনেরো ফুট পাতালে নেমে গেছে ওটা।

মাইনারদেরকে কাজে লাগিয়ে দিয়ে এন্ট্রান্সের টানেলে ফিরে এসেছে রানা। ওখানে চারজন শ্রমিক ছাদের গায়ে ছিদ্র বানানোতে ব্যস্ত—প্রতিটার গভীরতা পাঁচ ফুট। এক্সপ্লোসিভ নিয়ে এসেছে রানা, সাবধানে বসাচ্ছে একটার পর একটা চার্জ, তাড়াহুড়োয় যাতে কোনও ভুল-চুক হয়ে না যায়। ওকে সাহায্য

করছে দিনা। ছোট্ট একটা ঠেলাগাড়ি থেকে তুলে দিচ্ছে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভের সিলিণ্ডার আর নানা রকম ওয়্যার-ডিটোনেটর। এখানটায় আওয়াজের মাত্রা কম, সুযোগ বুঝে প্রশ্নটা করেই ফেলল ও।

'রানা, ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলবে আমাকে?'

একটা চার্জের গায়ে তার পেঁচাচ্ছিল রানা, চোখ তুলল না। বলল, 'টানেলটা ধসিয়ে দেব। আশা করি, মানসিনিকে বেশ কিছুক্ষণ আটকে রাখা যাবে তাতে।'

'সেটা তো বলেইছ। আমি উধাও হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা জানতে চাইছি। আর ওই যে... আসল সলোমনের খনির কথা বললে... সেটাই বা কী? আমরা কি নকল খনিতে বসে আছি নাকি? তা হলে হীরা পাচ্ছি কীভাবে?'

তার পেঁচানো শেষ করে দিনার দিকে ফিরল রানা। সরাসরি জবাব না দিয়ে পাল্টা একটা প্রশ্ন করল। 'ব্রাদার আব্রাহামের কাছে শোনা খনিটার বর্ণনার সঙ্গে এটার কোনও অমিল চোখে পড়েছে তোমার?'

'না তো!' দিনা মাথা নাড়ল। 'কোথায় অমিল?'

'ব্রাদার আব্রাহাম বলেছেন, এই খনি খুঁড়েছে শিশু-শ্রমিকরা, রাইট? ছোট টানেল খুঁড়তে সময় কম লাগে, কাজে গতি আসে... তাই না? কিন্তু এখানকার টানেলগুলো দেখো—আমাদের হাইটের চেয়ে উঁচু, পাশাপাশি দুজন মানুষ অনায়াসে হাঁটতে পারে। বর্ণনার সঙ্গে মিলছে? তা ছাড়া এন্ট্রান্সের এই টানেলটা সরাসরি কিম্বারলাইটের পাইপে এসে ঠেকেছে। এক-চেষ্টায় পাইপটার খোঁজ পাওয়া তো স্রেফ অসম্ভব একটা ব্যাপার!'

'কী বলতে চাইছ তুমি?' দিনা ভুরু কোঁচকাল।

'এই টানেলটা পরে খোঁড়া... কিম্বারলাইট পাইপটা পাওয়া যাওয়ার পরে!' বলল রানা। 'সাইজটা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে আকরিক-ভর্তি ঝুড়ি-সহ দুজন পূর্ণবয়স্ক লোক সহজে আসা-যাওয়া করতে পারে। লজিক্যালি চিন্তা করে দেখো, বাচ্চাদের তৈরি করা ছোট ছোট টানেল দিয়ে কি বেশি পরিমাণে আকরিক বের করা সম্ভব? মোটেই না। ওরা শুধু টানেল খুঁড়ে পাইপটার লোকেশন বের করেছে। তারপর এখান দিয়ে বয়স্ক শ্রমিকরা শিরাটা থেকে কিম্বারলাইট ভেঙে আসল মাইনিঙের কাজ করেছে। পুরো ব্যাপারটার এই একটাই ব্যাখ্যা হতে পারে। পুরনো ওই বইটাতে বাচ্চাদের খোঁড়া খনিটার কথা বলা হয়েছে, এটার নয়। ওটাই আসল সলোমনের খনি!'

'হায় খোদা!' বুঝতে পেরে অবাক হয়ে গেল দিনা। 'আমি তো এভাবে চিন্তাই করিনি!'

'ইট্স্ ওকে,' বলল রানা। 'ব্যাপারটা শুরুতে আমার মাথাতেও খেলেনি। খটকা লাগছিল, কিন্তু কেন... তা বুঝতে পারছিলাম না। অনেক ভাবতে হয়েছে রহস্যটা ধরতে।'

'বাচ্চাদের খোঁড়া খনিটা কি আমাদের নীচে আছে? দুটো খনি যেখানে ইন্টারসেক্ট করেছে, সেখানটাই খোঁড়াচ্ছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল দিনা।

'হ্যাঁ,' রানা মাথা ঝাঁকাল। চার্জটা তুলে মাথার উপরের গর্তের মধ্যে বসাতে

শুরু করল ও। 'মেডিউসা স্যাটেলাইটের তোলা ছবিগুলো শেষ পর্যন্ত কাজে লেগেছে। ওয়াশিংটনে থাকতেই ওগুলোতে বেশ কিছু এলোমেলো সাদা রেখা লক্ষ করেছিলাম। তখন গুরুত্ব দিইনি, ভেবেছিলাম স্যাটেলাইটটার পজিট্রন রিসিভারের ডিসটরশন-লাইন। পরে চিন্তা করে দেখলাম, ব্যাপারটা তা নয়। ওগুলো আসলে মাটির তলায় ফাঁকা জায়গা... মানে, টানেল।'

'এতক্ষণে বুঝতে পারছি, কেন আমাদেরকে জ্যান্ত কবর দিয়েছ তুমি,' দুশ্চিন্তা কেটে গেছে দিনার। হাসল। 'মানসিনিকে ফাঁকি দিতে চাইছ, তাই না? ওই খনিটার টানেল দিয়ে অন্য পথে বেরুতে চাও সারফেসে। ও এদিকে বোকার মত বসে থাকবে, আমাদেরকে না-পাওয়া পর্যন্ত চলে যেতেও পারবে না। এর মাঝে আবেল তোমার বসের সঙ্গে যোগাযোগ করে সাহায্য নিয়ে আসবে, ঠিক বলেছি? ভালই প্ল্যান এঁটেছ। ভাল কথা, স্যাটেলাইট ফটোতে ওই খনিটার এন্ট্রান্স পেয়েছ?'

রানার চেহারায় দ্বিধা ভর করল। 'ইয়ে... না। ছবিগুলোর রেজল্যুশন খুব বাজে। তবে আশা করছি, ওখানে ঢুকে পথটা খুঁজে বের করা যাবে।'

'অ্যাঁ! কী বলছ?' দিনার মুখ আবার কালো হয়ে গেল। 'যদি পথ পাওয়া না যায়? আর... আর রেজল্যুশন যদি খারাপই হয়, তা হলে নীচের খনিটার লোকেশনের ব্যাপারেই বা নিশ্চিত হচ্ছ কীভাবে? সুড়ঙ্গ যে খুঁড়ছ, ওটা যদি নীচের কোনও টানেলের গায়ে গিয়ে না ঠেকে?'

'কিছুটা অনিশ্চয়তা যে আছে, তা অস্বীকার করছি না,' চার্জটা সেট করে দিনার দিকে ফিরল রানা। 'কিন্তু সেটার কথা ভেবে চুপচাপ তো বসে থাকা যায় না।' সঙ্গিনীর অবস্থা দেখে আশ্বাস দেয়ার ভঙ্গিতে হাসল ও। 'এত ভয় পেয়ো না। হিসেবটাতে ভুলচুক হবার সম্ভাবনা কম। আশা করি ব্যর্থ হবো না।'

আশ্বাসে খুব একটা কাজ হলো না। দিনার মুখটা তস হয়ে রইল। ওকে সান্ত্বনা দেবার আর চেষ্টা করল না রানা, সময় নেই।

বিস্ফোরক বসানো শেষ হলে ছোটখাট একটা ভোটাভুটির আয়োজন করা হলো। নিজের পরিকল্পনা সবার কাছে ব্যাখ্যা করল রানা, বিপদ এবং ঝুঁকির প্রকৃতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দিল সবাইকে। জানতে চাইল, তাতে কারও কোনও আপত্তি আছে কি না। একবাক্যে নেতিবাচক জবাব পাওয়া গেল রিফিউজিদের কাছ থেকে। সবার সম্মতি পেয়ে এন্ট্রান্সের টানেলে বিস্ফোরণ ঘটানো হলো।

এরপর আরও আধঘণ্টা খোঁড়াখুঁড়ি চলল। রানা নিজেই নামল শাফটে, একটা ইলেকট্রিক ড্রিল মেশিন দিয়ে গভীর করে চলল গর্তটাকে। হঠাৎ মাটি-পাথরের বাধা পেরিয়ে ফাঁকা কীসের মধ্যে যেন ঢুকে গেল মেশিনটার ফলা। উত্তেজনা অনুভব করল ও, তবে থামল না। ড্রিলটা তুলে পাশে আরেকটা গর্ত করল। সঙ্গে সঙ্গে পুরো জায়গাটা ধসে পড়ল। কালো একটা গহ্বর আবিষ্কার করল রানা নীচে, গত তিন হাজার বছরে যেখানে আলো পড়েনি। ওর পিছনে শ্রমিকরা হল্লোড় করে উঠল, ধাক্কাধাক্কি করে উঁকি দিল গর্তটাতে, নীচ থেকে উঠে আসা গুমোট গন্ধটাকে মোটেই পাত্তা না দিয়ে।

ড্রিলটা অফ করে সবাইকে চুপ করতে বলল রানা। ইশারা করল জেনারেটরও বন্ধ করে দিতে। খানিক পরেই আরও শ্রমিক নেমে এল উপর থেকে, সঙ্গে দিনা। সবাই দেখতে চায় আবিষ্কারটা।

'মাই গড!' উত্তেজিত গলায় বলল দিনা। 'তুমি তো কামাল করে দিয়েছ!' রানাকে জড়িয়ে ধরে ঝোঁকের বশে চুমু খেয়ে বসল ও। পিছনের শ্রমিকরা হেসে উঠল ব্যাপারটা দেখে। অপ্রস্তুত হয়ে গেল দিনা, লজ্জিত ভঙ্গিতে পিছিয়ে গেল দু'পা।

রানা বলল, 'অগ্রগতি হয়েছে আমাদের, তবে এখনও নাচানাচি করবার সময় হয়নি। একটা ব্যাপার ভুলেই গিয়েছিলাম, এখন মনে পড়ল—কেইভ-ডিজিজ।'

'ওটা আবার কী জিনিস?' অবাক হয়ে জানতে চাইল দিনা।

'*ক্রিপ্টোককাস*। এক ধরনের ফাঙ্গাস ওটা, মাটির নীচে ফাঁকা জায়গায় বাস করে। সাধারণত পরিত্যক্ত গুহা, বা খনিতেই বেশি পাওয়া যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ঢুকে আক্রমণ করে ফুসফুস ও সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমকে। *মেনিনজাইটিস* রোগ হয় ও থেকে। দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা না করলে রোগী মারাও যেতে পারে।'

'ওহ্ গড! নীচে ওই জিনিস আছে ভাবছ?'

'ভাবছি না, আমি জানি—আছে। গন্ধ পাচ্ছ না? ওটা ক্রিপ্টোককাসের। ভেন্টিং করে বাতাসটা বের করে নিতে পারলে ভাল হতো, উপরের টানেলটাতে কাজ শুরুর আগে মানসিনি আর ওয়ালেস তা-ই করে নিয়েছিল; কিন্তু আমাদের সে-সুযোগ নেই। ঝুঁকিটা নিতেই হবে।'

'রোগটার চিকিৎসা আছে?'

'উমম্... সম্ভবত *অ্যাম্ফোটারেসিন* আর *ফ্লোরোসাইটোসিন*,' বলে হাসল রানা। 'রিল্যাক্স। ওষুধগুলো এক্ষুনি প্রয়োজন নেই আমাদের। ফাঙ্গাস-টা যত ডেনজারাসই হোক, কিছুটা সময় পাব আমরা। কাজেই ও-নিয়ে এখনি দুশ্চিন্তার কিছু নেই। কুইক, সবাইকে নামাতে হবে এখান দিয়ে। নামাতে হবে হীরাগুলোও। তারপর আমাদের সমস্ত ট্র্যাক মুছে দিতে হবে, যাতে মানসিনি এই পথটার খোঁজ না পায়।'

পরবর্তী বিশ মিনিটে বাকি কাজগুলো সেরে নিল ওরা। প্রথমেই হীরা-ভর্তি সিন্দুকটা নামানো হলো শাফট দিয়ে। তারপর শাফটের উপরে একটা *কফার-ড্যাম* তৈরি করা হলো—ক্যানভাসে বাঁধা ওভার-বারডেন আর মাটি-পাথরের স্তূপ ওটা, একটা দড়িতে টান দিলেই ঝুপ করে নীচে পড়ে গিয়ে শাফটের তলাটা সিল করে দেবে। জেনারেটর-সহ সমস্ত ইকুইপমেন্ট নষ্ট করে দিল ওরা, যাতে মানসিনি ভিতরে ঢুকে আলো আর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির সঙ্কটে পড়ে। কাজ শেষে সবাইকে শাফট ধরে নীচের খনিতে পাঠাতে শুরু করল রানা।

ম্যাকেঞ্জি আর চার গার্ডকে নিয়ে কী করবে, তা নিয়ে একটু দ্বিধায় ভুগল ও। যত বদমাশই হোক, নিরস্ত্র পাঁচজন মানুষকে খুন করবার প্রশ্নই ওঠে না;

ওদেরকে আবার ফেলে যাওয়াও যায় না। মানসিনি এলে এস্কেপ রুটের ব্যাপারে সব ফাঁস করে দেবে। শেষমেশ ঝামেলা ঘাড়ে নেবারই সিদ্ধান্ত নিল। সশস্ত্র প্রহরায় বন্দিদেরকেও সঙ্গে নেবে বলে ঠিক করল। মূল গ্রুপটার পিছু পিছু শাফটে নামানো হলো ওদের।

রওনা হবার আগে মানসিনিকে একটু ঘাবড়ে দেয়ার ইচ্ছেটা দমন করতে পারল না রানা। স্প্রে-পেইন্টের ক্যানটা নিল ও, চেম্বারের দেয়ালে বড় বড় করে লিখল একটা বার্তা। ওটা দেখে ইটালিয়ান টাইকুনের মাথা খারাপ হয়ে যাবে। মুখে একটা নিঃশব্দ হাসি নিয়ে সবার শেষে শাফটে ঢুকল ও। নীচে নেমে দুই খনির সংযোগকারী সুড়ঙ্গটায় শরীর ঢোকাল, তারপর টান দিল কফার-ড্যামের দড়িটাতে।

ক্যানভাসের বাঁধন খুলে নেমে এল রাশ রাশ ধুলো-মাটি। শাফটের তলা ঢেকে গেল মুহূর্তে, ঢাকা পড়ে গেল সুড়ঙ্গের মুখ, সেই সঙ্গে হীরা-ভর্তি সিন্দুকটাও। আবছা অন্ধকারে ছেয়ে গেল চারদিক। মানসিনি বা তার স্যাঙাৎ-দের কারও পক্ষেই এখন আর বের করা সম্ভব হবে না—দলবল নিয়ে রানা পালাল কোন পথে!

দড়িতে টান দিয়েই সুড়ঙ্গ ধরে নামতে শুরু করেছে রানা। কয়েক মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল সলোমনের সত্যিকার খনির টানেলে। একেবারে ছোট ওটা, দাঁড়াতে গিয়েই মাথা ঠুকে গেল ছাদের সঙ্গে। তাড়াতাড়ি হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ও, একটা ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে পরীক্ষা করল আশপাশ।

টানেলটার উচ্চতা মাত্র তিন ফুট, প্রস্থেও কমবেশি একই রকম। চতুষ্কোণ নয়, বৃত্তাকার। দেয়ালগুলো রুক্ষ, এবড়োখেবড়ো—প্রাচীন আমলের পাথরের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ছাপ ফুটে আছে সর্বত্র। বাতাস গুমোট, অক্সিজেনের পরিমাণ কম, শ্বাস টানতে কষ্ট হয়। উপরের সুড়ঙ্গটা বন্ধ হতেই কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বেড়ে যেতে শুরু করল, কাশতে লাগল অনেকে। রানা বুঝতে পারল, এক জায়গায় জটলা করা চলবে না, তাতে একসঙ্গে শ্বাসকষ্ট শুরু হবে সবার। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে হবে, তবে তাতে হারিয়ে যাবার ভয় আছে। এ-মুহূর্তে যেখানে বসে আছে, সেখান থেকে তিনটে শাখা দেখতে পাচ্ছে রানা—একটা গেছে ডানে, একটা বাঁয়ে, শেষটা নীচের দিকে। সবগুলোই ছোট ছোট, কোনোটাতেই দাঁড়াবার বা স্বচ্ছন্দে চলাফেরার উপায় নেই। ক্লস্ট্রোফোবিয়া জাগাবার মত একটা পরিবেশ, মনে হচ্ছে যেন কোনও ইঁদুরের গর্তে ঢুকে পড়েছে। এখন পর্যন্ত অবশ্য সঙ্গী-সাথীরা সবাই চুপচাপ আছে, তবে কতক্ষণ থাকবে, সেটাই প্রশ্ন।

সঙ্গীদেরকে ডিঙিয়ে দলটার একেবারে সামনে চলে গেল রানা, ওখানে আরেকটা ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে ওর অপেক্ষায় বসে আছে দিনা। আরও দুটো স্পেয়ার ফ্ল্যাশলাইট আছে ওদের কাছে, হেড-ক্র্যাঙ্ক মেকানিজমে জ্বলে, কাজেই ব্যাটারি ফুরিয়ে যাবার ভয় নেই। তিনফুট ব্যাসের একটা সুড়ঙ্গের জন্য দুটো ফ্ল্যাশলাইটই যথেষ্ট, তারপরও ভিতরটা কেন যেন আলোকিত মনে হলো না রানার কাছে, ফ্ল্যাশলাইটের রশ্মির ওপারেই জমাট বেঁধে আছে নিঃসীম অন্ধকার,

ওদেরকে যেন গিলে খাবার জন্য ওঁত পেতে আছে।

'এবার কী, দুঃসাহসী নেতা?' মুচকি হেসে জানতে চাইল দিনা। রানার আন্দাজ সঠিক প্রমাণিত হওয়ায় ওর উপর আস্থাটা ফিরে এসেছে।

ন্যাপস্যাক থেকে একটা লাইটার বের করল রানা, আগুন জ্বালল। কয়েক মুহূর্ত শিখাটার দিকে তাকিয়ে রইল—একবিন্দু কাঁপছে না ওটা, জড় পদার্থের মত স্থির। দীর্ঘশ্বাস ফেলে লাইটারটা নিভিয়ে ফেলল ও, ভরে রাখল পকেটে। বলল, 'এয়ার-মুভমেন্ট নেই এখানে। তবে ভয়ের কিছু নেই, সামনে কোথাও না কোথাও পাবো। এগোতে হবে আমাদেরকে।'

'এত লোক নিয়ে এগোনো সহজ হবে না,' মন্তব্য করল দিনা।

'জানি,' রানা মাথা ঝাঁকাল। 'একটা প্ল্যান আছে আমার। এই খনির ভিতরে ডরমিটরি থাকার কথা... মানে, কাজের ফাঁকে বাচ্চারা যেখানে বিশ্রাম নিত। ওখানে ছোটখাট এয়ার-ভেন্টও থাকবে। অমন একটা ডরমিটরি খুঁজে বের করে সবাইকে রেখে যেতে চাই আমি। পথ খুঁজতে বেরুব শুধু তুমি আর আমি। সারফেসে ওঠার এক্জিট পেলে সবাইকে নিয়ে যাওয়া যাবে।'

'ভাল বুদ্ধি,' স্বীকার করল দিনা। 'ওতে তাড়াতাড়ি এগোতে পারব আমরা। শ্রমিক, কিংবা বন্দিদেরকে নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।'

পিছন থেকে ভেসে আসা কাশির শব্দ একটু শুনল রানা। তারপর বলল, 'এবার বুঝতে পারছ, আবেলকে না এনে কেন তোমাকে এনেছি? ও প্রচুর সিগারেট খায়, ফুসফুস দুর্বল, এখানকার বাতাস সইতে পারত না। তা ছাড়া এই ছোট্ট টানেলে ওর মত লম্বা-চওড়া পুরুষের চাইতে তোমার মত হালকা-পাতলা মেয়েই সহজে নড়াচড়া করতে পারবে।'

'কৈফিয়ত না দিলেও চলবে,' বলল দিনা। 'আমার কোনও অভিযোগ নেই। তুমি নরকে যেতে বললেও আপত্তি করতাম না।'

'নরক নয়? এটাকে স্বর্গ মনে হচ্ছে?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

হেসে ফেলল দিনা। পরিবেশটা সহজ হয়ে এল।

'আবেল এর মধ্যে নিশ্চয়ই আমার বসের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেলেছে,' অনুমান করল রানা। 'মিলিটারি ফোর্স পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন তিনি। আমরা বেরুবার আগেই হয়তো পৌঁছে যাবে ওরা। আমাদের প্রাক্তন ইটালিয়ান *মনিব*-কে ভালমত আদর-খাতির করব তখন।'

'ইস্স্, তা-ই যেন হয়!'

'চলো, তা হলে। এগোই।'

হাঁটার উপায় নেই, হামাগুড়ি দিয়ে টানেল ধরে এগিয়ে চলল ওরা। সবার সামনে রানা, কামড়ে ধরে রেখেছে ফ্ল্যাশলাইটটা। ওর পিছনে দিনা, তারপর শ্রমিক আর বন্দিরা। সবার শেষে সশস্ত্র চারজন রিফিউজি, বন্দিদের উপর নজর রাখছে তারা। হাতের তালু আর হাঁটুর ঘষায় ধুলো উড়তে শুরু করল মেঝে থেকে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হাসপাতালের যক্ষ্মা ওয়ার্ডের মত অবস্থা হলো টানেলের ভিতর। অনবরত কাশছে প্রতিটি মানুষ, সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে কয়েক গুণ জোরালো হয়ে। গলা খসখসে হয়ে গেছে, সঙ্গে আনা

পানিতে ঘন ঘন চুমুক দিতে থাকল ইরিত্রিয়ান রিফিউজিরা একটু শান্তি পাবার আশায়। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল রানা, পরিস্থিতি খারাপের দিকে মোড় নিচ্ছে। তাড়াতাড়ি একটা এয়ার ভেন্টের খোঁজ পেতে হবে, নইলে শ্বাসকষ্টেই অচল হয়ে যাবে সবাই।

দু'ঘণ্টা পেরুল... কষ্টকর, ভয়াবহ দুটি ঘণ্টা। দলটার কারও মধ্যে আর কথা বলার শক্তি নেই। প্রত্যেকের গলা আর শ্বাসনালীতে যেন জ্বলন্ত কয়লা ঢুকে পড়েছে... তীব্র জ্বালাপোড়া! এগোনোর গতি কমে গেছে অনেক, ভূ-গর্ভের সংকীর্ণ টানেল দিয়ে কেঁচোর মত মন্থর গতিতে যাচ্ছে ওরা। কিছুক্ষণ পর পরই থেমে লাইটার জ্বালে রানা, কিন্তু বায়ু-চলাচলের কোনও চিহ্ন খুঁজে পায় না। প্রতিবারই স্থির থাকে আগুনের শিখা। সময় নিয়ে কয়েকবার মেডিউসা ফটোগ্রাফগুলোও স্টাডি করল ও। কিন্তু বাজে রেজল্যুশনের কারণে প্রাচীন খনির টানেল-সিস্টেমের সঙ্গে ওটাকে মেলানো গেল না। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে ওগুলো ন্যাপস্যাকে আবার ভরে রাখল, খামোকা সময় নষ্ট। ওর ইনস্টিঙ্কট আর অতীত অভিজ্ঞতাই এখন ভরসা, আর কিছুই এই গোলকধাঁধা থেকে দলটাকে বের করে নিতে পারবে না। ছোট ছোট শাখা-প্রশাখা ধরে এগোচ্ছে এখন ওরা, অপেক্ষাকৃত বড় টানেলগুলো চুম্বকের মত টানলেও সেদিকে যাচ্ছে না রানা। মনে মনে প্রাচীন খনিটার একটা ম্যাপ তৈরি করছে ও, সেই ম্যাপের দিকনির্দেশনা অনুসরণ করছে।

আরও এক ঘণ্টা পেরুল। শ্বাসকষ্টে চোখে আঁধার দেখতে শুরু করেছে সবাই, এমনি অবস্থায় আবার থামল রানা। পকেট থেকে বের করে জ্বালল লাইটার। শিখাটা কেঁপে উঠল একটু—এতই সামান্য যে, ভাল করে না তাকালে বোঝাই যায় না। স্বস্তি ফুটল ওর চেহারায়, দিনার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সব ঠিক হয়ে যাবে।'

পনেরো মিনিট পর পাওয়া গেল ছোট একটা চেম্বার—প্রাকৃতিক। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বিশ ফুট করে চওড়া, ছ'ফুট উঁচু। ছাদে সরু ফাটল আছে, সেখান দিয়ে পর্বতের ফাঁকফোকর গলে ঢুকছে পরিষ্কার বাতাস। চেম্বারটাতে বিশ্রাম নিত তিন হাজার বছর আগেকার শিশু-শ্রমিকরা, তার নিদর্শন পাওয়া গেল। চাপাচাপি হলেও ওখানে জায়গা হয়ে গেল দলের সবার। কষ্টটুকু গায়ে মাখল না কেউ। কয়েক ঘণ্টা খনির বিষাক্ত বাতাস টানার পর প্রাকৃতিক কুঠুরিটার নির্মল বায়ু স্বস্তির পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে ফুসফুস আর শ্বাসনালীতে।

বিশ্রাম পাওনা হয়েছে। একপাশের একটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসল রানা, পাশে দিনা। দলের অন্যেরা বসল আশপাশে। কাশির দমকটা চলল অনেকক্ষণ, তবে আস্তে আস্তে কমে এল। ছোট্ট চেম্বারে নীরবতা নামার পর বেশ কিছুক্ষণ কথা বলল না কেউ।

'এবার নীচে নামার পালা,' হঠাৎ মুখ খুলল রানা।

ওর দিকে মুখ তুলে তাকাল দিনা। 'মানে?'

'বাতাসের জন্য গত কয়েক ঘণ্টা ধরে সারফেসের কাছাকাছি উঠে এসেছি আমরা,' রানা বলল। 'তবে একজিটটা পেতে হলে আবার নীচের দিকে যেতে

হবে।'

'তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না,' ভুরু কোঁচকাল দিনা। 'একজিট তো থাকবে সারফেসের কাছে, নীচে যেতে হবে কেন? দেখো, যথেষ্ট হেঁয়ালি করেছ, আর না। ভেঙে বলো ব্যাপারটা।'

হাসল রানা। 'ঠিক আছে, বলছি। মঠ থেকে আসার পর প্রথম যখন আমরা খনিতে ঢুকলাম, তখন আমি টানেলের দেয়াল পরীক্ষা করছিলাম, মনে আছে?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল দিনা। 'বলেছিলে, পালাবার পথ খুঁজছ।'

'আসলেও তা-ই,' রানা বলল। 'সারফেস থেকে একশো ফুট দূরে একটা অংশের দেয়াল দেখে মনে হচ্ছিল, ওটা মূল সুড়ঙ্গের নয়। রঙটা একটু অন্যরকম ছিল... যেন ওপাশটায় একটা সাইড-টানেল ছিল, পাথর গেঁথে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কারণটা তখন ধরতে পারিনি...'

'তোমার ধারণা, ওই পথটা দিয়ে এই খনিতে আসা যেত?' বুঝতে পেরে প্রশ্ন করল দিনা।

'একজ্যাক্টলি। নীচের খনিটার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ায় নিশ্চয়ই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে ওটা।'

'ওই পথটা থাকতে তুমি শাফটের তলা খুঁড়ে নতুন পথ বানাতে গেলে কেন?'

'ওখান দিয়ে ঢুকলে আমাদের গায়েব হবার চিহ্ন থেকে যেত,' রানা ব্যাখ্যা করল। 'মেইন টানেলটা পরিষ্কার হলেই ওটা দেখে ফেলত মানসিনি। ঢোকার সময় তাই ব্যবহার করতে চাইনি পথটা। তবে এখন অনেকটা সময় পেরিয়ে গেছে, আমাদের সাহায্য করবার জন্য রি-এনফোর্সমেন্ট হয়তো এসে পড়বে বেরুতে বেরুতে, টানেলটাকে একজিট হিসেবে ব্যবহার করলে ক্ষতি নেই।'

'আর যদি তোমার ধারণা ভুল হয়? যদি ওই পথটার সঙ্গে এই খনির কোনও সম্পর্ক না থাকে?'

'তা হলে আমরা মরেছি!' হালকা গলায় বলল রানা।

শক্তি ফিরে পাবার জন্য আরও আধ ঘণ্টা বিশ্রাম নিল ওরা। তারপর দিনাকে ঝাঁকি দিয়ে সঙ্কেত দিল রানা। রওনা হবার আগে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে নিল ও, দিনাকে দোভাষী বানিয়ে নিজের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করল। জানতে চাইল, মাটির তলায় অপেক্ষায় থাকতে রিফিউজিদের কোনও আপত্তি আছে কি না। দেখা গেল, নেই। ইতোমধ্যে রানার নেতৃত্বের উপর অগাধ বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে সবার, ওর উপর ভরসা রাখছে সবাই। ব্যাপারটা গর্বের হলেও রানার বুক থেকে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। চল্লিশজন নিরীহ মানুষ তাদের জীবন সঁপে দিচ্ছে ওর হাতে। বোঝাটা বড়ই ভারী। ব্যর্থতার কথা চিন্তাও করা যাবে না।

'তুমি রেডি?' দিনাকে জিজ্ঞেস করল ও।

'কখনও *না* বলেছি?'

'গুড! চলো তা হলে।'

হামাগুড়ি দিয়ে চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেল ওরা দুজন। ডানদিকের মোটামুটি বড় একটা টানেল ধরে এগোতে শুরু করল। খানিক পরেই

রিফিউজিদেরকে দিয়ে আসা ফ্ল্যাশলাইটের আলো হারিয়ে গেল দৃষ্টিসীমা থেকে। এখন শুধু ওদের দুজনের হাতে ধরা অন্য দুটো ফ্ল্যাশলাইট আলো জোগাচ্ছে। গোলকধাঁধায় ভরা এই আঁধারের রাজত্বে রশ্মিদুটোকে বড়ই অপ্রতুল মনে হচ্ছে। একই কথা খাটে নিরাপত্তার জন্য সঙ্গে নেয়া একে-ফোরটি সেভেনটার বেলাতেও। প্রাচীন এই খনি থেকে যদি ওরা বেরুতে পারে, আর বেরুনোর পর মানসিনি এবং তার খুনে বাহিনীকে মোকাবেলা করতে হয়, তা হলে একটা মাত্র অস্ত্র দিয়ে কিছুই করা যাবে না। দিনাকে একটা অস্ত্র দেয়া গেলে ভাল হতো, কিন্তু ঝুঁকি নিতে চায়নি রানা, বন্দি সুদানিজদেরকে পাহারা দেয়ার জন্য বাকি অস্ত্রগুলো শ্রমিকদের কাছে রেখে আসতে হয়েছে।

হামাগুড়ি দিতে দিতে দুটো চিন্তাই শুধু খেলছে রানার মাথায়। ওরা কি বের হতে পারবে এই মৃত্যুগুহা থেকে? যদি পারে, বেরিয়ে কী দেখবে? মিত্রদের, নাকি রক্তলোলুপ ইটালিয়ানের দলবল?

সুযোগের অপেক্ষায় আছে সুদানিজ দস্যুদের নেতা হিলাল। ধৈর্যশীল মানুষ নয় ও, চুপচাপ পড়ে থাকতে কষ্টও হয়েছে খুব, তবে সেই কষ্টের ফল মিলতে চলেছে খুব শীঘ্রি। তিন সঙ্গীর সঙ্গে চেম্বারের মেঝেতে কাত হয়ে পড়ে আছে সে, সঙ্গীরা ওর দীর্ঘদিনের সহচর, সম্পূর্ণ অনুগত এবং বিশ্বস্ত। নেতার উপস্থিতিতে লাভ হয়েছে এই: নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছে ওরা নিজেদের, বোকার মত কিছু ঘটিয়ে বসেনি। ব্যাটা বাঙালি লোকটা আর তার ইরিত্রিয়ান বেশ্যাও তাই ওদেরকে খুন করবার কোনও অজুহাত পায়নি। মনে মনে নিজেকে বাহবা দিল হিলাল, পরিস্থিতিটা সামলাতে পারার জন্য।

স্রেফ কপাল বলা যেতে পারে, সঙ্গী-সাথীদের উৎসাহ দেবার জন্য আজ রাতের শিফটে সেধে ডিউটি নিয়েছিল ও। এতে কিছুটা ভোগান্তির শিকার হতে হলেও ত্যাঁদোড় বাঙালিটার প্ল্যানের দফা-রফা করে দেবার একটা দারুণ সুযোগ পাওয়া গেছে। ম্যাকেঞ্জিকে জিম্মি করে রানা যখন পিটে উদয় হলো, তখন ও-ই সবার আগে অস্ত্র নামিয়ে নিয়েছিল। অযথা সংঘাতে জড়ায়নি, ইরিত্রিয়ান বেশ্যাটার হাতেও একটা অস্ত্র দেখে বুঝতে পেরেছিল, তেড়ি-বেড়ি করলে খুন হয়ে যেতে হবে। প্রাণটা চলে গেলে মানসিনির প্রতিশ্রুত বিরাট অঙ্কের পুরস্কারটা আর ভোগ করা হবে না ওর। তারচেয়ে চুপচাপ থাকাই ভাল, মনে হয়েছে তার, যাতে ঝোপ বুঝে কোপ মারার একটা সুযোগ থাকে। এখন বোঝা যাচ্ছে, ওর চিন্তাটা ভুল ছিল না।

ভাগ্য আরেকটা ভূমিকা রেখেছে আজ রাতে—কেউ চিনতে পারেনি ওকে। গতকাল এক সৈনিকের সঙ্গে নাইফ-ফাইটিং মকশো করতে গিয়ে অসতর্ক মুহূর্তে প্রতিপক্ষের আঁচড়ে বড় একটা ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে মুখে। সিরিয়াস আঘাত নয়, তবে সেটা ব্যাণ্ডেজ করতে গিয়ে অর্ধেক মুখই ঢাকা পড়ে গেছে। ওর দিকে আলাদাভাবে নজর দেয়নি রানা, বা আর কেউ; বুঝতেই পারেনি, সুদানিজদের নেতা স্বয়ং রয়েছে বন্দিদের মধ্যে। টের পেলে হয়তো আরও সতর্ক হতো।

বন্দিত্ব বরণ করে নিয়েছে হিলাল, ইরিত্রিয়ান শুয়োরগুলোর লাথি-গুঁতো

সহ্য করেছে, গত কয়েকটি ঘণ্টা অমানুষিক কষ্ট ভোগ করেছে... সবই শুধু একটা কারণে। ওদের গোটা অপারেশন বন্ধ করে দেওয়ার পাঁয়তারা করছে যে লোক, সেই বেয়াদব বাঙালিটার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে চায় সে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে, মাসুদ রানার জিভ কেটে ওরই গলায় ভরে দেবে, দমবন্ধ হয়ে মরবে হারামজাদা... নিজেরই জিভের গোঁজ গলায় আটকে! ইরিত্রিয়ান বেশ্যাটাকেও খুন করবে সে, তবে খুন করার আগে ওর দেহটাকে আশ মিটিয়ে ভোগও করে নেবে। খুব ভাল হয়, যদি রানার সামনে ধর্ষণ করা যায় মেয়েলোকটাকে; নড়তে-চড়তে পারবে না, ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখবে প্রেমিকার সম্ভ্রমহানি আর মৃত্যুর দৃশ্য... বড়ই মজার একটা ব্যাপার হবে ওটা। নিজের অজান্তেই হিলালের ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটে উঠল।

তবে স্বপ্নটাকে বাস্তবে পরিণত করতে হলে মুক্ত হওয়া দরকার আগে। ধুলোমাখা টানেলে রানা আর দিনা আবানকে ট্র্যাক করতে অসুবিধে হবে না, তারপরও ওদেরকে বেশি এগিয়ে যেতে দিতে চায় না হিলাল। ক্লান্ত শ্রমিকরা ইতোমধ্যেই ঘুমিয়ে পড়তে শুরু করেছে, শীঘ্রি পিছু নিতে হবে ওকে। সাবধানে হাতের ইশারায় সঙ্গীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করল ও; এই পদ্ধতিটা ওদের নিজস্ব আবিষ্কার—অতীতে বহুবার ব্যবহার করেছে। একজন সঙ্গীকে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে চেম্বারের ভিতরে গোলমাল সৃষ্টির নির্দেশ দিল সে। হট্টগোলের সুযোগে চুপিসারে বেরিয়ে যাবে ও। প্রহরীদের আক্রমণ করবার কথা ভাবল একবার, পরমুহূর্তে চিন্তাটা বাতিল করে দিল। ওরা সশস্ত্র, খামোকা ঝুঁকি নেয়ার মানে হয় না। রাইফেল না থাকলেও অবশ্য অসুবিধে নেই হিলালের, পোশাকের ভিতর একটা ছুরি লুকানো আছে ওর। সংকীর্ণ টানেলের ভিতর রানাকে খতম করার জন্য ওটাই যথেষ্ট।

সঠিক মুহূর্তটার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে কয়েক মাস আগেকার সেই মোটা লোকটার কথা মনে পড়ে গেল সুদানিজ দস্যুর। শিকারটা তেমন আনন্দ জোগায়নি, তবে রাইফেলের বাট দিয়ে ব্যাটাকে থেঁতলে দিতে পেরে শান্তি পেয়েছিল। লোকটা নিজেকে আর্কিয়োলজিস্ট বলে দাবি করছিল। ওটা ছিল কাভার, মানসিনি তাকে জানিয়েছিল—এরিক অ্যাভনার আসলে হারানো খনিটার সন্ধান করছে... এই খনিটার। এখন হিলাল বুঝতে পারছে, লোকটাকে না মারলেও চলত। এখান থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে তল্লাশি চালাচ্ছিল সে, সফল হবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। অবশ্য হত্যাকাণ্ডটা নিয়ে খেদ নেই ওর মনে—লোকটার বুটজোড়া চমৎকার ছিল... ওগুলোই পরে আছে ও এখন!

খানিক পরেই হিলাল লক্ষ করল, বেশিরভাগ ইরিত্রিয়ান রিফিউজি ঘুমিয়ে পড়েছে, ওদের গার্ডরা তন্দ্রায় আচ্ছন্ন। আলো কমিয়ে দেয়া হয়েছে, দুটোর বদলে একটামাত্র ফ্ল্যাশলাইট জ্বলছে এখন। সুযোগটা চিনতে ভুল হলো না ওর, হাতের বাঁধন খোলা হয়ে গেছে আগেই, এবার সঙ্গীদের দিকে ফিরে হাত মুঠো করল। ওটাই সঙ্কেত।

অনুগত দস্যু মাথা ঝাঁকাল একবার, তারপরই ঝট করে উঠে দাঁড়াল। উঁচু গলায় শাপ-শাপান্ত করছে সে, তারপরই ঘুমন্ত রিফিউজিদের লাথি-গুঁতো মেরে

চেম্বারের আরও ভিতরদিকে সরে গেল, ঝাঁপিয়ে পড়ল একজন গার্ডের উপর। এতটা না করলেও চলত, ভাবল হিলাল—ব্যাটা দেখছি আত্মহত্যা করতে চলেছে! চোখের পলকে হৈ-চৈ বেঁধে গেল ছোট্ট কুঠুরিটার মধ্যে। কাঁচা ঘুম থেকে উঠে হতভম্ব হয়ে গেছে রিফিউজিরা। ওদিকে গার্ডের হাত থেকে অস্ত্রটা প্রায় ছিনিয়েই নিয়েছে ডাইভারশন সৃষ্টিকারী দস্যু। দৃশ্যটা দেখে সক্রিয় হয়ে উঠল অন্য গার্ডরা, একজন অস্ত্র কাঁধে তুলেই গুলি করল সুদানিজ লোকটার পিঠে। আর্তনাদ করে নেতিয়ে পড়ল সে।

গোলমালটার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল হিলাল। অন্য দুই সঙ্গী তাকে আড়াল দিল, সহজেই রিফিউজিদের চোখ এড়িয়ে কুঠুরি থেকে ক্রল করে বেরিয়ে গেল ও। বেরুনোর পথে স্পেয়ার ফ্ল্যাশলাইটটাও তুলে নিল আলগোছে। টানেলে পৌঁছে আরও দ্রুত এগোল দস্যুনেতা। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে এগিয়ে চলল। পর পর কয়েকটা সাইড-টানেলে ঢুকল, কেউ ধাওয়া করলে যাতে ফাঁকি দিতে পারে। তবে তার কোনও প্রয়োজন ছিল না। হিলাল বেরিয়ে যেতেই ওর অপর দুই সঙ্গী কুঠুরির একমাত্র ফ্ল্যাশলাইটটা আছাড় মেরে ভেঙে দিয়েছে, অন্ধকারে ওকে কেউ অনুসরণ করতে পারবে না।

বেশ কিছুদূর গিয়ে থামল হিলাল। টানেলের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে একটু বিশ্রাম নিল। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হতেই জ্বালল ফ্ল্যাশলাইটটা। তারপর বুকের কাছ থেকে বের করে আনল লুকানো ছুরি।

ধীরে ধীরে হাসি ফুটল নিষ্ঠুর দস্যুনেতার মুখে। পেরেছে... বোকা ইরিত্রিয়ানগুলোকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছে! কেউ ওর পিছুও নিতে পারবে না। পাতালের এই নরকে এখন একজন শিকারী ও... মাসুদ রানাকে শিকার করবে সে পিছু নিয়ে।

বিশ

নতুন পথে দু'ঘণ্টা পেরিয়ে যাবার পর রানা টের পেল, শুরুর কষ্টটা আসলে কিছুই ছিল না। শ্রমিকদেরকে বিশ্রাম-কুঠুরি পর্যন্ত নেয়ার সময় পুরোপুরি আত্মবিশ্বাস ছিল ওর, ইনস্টিঙ্কট বেঈমানী করেনি... এমনকী ভাগ্যেরও সহায়তা পাচ্ছিল। কিন্তু দিনাকে নিয়ে একজিটের খোঁজে বের হবার পর পাল্টে গেছে চিত্রটা। রওনা হবার পর এখন পর্যন্ত দুটো অন্ধগলিতে ঢুকেছে ও; বেশ কয়েকবার এমন সব জায়গা পেরুতে হয়েছে, যেখান দিয়ে প্রাচীন এই খনির শিশুশ্রমিকরাও হয়তো চলাচল করত না। বোতলের মুখের মত একেবারে সরু ওসব অংশ, সাপের ভঙ্গিতে শরীর বাঁকিয়ে-চুরিয়ে পাড়ি দিতে হয়েছে সংকীর্ণ ওসব সুড়ঙ্গ। রানার মনে হচ্ছিল, যেন অতিকায় কোনও দানবের উদরে ঢুকেছে ওরা খাদ্য হয়ে... পেটে গোলমাল আছে দানবটার, নাড়িভুঁড়ির মাঝ দিয়ে যেতে দিচ্ছে না খাবারকে। ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাসে ফাটল ধরতে শুরু করেছে ওর,

ভয় হচ্ছে—যে-কোনও মুহূর্তে পথ হারাতে পারে। এখন পর্যন্ত ধুলোয় ঢাকা টানেলের মেঝেতে হামা দেয়ার দাগ রেখে যাচ্ছে ওরা, কিন্তু কোনোক্রমে যদি ধুলোমুক্ত অংশে পৌঁছায়, তা হলে কিছুতেই আর ব্যাকট্র্যাক করে রিফিউজিদের কাছে ফিরতে পারবে না।

হঠাৎ বিশাল একটা চেম্বারে এসে ঢুকল রানা ও দিনা। প্রাকৃতিক ওটা, তবে খোঁড়াখুঁড়ি করে আরও বাড়ানো হয়েছে আকৃতি। সারফেস থেকে বাতাস আসছে না, দম টানতে কষ্ট হচ্ছে আগেরই মত, তবে উঠে দাঁড়ানো গেল। হাত-পা ঝাড়া দিয়ে জড়তা কাটাতে শুরু করল দুজনে, সেই সঙ্গে আলো ফেলে দেখতে শুরু করল গুহার ভিতরটা। হঠাৎ সারা শরীর কেঁপে উঠল ওদের দুজনের। বীভৎস একটা দৃশ্য দেখতে পেয়েছে, দুঃস্বপ্ন জাগাবার মত।

লাশ... লাশ পড়ে আছে গুহাটার মেঝেতে। ইটালিয়ান খনিটার মত সংখ্যায় অত বেশি নয়, বড়জোর ডজনখানেক হবে... তারপরও দৃশ্যটা ওখানকার চেয়ে ভয়াবহ। কারণ এখানকার লাশগুলো সব শিশুদের। অল্পবয়েসী মানব-সন্তান... দশ-এগারো বছরের বেশি হবে না কারও বয়স। গুছিয়ে, বা সাজিয়ে রাখা হয়নি ওগুলো; পড়ে আছে এলোমেলোভাবে—সম্ভবত ওভাবেই মারা গেছে। ভঙ্গিগুলো শিউরে ওঠার মত। বেঁকে, ভাঁজ হয়ে রয়েছে হাত-পা আর আঙুল; বদ্ধ আবহাওয়ায় শুকিয়ে মমি হয়ে যাওয়া কঙ্কালসার মুখগুলোতে তীব্র বেদনার ছাপ আজও ফুটে আছে।

'ওহ্ গড!' ফুঁপিয়ে উঠল দিনা।

দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে রইল রানা। মানুষের নিষ্ঠুরতা কতদূর গিয়ে পৌঁছুলে এমন ঘটনা ঘটতে পারে, ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছে। কাজ করতে করতে মারা গেছে এই বাচ্চারা, অথচ মৃতদেহগুলো সৎকারের কোনও ব্যবস্থা নেয়নি কেউ, ফেলে রাখা হয়েছে পচে-গলে মাটিতে মিশে যাবার জন্য। লাশগুলোর আশপাশে স্তূপ হয়ে থাকা মাটি-পাথর দেখে বোঝা যাচ্ছে, এতগুলো মৃত্যুতেও থামেনি মাইনিঙের কাজ। নির্বিকার ভঙ্গিতে খোঁড়াখুঁড়ি চালিয়ে যাওয়া হয়েছে। এমন বর্বরতার নজির মানুষের ইতিহাসে আরও অনেক আছে, বর্তমানেও ঘটছে অহরহ, কিন্তু চোখের সামনে দেখে সহ্য করা সত্যিই কঠিন।

আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ল রানা ও দিনা। যদিও দুজনেই জানে, ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই, বর্তমান নিয়ে ভাবতে হবে ওদের। চল্লিশজন মানুষের উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে হবে, নইলে প্রাচীন এই শিশুরা খুব শীঘ্রি নতুন সঙ্গী পাবে। এগিয়ে গিয়ে একটা লাশের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল রানা, আলো ফেলে পরীক্ষা করছে লাশটা—মৃত্যুর কারণ জানতে চাইছে। শুকিয়ে পাটকাঠির মত ভঙ্গুর হয়ে গেছে দেহটা, তাই নাড়াচাড়া করল না, চোখের দেখাতেই যা বোঝার বুঝে নিতে চাইল।

কোনও ধরনের ক্ষত নেই লাশটার গায়ে, হাড়-গোড় ভেঙেছে বলেও মনে হলো না। একমাত্র অস্বাভাবিকত্ব হচ্ছে হাত-পা আর আঙুল কুঁকড়ে যাওয়া। যেন প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কুণ্ডলী পাকিয়ে যাচ্ছিল গোটা শরীরটা। আশপাশে তাকিয়ে প্রত্যেকটা মৃতদেহে একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করল রানা।

কীসে ঘটাতে পারে এমনটা? ভুরু কুঁচকে ভাবছে রানা। লাশের মুখে দাঁত দেখা যাচ্ছে... তার মানে স্কার্ভিতে আক্রান্ত হয়নি ওরা। রিকেটস্-এর ফলেও এমন হতে পারে। কিন্তু এক সঙ্গে এক ডজন বাচ্চা একই জায়গায় কেন মারা যাবে? ভাবতে গিয়ে হাল ছেড়ে দিল রানা। ওদের মৃত্যুর কারণ জেনে লাভ কী? আর কি ফেরানো যাবে ওদের? একমাত্র সত্যটা হলো, তিন হাজার বছর আগেকার কোনও এক অজ্ঞাত সুপারভাইজরের বর্বরতার শিকার হয়েছে ওরা। কে জানে, কর্মদক্ষতার কারণে হয়তো সম্রাট মেনেলিকের কাছ থেকে পুরস্কারও পেয়েছে লোকটা! কিছু কি করা যাবে তার? আনমনে মাথা নাড়ল রানা, চোখ বুজে ভাবছে, আর মনে মনে প্রতিবাদ করছে।

কয়েক সেকেণ্ড পর চোখ মেলল ও, পাশ ফিরে আলো ফেলল স্তূপ হয়ে থাকা জঞ্জালের ঢিবির দিকে। বাচ্চারা কী খুঁড়ছিল, দেখতে চায়। পরমুহূর্তেই ঘাড়ের পিছনের খাটো চুলগুলো সরসর করে দাঁড়িয়ে গেল ওর। ইচ্ছে হলো দৌড়ে এই ভয়ানক গুহাটা থেকে বেরিয়ে যেতে। কিন্তু পারল না, নিজের ভিতরের কৌতূহল আটকে রাখল ওকে। বিড়বিড় করে ভাগ্যকে গালমন্দ করল ও, তারপর ফ্ল্যাশলাইটের প্রোটেকটিভ স্টিল কেসিং-টা খুলে তাতে একটু জঞ্জাল তুলে নিল। ব্যাগ থেকে একটা ডিনামাইটের স্টিক বের করল এরপর, সেটার মুখ কেটে ভিতরের বিস্ফোরকের একটুখানি ঢালল মাটিতে, তার উপর কেসিংটা রেখে পানির ক্যান্টিন দিয়ে চাপা দিল।

দিনা এগিয়ে এল। জানতে চাইল, 'কী করছ?'

'একটা সন্দেহ জেগেছে, সেটা সত্যি কি না, পরীক্ষা করে দেখছি,' বলল রানা। গলার সুরে উদ্বেগটা চাপা রইল না।

দেশলাই জ্বেলে বিস্ফোরকে আগুন লাগাল ও। সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট একটা বিস্ফোরণ ঘটল। পানির ক্যান্টিনে চাপা পড়ে থাকায় উল্টে গেল না কেসিংটা, শুধু তীব্র উত্তাপে গরম হয়ে গেল। ক্যান্টিনটা সরিয়ে ওটার ভিতরটা দেখল রানা। জঞ্জালটা কালচে বর্ণ ধারণ করেছে। ওটাকে পাশের একটা পাথরের উপর ছুঁড়ে মারল ও। কয়েক সেকেণ্ড পর ওর আশঙ্কাটাকে সত্য প্রমাণিত করে জঞ্জালের মধ্য থেকে কালচে-রূপালি রঙের একটা ঝিকঝিকে তরল গড়িয়ে নামল মেঝেতে।

রানার কপালে ভাঁজ পড়ে গেছে। সেটা লক্ষ করে দিনা জিজ্ঞেস করল, 'কী বুঝলে?'

ওর দিকে ফিরল রানা। 'ব্রাদার অব্রাহাম এখানকার বাচ্চাদের মৃত্যুর কারণ কী বলেছিলেন... মনে আছে?'

'হ্যাঁ। সিন... মানে, পাপ।'

'উঁহুঁ, কথা শেষ করতে পারেননি উনি। আসলে বলতে চাইছিলেন—*সিনাবার*। কেমিস্ট্রির ভাষায় ওটাকে বলে রেড *মারকিউরিক সালফাইড*। মারকারি, মানে পারদ-এর মূল খনিজ আকরিক ওটা।'

'পারদ! ওটা তো...'

'হ্যাঁ, দুনিয়ার সবচেয়ে বিষাক্ত পদার্থগুলোর একটা,' তিক্ত গলায় বলল

রানা। ওটার বাষ্প ফুসফুসে গেলে খুবই ভয়ানক প্রতিক্রিয়া হয়। শরীর কুঁকড়ে যেতে পারে, প্যারালাইসিস দেখা দিতে পারে... এমনকী মৃত্যুরও নজির আছে।'

'অ্যাঁ! এই বাচ্চারা কি মারকারি-পয়েজনিঙে মারা গেছে?'

'ঠিক ধরেছ। বেশিক্ষণ এখানে থাকলে আমাদেরও একই দশা হবে,' দিনার হাত ধরে টানল রানা, বেরিয়ে যাবার জন্য একটা টানেলের দিকে এগোচ্ছে। 'জিনিসটা এতই মারাত্মক যে, আজকালকার মাইনাররা পারদের খনিতে মাসে আট দিনের বেশি কাজ করে না। প্রতিটা মুহূর্তে আমাদের শরীরে পার্মানেন্ট ক্ষতি হবার সম্ভাবনা বাড়ছে। তাড়াতাড়ি পা চালাও।'

'কিছু করার নেই আমাদের?'

'হ্যাঁ, যত পারো, ঘামতে থাকো। ঘাম শরীর থেকে পারদের বিষ বের করে দেয়। এজন্য প্রত্যেক শিফটের শেষেই মাইনাররা স্টিম-রুমে কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নেয়, শক্তিশালী হিট-ল্যাম্পের সাহায্যে ঘাম ঝরিয়ে শরীরকে বিষমুক্ত করে।'

প্রাচীন খনিটার অভ্যন্তর যথেষ্ট গরম, ঘাম নিয়ে চিন্তা নেই। কিন্তু সমস্যা হলো, ওদের কাছে পানির মাত্র একটা ক্যান্টিন আছে। ওটা খতম হয়ে গেলে ঘাম সৃষ্টির মত তরল অবশিষ্ট থাকবে না ওদের দেহে। ব্যাপারটা ভাবতেই গা কাঁটা দিয়ে উঠল রানার। খুব শীঘ্রি এই মৃত্যুখনি থেকে বেরুবার পথ খুঁজে পেতে হবে ওদেরকে। আলো নিয়েও সমস্যা হতে যাচ্ছে, ছোট্ট এক্সপেরিমেন্টটা করতে গিয়ে একটা ফ্ল্যাশলাইটকে অকেজো করে ফেলেছে ও, কেসিং ছাড়া ওটা সম্পূর্ণ অচল।

এগোতে এগোতে প্রথমটার মত আরও কয়েকটা চেম্বার আবিষ্কার করল ওরা, সবগুলোতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে লাশ। সব মিলিয়ে অন্তত শ'দুয়েক মৃতদেহ দেখতে পেল ওরা পরবর্তী আধঘণ্টায়। কিছু কিছু শিশু সম্ভবত মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থাতেই পারদের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিল, ওদের লাশগুলো দেখলে শরীর শিউরে ওঠে—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকৃত, মানুষ বলে চেনাই যায় না।

'কিম্বারলাইট পাইপটা সম্ভবত মারকিউরিক সালফাইডের একটা শিরা ভেদ করে উপরে উঠেছে,' অনুমান করল রানা। 'এ-ধরনের জিয়োলজিকাল ফিচারের কথা আগে শুনিনি কখনও, তবে ব্যাপারটা একেবারে অসম্ভবও নয়। আর্ক অভ দ্য কাভানেন্ট কেন এই খনির ভিতরে আনা হয়েছিল, সেটা বুঝতে পারছি এখন।'

'কেন?' জানতে চাইল দিনা।

'স্বর্ণের সঙ্গে অতিমাত্রায় বিক্রিয়া করে পারদ,' ব্যাখ্যা করল রানা, 'স্বাভাবিক গুণাগুণ কমে যায়। ব্যাপারটা সে-আমলের লোকরাও জানত। আর্কটা আসলে সোনায় গড়া একটা বাক্স, তাই না? ওরা ভেবেছিল, সোনাটা এখানকার পারদকে নিষ্ক্রিয় করে দেবে।'

'কী বলছ!' অবাক হলো দিনা। 'কতটুকু সোনাই বা আছে ওতে! পুরো একটা খনিকে কীভাবে বিষমুক্ত করবে ওটা?'

'আমি বলছি না যে, ওদের প্ল্যানটা খুব কার্যকর ছিল।'

নিঃশব্দে এগোচ্ছে ওরা। আরও একটা ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। শেষে দিনা বলল, 'রানা, ওয়ার্কিং পিট থেকে সারফেস পর্যন্ত টানেলটা মাত্র দেড় মাইল লম্বা। আমরা তো এর মধ্যে কমপক্ষে পাঁচগুণ পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি, এখনও একজিট-টা পাচ্ছি না কেন?'

'ব্যাপারটা তুমিও তা হলে খেয়াল করেছ?' বলল রানা। 'সত্যি বলতে কী, আমি নিজেও এ নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছি। এখানকার টানেলগুলো আঁকাবাঁকা, তারপরও আসলে দূরত্বটা এত বেশি হবে বলে মনে হয় না। কেন যেন মনে হচ্ছে, আবার একটা কানা-গলিতে গিয়ে ঠেকব।'

'পথ হারাওনি তো?' শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করল দিনা, কাঁপছে গলা।

থামল রানা, ফ্ল্যাশলাইটটা ঘুরিয়ে আলো ফেলল দিনার মুখে। তারপর হালকা গলায় বলল, 'ভয় পেয়ো না। নাতি-পুতির মুখ না দেখে মরবে না তুমি।'

হেসে ফেলল দিনা। 'বিয়েই করলাম না এখনও! নাতি-পুতি তো অনেক পরের কথা।'

'সময় তো ফুরোয়নি। অস্থির হচ্ছ কেন? খুব ভাল একটা পাত্র রয়েছে তোমার কপালে... আমি দেখতে পাচ্ছি!'

'ভবিষ্যদ্বাণী করছ? তোমাকে দেখে তো জ্যোতিষী মনে হয় না।'

'যদি বলো তো হাতের রেখা পড়ে প্রমাণ দেখাতে পারি।'

'হয়েছে, এখন আমার হাত দেখতে হবে না,' বলল দিনা। 'আগে এখান থেকে বেরুনোর ব্যবস্থা করো। নইলে দেখা যাবে, আমাকে না পেয়ে ওই সুপাত্রটি অন্য কোনও ললনাকে মালা দিয়ে ফেলেছে। তখন কিন্তু তোমাকেই বিয়ে করে ফেলব! সাবধান!!'

আবার হামাগুড়ি দিতে শুরু করল রানা। খানিক পরেই আরেকটা চেম্বারে এসে ঢুকল। এটা বেশ বড়, ছাদ উঁচু, ফ্ল্যাশলাইটের আলো অন্যপাশের দেয়াল পর্যন্ত পৌঁছুল না। প্রতিধ্বনি শুনে ও আন্দাজ করল, অন্তত একটা ফুটবল মাঠের সমান আকৃতি হবে চেম্বারটার। মাইনিং টেকনিকটা চিনতে পারল—*রুম অ্যাণ্ড পিলার মাইনিং* বলে একে। এত বড় একটা জায়গা খোঁড়া হলে ছাদ ধসে পড়ার ভয় থাকে, তাই মাঝখানে নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর কলামের মত অংশ অক্ষত রাখা হয়েছে, ওগুলোই সাপোর্ট দিচ্ছে ছাদকে। কয়লা-খনিতে এ-পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, হীরার খনিতে হয় বলে শোনেনি কখনও। কিম্বারলাইট খোঁজার সময় পদ্ধতিটা খুব একটা এফিশিয়েন্টও নয়। এখানে প্রচুর কলাম রাখা হয়েছে, হঠাৎ দেখায় মনে হয় যেন জঙ্গলে পৌঁছে গেছে... লম্বা লম্বা গাছপালার মাঝখানে। উপরদিকে আলো ফেলতেই কারণটা ধরতে পারল—ছাদের অবস্থা খুব খারাপ... হাজারো ফাটল দেখা যাচ্ছে। কলাম রাখা না হলে ধসে পড়ত পুরো ছাদটাই। অবশ্য ধস নামার সময়ও হয়ে এসেছে, বয়সের ভারে দুর্বল হয়ে গেছে কলামগুলো, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আর ভার সইতে পারবে না উপরের। দিনাকে নিয়ে কলামগুলোর মাঝ দিয়ে এগোতে শুরু করল রানা।

মাঝামাঝি পৌঁছুতেই চোখের কোণে একটা নড়াচড়ার আভাস পেল। ঝট্ করে ওদিকে ঘুরল ও, বুক ধুকপুক করতে শুরু করেছে। হাজার হাজার বছরের পুরনো একটা খনির ভিতরে রয়েছে ওরা, এখানে ওরা ছাড়া আর কোনও জীবিত প্রাণী নেই। তা হলে কী নড়ল? আলো ফেলে চঞ্চল দৃষ্টিতে আশপাশটা দেখল, কিন্তু কিছুই পেল না। ব্যাপারটাকে চোখের ভুল ভেবে আবার পা বাড়াতে যাবে, এমন সময় ভয়ার্ত চিৎকার করে উঠল দিনা। উল্টো ঘুরতেই মেয়েটার গায়ের উপর একটা কালো ছায়াকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখল ও। ধাক্কা খেয়ে একদিকে চিত হয়ে পড়ে গেল দিনা। পরমুহূর্তে ছায়াটা রানার দিকে ছুটে এল।

ঘটনার আকস্মিকতায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল রানা। বুঝতেই পারছে না, এখানে ছায়াটা উদয় হয় কীভাবে। বুকের উপর প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ল রানা, হাত থেকে ছুটে গেল ফ্ল্যাশলাইট আর একে-ফোরটি সেভেন। মাটিতে আছাড় খেয়েই সিধে হতে চাইল, কিন্তু তার আগেই নাভির উপর পড়ল লাথি, কুঁকড়ে গেল ও। উপলব্ধি করল—কীসে হামলা করছে, সেটা বড় কথা নয়; বড় কথা হচ্ছে, ঠেকাতে হবে সেটা!

চোখ তুলতেই পড়ে থাকা ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় একটা ছুরির ফলা ছুটে আসতে দেখল রানা, সঙ্গে সঙ্গে একটা গড়ান দিয়ে সরে যেতে চাইল ও। তার আগেই ওর শরীরের উপর লাফিয়ে পড়ল হামলাকারী। বুকের উপর চেপে বসেই ছুরি চালাল। একহাতে লোকটার কব্জিতে ধাক্কা দিয়ে ছুরিটাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করল রানা, ঝটকা দিয়ে শরীরের নীচ থেকে মুক্ত করল অপর হাত। তারপর হাত ঘুরিয়ে কায়দামত ঘুসি চালাল শত্রুর বুকে। পাঁজরের অন্তত দুটো হাড়ে চিড় ধরল তাতে, কিন্তু ব্যথা পেলেও দমল না প্রতিপক্ষ, বরং আরও উন্মাদ হয়ে উঠল। মুগুরের মত মাথা চালিয়ে আঘাত করল সে রানার মুখে। নাক থেঁতলে গেল রানার, অবর্ণনীয় ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখল, অচল হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য। আত্মরক্ষার উপায় নেই, খুনির ছুরিতে তখুনি মারা পড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু মরল না দিনার কারণে। পিছন থেকে আক্রমণ করল মেয়েটা, একহাতে লোকটার গলা পেঁচিয়ে ধরে টান মারল, সরিয়ে দিল রানার গায়ের উপর থেকে।

পিছনদিকে কনুই চালাল লোকটা, পাঁজরে আঘাত পেয়ে ফুসফুস থেকে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল দিনার, নিজের অজান্তেই আলগা হয়ে গেল হাতের বাঁধন। ব্যথা সামলে দৃষ্টি ফেরাতেই দিনাকে একটা আপার-কাটে ধরাশায়ী হতে দেখল রানা, ছিটকে গিয়ে পড়েছে মেয়েটা কয়েক হাত দূরে মেঝেতে। উপুড় হয়ে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে এগোবার চেষ্টা করল ও, পড়ে যাওয়া আগ্নেয়াস্ত্রটা হাতে পেতে চাইছে। ঝাঁপিয়ে পড়া খুনির ছুরিটা টার্গেট মিস করল এর ফলে, বুকের বদলে উরুর পিছনে নরম মাংসে গেঁথে গেল ফলা। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল রানা, পিছনে শত্রুর নাকের উপর প্রচণ্ড এক রদ্দা মারল। খামচি দিয়ে ধরতে চাইল ওর চুল। ওকে অবাক করে দিয়ে নরম কীসের মধ্যে যেন সেঁধিয়ে গেল আঙুলগুলো, মুঠোর সঙ্গে উঠে এল ভেজা ভেজা একগাদা নরম কী যেন! টু-শব্দ নেই প্রতিপক্ষের মুখে, ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে কেবল।

হায় খোদা! কীসের সঙ্গে লড়াই করছে ও? হাজার বছরের পুরনো কোনও জীবন্মৃত পিশাচ নয়তো? ছুরির ফলাটা উরু থেকে উঠে যেতেই লাথি দিয়ে প্রতিপক্ষকে ফেলে দিল রানা, হাঁচড়ে-পাঁচড়ে কয়েক হাত সামনে গিয়ে উল্টো ঘুরল। টর্চের আবছা আলোয় এবার সুদানিজ সৈন্যদের নেতা... মানসিনির পোষা জল্লাদ হিলালের রক্তাক্ত চেহারাটা চিনে ফেলল। নিজেকে গাল দিল ও; মনে পড়ে গেছে, গার্ডদের একজনের মুখে ব্যাণ্ডেজ ছিল... এ-ব্যাটাই নিশ্চয়ই ছিল ওটা। চুলে থাবা মারতে গিয়ে ওই ব্যাণ্ডেজটাই খুলে এনেছে ও।

ইরিত্রিয়ানদের হাত থেকে লোকটা কীভাবে পালিয়ে এল, কীভাবেই বা ওদের দুজনকে ট্র্যাক করে এখানে এসে পৌঁছুল... সেসব ভাববার সময় নেই। কয়েক মুহূর্ত রুদ্রদৃষ্টি বিনিময়ের পরই নড়ে উঠল দুজনে। একে-ফোরটি সেভেনটা যেদিকে পড়েছে, সেদিক লক্ষ করে ছুটল রানা। দেখাদেখি হিলালও, ওকে বাধা দিতে চাইছে। কলামের সারির ফাঁক দিয়ে দূরে এক ঝলক আভা নজর কাড়ল রানার, কিন্তু অতদূরে যাবার কথা নয় আগ্নেয়াস্ত্রটার। চোখ ঘুরিয়ে মেঝের দিকে তাকাল ও। দিনা চেতনা ফিরে পেয়েছে, মাটি-পাথরের পিলারগুলোর ফাঁকে ছুটোছুটি করতে থাকা ছায়াদুটোকে দেখে আতঙ্কে চেঁচাতে শুরু করল। ভাবছে ভূ-গর্ভের হিংস্র কোনও অশুভ জানোয়ারের কবলে পড়ে গেছে।

পায়ের ধাক্কায় মেঝেতে গড়াতে থাকা ফ্ল্যাশলাইটের আবছা আলোয় দুই প্রতিদ্বন্দ্বীই একসঙ্গে দেখতে পেল রাইফেলটাকে। হিলাল ওটার কাছাকাছি রয়েছে, কিন্তু ক্ষিপ্রতায় রানা এগিয়ে। একসঙ্গে অস্ত্রটা লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল দুজন। খপ্ করে ওটা ওরা আঁকড়েও ধরল একই সঙ্গে!

শুরু হলো ধস্তাধস্তি। মেঝেতে গড়ানোর ফাঁকে মোচড় দিয়ে রাইফেলটা হিলালের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু পারল না। টানাটানি করতে গিয়ে বরং প্রতিপক্ষের শরীরের তলায় পড়ে গেল। হাঁটু দিয়ে ওর কনুইয়ের উপরে প্রচণ্ড এক আঘাত হানল হিলাল, সঙ্গে সঙ্গে অসাড় হয়ে গেল বাম হাতটা। রাইফেল আর ধরে রাখতে পারল না কিছুতেই, টান দিয়ে ওটা কেড়ে নিল হিলাল। ওর রক্তাক্ত মুখে হিংস্র হাসি ফুটে উঠল... এইবার বাগে পেয়েছে ত্যাঁদড় বাঙালিটাকে। রাইফেলটা তুলে ধরল সে, বাট দিয়ে রানার মুখমণ্ডল থেঁতলে দেবে।

ঝট করে ডান হাতটা কাঁধের উপর দিয়ে পিঠে আটকানো ন্যাপস্যাকের ভিতর ভরে দিল রানা, টান দিয়ে বের করে আনল দুইশ' ফুট লম্বা হাই-স্পিড ফিউযের একটা কয়েল। টানেলের কোথাও ব্লক পেলে সেটা ভেঙে এগোনোর জন্য ডিনামাইট আর ফিউযটুকু এনেছে ও; তবে এ-মুহূর্তের প্রয়োজনটা কম জরুরি নয়। হিলাল কিছু বুঝে ওঠার আগেই কয়েলটা মালার মত তাকে পরিয়ে দিল রানা, খোলা প্রান্তটা ধরে ঝটকা দিতেই সেটা ফাঁসের মত এঁটে গেল গলায়। বিস্মিত চোখে ওর দিকে তাকাল সুদানিজ দস্যু—রানার মতলব বুঝতে পারছে না। জাদুমন্ত্রের মত প্রতিপক্ষের হাতে একটা লাইটার জ্বলে উঠতে দেখল, শিখাটা ঠেকাল রানা ফিউযের খোলা প্রান্তে।

সেকেণ্ডে বিশ হাজার ফুট গতিতে পোড়ে ফিউযটা, চোখের পলকে ছাই হয়ে গেল পুরো কয়েল। ফাঁস-লাগা হিলালের গলাটাও সেদ্ধ হয়ে গেল একই সঙ্গে। পোড়া মাংসের বিশ্রী গন্ধ বেরুল, বাতাসের অভাবে খাবি খেতে শুরু করল সুদানিজ দস্যু, শ্বাসনালী পুড়ে জমাট হয়ে গেছে। চোখদুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল তার, মুঠোয় ধরা অটোমেটিক রাইফেলের ট্রিগারটা চেপে ধরল নিজের অজান্তে। ক্যাট ক্যাট করে একটানা শব্দ হলো, খালি হয়ে গেল পুরো ক্লিপ, বুলেটের সারি প্রবল বেগে আঘাত করল উপরের ছাদে।

অন্ধকারে গুমগুম শব্দ হলো একটু, ধীরে ধীরে বাড়ল সে-আওয়াজ। কয়েক টুকরো মাটি খসে পড়ল রানার মাথায়। সর্বনাশ হয়ে গেছে, গুলিগুলো যেন গুহাটার কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দিয়েছে। ছাদের নড়বড়ে কাঠামো সইতে পারেনি গুলির আঘাত, ধসে পড়তে যাচ্ছে! রানার কয়েক হাত দূরেই বিশাল একটা চাক ভেঙে পড়ে চৌচির হয়ে গেল, ধুলোয় ছেয়ে গেল জায়গাটা। ঝটকা দিয়ে মৃত্যুপথযাত্রী হিলালকে গায়ের উপর থেকে ফেলে দিল রানা, হামাগুড়ি দিয়ে সরে গেল দেহটার কাছ থেকে, মাটি থেকে তুলে নিল একে-ফোরটি সেভেন আর ফ্ল্যাশলাইট।

আরও পাথরের চাঁই ধসে পড়ল ওর আশপাশে। *ডমিনো এফেক্ট* দেখা দিয়েছে—একটা অংশ ধসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফাটল বড় হচ্ছে আরেক অংশে, ওখান থেকে ধসে পড়ছে ছাদের অংশ। ছাদকে সাপোর্ট দিতে থাকা কলামগুলোর উপর অবিশ্বাস্য চাপ সৃষ্টি হয়েছে। রানার চোখের সামনে বোমার মত বিস্ফোরিত হলো কয়েকটা স্তম্ভ। শ্র্যাপনেলের মত চারদিকে ছিটকাল মাটি আর পাথরের চাক। পুরো গুহার স্ট্রাকচারাল ইন্টেগ্রিটি নষ্ট হয়ে গেছে, হুড়মুড় করে নেমে আসছে গোটা ছাদ।

ধ্বংসযজ্ঞটা দেখে বিস্ময়ে স্থবির হয়ে গেছে দিনা, চেঁচাতে ভুলে গেছে। দৌড়ে গিয়ে ওকে কোলে তুলে নিল রানা, ছুটতে শুরু করল অঝোর বর্ষণের মত ঝরতে থাকা মাটি-পাথরের মাঝ দিয়ে। একটা সাইড-টানেলের মুখ দেখতে পেয়েই ডাইভ দিল ও। পিছনে সশব্দে আছড়ে পড়ল একটা বিশাল পাথরখণ্ড, এক মুহূর্ত দেরি হলে পিষে ফেলত ওদেরকে।

টানেলের ভিতর সিধে হয়ে গুহার দিকে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল রানা। এক পলকের জন্য দেখতে পেল হিলালকে। ট্রাকের সাইজের বিশাল একটা পাথরের চাঁই উপর থেকে নেমে এল লোকটার উপর, শরীরের নিম্নাংশ থেঁতলে দিল চোখের পলকে। প্রচণ্ড চাপে নাড়িভুঁড়ি আর মাংসের দলা ঘোঁট পাকিয়ে উঠে গেল হিলালের মাথার দিকে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ওর গলাটা কোলা-ব্যাঙের মত ফুলে যেতে দেখল রানা, তারপরই বিচ্ছিরি ভঙ্গিতে ফেটে গেল। ধুলোমাটির বর্ষণে মিশে গেল রক্তের ধারা আর ছিন্নভিন্ন মাংসখণ্ড।

ফ্ল্যাশলাইট ঘোরাল রানা চেম্বারের অন্যপাশে... যেখানে আলোর আভা দেখেছিল। এখনও আছে ওটা, নামতে থাকা মাটি-পাথরের ধারাকে ছাপিয়ে আরও উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে কী যেন—নীলচে আলোয় ভরে গেছে জায়গাটা। কয়েক সেকেণ্ড পরই আরেকটা বড় চাঁই খসে পড়ল সাইড টানেলের মুখে,

দৃষ্টিসীমা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল আলোটা। উল্টো ঘুরে এগোতে শুরু করল রানা, দিনাকে ইশারা করল ওকে অনুসরণ করতে।

নতুন এই টানেলটা অন্যগুলোর চেয়ে ছোট, প্রায় বুকে ভর দিয়ে এগোতে হচ্ছে ওদেরকে। পরিবেশটা ভয়াবহ—পিছনে তুমুল আক্রোশে হুঙ্কার ছাড়ছে ধ্বংস হতে থাকা গুহাটা, ঘন ধুলো ঢুকে পড়ছে টানেলে, ঘিরে ধরছে দুই মানবসন্তানকে। চোখ খুলে রাখা গেল না, শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে; অন্ধের মত দম আটকে হামাগুড়ি দিতে থাকল ওরা দুজনে। খসখসে মেঝেতে ঘষা খেয়ে হাতের তালু আর কনুইয়ের চামড়া ছিলে যাচ্ছে, পরোয়া করছে না।

মনে হলো যেন অনন্তকাল ধরে চলল এই তাণ্ডব, তারপর থামল সব। আসলে সময় পেরিয়েছে মাত্র কয়েক মিনিট। মুহুর্মুহু নিনাদের পর আচমকা নেমে আসা নীরবতা যেন থামিয়ে দিয়েছে সময়কে। রানার কানে অবশ্য এখনও প্রতিধ্বনি করে চলেছে প্রবল গর্জনের রেশ, মাথা ঝাড়া দিয়ে ঝনঝনানি-টা কাটাবার চেষ্টা করল ও। ঘোর-টা কেটে যেতেই থামল, দেখাদেখি দিনাও। পিছনে তাকাতেই আবিষ্কার করল, হাজার-হাজার টন মাটি আর পাথর ওদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে ইরিত্রিয়ান রিফিউজিদের কাছ থেকে। চাইলেও আর যে-পথে এসেছে, সে-পথে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়।

তবে ওটার চেয়ে রানাকে বেশি ভাবাচ্ছে অদ্ভুত ওই নীলচে আলোটা। কী ছিল ওটা? স্ট্যাটিক ডিসচার্জ? পাথরে পাথরে ঘষা খেয়ে বিদ্যুৎ তৈরি হয়েছিল? নাকি গ্যাস-পকেটে আটকা পড়া মিথেন গ্যাস জ্বলে উঠেছিল আগুনের ফুলকি লেগে? অনেকভাবেই ব্যাখ্যা দেয়া যায় ঘটনাটার, তবে অবাস্তব একটা ধারণাই কেন যেন পাক খাচ্ছে মাথায়। ওটা খনিতে লুকানো আর্কটার আভা ছিল না তো! আর্ক অভ দ্য কাভানেন্ট? পাথর ধসে ধ্বংস হয়ে যায়নি তো ওটা?

আনমনে মাথা নাড়ল রানা। অনেক ভেবেও জবাব খুঁজে পাচ্ছে না।

ঘোর কেটে গেছে দিনার। জিজ্ঞেস করল, 'কী ঘটল ওখানে, রানা?'

'তেমন কিছু না,' হালকা গলায় বলল রানা। 'হিলানের ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে। আর কাউকে জ্বালাতে পারবে না কখনও।' দিনার কাছ থেকে পানির ক্যান্টিন নিয়ে দুটো চুমুক দিল ও। তারপর জানাল, ভুল টানেলে এসে ঢুকেছে। যে-দিকটায় যাবার ইচ্ছে ছিল, এটা তার সম্পূর্ণ উল্টোদিকে। আশ্চর্য আলোর আভাটার প্রসঙ্গ তুলল না। খামোকা মেয়েটার মাথা ভারী করবার কোনও মানে হয় না।

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখে লেগে থাকা ধুলোবালি পরিষ্কার করল দিনা। 'বদমাশটা যখন হামলা করল, তখন কী ভাবছিলাম আমি, জানো?'

'অনুমান করতে পারি,' হাসল রানা। 'আমি নিজেও ভড়কে গিয়েছিলাম। অবস্থা কী তোমার? বেশি লেগেছে?'

'চোয়ালটা ব্যথা করছে, খুব শীঘ্রি কালসিটে পড়ে যাবে। এ-ছাড়া আর কোনও অসুবিধে নেই। তুমি?'

সাবধানে মাথা ঘুরিয়ে ঊরুর ক্ষতটা পরীক্ষা করল রানা—এখনও রক্ত বেরুচ্ছে। ওটা পরিষ্কার করবার জন্য পানি নষ্ট করল না, শুধু শার্টের নীচের

অংশ ছিঁড়ে চাপা দিল ক্ষতটা। তারপর দিনার সাহায্য নিয়ে ন্যাপস্যাক থেকে বের করল একটা ডাক্ট টেপের রোল। সেখান থেকে সরু দুটো ফালি নিয়ে কাপড়টুকু আটকে দিল ক্ষতের উপরে।

'ব্যস, হয়ে গেল ডা. মাসুদ রানার অ্যান্টিসেপটিক সার্জারি,' পরিবেশটা সহজ করবার জন্য হালকা রসিকতা করল রানা। 'সেকেণ্ডারি ইনফেকশন ঠেকানোয় এ-চিকিৎসার তুলনা হয় না।'

হাসল না দিনা। গম্ভীর গলায় বলল, 'আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।'

'ভেবো না, ইনজুরিটা তেমন সিরিয়াস না। মেজর কোনও আর্টারি ছেঁড়েনি, তা হলে অনেক বেশি রক্ত পড়ত। তোমার মুখে কালসিটে ফোটার আগেই হয়তো আড়ষ্ট হয়ে যাবে, আর কিছু না।'

'কী ছিল ওটা, রানা? ওই আলোটা?' হঠাৎ প্রশ্ন করল দিনা।

তা হলে ওর চোখেও পড়েছে! ভুল দেখেনি রানা!

'কী জানি, ঠিক বুঝলাম না,' বলল ও।

'আটকা পড়া গ্যাসের বিস্ফোরণ? নাকি অন্যকিছু?'

'কী জানি,' আবার বলল রানা। 'ফিরে গিয়ে আবার ওটা দেখার উপায় নেই।'

সত্যিই নেই উপায়।

ধুলোটা থিতিয়ে আসার জন্য কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল ওরা, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে আবার শুরু করল পথ-চলা। শ'খানেক গজ যাবার পর টানেলটা আরও সরু হয়ে এল, ওদের পিঠ ঘষা খেতে থাকল ছাদের সঙ্গে। উড়ন্ত ধূলিকণা কমে এসেছে কিছুটা, তবে এখনও ফ্ল্যাশলাইটের আলো বেশিদূর যেতে পারছে না।

দিনাকে কাশতে শুনে রানা বলল, 'ছোট করে দম নাও। ধুলোটা বসতে সময় নেবে। ততক্ষণ যতটা কম পারো, বাতাস টানো।' ওর নিজেরও বুক আর গলা জ্বলছে।

কিছুদূর যেতেই টানেলটার ডায়ামিটার আরও কমতে শুরু করল। রানার কাঁধ ঘষা খেতে থাকল দেয়ালে, শার্ট ছিঁড়ে গেল, উন্মুক্ত চামড়া ছিলে গড়াতে শুরু করল রক্ত। তবু থামল না ও, এগিয়ে চলল। এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। সরীসৃপের মত পুরোপুরি বুক আর পেটের উপর শুয়ে পড়েছে ওরা এখন, পায়ের পাতা দিয়ে সামনে ঠেলে নিচ্ছে শরীরকে।

'রানা! কোথায় যাচ্ছি আমরা?' পিছন থেকে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল দিনা।

'জানি না,' সরল গলায় স্বীকার করল রানা।

টানেলটা এখন স্রেফ একটা কফিনের আকৃতি পেয়েছে, কোনোমতে দেহটা শুধু এঁটে যায়, শরীর বাঁকানো বা মোচড়ানো খুবই কঠিন। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় সামনেটা আরও সংকীর্ণ মনে হলো রানার কাছে। হঠাৎ অনুধাবন করল—টানেলটার শেষ মাথা বন্ধ হতে পারে। কে জানে, অন্ধকূপেই ঢুকেছে কি না ওরা! ব্যাপারটা দিনাও আন্দাজ করতে পারছে। পিছন থেকে রানার নাম ধরে আবার চেঁচাল ও, হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হতে বেশি দেরি নেই।

'ধৈর্য ধরো!' রুক্ষ গলায় বলল রানা। এই সুড়ঙ্গ ধরে এগোতে ওর নিজেরও অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে। ন্যাপস্যাক আর রাইফেলটা অনেকক্ষণ আগেই কাঁধ থেকে নামিয়ে সামনে রেখেছে ও, ওগুলোকে ঠেলতে গিয়ে কষ্ট বেড়ে গেছে কয়েক গুণ। প্রতিটা ইঞ্চি অগ্রসর হবার জন্য করতে হচ্ছে অমানুষিক পরিশ্রম।

কিছুক্ষণের জন্য একই রকম রইল টানেলের আকৃতি—কমল না, বাড়লও না। তবে শামুকের গতিতে পরিণত হলো ওদের অগ্রযাত্রা। রানার চারপাশে শুধু পাথর আর পাথর; শরীরের একটা অংশও নেই, যেটা দেয়ালের রুক্ষ সারফেসে ঘষা খেয়ে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে না। পরিস্থিতিটাকে আরও ভয়াবহ করে তুলবার জন্যই যেন চোখের সামনে মারকিউরিক সালফাইডের দেখা পেল ও। টানেলটার পুরো দেয়াল পারদের লোহিত আকরিকে ঢাকা পড়ে আছে। কয়েক জায়গায় ছাদ চুঁইয়ে মেঝেতে নেমে এসেছে খাঁটি পারদের ধারা, খানা-খন্দের মধ্যে জমাট বেঁধে আছে।

'ওহ্ গড!' দিনার গলা শোনা গেল। 'এখানে কতক্ষণ নিরাপদ আমরা?'

'আমি শিয়োর না,' ঢোক গিলে বলল রানা। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় সামনে পারদ-ভর্তি ছোট ছোট গর্ত ঝিকমিকিয়ে উঠছে। 'সাবধানে এগোও। স্কিন-কণ্ট্যাক্টের মাধ্যমে পারদ শরীরে ঢুকতে পারে। উন্মুক্ত ক্ষতগুলোতে যাতে ওটা না লাগে।'

'কী বলছ এসব?' তিক্ত কণ্ঠে বলল দিনা। 'আমার গোটা শরীরটাই তো এখন উন্মুক্ত ক্ষত!'

আকরিকে ভরা বিপজ্জনক কয়েকটা অংশ পেরিয়ে এল ওরা। সামনে সুড়ঙ্গটা সামান্য ঢালু হয়ে নীচে নামতে শুরু করেছে। মেঝেতে গড়িয়ে চলে যাওয়া পারদের দাগ দেখা গেল ওখানে।

ধুলোর উৎপাত অনেকক্ষণ আগেই কমে গেছে, কাশির দমকও কমে এসেছে তাই। তবে কম কাশলেও একেকটা কাশি ভয়ানক কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে রানার জন্য। দিনার চারপাশে সামান্য হলেও জায়গা আছে, স্বাভাবিক ভঙ্গিতে রিঅ্যাক্ট করতে পারছে দেহ; কিন্তু রানার পুরো শরীর সেঁটে আছে সুড়ঙ্গের দেয়ালে। কাশতে গেলেই বুক প্রসারিত হয়, গ্লাসের ভিতর বেলুন ফোলানোর মত একটা পরিস্থিতিতে পড়ে, শরীরটা কাশির সঙ্গে ঝাঁকি খেতে পারে না... পুরো ঝড়টা বয়ে যায় মুখের মধ্য দিয়ে। চোখের সামনে নেমে আসে লাল পর্দা। এ-কারণে ফুসফুসের দু-চারটে টিস্যু ইতোমধ্যে ফেটেও গেছে বোধহয়, জিভে রক্তের নোনা স্বাদ পাচ্ছে রানা।

আরও কিছুদূর যাবার পর হঠাৎ আটকে গেল ও।

বোধবুদ্ধিহীন আতঙ্ক গ্রাস করতে চাইল রানাকে, কোনোমতে দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সামলাল। কাঁধদুটো মুচড়ে মুক্ত করতে চাইল শরীরটাকে, লাভ হলো না। যত চেষ্টা করল, ততই যেন দেহটাকে আরও আঁকড়ে ধরল নিষ্ঠুর পাথুরে সুড়ঙ্গ—নিজেকে গোঁজের মত মনে হলো রানার। টানেলের মেঝেতে হাতের আঙুল দিয়ে খামচি দিল, একটা অবলম্বন পেলে শরীরটা টেনে নেবে সামনে। কিন্তু জায়গাটা ঢালাই করা স্ল্যাবের মত মসৃণ, শক্ত—ব্যর্থ প্রচেষ্টায়

আঙুলগুলোই কেবল ক্ষত-বিক্ষত হলো।

'কী হলো? থামলে কেন?' পিছন থেকে জানতে চাইল দিনা।

'আমি আটকে গেছি,' বলল রানা।

'আটকে গেছ মানে?'

'মানে হচ্ছে, আমি একটা ছিপিতে পরিণত হয়েছি। না পারছি এগোতে, না পারছি পিছাতে।'

'চেষ্টা করো!' কড়া গলায় বলল দিনা। বদ্ধ টানেলে আবছা শোনাচ্ছে গলাটা।

'তোমার কি ধারণা, আমি শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছি?' শান্ত গলায় প্রতিবাদ জানাল রানা। কথাটা তেমন জোরে বলতে পারল না, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, বাতাস টানার জন্য বুক যতটা ফোলার দরকার, তা ফুলছে না।

'সরি,' বলল দিনা। 'আমি আসলে ওভাবে বলতে চাইনি। কী করব এখন?'

'আমার পা ধরে যত জোরে পারো, টানো।' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রানা। মাথা কাজ করছে না। সবকিছু ঘোলাটে লাগছে চোখের সামনে। চিৎকার দিতে পারলে স্বস্তি পেত, কিন্তু বাতাসের অভাবে সেটাও সম্ভব নয়।

পাঁচ মিনিট টানাটানি করে রানাকে কয়েক ইঞ্চি পিছিয়ে আনতে পারল দিনা। ততক্ষণে প্রায় উন্মাদ হবার মত অবস্থায় পৌঁছে গেছে ও, বাতাসের অভাবে খাবি খেতে শুরু করেছে। শরীরটা মুক্ত হতেই জোরে জোরে শ্বাস টানল কয়েকবার, চোখ মুদে উত্তেজিত নার্ভগুলোকে শান্ত করবার চেষ্টা করল। মাথার ভিতরটা দপ্ দপ্ করছে। সারা শরীরে অসংখ্য কাটাছেঁড়া, জ্বলছে ক্ষতগুলো।

'তুমি ঠিক আছ?' উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইল দিনা।

'হ্যাঁ। ধন্যবাদ। আর একটু যদি দেরি করতে, ভয়ে পাগল হয়ে যেতাম।'

'এখন কী করতে চাও?'

'সামনে এগোতে পারছি না। পিছিয়ে যাওয়াটাই তো একমাত্র উপায়, তাই না?'

'কিন্তু ও-পথটা তো গুহার ধসে বন্ধ হয়ে গেছে!'

'অতদূর যাব না। মোটামুটি চওড়া একটা জায়গা পেলেই হবে। আমার শরীরের উপর দিয়ে সামনে চলে যেতে হবে তোমাকে। চিকন জায়গাটায় আমি আটকে যাচ্ছি, কিন্তু তুমি সম্ভবত পেরিয়ে যেতে পারবে।'

'আমি নাহয় পেরুলাম, তোমার কী হবে?'

'সেটা নিয়ে পরে মাথা ঘামানো যাবে। এখন পিছাতে শুরু করো।'

কাজটা সহজ নয়, বুকে-পেটে ভর দিয়ে এগোনোর চাইতে পিছানোটা হাজারগুণ কঠিন। পুরো দুই ঘণ্টা অমানুষিক খাটুনি শেষে মোটামুটি প্রশস্ত একটা অংশে ফিরল ওরা। দিনাকে ইশারা করতেই ও হামাগুড়ি দিয়ে উঠে পড়ল রানার গায়ে, ধীরে ধীরে ওকে টপকে সামনে চলে যেতে শুরু করল। মুখটা রানার ঘাড়ের কাছে পৌঁছুতেই একটু থামল ও, জোরে জোরে শ্বাস ফেলল রানার কানের পাশে।

'দয়া করে আমাকে উত্তেজিত কোরো না,' ঠাট্টা করল রানা। 'এখানে

ইরেকশনের জায়গা নেই।'

কষ্টের মাঝেও না হেসে পারল না দিনা। হামা দিয়ে রানার সামনে নেমে গেল। 'এবার কী?' জানতে চাইল ও।

'এগোও তুমি,' রানা বলল। 'রাইফেল আর ফ্ল্যাশলাইটটা নিয়ে যাও। এখান থেকে বেরুনোর একটা পথ বের করতে হবে তোমাকে।' গলায় অনুভূতি ফুটতে দিল না ও। কপাল ভাল যে, অন্ধকারে ওর মুখটা দেখতে পাচ্ছে না মেয়েটা।

'আ... আমি পারব না, রানা!' অস্ফুট কণ্ঠে বলল দিনা।

'পারতে হবে তোমাকে, দিনা!' জোর দিয়ে বলল রানা। 'নইলে আমাদের অপেক্ষায় থাকা চল্লিশজন নিরীহ মানুষ মারা পড়বে।'

'ওদের কথা আমি ভাবছি না, রানা!' দিনা ফোঁপাচ্ছে। 'আমি ভাবছি তোমার কথা!'

হাত বাড়িয়ে মেয়েটার গোড়ালি স্পর্শ করল রানা। 'আমার কথা ভাবলেও যেতে হবে তোমাকে। যদি এখান থেকে আমাকে উদ্ধারের ব্যবস্থা না করো, তা হলে দুজনে চমৎকার কোথাও ছুটি কাটাতে যাবো কীভাবে?'

'সত্যি যাবে?'

'সুন্দরী মেয়েদের কথা দিলে সাধারণত সেটার বরখেলাপ করি না আমি...' কথাটা বলতে বলতেই কেশে উঠল রানা।

শব্দ করে কেঁদে ফেলল দিনা। 'তোমাকে আমি এ-অবস্থায় ফেলে যেতে পারব না, রানা!'

কান্নাটা শুনে বুকটা কেমন যেন করে উঠল রানার, নিঃসঙ্গ মৃত্যু ওরও কাম্য নয়। কিন্তু সে-কারণে দিনাকে আটকে রাখা চলে না। জোর করে ভাবাবেগ দমন করল ও। বলল, 'প্লিজ, যাও! বিবেকের উপর তোমার মৃত্যুর দায় নিয়ে মরতে দিয়ো না আমাকে। প্লিজ!'

কথাটা শুনে কান্না আরও বেড়ে গেল দিনার। কয়েক মিনিট পর নিজেকে সামলাল ও। বলল, 'ঠিক আছে, যাব আমি। তবে তোমাকে একাকী মরতে দিতে নয়... বাঁচাতে! যাতে ওয়াদা-টা ভাঙতে না পারো। ছুটিতে আমাকে সঙ্গে নিতে বাধ্য হও! তোমার সঙ্গে মিশরের নীল নদে নৌকায় বেড়াব আমি। কয়েকদিন আগে দেখেছি স্বপ্নটা। ওটা সত্যি করতে হবে তোমাকে, রানা!'

'কিচ্ছু ভেবো না,' প্রাণহীন হাসি হেসে বলল রানা। 'তুমি যাবার পরই একজন ট্রাভেল এজেন্টের সঙ্গে কথা বলছি। দুটো টিকেট বুক করতে বলব ওকে।' ফ্ল্যাশলাইট, একে-ফোরটি সেভেন, আর পানির ক্যান্টিনটা বাড়িয়ে ধরল ও। 'এগুলো নিয়ে যাও, কাজে লাগবে।'

বিদায় নেবার জন্য আর সময় নষ্ট করল না দিনা, সাহসেই কুলাল না বোধহয়। জিনিসগুলো নিয়েই হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেল ও। দৃষ্টিসীমার আড়ালে হারিয়ে গেল কয়েক মিনিট পরই। ধীরে ধীরে নিকষ অন্ধকার গ্রাস করল রানাকে।

বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর। যেখানটাতে শুয়ে আছে,

ওখানে মোটামুটি নড়াচড়া করা যায়, কিন্তু পারল না রানা। মৃতের মত পড়ে থাকল, মনে হলো প্রতিমুহূর্তেই চারপাশের দেয়াল ভয়ঙ্কর এক আলিঙ্গনে চেপে ধরছে ওকে। জীবনে কোনোদিন এমন ক্লস্ট্রোফোবিয়া অনুভব করেনি রানা, আজ করছে। জ্যান্ত কবর দেয়া হয়েছে যেন ওকে, নিঃসীম আঁধার আর সংকীর্ণ সুড়ঙ্গ বিভীষিকার জন্ম দিতে শুরু করল মানসপটে। হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে গেল, শ্বাস পড়তে থাকল ঘন ঘন।

কেশে উঠল রানা, মনে হলো বুকের ভিতর ধারালো ছুরি বসিয়ে দিয়েছে কেউ। আতঙ্কিত ভঙ্গিতে এগোবার চেষ্টা করতেই ছাদের সঙ্গে ঠুকে গেল মাথা। চোখ বন্ধ করে নিজেকে অটোসাজেশন দিতে শুরু করল—নইলে এই নিস্তব্ধতা ওকে কিছুক্ষণের মধ্যেই পাগল করে দেবে। মৃত্যু নিয়ে ভাবতে শুরু করল—কোন্‌দিক থেকে আসবে ওটা? ক্ষুৎপিপাসায় মরবে, নাকি এতটা সময় ধরে টানা পারদের বিষক্রিয়া আগেই ওর জীবনপ্রদীপ নিভিয়ে দেবে? মারকারি-পয়েজনিং সম্পর্কে কী জানে, মনে করার চেষ্টা করল—খিঁচুনি দেখা দেবার কথা সবার আগে। পা-দুটোতে অলরেডি কাঁপাকাঁপি অনুভব করছে ও—তা হলে কি ব্যাপারটা শুরু হয়ে গেছে?

জোর খাটিয়ে অনিবার্য পরিণতির ভাবনাটা দূর করে দিল রানা, চিন্তা-চেতনায় তুলে আনল ধ্বংস হওয়া গুহাতে দেখা নীল আলোটাকে। কী ছিল ওটা? মিথেন বিস্ফোরণ, নাকি আর্ক অভ দ্য কাভানেন্টের স্বর্গীয় দ্যুতি? ওটা কি তবে পাথরে চাপা পড়ে চিরকালের মত ধ্বংস হয়ে গেল?

অপ্রকৃতিস্থের মত হেসে উঠল রানা। ব্যাপারটা ভাবার জন্য বাকি জীবনটা পড়ে আছে... খুবই সংক্ষিপ্ত একটা জীবন!

একুশ

ওয়াশিংটন ডিসি।

'হ্যালো, মেজর জেনারেল! দুঃখিত, ছোট্ট একটা কাজ সারার জন্য লাইনটা কেটে দিয়েছিলাম...'

আবেল আক্তরাকির কণ্ঠটা শুনতে পেয়ে যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের। আধঘণ্টার বেশি সময় ধরে রানার স্যাট-ফোনটার নাম্বারে ডায়াল করে যাচ্ছেন তিনি, কিন্তু প্রত্যুত্তর পাচ্ছিলেন না। সেই যে আচমকা অফ করে দেয়া হয়েছিল সেটটা, এরপর থেকে আর অন্-ই করা হচ্ছিল না। হতাশ হয়ে কিছুক্ষণ আগে ভাবছিলেন, হাল ছেড়ে দেবেন; ছাড়েননি বলে ধন্যবাদ জানালেন ভাগ্যকে।

'কুইক, মি. আক্তরাকি! নতুন কোনও কাজ উদয় হবার আগেই সব খুলে বলুন আমাকে!'

টানা পনেরো মিনিট কথা হলো দুজনের মধ্যে। ইরিত্রিয়ায় ভ্যালি অভ ডেড

চিলড্রেনের লোকেশন, ওখানকার পরিস্থিতি আর রানার ব্যাপারে সব খুলে বলল আবেল। শেষে যোগ করল, 'সোহেল আহমেদ নামে এক ভদ্রলোকের কথা বলেছেন মি. রানা। উনি নাকি ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী ইয়োরাম রাবাকের প্রাইভেট এজেন্টদের হাতে বন্দি হয়ে আছেন...'

'সোহেলকে উদ্ধার করা হয়েছে,' সংক্ষেপে জানালেন রাহাত খান। 'রানাকে বলবেন চিন্তা না করতে।'

'দেখা পেলে তো বলব! তাড়াতাড়ি আপনারা ফোর্স পাঠাতে না পারলে ওঁর আর দিনা আবানের কোনও আশা নেই। মানসিনি খেপা কুকুরের মত ওঁদের পিছনে লেগে আছে, হাতে পাওয়ামাত্র ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলবে। মি. রানা বলেছেন, ফোর্স পাঠাবার জন্য দরকার হলে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, কিংবা এফবিআই ডিরেক্টর রবার্ট সোয়ানের সাহায্য নিতে।'

'আমি ওদের সঙ্গেই আছি এ-মুহূর্তে,' বললেন রাহাত খান। 'কথা বলে নিচ্ছি এখুনি। কখন সাহায্য পাঠাতে পারব, সেটা পরে জানাব আপনাকে।'

'ঠিক আছে, সার। আমি অপেক্ষায় থাকব।'

'আর হ্যাঁ... ফর গডস্ সেক, ফোনটা বন্ধ করবেন না!'

'করব না,' হাসল আবেল। তারপর কেটে দিল লাইনটা।

সেলফোনটা পকেটে গুঁজে সোজা হলেন রাহাত খান। ওভাল অফিসে বসা বাকি তিনজন কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ওঁর দিকে।

প্রেসিডেন্ট বললেন, 'ওয়েল?'

সংক্ষেপে আবেল আফরাকির মেসেজটা শোনালেন রাহাত খান। তারপর বললেন, 'সাহায্য দরকার ওদের... বড় ধরনের সাহায্য। মানসিনি লোকটা রীতিমত একটা বাহিনী নিয়ে বসে আছে ওখানে, সেই সঙ্গে আছে ইজরায়েলি গ্রুপটাও। আমার মনে হয়, মিলিটারি অপারেশন ছাড়া গতি নেই।'

প্রেসিডেন্ট বললেন, 'বাংলাদেশি কন্টিনজেন্টটাকে সুদান থেকে মুভ করালে চলবে?'

'ওরা অভিজ্ঞ, তবে ইকুইপমেন্ট আর ট্রান্সপোর্টেশনের দিক থেকে পিছিয়ে আছে,' জানালেন রাহাত খান। 'লোকেশনে দ্রুত পৌঁছুবার মত হাই-স্পিড হেলিকপ্টার নেই ওদের, মানসিনির ফোর্সটাকে সারেণ্ডার করাতে হলে সফিসটিকেটেড ওয়েপনও দরকার হবে।'

'হুম!' মাথা ঝাঁকালেন প্রেসিডেন্ট। ইন্টারকমের বোতাম টিপে সেক্রেটারির সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। 'ম্যাডেলিন, জেনারেল মরিস-কে খবর দাও। বলবে খুব জরুরি।'

জেনারেল উইলিয়াম মরিস হচ্ছেন প্রেসিডেন্টের জয়েন্ট চিফ অভ স্টাফ।

'ইয়েস, সার,' বলল সেক্রেটারি।

ইন্টারকমের সংযোগটা প্রেসিডেন্ট কেটে দিতেই রবার্ট সোয়ান বললেন, 'মার্সেলো মানসিনি সম্পর্কে জানা আছে আমার। এজেন্সিতে ওর উপর একটা ফাইল আছে—দশ ইঞ্চি পুরু! লোকটার নামে হাজারো অভিযোগ আছে—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গোলযোগে টাকা ঢালে সে। সরকার আর

বিপ্লবী... দু'পক্ষকেই টাকা দেয়, ওরা যাতে লড়াই চালিয়ে যেতে পারে। মাঝখান থেকে নানা রকম রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক সুবিধা আদায় করে নেয় সে—অশান্ত পরিস্থিতিতে দেশগুলোর জাতীয় সম্পদ লুটে নেয়, বাধা দিতে পারে না কেউ। একচেটিয়া বাজারও কায়েম করে। লোকটা পুরো দুনিয়ার জন্যই একটা হুমকি, মি. প্রেসিডেন্ট। শুধু প্রমাণের অভাবে আজ পর্যন্ত ওর বিরুদ্ধে কিছু করতে পারিনি আমরা...'

'এবার ওই সুযোগটা এনে দিয়েছে রানা,' বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'মানসিনিকে ঠেকাতে পারব আমরা।'

পনেরো মিনিট পর ওভাল অফিসের দরজা ঠেলে ঢুকলেন জেনারেল মরিস—হাঁপাচ্ছেন, খবর পেয়ে বলতে গেলে ছুটতে ছুটতে এসেছেন। ভিতরে ঢুকেই প্রেসিডেন্টের সামনে উপবিষ্ট তিন অতিথিকে দেখলেন তিনি। বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলেন, 'হোয়াটস্ গোয়িং অন, মি. প্রেসিডেন্ট?'

'বসো,' খালি একটা আসন দেখিয়ে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'এখুনি জানতে পারবে সব।'

জেনারেল ধাতস্থ হতেই সংক্ষেপে পুরো পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। তাঁর কথা শেষ হলে মাথা ঝোঁকালেন জয়েন্ট চিফ অভ স্টাফ। প্রশ্নবোধক কণ্ঠে বললেন, 'উত্তর ইরিত্রিয়া, না?'

'কোনও সমস্যা?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

'জী না, সার।' মাথা নাড়লেন জেনারেল মরিস। 'তবে বিনা-অনুমতিতে ওখানে অপারেশন চালানো-টা বোধহয় ঠিক হবে না। পরিস্থিতি যতই খারাপ হোক না কেন।'

'পলিটিকাল দিকগুলো আমার উপর ছেড়ে দাও,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল আর ইরিত্রিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলে সব ঠিকঠাক করে নেব আমি। তোমরা মিলিটারি ট্যাকটিক্সের ব্যাপারে ভাবো।'

'ঠিক আছে, সার।' রাহাত খানের দিকে ফিরলেন জেনারেল মরিস। 'কী ধরনের অ্যাসিসটেন্স দরকার আপনাদের?'

'হেলিকপ্টার ট্রান্সপোর্ট, নাইট ভিশন, মিডিয়াম আর্টিলারি... আর ফটো ইন্টেলিজেন্স।' চাহিদা জানালেন রাহাত খান।

প্রেসিডেন্টের দিকে তাকালেন জেনারেল মরিস, চোখের ইশারায় সম্মতি পেয়ে বললেন, 'ঠিক আছে। সোমালিয়ার উপকূলে আমাদের একটা ফোর্স-রিকন ইউনিট আছে, ওরা হেলিকপ্টার আর ইকুইপমেন্ট দিতে পারবে। আর ফটো ইন্টেলিজেন্সের ব্যাপারটা... নর্থ আফ্রিকার উপরে এ-মুহূর্তে কোনও স্যাটেলাইট আছে কি না, তা জানা নেই আমার। একটু খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে।'

'একটু তাড়াতাড়ি খোঁজ নিন,' বললেন রাহাত খান। 'আমাদের হাতে সময় কম। ওখানে পরিস্থিতি খুব দ্রুত খারাপের দিকে মোড় নিচ্ছে।'

'সব মিলিয়ে অন্তত ছ'ঘণ্টা তো লাগবেই,' বললেন জেনারেল মরিস। 'তাতেও পারব কি না সন্দেহ। ইকুইপমেন্ট আর হেলিকপ্টার তো সুদানে

পৌঁছুতে হবে প্রথমে, তাই না?'

'সময় বড্ড বেশি লেগে যাচ্ছে...' বিড়বিড় করলেন রাহাত খান।

'ইরিত্রিয়ান মিলিটারিকে ইনভলভ করলে কেমন হয়?' বললেন সোয়ান। 'ওরা তো দেশের ভিতরেই আছে। বাংলাদেশি কন্টিনজেন্টের আগে টার্গেট-এরিয়ায় পৌঁছুতে পারবে না?'

'মনে হয় না,' অ্যাডমিরাল হ্যামিল্টন মাথা নাড়লেন। 'বাংলাদেশি কন্টিনজেন্টটার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে রাহাত আর আমি ওদের কথাই ভেবেছিলাম। কিন্তু খোঁজখবর নিয়ে দেখলাম, উত্তর সীমান্তে তেমন কোনও ফোর্স নেই ইরিত্রিয়ান আর্মির। আর্মস, ইকুইপমেন্ট আর ট্রান্সপোর্টেশনের অবস্থাও যাচ্ছেতাই। ওদের চাইতে ইউ.এন. ফোর্সই বেশি এফেক্টিভ হবে অ্যাকশনে।'

'ভদ্রতা দেখিয়ে হলেও সাহায্য চাওয়া দরকার,' প্রেসিডেন্ট বলে উঠলেন। 'ওদেরকে কিছু না বললে মনঃক্ষুণ্ণ হতে পারে।'

'আমার মনে হয় সেটাই ভাল হবে,' রাহাত খান বললেন। 'ওরা ওখানে পৌঁছুতে পারলে ভাল, না পারলেও অসুবিধে নেই। আমরা কাজ চালিয়ে নেব।'

'তা হলে কোর্স-অভ-অ্যাকশনের ব্যাপারে আপনারা সবাই একমত?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

একযোগে মাথা ঝাঁকালেন সবাই।

'গুড,' প্রেসিডেন্ট বললেন। 'আমি এক্ষুনি তা হলে রিং করছি জাতিসংঘের মহাসচিব আর ইরিত্রিয়ার প্রেসিডেন্টকে।'

'আমিও যাই,' উঠে দাঁড়ালেন জেনারেল মরিস। 'ফোর্স রিকন ইউনিটটাকে খবর দিতে হবে—ওরা যাতে সমস্ত ইকুইপমেন্ট দ্রুত সুদানে পৌঁছে দেয়।'

মাথা ঝাঁকিয়ে অনুমতি দিলেন প্রেসিডেন্ট।

পকেট থেকে সেলফোন বের করে আবেদ আফরাকিকে কল দিলেন রাহাত খান। কী ঘটতে যাচ্ছে, তা জানিয়ে দেবেন।

ঠিক সাত ঘণ্টা পর জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীর ইউনিফর্ম পরা একদল দুর্ধর্ষ বাঙালি সৈন্য নিয়ে ইরিত্রিয়ার আকাশসীমায় প্রবেশ করল অনেকগুলো ইউ.এইচ-৬০ ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টার। লড়াইয়ে নামার জন্য তৈরি হয়ে আছে ওরা।

বাইশ

সলোমনের খনি।

মৃদু একটা শব্দ শুনে সচেতন হয়ে উঠল রানা। চরম নৈঃশব্দ্যের মাঝে হঠাৎ মৃদু একটা খসখসানি... ফিসফিস ডাক! মনের ভুল ভেবে নির্বিকার থাকল

কয়েক মুহূর্ত, তারপর আবার শুনতে পেল শব্দটা। এবার আর ভুল নেই। জায়গা থাকলে ঝট্ করে উঠে বসত, কিন্তু এখন সেটা সম্ভব নয়, শিরদাঁড়াটা সিধে করল শুধু। কান পাতল রানা, অন্ধকারের ভিতরেই নির্নিমেষ মেলে রাখল চোখের পাতা, যেন তাতেই শ্রবণশক্তির প্রখরতা বাড়বে। শব্দ করতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না—গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। গোঙানি বেরিয়ে এল শুধু মুখ দিয়ে।

সময় পেরুতে লাগল... কিন্তু কতটা—তা বলতে পারবে না ও। খসখস শব্দটা ক্রমেই জোরালো হচ্ছে। কোনও কিছুর আশা করছে না রানা, এখনও ভাবছে—কোথাও ভুল হচ্ছে ওর। শব্দ হবে কীভাবে? কে শব্দ করবে এই নিস্তব্ধ পাতালে? তারপর... হঠাৎই একটু আলোর দেখা পেল। বেশি নয়, ছোট্ট একটা বিন্দু... কিন্তু এই নিকষ আঁধারে সেটাই যেন অন্ধ করে দেবার মত। তৃষ্ণার্তের মত দু-চোখ ভরে সেই আলো পান করল ও।

'কে... কে ওখানে?' ফিসফিস করে জানতে চাইল রানা।

'ধৈর্য ধরো, ডিয়ার,' আবছাভাবে ভেসে এল দিনা আবানের অতি-পরিচিত কণ্ঠ। 'একটু পরেই আমার দেখা পাবে তুমি।'

চোখদুটো পানিতে ভরে গেল রানার, এ-অশ্রু আনন্দের। নিশ্চিত মৃত্যুর ক্ষণ গুনছিল, নিজের অসহায়ত্ব আর একাকীত্বের কথা ভেবে দুর্বল হয়ে পড়ছিল ভিতরটা। হাজার হোক, প্রিয়জনের সান্নিধ্য ছাড়া কে-ই বা চায় মরতে? দিনার সঙ্গে অল্পদিনের পরিচয় হলেও ইতোমধ্যে ওর মনের অনেকখানি জায়গা দখল করে নিয়েছে মেয়েটা; জোর করে পাঠিয়ে দিয়েছিল বটে, কিন্তু মনে মনে শেষ মুহূর্তে ওর কোলে মাথা রেখে মরতেও চাইছিল। ওকে ফিরে আসতে দেখে দুর্বল হৃদয়টা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছে।

'কী করছ তুমি?' ফিসফিসিয়ে জানতে চাইল রানা। গলার স্বরটা নেমে গেছে খুব, দিনা বোধহয় শুনতে পায়নি প্রশ্নটা। খসখস শব্দটাই শুধু ভাসতে থাকল বাতাসে।

দশ মিনিট কাটল, হঠাৎ টানেলের মেঝেটা দেবে গেল একটু। একই সঙ্গে রানার শরীরটাও ঢিলে হয়ে এল চাপা সুড়ঙ্গের মাঝে। চেষ্টা করতেই কাঁধ নড়াতে পারল। দিনার ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে ও, কী দিয়ে যেন মেয়েটা তুমুল গতিতে খুঁড়ে চলেছে টানেলের নীচটা। চোখের সামনে মেঝেতে কয়েকটা গর্ত সৃষ্টি হতে দেখল, শরীরটা আরও নেমে গেল।

তারপর... হঠাৎ করে বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে গেল রানা। ধরণী যেন দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল, গায়েব হয়ে গেল টানেলের মেঝে। হুড়মুড় করে নীচে পড়ে গেল ও, ধুলোবালিতে ঢাকা একটা ঢালের উপর দিয়ে বিপজ্জনক গতিতে গড়াতে শুরু করল নিম্নমুখী হয়ে। ঠোকর খেয়ে ব্যথায় চেঁচাতে চাইল, কিন্তু হাঁ করতেই মুখে ঢুকে গেল একরাশ ধুলো। বাধ্য হয়ে চিৎকারটা চেপে রাখতে হলো। ঢালের একেবারে তলায় পৌঁছে থামল পতন, আছাড় খেয়ে স্বাভাবিক চলৎশক্তি হারাল ও। নিথর দেহটার উপর নামতে থাকল ধুলোমাটির স্রোত, ঢেকে ফেলল মুহূর্তে।

দমবন্ধ হয়ে গেল রানার, শরীরের উপর চেপে থাকা মাটি সরাবার শক্তি পেল না। আধো-অচেতন অবস্থায় টের পেল, দিনা দু'হাতে মুক্ত করছে ওকে। মুখের উপর থেকে ধুলোমাটির আস্তর সরে গেল, টেনে ওকে স্তূপের তলা থেকে বের করে আনল মেয়েটা। চোখ যখন খুলল, তখন ওর শরীরের উপর হাসিমুখে ঝুঁকে আছে ও।

'খোঁড়াখুঁড়িটাকে ফুল-টাইম জব হিসেবে নেব কি না ভাবছি,' বলল দিনা। 'দেখা যাচ্ছে, গুপ্তধন উদ্ধারের একটা সহজাত ক্ষমতা আছে আমার।'

দুর্বল ভঙ্গিতে হাসল রানা। 'আমাকে সোনার মোহর ভাবলে ঠকবে কিন্তু।' আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল ও। সারা দেহ ব্যথায় টনটন করছে, তারপরও আশ্চর্য একটা পুলক অনুভব করছে। বেঁচে আছে ও! দিনার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভাবিনি, তুমি আবার ফিরে আসতে পারবে।' গলা ভারী হয়ে এল ওর। বদ্ধ টানেলে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষার মুহূর্তগুলো সত্যিই ভয়াবহ ছিল। বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়েছিল ও। 'ধন্যবাদ!' দিনাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরল।

কয়েক মুহূর্ত দৃষ্টি-বিনিময় হলো দুজনের, তারপর গাঢ় চুম্বন। দিনার ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে দিল রানা, পরস্পরের সঙ্গে সেঁটে থাকল ওরা বেশ কিছুক্ষণ।

সংবিৎ ফিরতেই দিনাকে ছেড়ে সোজা হলো রানা, কঠিন দায়িত্বটার কথা মনে পড়ে গেছে। ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে আলো ফেলল আশপাশে। নতুন একটা চেম্বার এটা—ত্রিশ ফুট উঁচু, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে প্রায় একই সমান। কিউবের মত আকৃতিটা দৃষ্টি আকর্ষণ করল রানার, বুঝতে পারল—চেম্বারটা প্রাকৃতিক নয়। দেয়ালগুলো মসৃণ, পাথর গেঁথে তৈরি করা হয়েছে। স্টেজিং এরিয়ার মত লাগল—শিশু-শ্রমিকদের খোঁড়া প্রাচীন টানেল সিস্টেম আর কিম্বারলাইট পাইপের দিকে যাওয়া মূল খনিটাকে সংযুক্ত করা হয়েছে এই প্রকোষ্ঠটার মাধ্যমে। সিল করে দেয়া একটা সাইড টানেল চোখে পড়ল, ওটার উল্টোপাশেই নিশ্চয়ই মানসিনি-নিয়ন্ত্রিত মূল টানেলটা রয়েছে... এই দেয়ালটাই সেদিন অন্য রকম রঙের বলে মনে হয়েছিল ওর কাছে। দিনা কীভাবে ওকে মুক্ত করেছে, তাও বোঝা গেল। চেম্বারের একপাশে একটা ঢালু জায়গা রয়েছে, ওটার মাথায়... ছাদে উঁকি দিচ্ছে কয়েকটা ছোট ছোট সুড়ঙ্গের মুখ। ওগুলোরই একটাতে আটকা পড়েছিল ও। টানেলগুলোর তলাকে সাপোর্ট দিচ্ছে জমাট ধুলোমাটির স্তূপ, অনেকটা পিলারের মত। ওই স্তূপের ওপাশে উঠেই টানেলের মেঝে আলগা করে দিয়েছে দিনা, ওকে নামিয়ে এনেছে নীচে।

'দেরি করার জন্য দুঃখিত,' দিনা বলল। 'আসলে টানেল থেকে বেরিয়ে ঢালটা দিয়ে গড়িয়ে নীচে পড়ে গিয়েছিলাম। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম মাথায় ঠোকর খেয়ে।' কথাটার সত্যতা প্রমাণ করছে বাম চোখের উপরে একটা নতুন কালসিটে।

'সেজন্যে আমার কোনও অভিযোগ নেই।' ক্যান্টিন নিয়ে এক ঢোক পানি খেল রানা, তারপর দিনার হাতের জিনিসটার উপর নজর দিল, ওটা দিয়েই টানেলের তলা খুঁড়েছে ও। ছোট একটা শাবল ওটা... প্রাচীন আমলের।

'দারুণ জিনিস,' রানা মন্তব্য করল। 'ব্রোঞ্জ-এইজের চমৎকার নিদর্শন।'

'তোমাকে বের করে আনার জন্য এমন পাঁচটা নিদর্শন নষ্ট করতে হয়েছে আমাকে,' দিনা বলল। 'আর্কিয়োলজিস্ট-রা জানতে পারলে ভয়ানক খেপে যাবে।'

চেম্বারের এককোণে পড়ে আছে প্রাচীন যন্ত্রপাতি—কোদাল আর শাবল। কিছু বড় আকারের... পূর্ণবয়স্ক লোকের জন্য, অন্যগুলো বাচ্চাদের ব্যবহারোপযোগী। স্টেজিং এরিয়া থেকে ওগুলো নিয়ে কাজে যেত শ্রমিকরা। শাবল-কোদালের পাশে পড়ে আছে নষ্ট হয়ে যাওয়া চামড়ার স্তূপ—এককালে বালতি আর পানির ফ্লাস্ক ছিল ওগুলো। ভাঙাচোরা কিছু মাটির প্রদীপও দেখা গেল ওখানে।

'আমিও আর্কিয়োলজিস্ট... শৌখিন,' বলল রানা। 'তবে নষ্ট হওয়া আর্টিফ্যাক্টের ব্যাপারে মাতম করবার কারণ দেখছি না। আপাতত এখান থেকে বেরিয়ে কয়েকজন মন্দ লোককে শায়েস্তা করতে চাই।'

স্টেজিং এরিয়া থেকে মূল খনিতে যাবার সিল করা টানেলটাতে চলে গেল ও। ন্যাপস্যাক থেকে ডিনামাইট বের করল, স্টিকটাকে দু'ভাগ করে ভিতর থেকে সামান্য এক্সপ্লোসিভ ঢালল দেয়ালের গোড়ায় গর্ত করে। সাবধানতা অবলম্বন করল ও, বিস্ফোরক এমনভাবে সেট করল, যাতে পুরো দেয়ালটার বদলে অল্প একটু জায়গা শুধু ভেঙে পড়ে। মেইন টানেলের পরিস্থিতি জানা নেই ওর, খামোকা বড় বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মানে হয় না।

'ফিউয কোথায় পাচ্ছ?' জানতে চাইল দিনা। 'কয়েলটা তো হিলালের গলায় খরচ করে ফেলেছ।'

মুচকি হেসে ন্যাপস্যাক থেকে আরেকটা কয়েল বের করল রানা। বলল, 'হার্ড-রক মাইনিঙের দ্বিতীয় নিয়ম হচ্ছে, কখনও মাত্র এক কয়েল ফিউয রেখো না।'

'প্রথম নিয়মটা কী?'

'বিস্ফোরক বেশি করে রেখো।'

হিলালের গলায় ব্যবহার করা ফিউযটার তুলনায় এবারেরটা অনেক স্লো, আগুন ধরিয়ে পিছিয়ে আসার যথেষ্ট সময় পাওয়া গেল। সাইড টানেল থেকে বেরিয়ে দু'পাশের দেয়ালের আড়ালে কাভার নিল রানা-দিনা। ধুম করে কয়েক সেকেণ্ড পর ঘটল বিস্ফোরণ। কেঁপে উঠল মাটি। ধুলোর মেঘ সরে যেতেই দেখা গেল, দেয়ালের গোড়ায় তিন-ফুট ব্যাসের একটা গর্ত সৃষ্টি হয়েছে... আলো দেখা যাচ্ছে ওপাশে।

আনন্দে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল ওরা দুজন, পরমুহূর্তেই চমকে উঠল। দেয়ালের ভাঙা ফোকর দিয়ে ভেসে আসছে গোলাগুলির শব্দ... ওপাশে লড়াই চলছে। আন্দাজ করল রানা, নিশ্চয়ই ফোর্স পাঠিয়েছেন বিসিআই চিফ, ওরাই লড়াই করছে সুদানিজদের সঙ্গে। কিন্তু মেইন টানেলে বেরুলে কোন্ পক্ষের সামনে পড়ে যাবে, সেটা বোঝার উপায় নেই।

'এখানেই থাকো,' দিনাকে বলল রানা। 'আমি গিয়ে দেখে আসি ব্যাপারটা।'

'কেন... আমি এলে অসুবিধে কী?' দিনা ভুরু কোঁচকাল।

'উঁহুঁ, ঝুঁকি নিতে দেব না তোমাকে,' রানা বলল। 'আমার জীবন তো বাঁচিয়েছ, এবার তোমারটা আমাকে বাঁচাতে দাও।'

দিনাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে এ.কে-ফোরটি সেভেনটা তুলে নিল রানা, কাঁধে ঝোলাল ন্যাপস্যাকটা; তারপর ক্রল করে বেরিয়ে গেল দেয়ালের ফোকর দিয়ে। একটু বিস্মিত হয়ে দু'দিকে তাকাল ও, খনির মেইন টানেলটা একদম পরিষ্কার, দেখে বোঝারই উপায় নেই গত রাতে ছাদ ধসিয়ে পুরো জায়গাটা বন্ধ করে দিয়েছিল রানা। গোলাগুলির মুহুর্মুহু আওয়াজ এবং প্রতিধ্বনিতে কাঁপছে জায়গাটা। মাথা নিচু করে প্রবেশমুখের দিকে কিছুটা এগোতেই লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলিরও দেখা মিলল—আবছা আঁধার চিরে ছুটে আসছে ট্রেসার রাউণ্ড। মেঝেতে শুয়ে পড়ল রানা, ক্রল করে এগোতে থাকল।

এণ্ট্রান্সের কাছাকাছি পৌঁছুতেই বোঝা গেল, কারা টানেলটাকে কাভার পজিশন হিসেবে ব্যবহার করছে। চারজন সুদানিজ সৈন্যকে দেখতে পেল ও, বালির বস্তা সাজিয়ে খনির মুখটাকে ট্রেঞ্চে রূপান্তরিত করেছে, ওখানে কাভার নিয়ে গুলি-বিনিময় করছে প্রতিপক্ষের সঙ্গে। একটা কণ্ঠ ভেসে এল দূর থেকে, বুলহর্নের মাধ্যমে ইংরেজি ভাষায় আত্মসমর্পণের আহ্বান জানানো হচ্ছে সুদানিজদেরকে। ওতে মোটেই সাড়া দিল না বেপরোয়া লোকগুলো, বরং শব্দের উৎস লক্ষ্য করে এক পশলা গুলি ছুঁড়ল।

রানা বুঝতে পারছে, বেশ সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে সুদানিজরা। অ্যামিউনিশন খতম না হওয়া পর্যন্ত অনায়াসে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে অপরপক্ষকে... আর খুব শীঘ্রি ওদের অ্যামিউনিশন ফুরানোর সম্ভাবনাও নেই। করণীয় সম্পর্কে একটু ভাবল রানা, তারপর শান্তভাবে হাতের রাইফেলটা কাঁধের কাছে তুলে আনল। লিভারটাকে সেট করল সেমি-অটোমেটিকে। হঠাৎ করে পিছনে ওর উপস্থিতি টের পেয়ে গেল এক সৈনিক, ঝট করে উল্টো ঘুরল। অস্ত্রহাতে রানাকে দেখতে পেয়ে যা বোঝার বুঝে নিল সে, চেঁচিয়ে উঠল সঙ্গীদের উদ্দেশে।

নির্বিকার ভঙ্গিতে ট্রিগার চাপল রানা, কোনও দয়া-মায়া দেখাল না। গত এক সপ্তাহে দেখা এদের নৃশংসতার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, মানসপটে ভেসে উঠছে ধর্ষিতা ইরিত্রিয়ান নারীদের চেহারা। বুকে-পিঠে গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল চার সৈনিক, ওর দিকে অস্ত্র তাক করবার কোনও সুযোগই পেল না।

বাইরে থেকে আরেক পশলা গুলি ছুটে এল ট্রেঞ্চের দিকে। রানা চেঁচাল, 'স্টপ শুটিং! এদিকটা ক্লিয়ার!' দু'হাত মাথার উপর তুলে বালির বস্তার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ও।

পুরোদস্তুর ব্যাটল গিয়ার পরা কয়েকজন কমাণ্ডো উদয় হলো খনির এণ্ট্রান্সের সামনে। সতর্ক ভঙ্গিতে হাতের অস্ত্র তাক করে রেখেছে ওরা। ট্রেঞ্চের ওপাশে চলে গেল কয়েকজন, সুদানিজদের অবস্থা দেখতে; বাকিরা ঘিরে ফেলল রানাকে। কমাণ্ডোদের নেতা তীক্ষ্ণ চোখে দেখল ওকে আপাদমস্তক, তারপর নিশ্চিত হবার জন্য প্রশ্ন করল, 'মেজর মাসুদ রানা?'

'কারেক্ট,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ইউ মে...'

'মাতৃভাষাতেই কথা বলতে পারেন,' হেসে উঠে বাংলায় বলল কমাণ্ডো। 'আমরা বাংলাদেশি। আমি ক্যাপ্টেন মাহমুদ জামান।'

'বাংলাদেশি!' রানা অবাক। 'কোত্থেকে...'

'সুদান, সার। ওখানে ইউ.এন. পিস-কিপিং মিশনে আছি আমরা। আপনার জন্য একটা সুসংবাদ পাঠিয়েছেন মেজর জেনারেল রাহাত খান—সোহেল আহমেদকে উদ্ধার করা হয়েছে!'

'শুনে খুব খুশি হলাম, ভাই,' আন্তরিক ভঙ্গিতে ওকে জড়িয়ে ধরল রানা। 'কখন এসেছ তোমরা? এখানকার সিচুয়েশন কী?'

'দু'ঘণ্টা হলো পৌঁছেছি,' জানাল ক্যাপ্টেন। 'উপত্যকা থেকে কয়েক মাইল দূরে ল্যাণ্ড করেছি আমরা, তারপর পাহাড় টপকে আচমকা আক্রমণ চালিয়েছি। পুরো ক্যাম্পটা এখন আমাদের নিয়ন্ত্রণে... খনিটা ছাড়া।'

'খনির ভিতর আর কেউ আছে?'

'জী, সার। পঞ্চাশজন সুদানিজ থাকার কথা বাইরে, আমরা পেয়েছি অর্ধেক... মানে পঁচিশ। কয়েকজন হয়তো হামলার ফাঁকে পালিয়ে গেছে, তারপরও খনির ভিতরে নিশ্চয়ই কিছু লোক রয়েছে ওদের। বেশিরভাগ ইরিত্রিয়ান রিফিউজিকে পাইনি আমরা, পালের গোদাটাও... মানে, মার্সেলো মানসিনি... গায়েব হয়ে গেছে। ওরা সবাই সম্ভবত ভিতরে ঢুকেছে, কিন্তু কেন... সেটা বুঝতে পারছি না।'

'হীরার জন্য,' মুচকি হাসল রানা। 'মানসিনি একটা গোঁয়ার, হীরা ফেলে সে কিছুতেই ফিরে যাবে না। শ্রমিকদের মাধ্যমে নিশ্চয়ই ওয়ার্কিং পিটটাতে তল্লাশি চালাচ্ছে।'

'কীসের হীরা?' ভুরু কোঁচকাল মাহমুদ।

খুলে বলল রানা।

'আই সি!' বলল মাহমুদ সিন্দুকটার কথা শুনে। 'কিন্তু এভাবে নিজেকে ফাঁদে ফেলছে কেন লোকটা? হীরা উদ্ধার করেই বা কী লাভ হবে তার? নিশ্চয়ই ভাবছে না, আমরা ওকে যেতে দেব?'

'আমার ধারণা, রিফিউজিদের জিম্মি করবার প্ল্যান এঁটেছে সে,' রানা বলল। 'জানে, নিরীহ মানুষের প্রাণের উপর ঝুঁকি নেবে না তোমরা।'

'তা হলে তো মহা-মুশকিল হয়ে গেল। ওয়ার্কিং পিটে আমরা হামলা চালালেও শ্রমিকদের জিম্মি করে বসতে পারে ও।'

'করবে, নিশ্চিত থাকতে পারো।' একটু ভাবল রানা। 'তোমাদের সঙ্গে নক-আউট গ্যাস আছে? পিটের সবাইকে অজ্ঞান করে ফেলতে পারলে...'

'না, সার,' মাহমুদ মাথা নাড়ল। 'মাত্র ত্রিশজন সোলজার নিয়ে এসেছি আমরা... ক্লোজ কমব্যাটের জন্য। গ্যাস-ট্যাস আনার জায়গা ছিল না হেলিকপ্টারে, দরকার আছে বলেও মনে করিনি।'

'সেক্ষেত্রে বিকল্প কিছু ভাবতে হবে,' আশপাশে নজর বোলাল রানা। হঠাৎ ওর মুখে হাসি ফুটল। 'জাস্ট আ মিনিট, বাইরের সব সুদানিজ গার্ড কি মারা

পড়েছে, নাকি জ্যান্ত ধরেছ দু'চারজনকে?'

'ধরেছি, বেশ ক'জনই আত্মসমর্পণ করেছে।' মাহমুদের কপালে ভ্রূকুটি দেখা দিল। 'কেন, কী দরকার ওদেরকে?'

'ওদেরকে দরকার নেই,' বলল রানা, 'দরকার ওদের এক সেট ইউনিফর্ম—যেটা গুলিতে ফুটো হয়ে যায়নি, কিংবা রক্তেও ভেজেনি।'

এবার মাহমুদ বুঝতে পারল প্ল্যানটা। হাসল ও। 'ওটা... স্যর... কোনও সমস্যাই নয়।'

তেইশ

ওয়ার্কিং পিটে ঝড়ের বেগে কাজ চলছে। ওয়ালেস মায়ার কোনও রকম দয়া-মায়া করছে না তার শ্রমিকদের উপর, চাবুক চালাচ্ছে ঘন ঘন, ইতোমধ্যে তিনজনকে গুলিও করেছে সে। নীরবে এই অত্যাচার সইতে হচ্ছে রিফিউজিদেরকে, প্রতিবাদ করতে পারছে না, আটজন সুদানিজ গার্ড রাইফেল তাক করে রেখেছে ওদের দিকে।

জটলা থেকে একটু দূরে একটা টুলে বসে আছে মার্সেলো মানসিনি। তার চেহারায় সন্তুষ্টির ছাপ দেখে যে-কেউ বিভ্রান্ত হবে। পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল—পুরো ক্যাম্পটা বেদখল হয়ে গেছে, সে-ও আটকা পড়েছে খনির ভিতরে... এরপরও সন্তুষ্টি আসে কী করে? কিন্তু মানসিনি অন্য ধাতের মানুষ, বিপদে বুদ্ধি হারায় না, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে জানে; সে-কারণেই এই পরিস্থিতিতেও উত্তেজিত নয় সে। ইতোমধ্যে ওর হীরা-ভর্তি সিন্দুকটা খুঁজে পাওয়া গেছে, এখান থেকে বহাল তবিয়তে নিজের সাম্রাজ্যে ফিরে যাবে বলেও স্থির বিশ্বাস রয়েছে তার। সন্তুষ্ট হবে না কেন?

শুরুতে অবশ্য অবস্থাটা অন্যরকম ছিল। পাথর-ধস সরিয়ে পিটে ঢোকার পর যখন দেখা গেল, মাসুদ রানা আর ইরিত্রিয়ান শ্রমিকদল-সহ ওর সিন্দুকটা গায়েব হয়ে গেছে, তখন সত্যিই বোকা বনে গিয়েছিল মানসিনি, দুশ্চিন্তায় কাবু হয়ে পড়েছিল। তারপরও অবশ্য হাল ছাড়েনি। জানা কথা, রানা কোনও একটা কৌশল খাটিয়ে সরে পড়েছে পিট থেকে; সেই কৌশলটা খুঁজে বের করবার জন্য ওয়ালেসকে নির্দেশ দেয় সে। লোকজন নিয়ে পিটের প্রতিটা ইঞ্চি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছে দক্ষিণ আফ্রিকান সুপারভাইজর, কাটিয়ে দিয়েছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা... কিন্তু কিছুতেই রানার এস্কেপ রুটটা খুঁজে বের করতে পারেনি। শেষে... যখন পরাজয় মেনে নিয়ে পাততাড়ি গোটানোর কথা ভাবতে শুরু করেছে মানসিনি, তখনই ওয়ালেসের সঙ্গী আরেক সুপারভাইজরের মাথা থেকে বেরোয় কার্যকর আইডিয়াটা। মেটাল ডিটেক্টর ব্যবহারের বুদ্ধি দেয় সে, ব্যাপারটা আগে কারও মাথাতেই আসেনি। ডিটেক্টর নিয়েই শেষ পর্যন্ত পঞ্চাশ ফুট গভীর একটা শাফটের ভিতর... জঞ্জালের তলায় খোঁজ পাওয়া যায়

সিন্দুকটার।

ততক্ষণে বহু সময় পেরিয়ে গেছে; মানসিনি বুঝতে পারছিল, যে-কোনও মুহূর্তে রানার পাঠানো খবর পেয়ে উদ্ধারকারী দল পৌঁছে যাবে ভ্যালি অভ ডেড চিলড্রেনে। তারপরও পিছিয়ে যেতে রাজি হয়নি সে; এন্ট্রান্সে ট্রেঞ্চ তৈরি করিয়ে খনিটাকে সুরক্ষিত করিয়েছে, ভিতর-বাইরে সশস্ত্র সুদানিজদের সার্বক্ষণিক পাহারার ব্যবস্থা করেছে। হামলা আসবে, তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু শত্রুকে ঠেকিয়ে রেখে সিন্দুক উদ্ধারের কাজটাও চালিয়ে যাবে সে। এখন পর্যন্ত প্ল্যানটা ঠিকমতই এগোচ্ছে।

শাফটের তলা খুঁড়ে ইতোমধ্যে সিন্দুকটাকে মুক্ত করা হয়েছে জঞ্জাল থেকে। মেকানিকাল হয়েস্ট আনার সময় পাওয়া যায়নি চেম্বারে, এখন একটা মেক-শিফট হেড-গিয়ার আর কপিকলের মাধ্যমে শ্রমিকরা দড়ি দিয়ে টেনে তুলছে লোহার ভারী বাক্সটা। পঞ্চাশ ফুট নীচ থেকে ওঠাতে হচ্ছে ওটা, শ্রমিকদের দম বেরিয়ে যাচ্ছে দড়ি টানতে টানতে, ঘামে চকচক করছে কালো দেহগুলো। শাফটের মুখে সিন্দুকটার উপরিভাগ উদয় হতেই হৈ-হল্লা শুরু হলো। উত্তেজিত ভঙ্গিতে টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মানসিনি, এগিয়ে গেল শাফটের দিকে।

'হোল্ড অন্!' চেঁচাল সে। 'শক্ত করে ধরো সবাই, পড়ে যেন না যায় ওটা!'

চেঁচামেচির মাঝে ওয়ার্কিং পিটের কার্নিশে উদয় হলো সুদানিজদের পোশাক পরা একজন মানুষ, মুখে কালিঝুলি মাখা, হাতে একে-ফোরটি সেভেন। নীচের গার্ডরাও সিন্দুকটা দেখতে পেয়ে উত্তেজিত, কেউ আলাদাভাবে খেয়াল করল না তাকে। র‍্যাম্প ধরে চেম্বারের মেঝেতে নেমে এল মানুষটা, লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল ইটালিয়ান টাইকুনের ঠিক পিছনে। সিন্দুকটা হেড-গিয়ারের মাথায় উঠে যেতেই আলতো করে রাইফেলের ব্যারেলটা ঠেকাল সে মানসিনির পিঠে।

'হাই, সেনর মানসিনি!' মৃদু গলায় বলল মানুষটা। 'ডোন্ট মুভ। যদি এক্ষুনি মরতে না চান।'

স্থির হয়ে গেল ইটালিয়ান টাইকুন। গলাটা চিনতে পেরেছে। মাসুদ রানা!

নিয়োগকর্তার মুখভঙ্গির পরিবর্তনটা চোখ এড়াল না ওয়ালেস মায়ারের। ঝট্ করে পিছনে দাঁড়ানো মানুষটাকে দেখল সে, পরমুহূর্তে তুলে আনল হাতের পিস্তল।

'খবরদার!' গর্জে উঠল রানা। 'কিছু করতে গেলে সবার আগে তোমাদের মনিব-ই ঝাঁঝরা হয়ে যাবে!'

দ্বিধা ভর করল ওয়ালেসের চেহারায়। 'মি. মানসিনি?'

'রিল্যাক্স,' শান্ত গলায় বলল মানসিনি। 'বোকার মত কিছু করতে যেয়ো না। তার কোনও প্রয়োজন নেই।'

'অস্ত্র ফেলে দিতে বলুন সবাইকে,' নির্দেশ দিল রানা।

নিচু স্বরে হেসে উঠল মানসিনি। 'ঠিক এই পর্বটা এর আগেও পেরিয়ে এসেছি আমরা, মি. রানা। ডেব্রে আমলাক মঠের কথা ভুলে গেছেন? জেতার

কোনও সম্ভাবনা নেই আপনার। এখানে গতবারের চেয়েও বেশিসংখ্যক নিরীহ লোক আছে। আমাকে গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শ্রমিককে খুন করা হবে।'

'আপনাকে গুলি করার ইচ্ছে নেই আমার,' বলল রানা। 'কারণ এবারের পরিস্থিতি আগের চেয়ে ভিন্ন। এবার আমার সঙ্গে রি-এনফোর্সমেন্ট আছে।' উঁচু গলায় একটা হাঁক ছাড়ল ও।

সঙ্গে সঙ্গে উপরের কার্নিশে উদয় হলো জনাবিশেক বাংলাদেশি কমাণ্ডো। নীচের গার্ডদের দিকে অস্ত্র তাক করল ওরা।

হাসল রানা। 'ইউ সি... আমি এবার প্রস্তুত হয়েই এসেছি।'

হাসল মানসিনি। 'ভেবেছেন, আমি প্রস্তুতি নিইনি?' ধীরে ধীরে পিছন ফিরল সে। চেহারা হিংস্র হয়ে উঠেছে। 'এই খনি... এই হীরা আমার জীবন, রানা। আমি না পেলে তোমাদেরকেও পেতে দেব না।' কোটের পকেটে হাত ভরল সে।

দ্রুত রাইফেলটা তার বুকে ঠেকাল রানা। 'খবরদার! আপনার পকেটের ওই পিস্তলটার খবর জানা আছে আমার। হাত বের করুন!'

'এবার আমি পিস্তল রাখিনি, রানা,' বলল মানসিনি। 'তারচেয়েও শক্তিশালী জিনিস রেখেছি।' হাত বের করল সে।

মুঠোটার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল রানা, সি-ফোর এক্সপ্লোসিভের একটা ব্লক দেখা যাচ্ছে ইটালিয়ান টাইকুনের হাতে, ডিটোনেটর আর টাইমার-সহ! ডিসপ্লে-তে কাউণ্টডাউন শুরু হয়ে গেছে—দশ, নয়, আট...

অসহায় বোধ করল ও। বিস্ফোরক সম্পর্কে ভাল জ্ঞান আছে ওর, বুঝতে পারছে—জিনিসটা ছাদের ধস নামাবার মত শক্তিশালী না হলেও শকওয়েভ দিয়ে চেম্বারের প্রতিটা প্রাণীকে হত্যা করতে পারবে। হতভম্ব দৃষ্টিতে মানসিনির দিকে তাকাল ও। লোকটা যে এতটা উন্মাদ, তা আগে ভাবতে পারেনি।

'আগেই বলেছি, জেতার কোনও সুযোগ নেই তোমার, রানা,' খ্যাপাটে ভঙ্গিতে বলল মানসিনি। 'আমার সঙ্গেই তোমার ভাগ্য বাঁধা পড়ে গেছে। চলো, একসঙ্গেই নরকে যাই আমরা।'

'দুঃখিত, অ্যারেঞ্জমেন্টটা পছন্দ হচ্ছে না আমার,' বলল রানা। 'একাই নরকে যেতে হবে আপনাকে।'

সজোরে ইটালিয়ান-টাইকুনের বুকে লাথি হাঁকল ও। প্রচণ্ড আঘাতে কয়েক পা পিছিয়ে গেল মানসিনি... আর তখুনি বুঝতে পারল রানার কথার মর্মার্থ। সিন্দুকের শাফটটার দিকে পিঠ দিয়ে ছিল সে, লাথি খেয়ে চলে এসেছে মুখের কিনারে। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের জন্য টলমল করল দু'পা, তারপরই চিৎ হয়ে পঞ্চাশ ফুট গভীর গর্তটাতে পড়ে গেল প্রতাপশালী ধনকুবের।

'আ...আ...আ...আ...' শাফটের দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলল তার আর্তচিৎকার।

'মাটিতে শুয়ে পড়ো সবাই!' চেঁচাল রানা, ডাইভ দিল মাটিতে, দেখাদেখি ঝাঁপ দিল পিটের প্রতিটা মানুষ। শ্রমিকদের মুঠো থেকে মুক্তি পেয়ে দড়ি-বাঁধা সিন্দুকটা সোজা নেমে গেল শাফটের ভিতরে... মানসিনির পিছু পিছু।

পঞ্চাশ ফুট তলায় সজোরে আছড়ে পড়ল ইটালিয়ান টাইকুন, শরীরের সবক'টা হাড় ভেঙে গেল তার। বিস্ময়ের ব্যাপার, সঙ্গে সঙ্গে মরল না সে; আরও কয়েক সেকেণ্ড বেঁচে রইল সিন্দুকটাকে নিজের উপর নেমে আসতে দেখার জন্য... তার পরম আরাধ্য হীরাসহ! ভারী বাক্সটার আঘাতে থেঁতলে গেল তার দেহ। এরপরেই ফাটল সি-ফোর বোমাটা।

রকেট একজস্টের মত শাফটের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল একটা আগুনের ধারা। পুরো চেম্বার কেঁপে উঠল শকওয়েভের ধাক্কায়। আগুনটা মিলিয়ে যেতেই ধসে পড়ল শাফটের দেয়াল, মেঝের পঞ্চাশ ফুট নীচে কবর হয়ে গেল মার্সেলো মানসিনির ছিন্নভিন্ন দেহ আর দু'হাজার ক্যারাট হীরার।

শকওয়েভটা কেটে যেতেই উঠে দাঁড়াল রানা, একে-ফোরটি সেভেনটা তাক করল ওয়ালেস মায়ার আর সুদানিজ গার্ডদের দিকে। ওরা যার যার অস্ত্র তোলার চেষ্টা করছিল, থমকে গেল রানার গম্ভীর হুমকি শুনে।

'সাবধান! তোমাদের প্রাক্তন বসের সঙ্গী হবার ইচ্ছে না থাকলে নোড়ো না কেউ!'

কার্নিশ থেকে নেমে এল কমাণ্ডোরা, নিরস্ত্র করল বন্দিদের, তারপর হাত-পা বেঁধে ফেলল। একটু পরেই ওয়ার্কিং পিটে হাজির হলো দিনা। ওকে এন্ট্রান্সের কাছে রেখে এসেছিল রানা, বিস্ফোরণের শব্দ পেয়ে ছুটে এসেছে।

কাছে এসে আশপাশে চোখ বোলাল ও, উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল, 'কী হয়েছে এখানে? মানসিনি কোথায়?'

'ওয়ান-ওয়ে টিকেট কেটে পরপারের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে,' ঠাট্টা করে বলল রানা। 'আর আমাদেরকে জ্বালাতে আসবে না।'

'তা হলে সব শেষ? দুঃস্বপ্নটা থেকে মুক্তি পেয়েছি আমরা?'

'আমার তা-ই ধারণা...' বলতে বলতে থমকে গেল রানা। কড়াৎ করে একটা তীক্ষ্ণ শব্দের সঙ্গে একটা গুলি এসে বিঁধেছে ওর পায়ের কাছে। চোখ তুলতেই দেখল, কার্নিশে চারজন সশস্ত্র মানুষ উদয় হয়েছে, হাতের রাইফেল তাক করেছে ওদের দিকে।

ইজরায়েলি টিম!

'হ্যালো, মি. রানা!' ভেসে এল ইয়াশাদের গলা। 'কী সৌভাগ্য, তাই না? শেষ পর্যন্ত দেখা হলো আমাদের!'

নিচু গলায় ভাগ্যকে গালমন্দ করল রানা। ওদের কথা ভুলেই গিয়েছিল। কল্পনাই করেনি, কমাণ্ডোরা উপত্যকার দখল নেবার পরও এরা রয়ে যেতে পারে।

'হোয়াট দ্য হেল!' বলে উঠল ক্যাপ্টেন মাহমুদ। 'এরা আবার কারা, স্যর?'

জবাব না দিয়ে ইয়াশাদের দিকে তাকাল রানা। 'তোমরা যাওনি এখনও?'

'যে-জিনিসের জন্য এসেছি, সেটা ছাড়া যাই কী করে, বলুন?' বলল ইয়াশাদ।

'আর্ক-টার কথা বলছ? ওটার আশা ছেড়ে দিতে হবে সবার। এখন আর

ওটা উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় তোমাদের পক্ষে। সবচেয়ে বড় কথা, জিনিসটা খনির ভিতরে আছে কি না, সেটাই শিয়োর হবার উপায় নেই।'

'ওয়েল... ওয়েল, দেখা যাচ্ছে আপনাকে আণ্ডার-এস্টিমেট করে ভুল করেছিলাম আমরা। আর্কের কথা জানেন আপনি। ভালই হলো, আর লুকোচুরির প্রয়োজন নেই।'

'ঠিক বলেছ। লেজ তুলে এবার চম্পট দাও, বাছা। বুঝতে পারছি, বাইরের কমাণ্ডোদের ফাঁকি দিয়ে ঢুকেছ এখানে, কিন্তু সেটা একটা বিরাট বোকামি হয়েছে। ওরা এসে পড়লে ফাঁদে পড়া ইঁদুরের দশা হবে তোমাদের।'

'চিন্তা করবেন না, পিছন থেকে আমাদের উপর হামলা চালাবার কোনও সুযোগই পাবে না ওরা,' ইয়াশাদ বলল। 'ওদেরকে ব্যস্ত রাখার আয়োজন করে এসেছি আমরা।'

টেরোরিস্ট নেতার কথাটাকে সত্য প্রমাণের জন্যই যেন খড় খড় করে উঠল ক্যাপ্টেন মাহমুদের রেডিও। খনির বাইরে থেকে ওর ডেপুটি জানাল, 'স্যর, উই আর আণ্ডার অ্যাটাক! দুটো সুপার স্ট্যালিয়ন হেলিকপ্টার উদয় হয়েছে কোত্থেকে যেন, ভারী অস্ত্রশস্ত্র-সহ ট্রুপস্ আছে ওগুলোতে, আমাদের দিকে ফায়ার করছে! আমাদের ব্যাকআপ দরকার!'

'যতক্ষণ পারো, ঠেকাও ওদেরকে,' তিক্ত গলায় বলল মাহমুদ। 'আমরা নিজেরাও এখানে বেকায়দায় আছি।'

'কী হয়েছে?'

'পরে জানাব। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

কমিউনিকেশনটা শুনতে পেয়েছে রানা। ইয়াশাদকে বলল, 'ইয়োরাম রাবাক তা হলে ফোর্স পাঠিয়েছে? আন্তর্জাতিক একটা কেলেঙ্কারি বাধাতে চলেছে সে, এটা জানে?'

'সবকিছুই জানেন তিনি,' ইয়াশাদ বলল। 'এনিওয়ে, যথেষ্ট কথা হয়েছে। আপনারা সবাই অস্ত্র ফেলুন।'

পরিস্থিতির প্রতিকূলতা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না রানার। হাই-গ্রাউণ্ডে রয়েছে প্রতিপক্ষ, ওদের দিকে গুলি ছুঁড়ে লাভ হবে না। শুয়ে পড়ে কার্নিশটাকেই কাভার হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে তারা। অন্যদিকে ওরা রয়েছে একেবারে খোলা জায়গাতে, কাভার নেবার মত তেমন কিছুই নেই আশপাশে। উপায়ান্তর না দেখে হাতের রাইফেলটা ফেলে দিল রানা, ক্যাপ্টেন মাহমুদকেও ইশারা করল একই কাজ করতে।

হতাশা ফুটল কমাণ্ডো লিডারের চেহারায়, তবে নির্দেশটা পালন করতে দ্বিধা করল না। দলের বাকিদের দিকে ইশারা করে নিরস্ত্র হলো সে। পরবর্তী কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে অন্যেরাও। ইয়াশাদ সন্তুষ্ট গলায় বলল, 'দ্যাটস্ গুড। এবার, মি. রানা, আপনি চলে আসুন এখানে।'

'কেন?'

'আমার ধারণা, খনির ভিতরটা খুব ভাল করে ঘুরেছেন আপনি। আর্কটা কোথায় আছে, তাও জানেন। চলুন, ওটা দেখিয়ে দেবেন।'

'কানে কম শোনো নাকি?' বিরক্ত গলায় বলল রানা। 'বললাম না, ওটা এখানে আছে কি না, সে-ব্যাপারেই শিয়োর না আমি? দেখাব কোথেকে?'

'ধোঁকা দেবার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই, মি. রানা,' কড়া গলায় বলল ইয়াশাদ। 'উঠে আসুন বলছি! নইলে আপনার সঙ্গী-সাথীদেরকে একে একে গুলি করতে শুরু করব আমি।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা, এদের সঙ্গে তর্ক করে লাভ হবে না। র‍্যাম্প ধরে কার্নিশে উঠে এল ও। দক্ষ হাতে ওর শরীর তল্লাশি করল ইয়াশাদ, তারপর বলল, 'চলুন, যাওয়া যাক।'

'আমার ন্যাপস্যাকটা লাগবে,' জানাল রানা। 'ওটার মধ্যে দরকারি জিনিসপত্র আছে।'

'কোথায় ওটা?'

ইশারায় দিনাকে দেখাল রানা, ন্যাপস্যাকটা ওর পিঠে ঝুলছে। হাতছানি দিয়ে ওটা নিয়ে আসতে বলল ইয়াশাদ। কার্নিশে উঠে ওটা টেরোরিস্ট লিডারের হাতে তুলে দিল দিনা। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকাল রানার দিকে।

'চিন্তা কোরো না,' রানা অভয় দিল। 'সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'নীচে ফিরে যাও!' দিনাকে হুকুম করল ইয়াশাদ, তারপর তিন সঙ্গীকে বলল, 'তোমরা এখানেই থাকো। কেউ হাই তুললেও গুলি চালাবে, ক্লিয়ার? আমি আর্কটা দেখে আসছি।' রানার দিকে ফিরল। 'চলুন।'

পিঠে রাইফেলের খোঁচা খেয়ে হাঁটতে শুরু করল রানা।

টানেল ধরে এগোল দুজনে, প্রাচীন খনির স্টেজিং এরিয়ায় যাবার পথটার সামনে এসে থামল। তলায় সৃষ্টি হওয়া ছোট্ট ফোকরটা দেখাল রানা, বলল, 'ওখান দিয়ে ঢুকতে হবে।'

হেসে উঠল ইয়াশাদ। 'আমাকে বোকা পেয়েছেন আপনি? ফোকর দিয়ে ঢুকতে গিয়ে অসহায় হয়ে পড়ব, আর সে-সুযোগে আপনি আমাকে আক্রমণ করবেন... এটুকু বুঝি না আমি? নো ওয়ে, মি. রানা। ঢোকার অন্য কোনও কায়দা থাকলে বলুন।'

'জানতাম, এ-কথাই বলবে তুমি,' বলল রানা। 'সেজন্যই ন্যাপস্যাকটা আনতে চেয়েছি। ওটাতে ডিনামাইট আর ফিউয আছে—দাও আমাকে। পথটা বড় করতে হবে।'

'ডিনামাইট?' ভুরু কোঁচকাল ইয়াশাদ। সন্দিহান হয়ে উঠেছে।

'ডোন্ট ওয়ারি,' লোকটার চিন্তাধারা বুঝতে পেরে বলল রানা। 'ডিনামাইট ফাটিয়ে তোমাকে মারতে গেলে আমি নিজেও মরব। তবে দুঃখের বিষয়... তোমার মত একটা নরকের কীটের জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দেবার কোনও ইচ্ছে নেই আমার।'

তীক্ষ্ণ চোখে রানার মুখের ভাব পরীক্ষা করল ইয়াশাদ, কিন্তু তাতে কোনও ভণিতা দেখতে পেল না। ন্যাপস্যাকটা নামিয়ে মাটিতে রাখল সে, পিছিয়ে গেল দু'পা। বলল, 'ভিতরের সবকিছু মাটিতে ঢালো, তারপর তুলে নাও কী দরকার।'

লোকটার সতর্কতা দেখে মনে মনে তারিফ না করে পারল না রানা, কাজেকর্মে কোনও রকম ভুলচুক নেই। অত্যন্ত চালু এবং অভিজ্ঞ। অবশ্য তাতে ওর কিছু যায়-আসে না, ও যে-প্ল্যানটা করেছে, সেটা বুঝতে হলে অন্য ব্যাপারে অভিজ্ঞতা দরকার।

ন্যাপস্যাকটা খালি করে দুটো ডিনামাইট নিল রানা, আর একটা স্লো-বার্নিং ফিউয। ওগুলো সেট করল দেয়ালের গোড়ার ফোকরে, ইয়াশাদের সতর্ক দৃষ্টির সামনে। বিস্ফোরক সেট করা হলে ফিউযের তার টেনে নিয়ে এল কয়েক গজ দূরে, টানেলের ভিতরদিকে। এরপর দুজনে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল কাভার নেবার জন্য।

'আগুনটা কে জ্বালবে?' রানা জিজ্ঞেস করল। 'তুমি, না আমি?'

পকেট থেকে একটা লাইটার বের করে দিল ইয়াশাদ। 'তুমিই জ্বালাও।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ফিউযে আগুন ধরাল রানা, ধীরে ধীরে ওটা পুড়তে শুরু করল... ছোট হয়ে ক্রমশ পৌঁছে যাচ্ছে ডিনামাইট দুটোর দিকে। বিড়বিড় করে প্রার্থনা করল রানা, প্ল্যানটা যেন কাজে লাগে, নইলে সর্বনাশ হবে!

কয়েক সেকেণ্ড পরেই ঘটল বিস্ফোরণ, আগুনের আভায় ঝলসে গেল টানেলটা, তারপরই ভেসে এল বিশ্রী একটা মড়মড় আওয়াজ। পিঠটা একটু দেবে গেল ইয়াশাদের, বিস্মিত হয়ে টের পেল—পিছনের দেয়ালটাতে ফাটল ধরেছে। বিপদের গন্ধ পেল সে, তাড়াতাড়ি রাইফেল দিয়ে খোঁচা দিতে চাইল রানাকে... কিন্তু কোথায় ও? চোখ পিটপিট করে তাকাতেই বাঙালি স্পাইটাকে দেখতে পেল—বিস্ফোরণের আওয়াজ আর আলোতে একটু বেসামাল হয়ে পড়েছিল ইয়াশাদ, সেই সুযোগে লাফ দিয়ে কয়েক গজ দূরে সরে গেছে রানা, ওর দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছে!

কী ঘটছে বুঝতে পারল না টেরোরিস্ট নেতা; কিন্তু গড়বড় যে আছে, তাতে তার কোনও সন্দেহ নেই। তীব্র ক্রোধ নিয়ে রাইফেলটা প্রতিপক্ষের দিকে তাক করল, কিন্তু ট্রিগার চাপার আর সময় পেল না। হুড়মুড় করে পাশ থেকে টানেলের দেয়ালটা ধসে পড়ল তার গায়ে, অবলম্বন হারিয়ে নেমে এল ছাদেরও একাংশ। মেঝের উপর কাত হয়ে পড়ে গেল ইয়াশাদ, হাত থেকে ছুটে চলে গেল রাইফেলটা। ভারী পাথরের তলায় বুক পর্যন্ত চাপা পড়ে গেল তার, হাড়-গোড় ছাতু হয়ে গেল, ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল সে।

পাথরধস স্থির হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা, তারপর ধীর পায়ে হেঁটে ইয়াশাদের সামনে এসে দাঁড়াল। ব্যথায় ককাতে থাকা শত্রুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'বুঝতে পারছি, আর যা-ই হও, বোমা সম্পর্কে কিছুই জানো না তুমি।' ডিনামাইটটা একটু কৌশল খাটিয়ে সেট করেছিল ও, যাতে এ-পাশের দেয়ালটা শকওয়েভে ভেঙে পড়ে। ইয়াশাদ সেটা বুঝতে পারেনি। মেঝে থেকে রাইফেলটা তুলে নিল রানা। মাজলটা ঠেকাল ইয়াশাদের মাথায়। 'অনেক মানুষ খুন করেছ তোমরা, আমার খুব প্রিয় একজন বন্ধুর ওপর অমানুষিক নির্যাতনও চালিয়েছ। এটা তার প্রতিদান।'

ট্রিগারটা চেপে দিল ও।

[illegible] চোখ তুলতেই কার্নিশের উপর তিন ইজরায়েলিকে নেতিয়ে পড়তে দেখল। কয়েক মুহূর্ত পর সেখানে উদয় হলো রানা। কাউকে আনন্দ-উল্লাসের সময় দিল না ও, চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল, 'মাহমুদ, তাড়াতাড়ি এসো! বাইরের ওদের সাহায্য দরকার!'

অস্ত্র তুলে নিল কমাণ্ডোরা। রানার পিছু পিছু ছুটে বেরিয়ে এল খনি থেকে। কিন্তু মাইনিং ক্যাম্পে পৌঁছেই বিস্মিত হতে হলো ওদেরকে। সাহায্যের প্রয়োজন ছিল না, ইতোমধ্যেই ট্রাক আর জিপে চড়ে পুরো এক ব্যাটালিয়ন ইরিত্রিয়ান সৈন্য পৌঁছে গেছে ওখানে। ওদের চোখের সামনে দুটো অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফট মিসাইল ছোঁড়া হলো মাটি থেকে, ক্যাম্পের উপর উড়তে থাকা ইজরায়েলি সুপার-স্ট্যালিয়ন কপ্টারদুটোকে আঘাত করল ওগুলো।

চোখের পলকে দুটো আগুনের গোলা জ্বলে উঠল আকাশে। গোত্তা খেয়ে উপত্যকার মেঝেতে নেমে এল কপ্টারদুটো, বিস্ফোরিত হলো। হল্লা করে উঠল সৈন্যরা সেই দৃশ্য দেখে।

একটু পরেই সশস্ত্র দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে এক উচ্চপদস্থ অফিসার হাজির হলেন ওদের সামনে, তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে খুব পরিচিত একজন মানুষ... আবেল আফরাকি। কাছে এসেই রানাকে জড়িয়ে ধরল সে। তারপর পরিচয় করিয়ে দিল, 'মি. রানা, ইনি জেনারেল বারহান নাগাসি।'

করমর্দন করলেন জেনারেল। বললেন, 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম, মি. রানা। আসার আগে অনেক কিছু শুনে এসেছি... তার সিকিভাগও যদি সত্যি হয়ে থাকে, তা হলে বলব—আপনি আমাদের দেশের ভাগ্য পাল্টে দিয়েছেন!'

'ওসব কথা কেউ বলে থাকলে বাড়াবাড়ি করেছে,' বলল রানা। 'আমি শুধু একটা খনি খুঁজে বের করেছি। ভাগ্য পাল্টানোর ব্যাপারটা নির্ভর করছে আপনারা এটাকে কীভাবে ব্যবহার করেন, তার উপর।'

'ওটা আপনার বিনয়,' বললেন জেনারেল। 'এনিওয়ে, এখন কী করতে হবে... তা-ই বলুন। অবস্থা দেখে তো মনে হচ্ছে না, কিছু বাকি রেখেছেন আমাদের জন্য। দুঃখিত, আসলে এর চাইতে দ্রুত পৌঁছুনো সম্ভব ছিল না আমাদের পক্ষে।'

'দুঃখ পাবার কিছু নেই,' রানা বলল। 'কঠিন একটা কাজ আছে আপনাদের জন্য... খোঁড়াখুঁড়ির কাজ। চল্লিশজন রিফিউজি আটকা পড়ে আছে মাটির তলায়, প্রথমে ওদেরকে বের করে আনতে হবে। আমি ম্যাপ এঁকে দিচ্ছি।'

'এখুনি উদ্ধারের ব্যবস্থা করা হবে। আমি লোক ডাকছি।' উল্টো ঘুরে চলে গেলেন জেনারেল।

কাঁধে একটা নরম হাত পড়ল। উল্টো ঘুরে দিনার মুখোমুখি হলো রানা। মেয়েটা কিছু বলার আগেই বলল, 'হ্যাঁ, এবার শেষ হয়েছে দুঃস্বপ্নটা।'

'আর আমাদের যে ছুটি কাটাতে যাবার কথা ছিল?' দিনা ভুরু নাচাল।

হয়ে... ট্রাভেল এজেন্টকে এখনও টিকেটের কথা বলতে পারিনি। তোমার কাছে ফোন আছে?'

হেসে রানাকে জড়িয়ে ধরল দিনা।

চব্বিশ

মাসাদা, ইজরায়েল। মধ্যরাত।

যে-এলাকার প্রতিটা ভবন, প্রতিটা পাহাড়... এমনকী প্রতিটা গুহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে, সেখানেও রাজা হেরডের দুর্গটার রয়েছে আলাদা একটা সম্মান। মাসাদার উপকূলে হীরক-আকৃতির একটা পাহাড়ের ডগায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ওটা, ওখান থেকে চারপাশের এক অপূর্ব দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। পাহাড়টার ছায়াতে পড়ে আছে ডেড সি—পৃথিবীর গভীরতম জায়গা... সমুদ্র-সমতল থেকে এক হাজার ফুট নিচু ওটার সারফেস। পানিটা এতই লবণাক্ত যে, ঢেউ-টেউ ওঠে না কখনও, দূর থেকে জমাট ভূমি বলে মনে হয়। উপকূলীয় মাটির সঙ্গে পার্থক্য করা খুবই কঠিন।

মাসাদাকে দুর্ভেদ্য একটা ঘাঁটি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল কয়েক হাজার বছর আগে। তবে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো, সামরিক গুরুত্বের বদলে ওটা রাজা হেরডের অবকাশ যাপনের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। নগরটার চাকচিক্য ধরে রাখার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ও প্রচেষ্টা ছিল তুলনাহীন। দুটো প্রাসাদ আছে এখানে, আর আছে বিশাল এক সুইমিং-পুল... এই মরু-পরিবেশেও ওটা কখনও শুষ্ক থাকে না। তবে স্থাপত্য- বৈশিষ্ট্যের কারণে ঐতিহাসিক গুরুত্ব পায়নি এই নগরী; পেয়েছে প্রথম শতাব্দীর এক রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের কারণে। গোঁড়া ইহুদি যিলট-রা বিদ্রোহ করে বসেছিল তাদের রোমান মনিবদের বিরুদ্ধে... এখানেই যুদ্ধ করেছিল তারা।

বিদ্রোহের সময় মেনাচেন বেন ইয়োদা-র দখলে ছিল মাসাদা, হয়ে উঠেছিল ইহুদি যিলটদের এক অভয়াশ্রম। চার বছরের যুদ্ধ, এবং তিনবার হাত বদলের পর এ-নগরীতেই চূড়ান্ত সংগ্রাম করে ওরা। মরণপণ লড়াই শেষে যখন রোমান-রা বিজয়ীর বেশে নগরে প্রবেশ করে, তখন ওখানে বিশাল একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বলছিল... মানুষের অগ্নিকুণ্ড! পরাজিত যিলট-রা ধরা না দিয়ে আগুনে আত্মাহুতি দিয়েছিল।

জেরুসালেমের পশ্চিম প্রাচীরের মত তাই মাসাদাও ইহুদি ধর্মের ইতিহাসে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান। তীর্থপিঠের মর্যাদা পেয়েছে প্রাচীন এ-নগরীর ধ্বংসাবশেষ। প্রতি বছর হাজার হাজার তীর্থযাত্রী আসে এখানে। এমনকী ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সের সমস্ত নবীন সদস্যদের শপথ-গ্রহণের অনুষ্ঠানটাও পরিচালনা করা হয় মাসাদার ত্রিশ একরের পুণ্যভূমিতে; ওদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় ইহুদি জাতির গৌরবোজ্জ্বল অতীত।

ঠিক এই কারণেই মেজাজটা খিঁচড়ে রয়েছে ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী লিওনিদ হালপেরিনের। সরকারি ছাপ্পর-মারা একটা *অ্যারোস্প্যাশিয়া* হেলিকপ্টারে বসে আছেন তিনি, ধীরে ধীরে নীচে নামছে ওটা। ল্যাণ্ডিং লাইটের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ধুলোময় মালভূমিটার উপরিভাগ। প্রচণ্ড রেগে আছেন হালপেরিন, ইয়োরাম রাবাকের মত একটা কাপুরুষের কোনও অধিকার নেই এমন পবিত্র একটা জায়গাকে কলুষিত করবার। অথচ আত্মসমর্পণের স্থান হিসেবে মাসাদাকেই বেছে নিয়েছে লোকটা... একে ধৃষ্টতা ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে?

ইরিত্রিয়ায় ইজরায়েলি এয়ারফোর্সের দুটো হেলিকপ্টার ধ্বংস হবার পর পরই উধাও হয়ে গেছে ইয়োরাম রাবাক। স্বাধীন একটা দেশের ভিতর বিনা উস্কানিতে... সেই সঙ্গে সরকারি অনুমতি ছাড়া সশস্ত্র হামলা চালাবার নির্দেশ দিয়ে আন্তর্জাতিক সঙ্কট সৃষ্টি করেছে লোকটা; এরপর তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে কোনও বাধা ছিল না হালপেরিনের। প্রতিরক্ষা-মন্ত্রীকে গ্রেফতারের জন্য শিন-বেটকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ধুরন্ধর লোকটা ব্যাপারটা টের পেয়ে সটকে পড়ে। বেশ কয়েকদিন কেটে গেছে রাবাকের গায়েব হবার পর, শিন-বেট বহু চেষ্টা করেও তার নাগাল পায়নি এখনও। তবে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাবাক ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে পড়ছে, পিঠ বাঁচানোর জন্য তার প্রাক্তন সহকারী এবং অনুসারীরা দল পাল্টে ফেলছে... বাঁচার আর উপায় নেই তার। শেষ পর্যন্ত আজ সকালে নিজেই ফোন করেছে সে প্রধানমন্ত্রীর কাছে, আত্মসমর্পণ করবার প্রস্তাব নিয়ে। তবে একটাই শর্ত ওর—হালপেরিনকে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হতে হবে ওকে গ্রেফতার করবার জন্য। শর্তটা মেনে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। রাবাকের মত একটা পাগলা কুকুরকে চোদ্দশিকের ভিতরে ভরার জন্য একটু ঝুঁকি নিতে পিছপা হননি তিনি।

রোটরের বাতাসে ভূমি থেকে পাক খেয়ে ওঠা ধুলোর মেঘের মাঝখানে ধীরে ধীরে ল্যাণ্ড করল *অ্যারোস্প্যাশিয়া* হেলিকপ্টারটা। চারপাশের অনেকখানি জায়গা ঢাকা পড়ে গেল উড়তে থাকা সেই ধুলোর আড়ালে, কপ্টারের পাখাগুলোর ঘূর্ণন বন্ধ হবার পরও বেশ কিছুক্ষণ ভাসতে থাকল বাতাসে। লাফ দিয়ে কপ্টার থেকে নামল দুজন সশস্ত্র দেহরক্ষী—চোখে নাইট-ভিশন, হাতে এমপি-সেভেন সাবমেশিনগান। সতর্ক চোখে চারপাশটা দেখে নিল তারা, বুঝে নিতে চাইছে—অ্যামবুশ পাতা হয়েছে কি না।

সিটবেল্ট খুলে ওদের পিছু পিছু নামলেন লিওনিদ হালপেরিন। একজনের পিঠে হাত রেখে বললেন, 'রিল্যাক্স, আমাকে খুন করতে চাইলে এখানে কপ্টারটাকে ল্যাণ্ড-ই করতে দিত না রাবাক।'

'তারপরও, সার, ব্যাপারটা আমাদের পছন্দ হচ্ছে না,' পরিষ্কার গলায় বলল দেহরক্ষী। 'এভাবে নির্জনে... গোপনে আপনাকে আসতে বলা হয়েছে কেন? আরও কিছু লোক আনলেই বা কী ক্ষতি হতো?'

'মানুষের মন বড় বিচিত্র,' হাসলেন হালপেরিন। 'লোকজনের সামনে আত্মসমর্পণ করতে হয়তো লজ্জা লাগছে ওর।'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল দুই রক্ষী। যুক্তিটা মেনে নিতে পারছে না।

ওদের দ্বিধাটাকে গ্রাহ্য না করে হালপেরিন বললেন, 'তোমরা এখানেই থাকো। হেরডের প্রাসাদের ওপরের টেরেসে আমার সঙ্গে দেখা করার কথা ওর। চিন্তা কোরো না, খুব শীঘ্রি ফিরব।'

একটা ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে উত্তরমুখী পথ ধরে হাঁটতে শুরু করলেন তিনি। চারপাশে ঘন অন্ধকার, পা ফেলার তালে তালে নড়তে থাকা আলোকরশ্মিটা চিরে দিচ্ছে সেই অন্ধকার। একটু পরেই প্রাচীন রোমান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙের ভাঙা দেয়ালের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী। মেজাজ ধীরে ধীরে শান্ত হতে শুরু করেছে আবহাওয়ার কারণে। রাতটা উষ্ণ, তবে জোর বাতাস বইছে... সাগরের দিক থেকে উড়ে আসছে জলীয় বাষ্প। লিওনিদ হালপেরিনের চুল উড়ছে সে-বাতাসে।

হেরডের প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপে পৌঁছে গেলেন তিনি। ধুলোয় ছাওয়া সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলেন টেরাসে। মালভূমির একেবারে প্রান্তদেশে ওটা, পাহাড়ের কিনারা পেরিয়ে শূন্যে মাথা বের করে রেখেছে প্রতিকায় কোনও জাহাজের গলুইয়ের মত। অন্ধকারে কিছু ঠাহর করা যায় না, তবে দ্বিতীয় একজন মানুষের উপস্থিতি ঠিকই অনুভব করতে পারলেন হালপেরিন।

'আমি জানতাম তুমি আসবে।' পিছন থেকে ভেসে এল একটা পরিচিত কণ্ঠ।

ঘুরলেন না হালপেরিন, সামনের শূন্যতার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'এই পবিত্র জায়গাটাকে কলুষিত না করলেই কি তোমার চলছিল না, ইয়োরাম? তোমার স্পর্শ... তোমার পায়ের ছাপ... এ-পুণ্যভূমির জন্য একটা কলঙ্ক!'

'কলুষিত করেছি? আমি?' হেসে উঠলেন ইয়োরাম রাবাক। 'ভালই বলেছ বটে!'

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালেন হালপেরিন, ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেললেন রাবাকের মুখে। গলায় ক্রোধ ফুটল তাঁর। 'এই মাসাদা যা-কিছুর প্রতিনিধিত্ব করছে, তা তুমি ধ্বংস করে দিচ্ছিলে!'

'ধ্বংস? না লিওনিদ, আমি বরং সবকিছুকে আবার জাগিয়ে তুলতে যাচ্ছিলাম। আমাদের ধর্মের সবচেয়ে পবিত্র নিদর্শনটাকে ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছিলাম ইজরায়েলের মাটিতে।' আলোর মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন রাবাক। অনুতপ্ত ভঙ্গিতে নয়, গর্বিত ভঙ্গিতে। পরিষ্কার, নিভাঁজ একটা ইউনিফর্মও রয়েছে তাঁর পরনে। লোকটার এই অবয়বের পাশে নিতান্তই একজন তুচ্ছ বৃদ্ধের মত দেখাল হালপেরিনকে।

প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'বড়াই করে লাভ নেই কোনও, ইয়োরাম। তোমার ওই স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।'

রাবাক হাসলেন। 'তোমার তা-ই ধারণা? এতটা অন্ধ বলে তো মনে হয় না তোমাকে। ভেবেছ এতদিন যা করেছি, তা আমার একার কার্যকলাপ? না লিওনিদ, আরও অনেক লোক জড়িত এর সঙ্গে—ক্ষমতাবান নারী-পুরুষ... যাদের অনেকে তোমার সরকারের ভিতরেই আছে। এবার আমরা ব্যর্থ হলাম

বটে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আবার আমরা চেষ্টা করব না। এই আমি বলে দিচ্ছি—আর্কটা আমরা খুঁজে বের করবই, জেরুসালেমের মহামন্দিরও আবার দাঁড় করাব। আর তারপর... নিশ্চিহ্ন করে দেব গোটা প্যালেস্টাইন আর মুসলিম জাতি-কে! তুমি আমাদেরকে ঠেকাতে পারবে না!'

'হয়তো পারব না,' স্বীকার করলেন হালপেরিন। 'কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না। প্রতীক তখনই ক্ষমতাবান হয়, যখন জনগণ ওটাকে ক্ষমতা দেয়। তোমার কি ধারণা, আর্কটা পেলেই তুমি সমস্ত লক্ষ্য পূরণ করে ফেলতে পারতে? হ্যাঁ, উত্তেজনা সৃষ্টি হতো বটে... কিন্তু কতদিন টিকত সে-উত্তেজনা? পত্রিকার পাতায় নতুন কোনও যুদ্ধ, কিংবা নতুন কোনও স্ক্যাণ্ডালের খবর বেরুনো পর্যন্ত! বোকার স্বর্গে বাস করছ তুমি, ইয়োরাম। আজকালকার মানুষ প্রতীকে বিশ্বাস করে না। ওরা চায় বাস্তব উদাহরণ।'

'ভুল!' গর্জে উঠলেন রাবাক। 'এখনই বরং ওদের সামনে আমাদের প্রতীক তুলে ধরা দরকার সবচেয়ে বেশি। পুরো দুনিয়া ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে, লিওনিদ। আমেরিকানরা বিভাজন নীতিতে দুর্বল করে দিচ্ছে সবাইকে। একই ধর্ম... একই জাতির মাঝে তাই সৃষ্টি হচ্ছে বিভেদ, নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে লড়ছি আমরা। এখন আর্ক অভ দ্য কাভানেন্টের মত একটা প্রতীকই প্রয়োজন আমাদের... যাতে দুনিয়ার সমস্ত ইহুদিকে মনে করিয়ে দেয়া যায়—আমরা কারা, কী আমাদের ঐতিহ্য!'

'হ্যাঁ, হয়তো ঠিকই বলেছ। কিন্তু যে-পদ্ধতিতে তুমি এগিয়েছ, তা সঠিক ছিল না।'

'লিওনিদ, আমাদের বন্ধুত্বের খাতিরে...'

'দাঁড়াও,' বাধা দিলেন হালপেরিন, 'আমরা কখনোই বন্ধু ছিলাম না। রাজনৈতিক একটা চাহিদা পূরণের গুটি ছিলে তুমি... তোমার সমর্থন ছাড়া কোয়ালিশনের সরকারটা গঠন করা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে। সে-কারণেই তোমাকে সহ্য করেছি এতদিন। ওটাকে তুমি বন্ধুত্ব ভাবলে ভুল করবে।'

সোজাসাপ্টা কথাটা শুনে একটু থতমত খেয়ে গেলেন রাবাক। নিজেকে সামলাবার জন্য অপেক্ষা করলেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'ঠিক আছে, বন্ধু নই আমরা। কিন্তু একসঙ্গে বহুদিন তো কাজ করেছি? এটুকু নিশ্চয়ই জানো—ইজরায়েলের ক্ষতি চাই না আমি। সেজন্যেই আজ রাতে এভাবে মিলিত হয়েছি আমরা। আমার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, লিওনিদ; এরপরও যদি রাজনীতিতে সক্রিয় থাকি, তাতে তোমার সরকার একটা বিব্রতকর অবস্থাতে পড়বে।'

'বাহ্! তুমি দেখি অন্যের কথাও ভাবতে জানো!' বিদ্রূপ করলেন হালপেরিন।

'ভেবো না আমি শুধু তোমার কথা বলছি,' রাবাক বললেন। 'শুনেছ তো, আমার আরও সঙ্গী-সাথী আছে। আমার প্ল্যানের বারোটা বেজে গেছে বলে ওদেরকে বিপদে ফেলা চলে না। তা হলে আমাদের আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যাবার মত আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।' হঠাৎ করে একটা পিস্তল উদয় হলো

ওটা এতক্ষণ কোমরের পিছনে একটা হোলস্টারে রাখা ছিল।
তাঁর হাতে, 'আমার সামনে এই একটাই পথ খোলা আছে।' পিস্তলটা নিজের কপালের পাশে ঠেকাতে গেলেন তিনি।

প্রচণ্ড একটা আওয়াজ হলো গুলির, ইয়োরাম রাবাক চিনচিনে ব্যথা অনুভব করলেন বুকে। চোখ নামাতেই ওখানে একটা ক্ষত দেখতে পেলেন, রক্ত বেরুচ্ছে কলকল করে। দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল তাঁর, পড়ে গেলেন হুড়মুড় করে, হাত থেকে ছুটে চলে গেল পিস্তলটা।

ধোঁয়া বেরুতে থাকা পয়েন্ট ফোর-ফাইভ অটোমেটিকটা পকেটে আবার ভরে ফেললেন হালপেরিন। সারাক্ষণই ওটা ডিফেন্স মিনিস্টারের দিকে তাক করে রেখেছিলেন তিনি, মুখের উপর ফ্ল্যাশলাইটের আলো পড়ায় দেখতে পাননি রাবাক। কয়েক পা এগিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ছাড়তে থাকা মানুষটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন প্রধানমন্ত্রী।

'তুমি প্রতীক হতে পারবে না, ইয়োরাম,' শান্ত গলায় বললেন তিনি। 'আত্মহত্যা করে ফ্যানাটিক অনুসারীদের চোখে আত্মত্যাগী দেশপ্রেমিক সাজতে দেব না তোমাকে। এই মাসাদাকে তোমার নোংরা আত্মার বিচরণভূমিও হতে দেব না আমি। তোমার স্থান নরকে। ওখানেই চলে যাও!'

পঁচিশ

মিশর। ভোর পাঁচটা দশ।

নীল নদ যে মানবসভ্যতার সূচনালগ্নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল, তার পিছনে অনেক কারণ আছে। প্রতি বছর এ-নদ বন্যার মাধ্যমে আশপাশের এলাকা ঢেকে দেয় উর্বর পলিমাটি দিয়ে, চাষাবাদকে করে তোলে অত্যন্ত সহজসাধ্য। এ-ছাড়াও উত্তরমুখী হয়ে বইছে জলধারাটা, বাতাস বয় দক্ষিণদিকে; ফলে পুরনো আমলের সওদাগরি জাহাজগুলো যে-কোনও দিকে সহজে যাতায়াত করতে পারত, ব্যবসা চলত নির্বিঘ্নে। চাষাবাদ আর ব্যবসা... দুটোই যদি ঠিকমত চলে, তা হলে সভ্যতার বিকাশ না হয়ে উপায় আছে?

বিলাসবহুল ইয়ট *ওয়াটার লিলি*-র ডেকে দাঁড়িয়ে নীল নদের সেই তনু-মনজুড়ানো বাতাস উপভোগ করছে মাসুদ রানা। চোখদুটো বন্ধ, এলোমেলো চুল বাঁধনহারা ভঙ্গিতে উড়ছে। আশ্চর্য এক পুলক ছড়িয়ে পড়ছে দেহ-মনে। ছোট একটা শর্টস ছাড়া আর কিছু নেই ওর পরনে, উন্মুক্ত ঊর্ধ্বাঙ্গে ফুটে আছে নানান রঙের কালসিটে দাগ, এখনও শ্বাস নিতে গেলে বুকের ভিতর খচ্ করে কী যেন বেঁধে। তবে থরো-চেকআপ করে ডাক্তার জানিয়েছেন, আঘাত কোনোটাই তেমন গুরুতর নয়, এমনকী মারকারি-পয়েজনিঙেও স্থায়ী কোনও ক্ষতি হয়নি দেহের। পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠাটা শুধু সময়ের ব্যাপার, সবচেয়ে জরুরি পথ্য হচ্ছে—বিশ্রাম। ছুটি।

বলা বাহুল্য, এ-ধরনের ডাক্তারি পরামর্শের পর সেটা মঞ্জুর হতে অসুবিধে হয় না। রানারও হয়নি, দিনারও না। দেশেই ফিরতে হয়নি কাউকে, ফ্যাক্স করে আসমারাতেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল ছুটি মঞ্জুরের সংবাদ। ব্যস, রানার পুরনো এক বন্ধুর ইয়ট নিয়ে দুজনে চলে এসেছে দিনার স্বপ্নের সেই নীল নদের বুকে। স্বপ্নময়, রোমান্টিক একটি সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে এরই মধ্যে।

নরম দুটো হাতের স্পর্শে ঘোর ভাঙল রানার, পিছন থেকে ওকে জাপটে ধরেছে দিনা—পরনে স্রেফ একটা টু-পিস বিকিনি... আছে কি নেই, হাত বোলাতে গিয়ে শুধু চামড়ার স্পর্শই পাওয়া গেল, পরিধেয়-র নয়। কানের কাছে ফিসফিস করে মেয়েটা বলল, 'এ ভারি অন্যায়, রানা। আমাকে ফেলে একা-একা এই সুন্দর পরিবেশটা এনজয় করছ!'

'ডাকলে কি তোমার ডেইলি রিপোর্ট বাদ দিয়ে আমার সঙ্গে বাতাস খেতে আসতে?' হাসল রানা।

বিস্ময় ফুটল দিনার চেহারায়। 'আমি কখন তেল-আবিবে রিপোর্ট পাঠাই, তা তুমি জানো?'

'জানব না কেন?' ওর দিকে ফিরল রানা। 'একটা মিনিয়েচার ট্রান্সমিটার আছে তোমার কাছে, বাথরুমে গিয়ে জানালা দিয়ে ওটার অ্যান্টেনা বের করো, তারপর আইডেন্টিফিকেশন কোড...'

'হয়েছে, আর বলতে হবে না,' রানাকে বাধা দিল দিনা। 'কিন্তু এসব তুমি জানলে কী করে...' বলতে বলতে থমকে গেল ও। 'ওহ্ গড! তুমি... তুমি...'

'একজন স্পাই,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল রানা। 'কী করব বলো? এটাই আমার নেশা ও পেশা!'

'দুষ্টু কোথাকার!' রানার বুকে কিল বসাল দিনা। ওকে জড়িয়ে ধরল রানা, চুমু খেল ঠোঁটে।

আবেশে চোখদুটো বন্ধ হয়ে গেছে দিনার। রানা মুখ তুলতেই ফিসফিস করে বলল, 'থেমো না!'

'উঁহুঁ,' রানা মাথা নাড়ল। 'আগে ওদিককার খবরাখবর জানাও। আমরা চলে আসার পর কী ঘটল, সেটা জানার জন্য অস্থির হয়ে আছি আমি।'

একটু হেসে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল দিনা। দুটো ডেক-চেয়ার টেনে বসল ওরা মুখোমুখি।

'আগে খারাপ খবরটাই শোনাই,' বলল দিনা। 'আমরা যে-চল্লিশজন রিফিউজিকে খনির ভিতরে রেখে এসেছিলাম, ওদের মধ্যে দুজন মারকারি-পয়েজনিঙে মারা গেছে। কষ্ট পেয়ো না, তোমার আসলে কিছু করার ছিল না... অন্যদের চাইতে শারীরিক অবস্থা দুর্বল ছিল ওদের। বাকিদেরকে সুস্থ অবস্থায় বের করে আনা সম্ভব হয়েছে।'

'হুম! ওয়ালেস মায়ার আর ওর সাউথ আফ্রিকান সঙ্গীদের কী খবর?'

'এ ব্যাপারে শক্ত স্ট্যাণ্ড নিয়েছে ইরিত্রিয়ান সরকার। আসমারাতেই বিচার হবে ওদের। ধরা পড়া সুদানিজ গার্ডদেরও একইভাবে দাঁড়াতে হবে কাঠগড়ায়। আর হ্যাঁ... তোমার বন্ধু সোহেল আহমেদ এখন ইজরায়েলে। বন্দি অবস্থায়

ইয়োরাম রাবাকের গ্যাঙের অনেককে দেখেছে ও, এখন শিন-বেটকে সাহায্য করছে ওদেরকে আইডেন্টিফাই করার ব্যাপারে। পুরো চক্রটাকেই ধ্বংস করে দেব আমরা।'

'খালি রাবাক-ই পার পেয়ে গেল, তাই না? হার্ট-অ্যাটাকের কথা বলছি... একেবারে সময়মত হলো ওটা। ধরা-টরা পড়তে হলো না!'

একটু হাসল দিনা। 'পেপারের ওই খবরটা স্রেফ একটা কাভার স্টোরি। আসল ঘটনা চুপি চুপি জানাই, রাবাককে প্রাইম মিনিস্টার নিজে গুলি করে মেরেছেন!'

'সেটা আমিও জানি,' রানা হাসল। 'তোমাকে আসলে একটু টোকা দিয়ে দেখছিলাম। হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে রোজ আমারও তো কথা হয়।'

'জানা খবর নতুন করে শুনছ আমার মুখ থেকে?' দিনা ভুরু কোঁচকাল।

'না, না,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'ইরিত্রিয়ায় কী ঘটছে, তা জানা নেই আমার... সত্যি! ওখানকার খবরই তো জানতে চাইলাম তোমার কাছে।'

'ওখানে তো সব ভাল। ভ্যালি অভ ডেড চিলড্রেনে ডায়মণ্ড মাইনিঙের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। আবেলকে ওখানকার চিফ সুপারভাইজর হবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে ইরিত্রিয়ান সরকারের পক্ষ থেকে। লণ্ডনের ডায়মণ্ড কার্টেলের সঙ্গেও ওদের খনিজসম্পদ-মন্ত্রীর একটা মিটিং হয়েছে গত পরশু। খুব শীঘ্রি একটা চুক্তি হবার কথা, সেটা দু'পক্ষ সই করে দিলে আগামী মাস থেকেই ইরিত্রিয়ান হীরার শিপিং শুরু হয়ে যাবে।'

'তা হলে সত্যিই ইরিত্রিয়ার ভাগ্য বদলাচ্ছে?' আশান্বিত কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

'সেটা জানার জন্য আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে,' বলল দিনা। 'তৃতীয় বিশ্বের আর সব দেশের মত একই অভিশাপ বিরাজ করছে ইরিত্রিয়াতেও। দুর্নীতি আর স্বার্থপরতার থাবা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে একটা কেন, দশটা হীরার খনিও কারও ভাগ্য বদলাতে পারবে না।'

'তা অবশ্য ঠিক বলেছ,' রানা স্বীকার করল।

'তবে একটা ব্যাপার,' বলল দিনা, 'খনিটাতে আর্ক অভ দ্য কাভানেন্ট সত্যিই আছে কি না, তা এখনও জানা যায়নি।'

'কোনোদিন যাবে বলেও মনে হয় না,' গম্ভীর গলায় বলল রানা।

'মানে!'

'মনে নেই তোমার, দিনা, সেদিন হিলারের সঙ্গে লড়াইয়ের ফাঁকে বিশাল গুহাটার ভিতর অদ্ভুত একটা আভা দেখেছিলাম আমরা? ওটা ন্যাচারাল কোনও আলো বলে মনে হয়নি, আমার স্থির বিশ্বাস—ওখানে আমাদের চেনাজানা বৃত্তের বাইরের অন্য একটা কিছু ছিল। আর্ক অভ দ্য কাভানেন্ট কি না, তা বলতে পারব না, তবে কিছু একটা তো বটেই! সমস্যা হলো, ওটা এখন লাখ লাখ টন পাথরের তলায় চাপা পড়ে গেছে। ওখানে আসলে কী ছিল, তা জানার আর কোনও উপায় নেই।'

'কী বলছ তুমি!' উত্তেজিত গলায় বলল দিনা। 'এ-কথা... এ-কথা আগে

বলোনি কেন? এখুনি আবেলের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার। ওকে ওই জায়গাটা খুঁড়ে...'

'না,' দিনার বাহুতে চাপ দিয়ে বলল রানা। 'কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। শুধু তোমার-আমার মাঝেই গোপন থাকুক ব্যাপারটা।'

বিস্মিত চোখে রানার দিকে তাকাল দিনা। 'কিন্তু কেন?'

'নিজেই ভেবে দেখো,' বলল রানা, 'ওটার জন্য কত মানুষ মরেছে এ-পর্যন্ত? যদি তল্লাশিটা জারি রাখা হয়, তা হলে আরও মরবে। তাতে কী লাভ হবে ইজরায়েল, বা বাকি পৃথিবীর? শুরুতে জিনিসটা কী করতে পারত, জানি না; কিন্তু আর্ক অভ দ্য কাভানেন্ট এখন শুধু ধর্মে-ধর্মে হানাহানির জন্ম দিতে পারে, আর কিছু না। ওটা বের করে আনা কি উচিত হবে বলে মনে করো? তারচেয়ে থাকুক না ওটা যেমন আছে।' একটু থামল ও। তারপর বলল, 'ব্রাদার আব্রাহাম কী বলেছিলেন, মনে আছে? মেনেলিককে ঈশ্বর নির্দেশ দিয়েছিলেন আর্কটা আফ্রিকায় নিয়ে আসতে। ব্যাপারটা যদি সত্যি হয়, আমি বলব—গোটা মানবজাতিকে বাঁচাবার জন্য অমন নির্দেশ দিয়েছিলেন ঈশ্বর, লুকিয়ে রাখতে বলেছিলেন ওটাকে। আর্কটার জন্য তখন যেমন তৈরি ছিলাম না আমরা, আজও নই। ওটা লোকচক্ষুর আড়ালে থাকাই ভাল।'

'এভাবে ব্যাপারটা ভেবে দেখিনি আমি,' নরম গলায় বলল দিনা। চোখ বুজে ভাবল কিছুক্ষণ। 'ঠিক আছে, ব্যাপারটা তা হলে গোপনই রাখব আমি।'

'ধন্যবাদ!' আন্তরিক ভঙ্গিতে বলল রানা।

ডেক-চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল দিনা। মোহনীয় একটা ভঙ্গিমা করে বলল, 'সমস্যা কী, জানো? এই ইয়টে কিছুই গোপন থাকে না। ওই যে, আমি কীভাবে রিপোর্ট পাঠাই—সেটা তুমি যেমন জানো; তেমনি আমিও জানি, রাতে বিছানায় আসার আগে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তুমি ঠিক কী ধরনের ব্যায়াম করো।'

'কী বললে?' চমকে উঠল রানা।

মুচকি হাসি ফুটল দিনার ঠোঁটে। 'দরজার ফুটো শুধু বাথরুমে নয়, চেঞ্জিং রুমেও আছে!'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা, টান দিয়ে দিনাকে এনে ফেলল বুকে। 'কিছুই গোপন নেই?'

'একটা জিনিস বাদে,' বলল দিনা। 'তুমি আমাকে কতটা ভালোবাসো...'

পাঁজাকোলা করে ওকে তুলে নিল রানা, চুমু খেল ঠোঁটে। 'জানতে চাও?'

'হ্যাঁ!' গলাটা কেঁপে গেল দিনার।

ওকে নিয়ে কেবিনের দিকে রওনা হলো রানা। ইয়টের নীচে কোলাহল করে উঠল নীল নদের ঢেউ।

কল কল। ছল ছল।

***